ভূমিকা

ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। যেখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ জন্য ইসলামকে পৃথিবীর সকল ধর্মের পণ্ডিতগণই সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলাম শব্দের মধ্যেই নিহিত শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও আত্মসমর্পণ। আল্লাহ প্রদত্ত এ ধর্মকে ইসলাম নামে অভিহিত করার কারণ হলো এ ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পণ করে ও তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করে। সে কারণেই এর অনুসারীকে মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী বলে। হযরত আদম (আ.) হতে মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলগণের ধর্মই ছিল ইসলাম। নবী ও রাসূলগণ সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদারতা ও সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাই সার্বজনীন মানবতার ধর্ম ইসলাম বিশ্বজনীন উদারতা ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টির প্রধান অন্তরায় সাম্প্রদায়িকতাকে সমূলে বিনাশ করেছে। শান্তির ধর্ম ইসলামে অশান্তি, মানুষ হত্যা ও বর্বর হামলার স্থান নেই। তবে দেশে দেশে কিছু দেশীয় উগ্রবাদী ও জঙ্গি থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি তৎপরতার মূল উৎপত্তিস্থল আফগানিস্তান, ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ। যুগ যুগ ধরে পশ্চিমা শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার শিকার এসব অঞ্চলের মানুষেরা। এই শতাব্দীর শুরুর দিকে নেতৃত্ব পরিবর্তনের লক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং তাদের সহযোগী কিছু দেশ যুদ্ধ শুরু করে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়ায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার 'ইসলাম ধর্মের বিকৃত ও মনগড়া ব্যাখ্যাদানকারী উগ্রবাদীদের প্ররোচনা ও পরিকল্পনা রয়েছে এগুলোর পেছনে। পবিত্র কুরআনে জিহাদ বা কিতাল সম্পর্কিত কয়েকটি খণ্ডিত আয়াত ও হাদিসের অংশ বিশেষ অর্ধ-শিক্ষিত, সাধারণ শিক্ষিতদেরকে বুঝানো হয় যে, অন্যান্য ফরযের ন্যায় জিহাদ বা কিতাল ফরয। জিহাদ বা কিতাল আমল করে নিহত হলে অতি সহজে বেহেশতে যাওয়া যাবে। তাই তারা অতি আবেগী ও প্ররোচিত হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে স্বসস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আর যখন তারা সরাসরি সংগ্রামের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের সুযোগ না পায় তখন তারা জঙ্গিবাদে জড়িয়ে বোম হামলা ও আত্মঘাতী বোমা হামলা করে মানুষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের এ বিষবাস্প দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে। দেশের নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্রীয় সরকারের মূল কর্তব্য। যা সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের কারণেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই এখন যৌক্তিক কারণেই জগতের অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি জঙ্গিবাদ নিয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্ব জঙ্গিবাদ মানবসমাজকে ঠেলে দিচ্ছে এমন একটি অন্ধকার সময় ও স্থানের দিকে, যেখানে গণতান্ত্রিক সমাজের ধারণাগুলো বিলুপ্ত ও বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তারা সমাজ কাঠামোতে ভাঙ্গন ধরিয়ে সুচতুর কৌশলে মানব সমাজে বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে তা করতে যাচ্ছে। যারা সভ্য মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার কিংবা আচার আচরণের মূলে কুঠারাঘাত দিয়ে ভয়াল বিপর্যয় ঘটিয়ে নিত্যনতুন নির্মম সন্ত্রাস, অমীমাংসিত হত্যাকাণ্ড ও অরাজক পরিস্থিতিতে অসহনীয় পারিপার্শ্বিকতা তৈরি করে। যাতে নাগরিক মানুষের মনে সন্দেহ, সংশয়, আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি হয় এবং সুশীল সমাজে স্বাধীনতা ও সাধারণ মানুষের বাঞ্ছিত জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়ে সামাজিক পরিবেশ জুড়ে নেমে আসে মৃত্যুশীতল বিপর্যয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জঙ্গিরা নিজেদের মধ্যে গোপন বাক্যালাপ ও তথ্য আদান-প্রদান ও সরবরাহের কাজে নব্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তৈরি করে নিয়েছে এনক্রিপ্টেড রেডিওর মাধ্যমে তাদের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। যে নেটওয়ার্কে নিজেদের একান্ত বিশ্বস্ত জঙ্গিকর্মী ছাড়া অন্যের প্রবেশাধিকার অসম্ভব। এমনকি অপরাধ জগতের সব রকম তথ্যানুসন্ধান জানা সুচতুর গোয়েন্দারাও সেখানে অধিকাংশ সময়েই প্রবেশ করতে ব্যর্থ। সেই কারণেই তাদের মাস্টার প্লান, প্রোগ্রাম, রুটিনমাফিক জঙ্গিদের মিটিং-কনফারেন্স সম্পর্কে জানতে কিংবা আলাপ আলোচনার বিষয়ে অবগত হতে তারা অনেক সময়েই থেকে যাচ্ছেন দুর্ভেদ্য অন্ধকারে। ধর্মের নামে মানুষ হত্যা, বোমা হামলা, আত্মঘাতী বোমা হামলা করে মানব সভ্যতাকে অস্থির করে তুলেছে। এই উগ্র জঙ্গিগোষ্ঠীর অমানবীক, পৈশাচিক, নির্দয়, ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় অপকর্মে শান্তির ইসলাম ধর্ম যেন অশান্তির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় স্বার্থে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ছড়াচ্ছে, তারা বাস্তবিক পক্ষে ইসলামের মূল ভিত্তির

ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কুরআন ও হাদিসে তাদের এমন কর্মকাণ্ডের পক্ষে কোন দলিল প্রমাণ নেই। সর্বাবস্থায় ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে পৃথিবীতে অশান্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে সরকার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এ গবেষণা কর্মটি তার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাই এ ব্যাপারে কার্যক্রম পরিচালনা করতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তার দিক নির্দেশনা এ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে দেওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। সে সাথে জঙ্গিবাদের শাস্তির বিধান বর্ণনার মাধ্যমে সমাজ থেকে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে প্রশাসন ও সরকারকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আরো অধিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সাজানো হয়েছে-

প্রথম অধ্যায়: ইসলামের মর্মবাণী উদারতা ও সম্প্রীতির পরিচিতি। এ অধ্যায়ে ইসলামের মর্মবাণী, উদারতা ও সম্প্রীতির পরিচয়, ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির অপরিহার্যতা, আল-কুরআনে উদারতা ও সম্প্রীতি, আল-হাদীসে উদারতা ও সম্প্রীতি, ঈমান আকীদা ও ইবাদত বন্দেগীতে উদারতা ও সম্প্রীতি, অমুসলিমদের সাথে আচার-আচরণে উদারতা ও সম্প্রীতি, ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির মূলনীতি, ও ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের পরিচয়। এ অধ্যায়ে সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের পরিচিতি, চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ- এর পারিভাষিক পরিচিতি, পারিভাষিক পরিচিতির বিশ্লেষণ, ইসলামে চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রকারভেদ, সন্ত্রাসের নেপথ্যে আসলে কারা, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের উৎস, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সূত্রপাত ও বিস্তার, সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের কারণ ও প্রতিকার, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিভিন্ন কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামের ইতিহাসে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ইতিবৃত্ত। এ অধ্যায়ে ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস, বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ, বাংলাদেশীয় জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রবাদী জঙ্গি দলসমূহ, কালো তালিকাভুক্ত দল সমূহ, বিশেষ ২৩ জেলায় জঙ্গি তৎপরতা, নিষিদ্ধ চারটি আত্মস্বীকৃত জঙ্গি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনসমূহ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জঙ্গি সংগঠনগুলো, মায়ানমার ভিত্তিক জঙ্গি গ্রুপ, জঙ্গি অর্থায়নে অভিযুক্ত বিভিন্ন এনজিও সংস্থা, প্রকাশ্যে বিভিন্ন জঙ্গিদলের উত্থান পর্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার বিবরণ। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলার ইতিহাস, আনসার আল ইসলাম ও আইএস এর জঙ্গি কার্যক্রম, আনসার আল ইসলাম, নব্য জেএমবি জঙ্গি হামলা, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা, বিভিন্ন জঙ্গিদলের সশস্ত্র হামলা সমূহের বিবরণ সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: জিহাদের নামে বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা। এ অধ্যায়ে বিভ্রান্তির সমকালীন পেক্ষাপট, জিহাদ বা কিতাল বিষয়ক অপপ্রচার, ইসলামে জিহাদের নামে কাফির ও মুশরিক হত্যায় বিভ্রান্তি, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় খারিজীগণের বিভ্রান্তি, ইসলামী শরীয়তে প্রকৃত জিহাদ ও তার পূর্বশর্ত, জিহাদের শাব্দিক অর্থ, জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা, জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্যাবলী, জিহাদ বা কিতাল ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী, জিহাদের ফযীলত ও বিধান, জিহাদ বা কিতাল সম্পর্কে আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের কতিপয় বিভ্রান্তির অপনোদন, বাতিল দল-উপদলসমূহের জিহাদ বা কিতাল বিষয়ক বিভ্রান্তি, বাতিল ও খারিজীগণের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণ, সমাজ পরিবর্তনে সাহাবী ও পরবর্তীদের কর্মধারা, জিহাদ বনাম সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ইসলামী আইনে ধর্মান্ধতা, সহিংসতা ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান। এ অধ্যায়ে ইসলামের নামে সহিংসতা, ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদ সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান ও সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে সার্বিক মূল্যায়নে কিছু প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে উপসংহার এবং গ্রন্থপঞ্জি নামে সহায়ক গ্রন্থাবলির একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের মর্মবাণী
উদারতা ও সম্প্রীতির পরিচয়
ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির অপরিহার্যতা
আল-কুরআনে উদারতা ও সম্প্রীতি
আল-হাদীসে উদারতা ও সম্প্রীতি
ঈমান আকীদা ও ইবাদত বন্দেগীতে উদারতা ও সম্প্রীতি
অমুসলিমদের সাথে আচার-আচরণে উদারতা ও সম্প্রীতি
ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির মূলনীতি
ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির উদ্দেশ্য

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের মর্মবাণী

বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে ইসলাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ ধর্মের অনুসারীদের জীবনধারা, কর্মপদ্ধতি, আদর্শ ,কর্মচাঞ্চল্য, ত্যাগ, সাধনা ও সাফল্য ইসলাম নামক শব্দে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত আদম (আ.) সর্ব প্রথম ইসলাম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। তারপর আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসূল। তাঁরা সবাই ইসলামের কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর তাগুতকে।"[১] নবী-রাসূলের তথা ইসলামের মূলবাণী হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই)। পৃথিবী সৃষ্টি লগ্ন থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত যত নবী ও রাসূল এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন, তাঁদের সবারই ইসলামের দাওয়াতের ধরণ একই ছিল। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর ইসলামের দাওয়াতের ধরণ ছিল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইব্রাহীমু খলিলুল্লাহ"। হযরত ইসমাঈল (আ.) এর ইসলামের দাওয়াতের ধরণ ছিল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইসমাঈলু জবিহুল্লাহ"। হযরত মুসা (আ.) এর ইসলামের দাওয়াতের ধরণ ছিল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ"। হযরত ঈসা (আ.) এর ইসলামের দাওয়াতের ধরণ ছিল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রুহুল্লাহ"।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দাওয়াতের ধরণ ছিল "লা-ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল)। ইসলামের এই দাওয়াতের মাধ্যমে কুফর, শিরক, পৌত্তলিকতা, মুর্তি পুজাকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হয়েছে। ভূলুন্ডিত করা হয়েছে সকল অন্যায় শিরক ও কুফরি মতবাদকে। আর ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যার মধ্যে কোন বক্রতা, বিভ্রান্তি ও অকল্যাণকর কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ নিজেই এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, ফেরেশেতা এবং জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এই সাক্ষ্যই দিচ্ছেন।"[২] মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যা ইসলামে আলোচনা করা হয়নি; মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যা কিছু তার জীবনে প্রয়োজন সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বিধৃত করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মুখ নিসৃত বাণী তথা হাদিসের মাধ্যমে বিস্তারিত বর্ণনা ও বাস্তব প্রয়োগ করে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইসলাম ব্যক্তিগত,[৩] পারিবারিক,[৪] সামাজিক,[৫] অর্থনৈতিক,[৬] রাষ্ট্রীয়,[৭] ও আর্ন্তজাতিক [৮] জীবনকে ব্যাপৃত করে। কেবল সেই মন্ত্রের নাম ইসলাম নয় যা মুখস্থ পড়লেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, আর না তা কতিপয় আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম যা আদায় করলে আর কিছু করার থাকে না বরং ইসলাম হচ্ছে

---

১. আল কুরআন, ১৬ : ৩৬

২. আল কুরআন, ৩ : ১৮

৩. ইসলাম শিক্ষা ও সংস্কৃতি, তাকওয়া, সিদক, সবর, জিকির, তাওয়াক্কুল, শোকর, ইহসান, কর্তব্যপরায়নতা, হালাল উপার্জন, হারাম বর্জন, স্বদেশ প্রেম, নারীর অধিকার ও সম্মানবোধ, শিশু ও প্রতিবন্ধী অধিকার ইত্যাদি।

৪. সন্তানের প্রতি পিতামাতার, পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য, ভাই-বোনের প্রতি করণীয়, নৈতিক, মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ইত্যাদি।

৫. প্রতিবেশীর অধিকার, আত্মীয় স্বজনের অধিকার, নিরক্ষরতা ও সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ, গণশিক্ষা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, আদল, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, সামাজিক সমস্যাবলী তথা মিথ্যাচার, প্রতারণা, গিবত, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, অসৎসঙ্গ, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মাদকাশক্তি, ধুমপান, অধিকারহরণ, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ছিনতাই, হত্যা, আত্মহত্যা, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, জ্বেনা, ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তি, ইভটিজিং, রেগিং, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিময় সমাজ গঠন ইত্যাদি।

৬. পরিমিত ব্যয়, অপব্যয় বা কৃপনতা পরিহার, যাকাত প্রদান, যাকাত ব্যয়ের খাতগুলো সঠিকতা যাচাই, রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস তথা উশর, খারাজ, জিজিয়া, ফাই, সাদাকাত, কুরবানী ইত্যাদি।

৭. রাষ্ট্রের বৈধ নিয়ম-নীতির অনুসরণ, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, বিপদ সংকুল মুহূর্তে দেশ রক্ষায় অংশ গ্রহণ, জনগণের সেবায় এগিয়ে আসা, একে অপরের অধিকার সংরক্ষণ, প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম পালন, কোনো ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের ওপর আক্রমণ না করা, দেশের তথ্য সংরক্ষণ ও গোপনীয়তা রক্ষা ইত্যাদি।

৮. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, জাতীয়তাবাদ, সৃষ্টির সেবা, বর্হিবিশ্বের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও দ্বন্ধ নিরসন, যুদ্ধ নয় শান্তি, সামরিক আগ্রাসন পরিহার করে সামগ্রিক ভাবে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাঙ্গীণ ও পূর্ণাঙ্গ এক জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, " নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম।"[৯] তিনি আরো বলেন, "আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবেনা।"[১০] এই জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণ করে আল্লাহ ঘোষণা দেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম ইসলামকে।"[১১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না, তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।[১২] আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়ত ও সত্য দ্বীনসহ যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[১৩] মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচারভিত্তিক শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ সুন্দর সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই।

ইসলাম শব্দের অর্থ

ইসলামের মূল পরিচয় 'ইসলাম' শব্দটির অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মধ্যেই নিহিত। ইসলামের শাব্দিক অর্থ আত্মসমর্পণ করা, নিরংকুশ আনুগত্য প্রদর্শন করা।[১৪] ইংরেজিতে এ অর্থগুলোকে to obey, to surrender বলা হয়।[১৫] আরবী ভাষায় বিখ্যাত ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অভিধান ইবনে মানজুর রচিত 'লিসান আল আরাব' এ বলা হয়েছে, ইসলাম শব্দটি 'ইসতিসলাম' শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে কারো কাছে নত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা।[১৬] ইসলাম শব্দের মূল ধাতু 'সালমুন' এর অর্থ হলো শান্তি ও আত্মসমর্পণ। মানুষের দেহ ও আত্মার পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও প্রশান্তির জন্যেই এ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। ইমাম ইবনে ফারিস রাজি বলেন, ইসলাম 'সালিমা' শব্দ হতে হলে অর্থ হবে সুস্থতা ও মুক্তি। অতএব 'সালামাহ' অর্থ বিপদ ও কষ্ট থেকে মানুষের নিরাপদ থাকা। উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা হলেন 'সালাম'। যেহেতু তিনি দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত, যা মাখলুকের গুণাগুণ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।"[১৭] আল্লাহ হলেন শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা এবং জান্নাত হলো তাঁর আবাস। এ শব্দ থেকেই এসেছে 'আল-ইসলাম'। এর অর্থ মান্য করা, আনুগত্য প্রদর্শন করা। (সুস্থতা ও নিরাপত্তার অর্থের সাথে ইসলামের অর্থের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।) কেননা এটা অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতা থেকে (মুসলিমকে) নিরাপদ করে।[১৮] আল-মুনজিদে 'ইসলাম' অর্থ বলা হয়েছে, কোন প্রকার আপত্তি ছাড়া হুকুমদাতার আদেশ-নিষেধ মান্য করা।[১৯] মোটকথা আভিধানিকভাবে আল-ইসলাম শব্দটি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করার অর্থ বুঝায়। চাই মাখলুকের আনুগত্য হোক বা খালিকের, দ্বীনি বিষয়ে হোক বা পার্থিব, স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্যতামুলক; সকল ক্ষেত্রেই তাকে আল-ইসলাম বলা যাবে।

ইসলামের পারিভাষিক অর্থ

শরীয়াতের পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর অনুগত হওয়া। বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া

---

৯ . আল- কুরআন, ৩ : ১৯
১০ . আল- কুরআন, ৩ : ৮৫
১১ . আল-কুরআন, ৫ : ৩
১২ . আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭
১৩ . আল-কুরআন, ৬১ : ৯
১৪ . শামসুদ্দিন ইবন কায়্যিম জাওযী, ***মুখতারুস সিহাহ*** (কায়রো: দারুল হাদীছ, ১ম সংস্করণ- ২০০১ খ্রি./১৪২২ হি.) পৃ. ১৫৩
১৫ . Oxford Advanced Learner's Dictionary; Seceond Edition:2019,p.543,741
১৬ . সাহিব বিন আব্বাদ, ***আল-মুহিত ফিল লুগাহ্*** (বৈরূত: মাকতাবাতুশ্ শামেলা, ১ম সংস্করণ-১৯৯৪ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ২৬৫
১৭ . আল-কুরআন, ১০ : ২৫
১৮ . আহমাদ ইবন ফারিস আর-রাযী, ***মাকায়িসুল লুগাহ*** (বৈরূত: দারুল ফিকর, প্রকাশের সন- ১৯৭৯ খ্রি./১৩৯৯ হি.) খ. ৩, পৃ. ৯০
১৯ . আলি ইবনুল হাসান, ***আল-মুনজিদ*** (কায়রো: আলিমুল কুতুব, ২য় সংস্করণ- ১৯৮৮ খ্রি.) পৃ. ৩৪৭

বিধান অনুসারে জীবনযাপন করা। ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে মেনে নিয়ে তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ অনুসারে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা। ইমাম ইবনে তাইমিয়া মাজমু আল ফাতাওয়াতে বলেছেন, ইসলাম এর অর্থের মধ্যে রয়েছে, এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা।[২০] ইমাম কুরতুবি বলেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তার আনুগত্য করার নাম ইসলাম। ইমাম আবুল আলিয়া বলেন, এটাই অধিকাংশ বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মত।[২১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ, অতএব তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর, আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও।"[২২] এ সংজ্ঞানুসারে সকল সৃষ্টিই মুসলিম। কেননা তাদের আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। সুস্থতা-অসুস্থতা, জীবন-মৃত্যু, স্বচ্চলতা-দীনতা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক সব মেনে নেয়। কেননা এ ছাড়া যে তাদের ভিন্ন কোন উপায় নেই। আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতে বলা হয়েছে, ইসলাম হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আনীত শরিয়তের অনুসরণ, যথা তাওহিদ-রিসালাতের মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শন করা।[২৩] শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর আনীত দ্বীন ও শরীয়তকে মুলত ইসলাম বলে। হাদিসে জিবরিলে এসেছে, "ইসলাম হলো, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, রমজান মাসের রোজা রাখবে এবং সামর্থ থাকলে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।"[২৪] সুতরাং যে কোনো আনুগত্যের নাম ইসলাম নয়; বরং আনুগত্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর দেয়া বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে। আবার শুধু বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে আনুগত্য করাই যথেষ্ট হবে না যতক্ষণ না তা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনীত শরীয়তের অনুকূলে হবে।

অতএব, প্রকৃত ইসলাম রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আনীত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নাম। এতে যে কমবেশ করবে সে প্রকৃত ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। আবার ইসলাম হলো আল্লাহ তা'আলার নিরঙ্কুশ আনুগত্য স্বীকার করা এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নির্দেশের স্বীকৃতি দেয়া এবং মেনে চলা। এ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য সৃষ্টিজগতের কারো কাছে নয় গোটা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, নিরংকুশ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মালিক রাব্বুর আলামীনের কাছেই। তিনি আসমান যমীনের স্রষ্টাসহ তার মাঝে যা কিছু আছে সে সবের স্রষ্টা এবং সবকিছুর মালিক, সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে যা বুঝায় সেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারীও তিনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় সকল শক্তি আল্লাহর জন্য।"[২৫] তাঁর প্রতি নিরংকুশ ও নির্ভেজাল আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ যে আদর্শের ভিত্তি তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। ইসলামের এ যথার্থ পরিচয় উপলব্দি করতে হলে যার পক্ষ থেকে ইসলাম এসেছে তাঁর সঠিক পরিচয় জানা ও বুঝা অপরিহার্য। আল্লাহ সম্পর্কে যাদের সঠিক ধারণা ও পরিচয় জানা নেই, তাদের পক্ষে ইসলামী আদর্শের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-চেতনা ও লেখনীতে ইসলাম সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি দেখা যায়, তার মূল রহস্য এখানেই।

ইসলামকে ইসলাম নামকরণ

দুনিয়ায় যত ধর্ম রয়েছে তার প্রত্যেকটির নামকরণ হয়েছে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে। অথবা যে জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছে তার নামে। যেমন ঈসায়ী ধর্মের নাম রাখা হয়েছে তাঁর প্রচারক হযরত ঈসা (আ.) এর নামে। বৌদ্ধ ধমের্র নাম রাখা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের নামে। আবার ইয়াহুদী ধর্ম

---

[২০]. তকী উদ্দীন ইবন তাইমিয়া, ***মাযমুআ'ল ফাতাওয়া*** (মদীনা: বাদশাহ্ ফাহাদ প্রকাশনা, প্রকাশের সন- ১৯৯৫ খ্রি./১৪১৬ হি.) খ. ১৮, পৃ. ২৯১-৩০৫

[২১]. সামছুদ্দিন কুরতুবি, ***আল-জামেউ লিআহকামিল কুরআন*** (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিশরিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ- ১৯৬৪ খ্রি./১৩৮৪ হি.) খ. ৪, পৃ. ৪৩

[২২]. আল-কুরআন, ২২ : ৩৪

[২৩]. হোসাইন ইবন আউদা, ***আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা*** (বৈরূত: দারু ইবনে হুজুম, ১ম সংস্করণ- ১৪২৩ হি.) খ. ৪, পৃ. ২৫৯

[২৪]. সহীহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, ***সহীহ মুসলিম*** (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যা, তা.বি) খ. ১ পৃ. ৩৬

[২৫]. আল-কুরআন, ২ : ১৬৫

ইয়াহুদা নামে বিশেষ গোষ্ঠীর নামে জন্ম নিয়েছিল। দুনিয়ায় আরো যে সব ধর্ম রয়েছে, তাদেরও নামকরণ হয়েছে এমনিভাবে। অবশ্য নামের দিক দিয়ে ইসলামের রয়েছে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির সাথে তার নামের সুযোগ নেই বরং 'ইসলাম' শব্দটির অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই গুণই প্রকাশ পাচ্ছে এ নামে। প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং (হে রাসূল!) যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।"[২৬] এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' বলেছিলেন। "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত একটি উম্মত (সম্প্রদায়) সৃষ্টি কর।"[২৭] হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদের প্রতি ওসীয়ত প্রসঙ্গে বলেন, "তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য ধর্মের ওপর মৃত্যুবরণ করো না।"[২৮] হযরত ইব্রাহীম (আ.) এরপর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলমান'। এ উম্মতের ধর্মও 'মিল্লাতে ইসলামিয়াহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্ম। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বে এবং এ কিতাবেও (কুরআনেও)।"[২৯]

হযরত ঈসা (আ.) এর সহচরগণ (হাওয়ারীগণ) এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন, "আপনি সাক্ষী থাকুন যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।"[৩০] মুলত প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দ্বীনই ছিল ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দ্বীনে মুহাম্মদীই 'ইসলাম' নামে অভিহিত করা হয়েছে-যা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।[৩১] উল্লেখ্য যে, নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, কোন ব্যক্তি, দেশ ও জাতির মধ্যে এ ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ইসলামের গুণরাজি সৃষ্টি করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যে সব খাঁটি ও সৎ লোকের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া যাবে, তারাই 'মুসলিম'। এ ধরণের লোক অতীতেও ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবেন। সুতরাং সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোন অর্থই নেয়া হোক না কেন, সারমর্ম হবে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাবের পর কুরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো ধর্ম নয়।

ইসলামের তাৎপর্য

এ পৃথিবীর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা এবং যাবতীয় সৃষ্টি এক অপরিবর্তনীয় বিধি-বিধান মেনে চলছে। সেই বিধানের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। দুনিয়া এক নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলছে নির্দিষ্ট এক কক্ষপথ অতিক্রম করে। তার চলার জন্য যে সময়, গতি ও পথ নির্ধারিত রয়েছে, তার কোন পরিবর্তন কখনো নেই। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, পানি, তাপ ও আলো-সব কিছুই এক সঠিক নিয়মের অধীন হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর প্রত্যেকে (পৃথিবীর সব কিছুই) নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।"[৩২] জড়, গাছপালা, পশু-পাখির রাজ্যেও রয়েছে তাদের নিজস্ব নিয়ম। সেই নিয়ম অনুসারে তারা সৃষ্টি হয়, বেড়ে উঠে, ক্ষয় হয়, বাঁচে ও মরে। মানুষের অবস্থা চিন্তা করলে দেখা যায় যে,

[২৬]. আল-কুরআন, ৪২ : ১৩
[২৭]. আল-কুরআন, ২ : ১২৮
[২৮]. আল-কুরআন, ৩: ১০২
[২৯]. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮
[৩০]. আল-কুরআন, ৫ : ১১১
[৩১]. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি, *তাফসীর মাআরেফুল কুরআন*, প্রকাশনী: মদিনা পাবলিকেশান্স, পৃ. ১৬৯
[৩২]. আল-কুরআন, ৩৬ : ৪০

ইহাও এক বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এক নির্দিষ্ট জীবতাত্ত্বিক বিধান অনুযায়ী সে জন্মে, শ্বাস গ্রহণ করে, পানি, খাদ্য, তাপ ও আলো আত্মস্থ করে বেঁচে থাকে। তার হৃৎপিণ্ডের গতি, তার দেহের রক্ত প্রবাহ, শ্বাস-প্রশ্বাস একই বাঁধাধরা নিয়মের অধীন হয়ে চলছে। তার মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, শিরা-উপশিরা, পেশীসমূহ, হাত, পা, জিহবা, কান, নাক- এক কথায় তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ সেই একই নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে। দুনিয়ার বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সবকিছুই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থ এ বিধানকর্তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং সবই তাঁরই নিয়ম মেনে চলে। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম, তাই এদিক দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "প্রত্যেক নবজাতক ফিৎরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টান অথবা অগ্নি উপাসক করে।"[৩৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা কি চায় আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।"[৩৪] চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গাছপালা, পাথর ও জীব-জন্তু সবই মুসলিম। যে মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে পূজা করে এবং আল্লাহর কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার করে, স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে সেও মুসলিম, কারণ তার জীবন-মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহর বিধানের অনুসারী। তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার দেহের প্রতিটি অনুশাসন ইসলামের নিয়মানুসারে চলে। কারণ তার সৃষ্টি, বুদ্ধি ও গতি সবকিছুই আল্লাহর দেয়া নিয়মের অধীন। মূর্খতাবশত যে জিহবা দিয়ে সে শিরক ও কুফর এর কথা বলছে, প্রকৃতির দিক দিয়ে তাও মুসলিম। একত্ববাদের বিপরীতে আর একটি বিষয় হচ্ছে শিরক। শিরক আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ পরস্পর অংশীদার করা, অংশীদার সাব্যস্ত করা। পরিভাষায় বিভিন্ন প্রভুর উপর বিশ্বাস করাকে শিরক বলে।'[৩৫] আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা বা তাঁর সমকক্ষ মনে করা সবচেয়ে বড় শিরক। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া নবী, দেব-দেবী, পীর-আউলিয়া বা অন্য কোন কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে তাহলে সে মুশরিক হয়ে যায়। খাদ্য অন্বেষণে বা রোগমুক্তির বা অন্য কোন কামনা বাসনা পূরণের জন্য আল্লাহ ছাড়া কাউকে আহ্বান করা হয় তাহলে সে মুশরিক হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- "আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারেনা এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারেনা। অতএব তুমি যদি কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.

"আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করো না; যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এরূপ কর তাহলে তুমি এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।"[৩৬]

আল্লাহ তা'আলা জীবন, রিজিক, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান সবকিছু দান করছেন তাঁর সাথে কাউকে সমকক্ষ মনে করা বড় অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর স্মরণ কর, যখন লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হলো বড় যুলম।"[৩৭] কেউ যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে তাহলে তার সকল নেক আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত।"[৩৮] এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, শিরক সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। কেউ যদি মনে শিরক

[৩৩]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-সহীহুল বুখারী, ***সহীহুল বুখারী,*** (বৈরূত: দারুত্ তূকী নাজাহ, ১ম সংস্করণ-১৪২২ হি.) খ. ২ , পৃ. ১০০

[৩৪]. আল-কুরআন, ৩ : ৮৩

[৩৫]. ড. মুহাম্মদ রাউস কালয়াভী; ড. হামেদ সাদেক কাইনাভী, মু'জামু লুগাতুল ফুকাহা, করাচি : পাকিস্তান, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ২৬০

[৩৬]. আল-কুরআন, ১০ : ১০৬

[৩৭]. আল-কুরআন, ৩১ : ১৩

[৩৮]. আল-কুরআন, ৩৯ : ৬৫

লালন করে দান-সদকা, নেক-আমল বা পূণ্যের কাজ-কর্ম করে তা সম্পূর্ণরূপে নিস্ফল হবে। তাই মুসলিম মুমিন ছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী, নাসারাদের সকল ভাল কর্ম আল্লাহর দরবারে গ্রহনীয় হবে না। শিরক পৃথিবীর সর্বোচ্চ অপরাধসমূহের একটি অন্যতম অপরাধ। এ অপরাধ ক্ষমা করার অযোগ্য। কেননা বান্দা তার স্বীয় স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে অংশী (শিরক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না । এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শিরক) করে, সে এক মহাপাপ করে।"[৩৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"[৪০] তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক মুহাম্মদ (সা.) সর্বদা শিরক থেকে পরিত্রাণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। মুশরিকরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না, বরং পূণ্যের কাজ মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল তারা এ অবস্থার ওপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যখন সে এ অবস্থার ওপর কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়। তাই দুনিয়ার জীবনে মানবিক আইন বা রাজনৈতিক কারণে শাস্তি অনিবার্য না হলে ও পরকালে জাহান্নামের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি অবধারিত ও চিরস্থায়ী হবে। কোন মুসলিম যদি আল্লাহর সাথে শরীক করে তাহলে সে মুশরিক হয়ে যায়। কবিরা গুনাহ হল কুফর। কোন ব্যক্তি বৈধ মনে করে বারবার কবিরা গুনাহ করলে বেঈমান হয়ে যায়। এ কুফর শোকরের বিপরীত এর আভিধানিক অর্থ ঢেকে রাখা, গোপন করা।

ইসলামের পরিভাষায় কুফর হলো আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অস্বীকার করা এবং যা তিঁনি দ্বীনের প্রয়োজনে নিয়ে এসেছেন তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।[৪১] আর এ কুফর হল ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া, তার মূল অর্থ বিশ্বাসে কুফরী করা।'[৪২] যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, হাদীস, জন্ম-মৃত্যু, কবর-হাশর, ফেরেশতা, ইত্যাদি অস্বীকার করে এমনকি তার জন্মকে পর্যন্ত অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়। ব্যক্তির কুফরির কারণে তার নেক আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যায়। কাফির ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকে। সে প্রকৃতিকে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক মনে করে। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ পৃথিবীতে আসে আবার চলে যায়, তাতে কারো কোন হাত নেই। তার এ চিন্তা অমূলক ও ভ্রান্ত। কেননা পৃথিবীর এমন কোন কিছু নেই যা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বাহিরে আছে। সব কিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, মানুষ স্বীকার করুক আর না করুক। কেউ যদি আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাতে আল্লাহ তা'আলার কোন কিছু যায় আসে না বরং সে ব্যক্তি নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা সে দুনিয়ার জীবনে সাময়িক কল্যাণ লাভ করলেও মূলত সে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপমান নিয়ে বেঁচে থাকে। তার সামাজিক কোন মূল্যায়ন থাকে না। আর পরকালীন জীবন তার জন্য ভয়াবহ ও কঠিন হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- "আর সে ব্যক্তির চেয়ে যালিম আর কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নিকট সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে? জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়?"[৪৩]

কাফেররা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করলেও পরকালে তারা সবই সত্য অবলোকন করবে। তখন তারা আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় দোয়া করবে, কিন্তু তা কবুল করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন "নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; সেদিন মানুষ তার

---

৩৯. আল-কুরআন, ৪ : ৪৮
৪০. আল-কুরআন, ১৮: ১১০
৪১. মুফতী আমিমুল ইহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৫
৪২. মুহাম্মদ ইবনে জামিল জয়নু, *মাজমুয়াতু রেসায়েলেত তাওজিহাতুল ইসলামিয়া,* (রিয়াদ: দারুস্ সাময়ী লিন্নশরে ওয়াত্ তাওযী, ৯ম সংস্করণ: ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.) পৃ. ২৮৯
৪৩. আল-কুরআন, ২৯: ৬৮

কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং অবিশ্বাসী বলবে, হায় আফসোস! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম।"[৪৪] দ্বীন বা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কিন্তু বুঝে-শুনে ইসলাম গ্রহণ করার পর তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। অস্বীকার করলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। যে মানুষের কথা ওপরে বলা হয়েছে, তার মোকাবিলায় রয়েছে আর এক শ্রেণির মানুষ। সে মুসলিম হয়েই সৃষ্টি হয়েছে এবং না জেনে, না বুঝে জীবনভর মুসলিম হয়েই থেকেছে। কিন্তু নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে আল্লাহকে চেনেনি এবং নিজের নির্বাচন ক্ষমতার সীমানার মধ্যে সে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে। এ ধরণের লোক হচ্ছে কাফির।"[৪৫]

যে মাথাকে জোরপূর্বক আল্লাহ ছাড়া অপরের সামনে অবনত করছে, সেও জন্মগতভাবে মুসলিম, অজ্ঞতার বশে যে হৃদয়ের মধ্যে সে অপরের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করে, তাও সহজাত প্রকৃতিতে মুসলিম। তারা সবাই আল্লাহর নিয়মের অনুগত এবং তাদের সব কাজ চলছে এ নিয়মের অনুসরণ করে। একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতির লীলাখেলার মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের রয়েছে দুটি দিক। এক দিকে সে অন্যান্য সৃষ্টির মতোই জীব জগতের নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা রয়েছে। তাকে সেই নিয়ম মেনে চলতে হয়। অপরদিকে, তার রয়েছে জ্ঞানের অধিকার, চিন্তা-ভাবনার মাধমে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছার সক্ষমতা। নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন বিশেষ মতকে সে মেনে চলে, আবার কোন বিশেষ মতকে সে অমান্য করে, কোন পদ্ধতি সে পছন্দ ও অপছন্দ করে। জীবনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কখনো কোন নিয়ম-নীতিকে সে স্বেচ্ছায় তৈরী করে নেয়। কখনো বা অপরের তৈরী নিয়ম-নীতিকে নিজের করে নেয়। এ দিক দিয়ে সে দুনিয়ার অন্যবিধ সৃষ্ট পদার্থের মতো একই ধরাবাঁধা বা নিয়মের অধীন নয় বরং তাকে দেয়া হয়েছে নিজস্ব চিন্তা, মতামত ও কর্মের স্বাধীনতা। মানব জীবনে এ দুটি দিকেরই রয়েছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। প্রথম বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মানুষ দুনিয়ার অপর সব পদার্থের মতই জন্মগত মুসলিম এবং পূর্বের সেই অনুসারে মুসলিম হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মুসলিম হওয়া না হওয়ার উভয়বিধ ক্ষমতা তার মধ্যে রয়েছে এবং এ নির্বাচন ক্ষমতার প্রভাবেই মানুষ বিভক্ত হয়েছে দুটি শ্রেণীতে। এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে তারা, যারা স্রষ্টাকে হৃদয় দিয়ে জানে, তাকেই তাদের একমাত্র মনিব ও মালিক বলে মেনে নিয়েছে এবং যে ব্যাপারে তাদেরকে নির্বাচনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সেখানেও তারই নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলবার পথই তারা বেছে নেয়, তারা হয়েছে পরিপূর্ণ মুসলিম। তাদের জীবনই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহতে সমর্পিত। না জেনে-শুনে যারা নিয়মের আনুগত্য করছে জেনে-শুনেও তারই আনুগত্যের পথই তারা অবলম্বন করছে। অনিচ্ছায় তারা আল্লাহর বাধ্যতার পথে চলেছিল, স্বেচ্ছায়ও তাঁরই বাধ্যতার পথ তারা বেছে নেয়। তারা হচ্ছে এখন সত্যিকার জ্ঞানের অধিকারী। যে আল্লাহ তাদেরকে জানার ও শিখার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই আল্লাহকেই তারা জেনেছে। এখন তারা হয়েছে সঠিক যুক্তি ও বিচার ক্ষমতার অধিকারী। কারণ যে আল্লাহ তাদেরকে চিন্তা করার, বুঝার ও সঠিক সিদ্ধান্ত কায়েম করার যোগ্যতা দিয়েছে, চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝে-শুনে তারা সেই আল্লাহরই আনুগত্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাদের জিহবা হয়েছে সত্যভাষী, কেননা তারা সেই প্রভুত্বের স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে, যিনি তাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন। এখন তাদের পরিপূর্ণ জীবনই হচ্ছে পূর্ণ সত্যাশ্রয়ী। কারণ ইচ্ছা-অনিচ্ছার উভয় অবস্থায় তারা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী। সমগ্র সৃষ্টির সাথেই তাদের মিতালী। কারণ সৃষ্টির সকল দুনিয়ার বুকে তারা হচ্ছে আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি) সারা দুনিয়া এখন তাদেরই এবং তারা হচ্ছে আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।"[৪৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "আমি সৃষ্টি করেছি জ্বীন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।[৪৭]

---

[৪৪]. আল-কুরআন, ৭৮: ৪০

[৪৫]. ড. মুহাম্মদ রাউস কালয়াজী; ড. হামেদ সাদেক কায়নাবী, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৪৬২

[৪৬]. আল- কুরআন, ২ : ৩০

[৪৭]. আল- কুরআন, ৫১ : ৫৬

ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্ক

ইসলাম এবং ঈমানের সংজ্ঞায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। ঈমান হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ। অর্থাৎ ঈমান ইসলামের একটি অংশ। তবে বাহ্যিক আমলকে ইসলাম ও অন্তরের আমলকে ঈমান বলে। ইসলাম ও ঈমান শব্দ দ'ুটি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র দ্বীন এবং পরম কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা। অতএব ইসলাম অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার ওপর সংশয়হীনভাবে ঈমান আনার সাথে সাথে উপরোক্ত বিষয়াদিতে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের প্রতি ঈমান এনে তা অনুসরণ করা। যারা তা করে তাদেরকে মুসলিম বলা হয়। ইসলামের প্রধান ভিত্তি হলো পাঁচটি। রাসূল্লাহ (সা.) বলেছেন, ইসলামের প্রধান বুনিয়াদ হলো পাঁচটি; ১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত আদায় করা, ৪. রোযা রাখা, ৫. হজ্জ আদায় করা।[৪৮] উক্ত হাদীসে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের একটি বুনিয়াদ হিসেবে উল্লেখ করে ঈমানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে প্রথম বুনিয়াদ হলো ঈমান। অতএব কেউ শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস করলে তার ঈমান বিশুদ্ধ হবে না বিধায় নিম্মের পাঁচটি বিষয়ে ঈমান আনতে হবে-

ক) ঈমান :

ইসলামের সমস্ত ইবাদত ও নেক আমলের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমান ব্যতীত কোন ইবাদত ও নেক আমল আল্লাহর তা'আলার নিকট গ্রহণীয় নয়। ঈমানের শাব্দিক অর্থ হলো বিশ্বাস করা, প্রত্যয় করা। ঈমান হলো-বিশ্বাস, বিশ্বস্থতা ও নিরাপত্তা এই তিন শব্দের সমষ্টি। কারো কথাকে তার বিশ্বস্থতার নিরিখে মনে-প্রাণে মেনে নেয়া।[৪৯] পারিভাষিক অর্থ হলো: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ তা'আলা রাসূলূল্লাহ (সা.)- এর উপর যা নাযিল করেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। লা-ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এ সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে ব্যক্তি শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত হয়ে ঈমানে প্রবেশ করে। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত; রাসূল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ হচ্ছে, মুখে স্বীকৃতি, অন্তরে সত্য বলে গ্রহণ এবং ইসলামের মূল বুনিয়াদী বিষয় গুলোর প্রতি আমল।[৫০] আর ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের একটি বুনিয়াদ হলো, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা তথা ঈমান। এই ঈমান পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তথা ঈমান আনতে হবে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, "একবার হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমান কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ঈমান হলো আল্লাহকে বিশ্বাস করা, ফেরেশতাগণকে বিশ্বাস করা, তাঁর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে তথা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করা, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণকে বিশ্বাস করা, শেষদিন তথা কিয়ামত দিবসকে বিশ্বাস করা, তাকদীরের কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়ে বিশ্বাস করা।"[৫১] উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে আরো পাঁচটি বিষয় তথা মোট ছয়টি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

খ) সালাত :

সালাত আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ হলো দু'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, নতো হওয়া, দরূদ পাঠ করা, তাসবীহ পাঠ করা ইত্যাদি। পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত বিশেষ এক ইবাদত, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত বিধি-বিধান মোতাবেক রুকূ-সিজদাহ সহকারে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে

---

[৪৮]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১; সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৯

[৪৯]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মারেফুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৩

[৫০]. আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আস-সিরাজ, *হাদিসুস্ সিরাজ* (কায়রো: আল-ফারুকুল হাদীসাহ্ লিত্ ত্বাবাআ'তী ওয়ান্ ন্নশরে, ১ম সংস্করণ- ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ২৬

[৫১]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৯

আদায় করা হয়।[৫২] অন্য কথায় বলা যায়, সালাত পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের একটি বিশেষ প্রার্থনা প্রক্রিয়ার নাম। সালাত হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আরোপিত প্রথম কর্তব্য। এক কথায় সালাত নিয়ত সহযোগে বিশেষ কিছু শর্ত সমন্বিত নির্দিষ্ট কথা ও কাজের নাম। যা তাকবিরের মাধ্যমে সূচিত হয়ে সালামের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক নর-নারীর মাঝে সুনিবিড় সম্পর্ক ও সান্নিধ্য সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ কর।[৫৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তেলাওয়াত কর এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ।"[৫৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "ইসলাম বান্দা ও কুফরির মধ্যে পার্থক্যকারী হল সালাত।"[৫৫] তাই সালাত ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। সালাত আদায় না করলে কাউকে মুমিন ও মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন। কুরআন এবং হাদিসে সালাত আদায়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কোন অবস্থায়ই সালাত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি ইসলামে নেই। এমনকি সালাত আদায়ে শিথিলতার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফির আখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। অতঃপর যদি তোমরা বিপদাশংকা কর, তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে, (অর্থাৎ সালাত আদায় কর) যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"[৫৬] সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে।"[৫৭] সালাত আদায়কারীকে আল্লাহ তা'আলা দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি সালাতের হিফাজত করবে, এটা তার জন্য কিয়ামতের দিবসে জ্যোতি, দলিল ও নাজাতের অসিলা হবে।"[৫৮] আর মুমিন সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তুমি এমনভাবে সালাত আদায় করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাও আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তাহলে অন্তত ভাববে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।"[৫৯] কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে একথা নিশ্চিত যে, সালাত মুসলিমের মূল পরিচয়। সালাত ছাড়া মুসলিমের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। সালাত পরিত্যাগকারী কখনোই মুসলিম বলে গণ্য হতে পারে না।

গ) সাওম :

সাওম আরবী শব্দ এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, কঠোর সাধনা করা, অবিরাম প্রচেষ্টা, আত্মসংযম। পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম সাওম। আল্লাহ ভীতি, আল্লাহ প্রেম, আধ্যাত্মিক উন্নতি, আত্মশুদ্ধি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাওম এক অতুলনীয় ও অনিবার্য ইবাদত। এর ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্প্রীতি, নৈতিক ও দৈহিক শৃঙ্খলা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হয়েছে, যেমন বিধান দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য;

---

৫২. মু. আবদুর রব মিয়া, ***ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ*** (ইফাবা, নামায অধ্যায়, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ৭১

৫৩. আল কুরআন, ২ : ৪৩

৫৪. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫

৫৫. আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আসআ'স আস-সিজিস্তানি, ***সুনানু আবি দাউদ*** (বৈরূত: মাকতাবাতুল আসরীয়্যাহ্, তা.বি) খ. ৪ পৃ. ২১৯; আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইয়াযিদ ইবন মাজাহ্, ***সুনানু ইবনু মাযাহ*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ্, তা.বি), খ. ১ পৃ. ৩৪

৫৬. আল কুরআন, ২ : ২৩৮-২৩৯

৫৭. আল কুরআন, ২৩ : ১-২

৫৮. আহমদ ইবন হাম্বল, ***মুসনাদে আহমদ*** (বৈরূত: মুআস্সাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ-১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.) খ. ১১, পৃ. ১৪১

৫৯. আহমদ ইবন হাম্বল, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১,পৃ. ৩১৫

যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"[৬০] অতএব তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।[৬১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে সাওম পালন করল, সে যেন পুর্বাপরের সকল গুনাহ মার্জনা করে নিল।"[৬২] তাই সাওম আত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও গুনাহ মার্জনাকারী ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাদিসে কুদসিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, "আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম ব্যতিক্রম। এটা অবশ্যই আমার জন্য। আর আমিই এর প্রতিদান দেব।"[৬৩]

ঘ) হজ্জ :

হজ্জ আরবি শব্দ এর অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা তথা যিয়ারত বা দর্শনের সংকল্প করা। পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যিলহজ্জ চান্দ্র মাসের ৮ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে মক্কার বাইতুল্লাহ বা কা'বা শরীফ ও নির্ধারিত স্থানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী যিয়ারত, তাওয়াফ, সায়ী ও অবস্থান করা ও নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করাকে হজ্জ বলে। ইহা শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক ইবাদতের অনন্য সমন্বয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষের মধ্য থেকে যারা পথের খরচ বহন করতে সক্ষম, তাদের নিছক আল্লাহর জন্যে এ ঘরের হজ্জ ফরয করা হয়েছে" ।[৬৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কামনা-বাসনা ও আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করে, সে যেনো মাতৃগর্ভ হতে যেরূপ নিষ্পাপ জন্ম গ্রহণ করে, সেরূপ নিষ্পাপ হয়ে যায়। নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে নিজ ঘরে ফিরে।"[৬৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।"[৬৬] এ হজ্জের মাধ্যমে অফুরন্ত সাওয়াব ও জান্নাত লাভ করা যায়। হজ্জকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক অন্যতম দৃষ্টান্ত এবং বিশ্ব সম্মেলন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঙ) যাকাত :

যাকাত আরবী শব্দ **(الزكوة)** থেকে গৃহীত। যার অর্থ পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধতা। যাকাতের আরেক অর্থ পরিবর্ধন (Growth)[৬৭] এছাড়াও যাকাত একাধারে পবিত্রতা, বর্ধিত হওয়া, আশীর্বাদ (Blessing) এবং প্রশংসা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুরআন এবং হাদীসে যাকাতের এসব তাৎপর্য নিহিত।[৬৮] আল্লামা জুরজানী বলেন, **(الزكاة في اللغة الزيادة)** অর্থাৎ যাকাতের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত।[৬৯] মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, যাকাতের আসল অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি (Growth), প্রবৃদ্ধি লাভ (Increse), প্রবৃদ্ধির কারণ (To cause to grow) ইত্যাদি যা আল্লাহ প্রদত্ত বরকত (Blessing) থেকে অর্জিত হয়।[৭০] আল মু'জামুল ওয়াসীতে আছে, আভিধানিক অর্থ **(زكا)** যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও পরিমাণে বেশি হয়। **(زكافلان)** অমুক ব্যক্তি যাকাত দিয়েছে অর্থ- সুস্থ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। অতএব যাকাত হচ্ছে বরকত, পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা-সুসংবদ্ধতা।[৭১] ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর সম্পদে পূর্ণ এক বছর কাল অতিক্রম করলে ঐ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়।[৭২] আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বলেন- 'শরী'আতের

---

[৬০]. আল-কুরআন, ২ : ১৮৩
[৬১]. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫
[৬২]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৩, পৃ. ৪৫
[৬৩]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৯, পৃ. ১৪৩
[৬৪]. আল-কুরআন, ৩ : ৯৬-৯৭
[৬৫]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***,খ. ২, পৃ. ১৩৩
[৬৬]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৩, পৃ. ২
[৬৭]. ইসলামী বিশ্বকোষ ***প্রাগুক্ত***, (ই.ফা.বা.) খ. ২১ পৃ. ১২২
[৬৮]. মির্জা মুহাম্মাদ হুসাইন, ***ইসলাম এন্ড সোসিয়ালিজম***, পৃ. ১৬৬
[৬৯]. আল্লামা জুরজানী, ***আত তা'রীফাত*** (কাদিমী কুতুবখানা, করাচী, তা.বি.) পৃ. ৮৩
[৭০]. মাওলানা আব্দুর রহীম, ***যাকাত*** (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ১৪
[৭১]. ইব্রাহিম মাদকুর, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৩৯৬
[৭২]. ড. কালাজী, ***মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*** (কারাচী: ইদারাতুল কুরআন, তা.বি.) পৃ. ২৩৩

দৃষ্টিতে যাকাত ব্যবহৃত হয় সম্পদে সুনির্দিষ্ট ও ফরযকৃত অংশ বোঝানোর জন্য। যাকাত পাবার যোগ্য লোকদের ফরযকৃত নির্দিষ্ট অংশের ধন-সম্পদ প্রদান করাকেও যাকাত বলে।'[৭৩]

মোটকথা সাহেবে নিসাব নিজ পরিবার-পরিজনের জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর বছরান্তে যদি ন্যূনতম পক্ষে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে উক্ত ধন-সম্পদের শতকরা আড়াই (২.৫০%) ভাগ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলে। এটাকে যাকাত বলার কারণ হলো এভাবে যাকাত দাতার অর্থ সম্পদ এবং তার নিজের আত্মা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। যাকাতের শর'য়ী অর্থই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোনও সম্পদশালী ব্যক্তি কর্তৃক কোনও হকদার ব্যক্তিকে তার সম্পদের নির্ধারিত অংশ অর্পণ করা। সালাতের ন্যায় যাকাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা সালাত আদায়ের সাথে সাথে অধিকাংশ আয়াতে যাকাত আদায়েরও নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো।"[৭৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাকাহ্ গ্রহণ কর, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করে দেবে।"[৭৫] যাকাত ইসলামের অকাট্য বিধান। তা অস্বীকারকারী কাফের। একারণে যেসব মুসলিম যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) সকল সাহাবিকে নিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৭৬] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "মুসলমানদের ধনী ব্যক্তিদের থেকে যাকাত সংগ্রহ কর এবং অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বন্টন কর।[৭৭] এ যাকাতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, মানুষের সকল কাজ-কর্মকে ইসলামে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে-

প্রথমত : ঈমান সম্পর্কিত বিষয় সমূহ-

ক) আল্লাহ তা'আলা ওপর বিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। এই সবুজ শ্যামল পৃথিবী, আমাদের মাথার উপরে আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা, যাদের নাম আমরা জানি ও জানি না, যাদেরকে আমরা দেখি বা দেখতে পাই না, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'আলা। তাঁর কোন শরীক নেই, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কিছুই নেই। তিনি কোন কিছু খান না, পান করেন না, ঘুমান না। তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি এবং কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। যে লোকটি সবচেয়ে সহজ, বেশি জ্ঞান বুদ্ধি রাখে না সেও ভালভাবে জানে যে, কেউ কখনো নিজের সৃষ্টা নিজে হতে পারে না। এখানে অবশ্যই একজন সৃষ্টা আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না।[৭৮] তিনি আমাদের এবং বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাদের কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছুই জানেন। সেই অনুযায়ী তিনি আমাদের জন্য জীবন পরিচালনার জন্য বিধান দিয়েছেন, যার অনুসরণ করলে পুরস্কৃত হব, অমান্য করলে শাস্তি পাব, তিনি নিখুঁত বিচারক।

খ) ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারা শুধুমাত্র তাঁরই আদেশ পালনের জন্য নিয়োজিত থাকেন। তাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। তাদের খাওয়া, ঘুম, পেশাব-পায়খানা কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তাদের কোন জাতিভেদ নেই। তাদের পরিবার পরিজনও নেই। তাদের সংখ্যা যে কত তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বিশেষ দায়িত্ব

---

৭৩. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে যাকাতের বিধান*, মাওলানা আব্দুর রহীম অনুদিত (ই.ফা.বা, ২য় প্রকাশ ২০০৮ খ্রি.) পৃ. ৪৯
৭৪. আল-কুরআন, ২ : ৪৩
৭৫. আল-কুরআন, ৯ : ১০৩
৭৬. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ১১২
৭৭. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫১
৭৮. আল কুরআন, ৫২ : ৩৫-৩৬

দেয়া হয়েছে। যেমন: ১. হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে নবী রাসূলগণের নিকট ওহী পাঠানোর দায়িত্ব, ২. হযরত মিকাইল (আ.) কে মেঘ-বৃষ্টি পরিচালনা ও জীবিকা বণ্টনের দায়িত্ব, ৩. হযরত ইস্রাফীল (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা আদেশে কিয়ামতের সময়ে শিঙ্গা ফুঁক দেয়ার দায়িত্ব, ৪. হযরত আজরাঈল (আ.) কে সকল প্রাণির জান (রূহ) কবজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

গ) আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এই মর্মেও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নবী-রাসূলদের কাছে ওহীর মাধ্যমে ছোট বড় বহু কিতাব পাঠিয়েছেন। এই কিতাবগুলো সত্য ছিলো বলে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যেমন হযরত দাউদ (আ.) এর উপর যাবুর কিতাব নাযিল হয়। হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল হয়। হযরত ঈসা (আ.) এর ওপর ইঞ্জিল কিতাব নাযিল হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর কুরআন মাজীদ নাযিল হয়। এছাড়াও একশত সহিফা নাযিল করা হয়; হযরত আদম (আ.) উপর ১০ খানা সহিফা, হযরত শীশ (আ.) এর উপর ৫০ খানা সহিফা, হযরত ইদরীস (আ.) এর উপর ৩০ খানা সহিফা এবং হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর উপর ১০ খানা সহিফা নাযিল করা হয়। অতএব ১০৪ খানা আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সাথে সাথে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, যদিও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিল হয়েছে তবে বর্তমানে অবিকৃত অবস্থায় কোন কিতাব নেই। কুরআনই একমাত্র অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নিজেই এই কিতাবের হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।[৭৯] কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব, কুরআনের পরে আর কোন কিতাব নাযিল হবে না।

ঘ) নবীগণের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নবীগণকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত করেন। তাঁদের স্বভাব-চরিত্র উত্তম হয়, তাঁরা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাঁরা মানুষদের আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্য আহ্বান করেন। নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.); তিনি হলেন শেষ নবী ও তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না।

ঙ) আখিরাত বা কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস

ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এ বিষয়েও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মানুষের দুনিয়ার জীবন চিরস্থায়ী নয়। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত তাকে দুনিয়ায় জীবন ধারণের সুযোগ দেয়া হয়। তারপর পরপারে পাড়ি জমাতে হয়। কেউ মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; তারপর তোমরা আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৮০] তবে মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের অবসান ঘটে না। তাকে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় হিসাব-নিকাশের জন্য জীবিত করবেন। এ জীবনকেই বলা হয় আখিরাত। দুনিয়ায় ঈমানের সাথে সৎ কাজ করলে আখিরাতের জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ভোগ করা যাবে। আর দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে শিরক করলে এবং তওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে বসবাস করবে। কেউ ঈমানের সাথে তথা মু'মিন হয়ে দুনিয়াতে কোন অসৎ কাজ করে থাকলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন। তবে শাস্তি দিলেও ঈমানের কারণে সে একদিন না একদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

চ) তাকদীর বা অদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস

[৭৯]. আল কুরআন, ১৫ : ৯

[৮০]. আল কুরআন, ২৯ : ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তাকদীরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয় এই বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে অপরাধ করে কেউ বলতে পারবে না যে, এটা আমার তকদীরে ছিলো সেজন্য এ অপরাধ করেছি। সেটা নাফরমানী হবে। অন্যদিকে ভাল-খারাপের মালিক নিজেকেও মনে করা যাবে না। তাকদীরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তবে তাকদীরকে নিয়ে বাকবিতণ্ডা করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এ ব্যাপারে বাদানুবাদ করে ধ্বংস হয়ে গেছে।[৮১]

ছ) পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। এ পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সকল প্রাণিকে হাশরের মাঠে উঠনো হবে। দুনিয়ার জীবনের সকল কৃতকর্মের হিসাবের জন্য সে বিচারের মুখামুখী হবে। মানুষ তার সকল কৃতকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে আরশে কুরসিতে বসে মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যখন কবরগুলো উম্মোচিত হবে, তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে যা আগে পাঠিয়েছে এবং যা পিছনে রেখে গেছে।"[৮২] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি উপস্থিত করেছে।"[৮৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে এবং কাফের বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।"[৮৪] হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এত মানব, জ্বীন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্রিত করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এমন কি কোন শিংবিশিষ্ট ছাগল কোন শিংহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তারও প্রতিশোধ নেয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবে; মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফেররা আকাঙ্খা করবে হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যেতাম।[৮৫]

দ্বিতীয়ত : আমলে সালেহ

ক) ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়

ইবাদতের পরিচয়

ইবাদত শব্দটি আভিধানিকভাবে 'আবদ' বা 'দাস' শব্দ থেকে গৃহীত। দাসত্ব বলতে 'উবূদিয়্যাত' ও 'ইবাদত' দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। উবূদিয়্যাত ব্যবহৃত হয় লৌকিক বা জাগতিক দাসত্বের ক্ষেত্রে। আর 'ইবাদত' বুঝানো হয় অলৌকিক, অজাগতিক বা অপার্থিব দাসত্বের ক্ষেত্রে। সকল যুগে সকল দেশের মানুষই জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি অতিপরিচিত শব্দের মতই 'ইবাদত', উপাসনা, worship, veneration ইত্যাদি শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বুঝে। মানুষ অন্য মানুষের দাস হতে পারে বা দাসত্ব করতে পারে, তবে সে অন্য যে কোনো সত্তার 'ইবাদত' বা উপাসনা করে না। শুধু মাত্র যার মধ্যে অলৌকিক বা অপার্থিব ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলেই মঙ্গল করার বা অমঙ্গল করার বা তা রোধ করার অলৌকিক শক্তি বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তারই 'ইবাদত' করে। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ রাগিব ইস্পাহানী হুসাইন ইবন মুহাম্মদ বলেন, 'উবূদিয়াত' (Slavery, Serfdom, Bondage) হলো বিনয়-ভক্তি প্রকাশ করা। আর 'ইবাদত'(Worship, Veneration) এর চেয়েও অধিক গভীর অর্থজ্ঞাপক। কারণ ইবাদত হলো চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি-অসহায়ত্ব প্রকাশ, যিনি চূড়ান্ত কর্ম- ক্ষমতা ও দয়ার মালিক তিনি ছাড়া কেউ এই চূড়ান্ত

---

[৮১]. ইবন মাজাহ্, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১০০৮
[৮২]. আল-কুরআন, ৮২ : ৪,৫
[৮৩]. আল-কুরআন, ৮১ : ১৪
[৮৪]. আল- কুরআন, ৭৮ : ৪০
[৮৫]. মাওলানা মুফতী শফী, *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৩৩

বিনয়-ভক্তি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না।"[৮৬] অন্যান্য আলিমগণও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাদের ভাষায়, "ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হলো, চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি, অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিত্ব।"[৮৭]

আল্লামা ইবন কাসীর বলেন, "আভিধানিকভাবে ইবাদত অর্থ ভক্তি-বিনয় বা অসহায়ত্ব। আর শরী'আতের পরিভাষায় পরিপূর্ণ ভালবাসা, ভক্তি, বিনয় ও ভীতির সমন্বিত অবস্থাকে ইবাদত বলা হয়।"[৮৮] এভাবে দেখা যায় যে, পরিপূর্ণ ভালবাসা ও ভীতিময় চূড়ান্ত ভক্তিই ইবাদত। আর চূড়ান্ত বিনয়, অসহায়ত্ব ভক্তি প্রকাশ করে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও করুণার অধিকারীর জন্য যে কর্ম করা হয় তা বিভিন্ন পর্যায়ের। তার কাছে যেমন প্রার্থনা করা হয়; তেমনি তার প্রশংসাও করা হয়, এ সবই ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যা কিছু করে সবই ইবাদত বলে গণ্য। এজন্য ইবাদতের ব্যাখ্যায় বলা হয়, "আল্লাহ্ ভালবাসেন এরূপ সকল কথা, বাহ্যিক কর্ম ও দৈহিক বা মানসিক কর্ম সব কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত।"[৮৯] মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, কারও প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দরুন তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করার নাম ইবাদত।[৯০] আর এ ইবাদত বিভিন্ন ধরণের হতে পারে- ফরয, ফরযে কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নাহ্, নফল ও মুস্তাহাব ।

১. ফরয : ইসলামী শরী'আতে ইবাদতের মধ্যে ফরয হল সবগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যা পালন করা সকল মুসলিমের উপর আবশ্যক। ফরয দু'প্রকার যথা-

ক) ফরযে আইন : ইসলামি শরীয়তের যে বিধি-নিষেধ আদায় করা অত্যাবশ্যক তাকে ফরযে আইন বলে। ফরয শব্দের অর্থ আবশ্যক, অবশ্যকরণীয়। তাই তো ইবাদত হউক বা কোন আদেশ-নিষেধ হউক। আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ ও নিষেধ করেছেন তা পালন করা ফরয বা অত্যাবশ্যক। কেউ যদি ফরয অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কেউ অস্বীকার না করে অমান্য করলে তা কবীরা গুনাহ হবে। অস্বীকারকারী দুনিয়ার জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ভোগ করবে। আর পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি মুসলিম হওয়ার পর কুফরী করে তাহলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হবে। আর কবীরা গুনাহকারী খালেছ নিয়তে তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। ব্যক্তি যদি বার বার কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় এবং তা বৈধ বলে বিশ্বাস করে তাহলে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। যেমন সালাত একটি ফরয ইবাদত। কুরআনের ৮২ স্থানে আল্লাহ তা'আলা সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর এ নির্দেশ পালন করা ফরয। ব্যক্তি মুসলিম কিনা, সে আল্লাহও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ঈমান পোষণ করে কিনা তা জানা যায় সালাত থেকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাঁর অভিমুখি হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।"[৯১] সালাত কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন- "ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত"[৯২] মুমিন সালাত কায়িম করে, কাফির তা বর্জন করে, এজন্য স্বেচ্ছায় সালাত ত্যাগ করা কুফরির মতো অপরাধ। রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে সে কাফির হয়ে যায়"[৯৩] সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল? তারা বলবে, আমরা

---

[৮৬]. রাগিব ইসপাহানী, ***আল-মুফরাদাত*** (দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, তা.বি.) পৃ. ৩১৯

[৮৭]. শামসুল হক আযীম আবাদী, ***আউনুল মা'বূদ*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি.) খ. ৪, পৃ. ২৪৭; আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, ***তুহফাতুল আহওয়াযী*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.) খ. ৯, পৃ. ২২০; আব্দুর রাউফ মুনাবী, ***ফাইদুল কাদীর*** (কায়রো: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি.) খ. ৩, পৃ. ৫৪০

[৮৮]. ইবন কাসীর, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ২৬

[৮৯]. মুহাম্মাদ ইবন সালিহ উসাইমীন, ***আল-কাওলুল মুফীদ*** (দাম্মাম: দারু ইবনিল জাওযী, তা.বি) খ. ১, পৃ. ১৬

[৯০]. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ***মা'আরিফুল কুরআন*** (অনুবাদ, মাও. মহিউদ্দীন খান, খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প) পৃ. ৪

[৯১]. আল-কুরআন, ৩০ : ৩১

[৯২]. ইবন মাজাহ্, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ৩৪২

[৯৩]. আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-সুনানুত্ তিরমিযী, ***সুনানুত্ তিরমিযী*** (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, প্রকাশের সন- ১৯৯৮ খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না”[৯৪] যাকাত সম্পদ থেকে প্রদান করতে হয়; এটি সালাতের ন্যায় ফরয ইবাদত সমূহের একটি । প্রত্যেক স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক, মুসলিম ব্যক্তি, যার নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে, সে সম্পদ ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং যার উপর মালিকানার মেয়াদ ন্যূনতম এক বছর এমন ব্যক্তির উপর যাকাত দেওয়া ফরয। যাকাত অস্বীকারকারী কাফির। কোন মুসলিম ব্যক্তি বা দল যাকাত অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যাবে।

হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর জীবদ্দশায় যাকাত হিসেবে আদায় করত বকরী বাঁধার এমন গাছি দড়ি ও তারা যদি এখন আদায় করতে অস্বীকার করে, আল্লাহর শপথ তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব”।[৯৫] যাকাত প্রদান করে মুমিন নিজের মালের পবিত্রতা রক্ষার মাধ্যমে নিজের ঈমানের দৃঢ়তার প্রমাণ পেশ করে। মুশরিকরা যাকাত দেয় না। সে জন্য শিরকের নিদর্শন হলো যাকাত না দেওয়া। যাকাত আদায় না করার জন্য মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত আদায় করে না এবং তারাই আখিরাত অস্বীকারকারী”।[৯৬] যাকাত ফরয হওয়ার পর তা আদায় না করলে আখিরাতে অত্যন্ত খারাপ পরিণতি বরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- “আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।”[৯৭]

মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা যে ইবাদত সমূহ ফরয করেছেন সাওম তার অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হয়েছে, যেমন বিধান দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য; যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার ”[৯৮] সে জন্যে চান্দ্রসনের রমজান মাসে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ, স্থায়ী অধিবাসী (মুকীম) এবং বিবেকবান মুসলিমের উপর সিয়াম পালন করা ফরয। শরীয়াত সম্মত কারণ ছাড়া সিয়াম ত্যাগ করা ভয়ানক অন্যায়। সঙ্গত কারণে সিয়াম পালন করতে না পারলে তা পরে যে কোন মাসে সুবিধা সময়ে কাযা করতে হবে। কেউ সিয়াম অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর অস্বীকার না করে আমলে শৈথিল্য হলে সে কবীরা গুনাহকারী হবে। এজন্য খালেছ নিয়তে তাওবা করে সিয়াম কাযা করতে হবে। আর যদি কেউ কাযা আদায় করার ক্ষমতা না রাখে তাহলে তিনি কাফফারা প্রদান করে দায়মুক্ত হবেন। এমনিভাবে হজ্জ একটি অর্থনৈতিক ফরয ইবাদত। সুস্থ, সবল, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্গতি আছে, এমন মুসলিমের ওপর আল্লাহ তা'আলা সারা জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য।”[৯৯] হজ্জ শুধু সওয়াব অর্জনেই নয় বরং আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা লাভের মাধ্যম হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথভাবে হজ্জ পালন করা হলে আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তির পূর্বের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- “যে ব্যক্তি হজ্জ করার জন্য বায়তুল্লাহ আগমন করে তারপর সব রকমের যৌনক্রিয়া ও পাপাচারে লিপ্ত হয় না সে যেন সদ্যজন্ম নেওয়া নিষ্পাপ শিশুর মতো প্রত্যার্বতন করে”[১০০]

খ) ফরযে কিফায়া : ইসলামি শরীয়তের যে বিধি-বিধান সকলের পক্ষ থেকে কেউ পালন করলে আদায় হয়ে যায়, তাকে ফরযে কিফায়া বলে। যেমন : সালাতুল জানাজা ও রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করা।

---

৯৪. আল-কুরআন, ৭৪ : ৪২-৪৩

৯৫. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ৯৩; সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫৩

৯৬. আল-কুরআন, ৪১ : ৬-৭

৯৭. আল-কুরআন, ৯ : ৩৪

৯৮. আল-কুরআন, ২ : ১৮৩

৯৯. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا- (আল-কুরআন, ৩ : ৯৭)

১০০. من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه- (সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৯৮৩)

২. ওয়াজিব : যা দ্ব্যর্থবোধক দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং ইহা পালন করার জন্য আদেশ করা হয়েছে, তাহাই ওয়াজিব। ওয়াজিব পালন করলে ছওয়াব হবে, আর ছেড়ে দিলে পাপ হবে, অগ্রাহ্য করলে কাফির হবে না বরং ফাসিক হবে। যেমন বেতরের সালাত।

৩. সুন্নাত : যা রাসূলুল্লাহ (সা.) সদাসর্বদা করেছেন তাকে সুন্নাত বলে। ইহা আবার দু'প্রকার যথা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, সুন্নাতে যায়েদাহ।

ক) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা : যে সুন্নাত সর্বদা পালন করতে হয়, তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলে। ইহা পালন করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে।

খ) সুন্নাতে যায়েদাহ : যে সুন্নাত পালন করলে সওয়াব হয় কিন্তু ছেড়ে দিলে কোন গুনাহ নেই, তাকে সুন্নাতে যায়েদাহ বলে।

৪. নফল : ফরয, ওয়াজিব আদায় করার পর অতিরিক্ত সওয়াবের আশায় নেক আমল করাকে নফল বলে। যেমন নফল রোজা, নফল নামাজ ইত্যাদি।

৫. মুস্তাহাব : যা রাসূলুল্ললাহ (সা.) কখনও করতেন আবার কখনও করতে না, তাকে মুস্তাহাব বলা হয়। ইহা আমল করলে সওয়াব পাওয়া যায়। আর ছেড়ে দিলে কোন গুনাহ হয় না।

খ) মুআমলাত বা লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়

ক্রয়-বিক্রয় ও এর প্রকার

ব্যবসা বাণিজ্য মানব জীবনের প্রয়োজনীয় এক অধ্যায়। জীবনের বহুবিধ প্রয়োজনের সব কিছুই একজনের পক্ষে নিজে উৎপাদন করা সম্ভব নয় বিধায় পরস্পরের প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই ব্যবসার পথে অগ্রসর হতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য জীবন-জীবিকা লাভের অন্যতম উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা যমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর।"[১০১] রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে ব্যবসা করেছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। রাসূল (সা.) বলেন, "সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।"[১০২] আরবী 'বাই' শব্দের অর্থ হলো ক্রয়-বিক্রয়। বেচা-কেনা, ব্যবসা, তিজারাত এর সমার্থক শব্দ। সাধারণ সম্পদ বা অর্থ লাভের আশায় বৈধ পণ্যের লেন-দেনকে ব্যবসা ও তিজারাত বলা হয়। ফিকহের পরিভাষায় "বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুই পক্ষের পূর্ণ সম্মতিক্রমে মুদ্রা কিংবা বৈধ পণ্যের বিনিময়ে বৈধ পণ্যের হস্তান্তরকে ইসলামি শরীয়তে ক্রয়-বিক্রয় বলে।[১০৩] এ ক্রয়-বিক্রয় শরীয়ত সম্মত উপায়ে সংঘটিত হওয়ার জন্য মোট **৩টি** জিনিস পাওয়া যেতে হবে। যেমন-

ক) বৈধ মাল হতে হবে।
খ) পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হবে।
গ) উভয় পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পাওয়া যেতে হবে।

ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় চার প্রকার-

ক) বাই মুরাবাহা : বাই মুরাবাহা হলো নির্ধারিত ও সম্মত লাভের ভিত্তিতে গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রি করা।
খ) বাই মুয়াজ্জাল : বাই মুয়াজ্জাল বলতে মুনাফার উদ্দেশ্যে বাকিতে পণ্য বিক্রি করা।

গ) বাইসালাম : বাই সালাম এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি যার আওতায় ভবিষ্যতে কোনো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহের শর্তে মালের দাম আগাম পরিশোধ করে।

---

১০১. আল-কুরআন, ৬২ : ১০
১০২. সুনানুত্ তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫০৬
১০৩. আলি ইবন আবিবকর বুরহানুদ্দিন মুরগিনানী, *আল-হিদায়া ফি শরহে বিদায়াতিল মুবতাদী* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াঈত্ তুরাছিল আরাবি, তা.বি) খ. ৩, পৃ. ১৯০

ঘ) বাই ইসতিসনা : বাই ইসতিসনা কোনো নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন করে বিক্রয়ের চুক্তি, যাতে উৎপাদনকারী কর্তৃক উক্ত পণ্য তৈরীর পর গ্রাহককে সরবরাহ করা হবে।

উত্তরাধিকার সম্পদের বন্টন

পূর্বপুরুষদের মৃত্যুর পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ তাদেরই পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে একটা বিশেষ নিয়ম বা বিধান অনুযায়ী বন্টন করা হয়, তাকে মীরাসী আইন বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।[১০৪] মীরাস নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলে সমান। প্রাক-ইসলামী যুগে নারী, শিশু ও কন্যা সন্তানদের মীরাসের অংশ ছিল না। বর্তমান যুগেও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। আবার কোন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সমুদয় সম্পত্তির মালিক হয় এবং অন্যদেরকে বঞ্চিত করা হয়। ইসলাম এসব কুসংস্কার বিলোপ সাধন করে পুত্র-কন্যা, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল ওয়ারিশকেই মীরাসের হকদার সাব্যস্ত করেছে।

অসিয়্যত

অসিয়ত এর আভিধানিক অর্থ আদেশ দান, ভার অর্পণ। এটা অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর পালনের জন্য হতে পারে।[১০৫] পরিভাষায় "অসিয়ত বলতে কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরবর্তীকালের জন্য কাউকে কোন কিছুর মালিকানা প্রদানের নির্দেশ দান বুঝায়।"[১০৬] অসিয়তের জন্য কোন সম্পত্তি হতে পারে কিংবা সম্পত্তির উপকার বা উপযোগ, যার প্রতি অসিয়্যতকার্যে পরিণত করার ভার অর্পিত হয় তাকে অসী (ট্রাষ্টী) বলা হয়।[১০৭] জীবনের ঘটে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার করার শেষ সুযোগ এ অসিয়্যাতের বিধান এবং সেই সঙ্গে উত্তম কাজ করে বিদায় নেওয়ার এক সুন্দরতম ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন, যাতে তোমরা তোমাদের জীবনের শেষ কালে বিগত পুণ্যের উপর অধিকতর পুণ্য অর্জন করতে পারো। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা তোমরা এ সম্পদ ব্যয় করো।"[১০৮] যে সব আত্মীয়ের জন্য মিরাসের কোন অংশ নেই, তাদের জন্য অসিয়্যাতের অনুমতি রয়েছে।

হকূক:

হকুক বহু বচন, এক বচন হলো হক। এর আভিধানিক অর্থ অংশ, প্রাপ্য, বিশ্বাস, মিথ্যার বিপরীত প্রকাশ পাওয়া, অধিকার ইত্যাদি। আর পরিভাষায় হক বা অধিকারকে বুঝায়।[১০৯] তাফতাযানী বলেন, হক অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি যে সকল নির্দেশ প্রদান করেছেন সে অনুযায়ী কাজ করা। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে, হক বলতে সাধারণত মানুষের অধিকারকে বুঝায়। এই অধিকার মাল-সম্পদ অথবা মাল-সম্পদ ছাড়াও হতে পারে।[১১০] ইসলামী শরীয়ত হক কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-
এক. বাধ্যতামূলক (লাযিম) হক : এ হক বলতে এমন হককে বুঝায় যা ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত।
দুই. হক জায়িয বা যে হক বাধ্যতামূলক নয় : আবার উপকার ও বিশেষ উপকার হিসেবে হক চার প্রকার। যথা-

এক. আল্লাহর হক ।
দুই. মানুষের হক ।

---

১০৪. আল-কুরআন, ৪ : ৭
১০৫. শামসুদ্দিন কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৪
১০৬. শামসুদ্দিন কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৩
১০৭. সিহাবুদ্দিন আলূসী, *রুহুল মা'আনী* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ- ১৪১৫ হি.) খ. ২, পৃ. ৫৩
১০৮. আলাউদ্দিন কাসানী, *বাদাঈ উস সানাঈ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ- ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.) খ. ৭,পৃ. ১৬৫
১০৯. জাবেদ মুহাম্মদ, *আল্লাহর হক মানুষের হক* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশ: জুলাই, ২০১৫) পৃ. ১৩
১১০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, *অধ্যায় ৫১ অধিকার সমূহ, ধারা- ১২৬৩*, তৃতীয় ভাগ, প্রথম প্রকাশ, ইফাবা, পৃ. ১৪

তিন. আল্লাহর হক ও মানুষের হক, তবে আল্লাহর হক প্রধান্য।
চার. আল্লাহর হক ও মানুষের হক, তবে মানুষের হক অগ্রগণ্য।

মৌলিকভাবে প্রত্যেক মানুষের ওপর তিনটি হক বা অধিকার রয়েছে। যথা-
প্রথমত : আল্লাহর হক, তা হলো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা, তিনি যে আদেশ-নিষেধ করেছেন তার অনুস্মরণ করা এবং অবাধ্যতার পথ পরিহার করা। মানুষের কাছে আল্লাহর হক হচ্ছে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব করবে, আল্লাহরই আদেশ-নিষেধ মেনে পৃথিবী পৃষ্ঠে বিচরণ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "এমনভাবে ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাও, আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন।"[১১১]

দ্বিতীয়ত : পিতামাতার হক, জন্মদাতা পিতামাতার জীবদ্দশায় সকল অধিকার সংরক্ষণ করা, তাদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করা, তাদের সেবা করা, সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা সর্বোপরি মৃত্যুর পর তাদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা।

তৃতীয়ত : সাধারণ মানুষের হক, তা হলো সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করা। কারো প্রতি জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, নারীদেরকে উত্যক্ত না করা, তাদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসাারিত করা। সর্বোপরি পৃথিবীর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রর্দশন করা। আর এসব অধিকার লজ্মন করলে তার জন্য হুদুদ তথা শাস্তির ব্যবস্থা ও রয়েছে।

যাবতীয় হদ

হুদুদ শব্দটি হদ এর বহুবচন। হদ এর আভিধানিক অর্থ বাধা দেওয়া, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করা।[১১২] (المنع) ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়, অপরাধের যে সব শাস্তি শরী'আত নির্ধারণ করে দিয়েছে সে সব শাস্তিকে হদ বলে। এ শাস্তি ধার্য করা আল্লাহর হক বা অধিকার[১১৩] কারণ জনগণের কল্যাণ সাধন ও দুর্ভোগ প্রতিহত করার লক্ষ্যে আল্লাহর এ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং যেসব অপরাধের ক্ষতি ও বিপর্যয় জনগণের ওপর বর্তায় এবং অপরাধীর শাস্তির ফায়দা জনগণ ভোগ করে সেসব শাস্তি আল্লাহর হক হিসেবে বিবেচিত। জনগণের হককেই বলা হয়েছে আল্লাহর হক। এ শাস্তির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হওয়ায় এর গুরুত্ব যেমন অধিক, তেমন একে রহিত করার ক্ষমতাও কারও নেই। কেউ রহিত করলেও এটা রহিত হয়ে যায় না। এ পরিভাষা অনুযায়ী কিসাস হদের আওতায় আসে না। যদিও তা শরী'আতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কারণ কিসাসের মধ্যে বান্দার হক থাকে প্রবল। অনুরূপ তা'যীরও হদের মধ্যে গণ্য হয় না। কারণ তা'যীরের শাস্তি শরী'আতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয়। হদের উপরোক্ত পারিভাষিক অর্থ জমহুর ফকীহদের থেকে বর্ণিত।

তবে কোনো কোনো ফকীহ হদের ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের মতে, শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিকে হদ বলে। এর সাথে আল্লাহর হক হিসেবে ধার্য হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। তাদের এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কিসাস ও দিয়াত হদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা উভয় শাস্তিই বান্দার হক হিসেবে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে, হুদুদ হলো, "শরী'আত কর্তৃক সে সব শাস্তি যা কতগুলো নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য প্রবর্তিত।" অপরাধগুলো হচ্ছে, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি (রাহাজানী), সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগ। হুদুদের বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শাস্তির সাধারণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। নীতিটি হচ্ছে, অপরাধের সাথে শাস্তির সমতা ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা। ন্যায়নীতি ও সুবিচারের জন্য এটা অপরিহার্য। এ শাস্তির মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কষ্ট যাতনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা অপরাধ ঘটাবার আগে মানুষকে সতর্ক করে ও পুনরাবৃত্তি করতে বাধা দেয়। এ শাস্তির বিশেষত্ব এই যে, অপরাধী ব্যতীত অন্যের ওপর কখনও আরোপ হয় না। এ কারণে এর নিঁখুত প্রয়োগ সমাজকে ক্ষতি ও বিপর্যয়ের কবল থেকে রক্ষা করে

[১১১]. *মুসনাদে আহমাদ*, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ৪৩৫
[১১২]. *আবুল হাসান আলি ইবন মুহাম্মদ মাওয়ারদী*, ***আল-আহকামুস্ সুলতানিয়্যাহ্*** (কায়রো: দারুল হাদিস, তা.বি) পৃ. ২১২
[১১৩]. আলাউদ্দিন কাসানী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৬, পৃ. ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের কল্যাণ সাধন করে। ফলে অপরাধের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। অন্ততঃপক্ষে বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে সমাজে শান্তি-স্থিতি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে এসব শাস্তি অপরাধ করতে উৎসুক ব্যক্তির সামনে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। তারপরেও যদি সে অপরাধ করে ফেলে তাহলে শাস্তি পাওয়ার পর পুনরায় অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে সে সংশোধন হয় এবং শাস্তি তার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। সন্দেহ নেই, কোনো ব্যক্তিকে অপরাধ থেকে দূরে রাখার মধ্যে তার জন্য বড় ধরণের কল্যাণ নিহিত থাকে। কেননা তখন তাকে শাস্তির কষ্ট ভোগ করতে হয় না। শরীয়াত লংঘন করার দায় ঘাড়ে নিতে হয় না এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও পরকালের আযাব থেকে সে রক্ষা পেয়ে যায়। আবার অপরাধ করার কারণে শাস্তি দেওয়া হলে তাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। কারণ, তখন সে দুনিয়ায় গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। প্রদত্ত শাস্তি তার সুপ্ত ঈমানকে জাগ্রত করে দেয় এবং আল্লাহর সম্মুখে তার বড় স্খলণের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। ফলে সে একনিষ্ঠ তওবা করার সৌভাগ্য লাভ করে।

হিবা বা দান

হিবা শব্দের অর্থ দান করা। কোন সম্পত্তি প্রতিদান ব্যতিরেকে তাৎক্ষনিক গ্রহিতাকে হস্তান্তর করা হয় তাহলে তাকে হিবা বলে। হিবা দানের অন্যতম একটি প্রকার। তা জনকল্যাণ ও দারিদ্র বিমোচনের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিবার মাধ্যমে দান করাকে উৎসাহিত করেছেন। হিবা হলো দু'ব্যক্তির মাঝে শরীয়তসম্মত কোনো উপকারী বস্তু প্রদানের চুক্তি। যে বস্তু একজন অপরজনকে বিনিময় ছাড়া দিয়ে থাকে। ফলে যাকে দান করা হয়েছে, সে দানকৃত বস্তুর মালিক হয়ে যায়। হিবা উপার্জনের শরীয়ত সম্মত একটি পন্থা। যার মাধ্যমে আত্মা পবিত্র হয়, পারস্পারিক ভালবাসা, সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। হিবা করলে তা আবশ্যক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে, হিবা করলে তা আবশ্যক হয়ে যায়; ফেরত নেওয়ার বৈধতা রহিত হয়ে যায়। যাকে দান করা হয়েছে, তার কাছে ওই জিনিস আর চাওয়া যাবে না। তবে শুধু পিতার বিষয়টি ব্যতিক্রম। সুতরাং পিতা নিজ সন্তানকে কোনো কিছু দেওয়ার পর তা ফেরত নিতে পারবে। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে, সাধারণভাবে হিবা আবশ্যক হয় না। দাতা কোনো কিছু দান করার পর পুনরায় তা ফিরিয়ে নিতে পারবে। যাকে দান করা হয়েছে, তার কাছে উক্ত জিনিস চাইতে পারবে।[১১৪] অবশ্য বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তা আর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে না। যেমন আত্মীয়স্বজনকে হিবা করলে, অনুরূপ হিবাকৃত বস্তু আর বিদ্যমান থাকলেও তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে থাকলে, তখন তা ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকে না।[১১৫]

ওয়াক্ফ (জনসেবামূলক ট্রাস্ট)

আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার অন্যতম পন্থা হল ওয়াক্ফ। ওয়াক্ফ শব্দের অর্থ নিবৃত্তি বা আকট, বাধা দেওয়া বা সংযত করা। মুসলিম আইনের পরিভাষায় এর মূলত অর্থ কোন বস্তুকে রক্ষা করা, একে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানাভূক্ত হতে বাধা দেয়া। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে, কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াকিফের মালিকানা আটক করে তার আয় দরিদ্রের জন্য কিংবা অন্য কোন নেক উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে ওয়াক্ফ বলে। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯২ এর সংজ্ঞানুসারে ওয়াক্ফ শব্দের অর্থ হল ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত যে কোন ধার্মিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় বা দাতব্য উদ্দেশে চিরতরে উৎসর্গ করা। এ উদ্দেশ্যে অমুসলিম দান করলেও তা এর অর্ন্তভূক্ত হবে। ওয়াক্ফ বিরাট সামাজিক সেবা প্রদান করতে পারে।[১১৬] এগুলোর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান গবেষণাগার, মসজিদ নির্মাণ

---

১১৪. আলাউদ্দিন কাসানী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৬, পৃ. ১৩২

১১৫. Kuran, Timur, (2004) `*Why the Middle East is Economically underdeveloped* : Historical Mechanisms of Institutional stagnation', The Journal and Economic Perspectives, summer, 18:3, p. 71-90

১১৬. Makdisi, 1981, Pp. 35-74; Hodgson, 1977, Volume 2, p.124;Kahf, 2004 and Ahmad, 2004

ও সংরক্ষণ, ছাত্র-শিক্ষক ও ইলম অর্জনকারীর জন্য লজিং, সেতু, পানির কূপ, রাস্তা ও হাসপাতাল।[১১৭] এগুলো সম্ভব হয়েছিল যখন ওয়াক্‌ফ যথাযথভাবে পরিচালিত ও তদারকি করা হতো।[১১৮]

যাকাত

যাকাত হচ্ছে বরকত, পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা-সুসংবদ্ধতা।[১১৯] ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর নিসাব পরিমান সম্পদে পূর্ণ এক বছর কাল অতিক্রম করলে ঐ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ তথা শতকরা আড়াই টাকা হারে আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়।[১২০]

সাদাকাহ

সাদাকাহ শব্দটি আরবী **(الصدقة)**। শব্দটি একবচন। বহুবচনে **(الصدقات)**। শব্দটির অর্থ দান, খয়রাত, সদকা। যাকাত অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১২১] আল মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 'সাদাকাহ হলো, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য যে সম্পদ দান করা হয়; সম্মান লাভের আশায় নয়।'[১২২] সাদাকাহ এর পারিভাষিক অর্থ হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় যে সম্পদ দান করা হয়। এই অর্থে ফরয সাদাকাহ তথা যাকাত এবং নফল সাদাকাহ উভয়ই অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যাকাতের ক্ষেত্রে সাদাকাহ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের মালামাল থেকে সাদাকাহ তথা যাকাত গ্রহণ কর, যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে।" [১২৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম।" [১২৪]

সাদকাতুল ফিতর

যে সব সাদাকাত বিভিন্ন কারণে বিত্তবানদের ওপর শরিয়তের পক্ষ থেকে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে তাকে ওয়াজিব সাদাকাত বলে। তন্মধ্যে সাদকাতুল ফিতর অন্যতম। এটি ঈদুর ফিতরের দিন নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। তা হচ্ছে ১.০৬ কেজি গম অথবা খেজুর অথবা সমপরিমাণ অর্থ। তবে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে সাদকাতুল ফিতরের পরিমাণ হলো এক ছা পরিমাণ গম বা খেজুর অথবা সমপরিমাণ অর্থ। বর্তমান ওজন পদ্ধতিতে এক ছা প্রায় দুই কেজি। "হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদের প্রত্যেক দাস-দাসী, স্বাধীন নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের ওপর এক ছা পরিমাণ খেজুর অথবা এক ছা গম সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন।" এ হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক নিসাবধারী মুসলিম ঈদের পূর্বে তার নিজের, স্ত্রীর, সন্তানাদির এবং তার অধীন সকলের পক্ষ থেকে জনপ্রতি এক ছা খেজুর বা গম অথবা সে পরিমাণ অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে গরীব-মিসকীনদের দান করতে হবে।

ওশর

ওশর আরবী শব্দ। এর অর্থ এক দশমাংশ। দরিদ্র জনসাধারণের সাহায্যার্থে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ নির্ধারণ করা। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় জমির উৎপন্ন ফসলের ওপর এক দশমাংশ যাকাত প্রদানকে

---

১১৭. Inalcik Halil (1970) `*The Rise of the Ottoman Empire*', in Holt , et al, Volume 1, Pp. 295-323

১১৮. ইব্রাহিম মাদকুর, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৩৯৬

১১৯. ড. কালাজী, ***মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*** (কারাচী: ইদারাতুল কুরআন, তা.বি.) পৃ. ২৩৩

১২০. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৬২৪

১২১. ইবরাহীম মাদকুর, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৫১১

১২২. আল কুরআন, ৯ : ১০৩

১২৩. সম্পাদনা পরিষদ, ***আল মাওসু'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ*** (আম্মান: ওজারাতুল আওকাফ, ১৪২৭ হি.) খ. ২৩, পৃ. ২২৬

১২৪. আল-কুরআন,২ : ২৭১

উশর বলে। উশর আদায় করা ফরয। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, "তোমরা তার ফল থেকে আহার কর, যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও। আর অপচয় করোনা।"[১২৫] আবাদি জমি দু'ভাবে চাষ করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো জমিতে বিনা সেচে প্রাকৃতিক বৃষ্টি বা ঝরণার পানির সাহায্যে চাষাবাদ হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো জমিতে কৃত্রিম সেচের সাহায্য চাষাবাদ করতে হয়। এ দু'ধরনের জমির উৎপন্ন ফসলের ওশরের নিসাব দু'রকম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে জমিকে বৃষ্টির ও নদীর পানি সিক্ত করে তা থেকে ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ (উশর) এবং যে সব জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তা থেকে ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ (অর্ধ উশর) দিতে হবে।"[১২৬] উশর ধার্যের পূর্বে জমির প্রকৃতি, শ্রম, বিনিয়োগ, বন্যা প্রবণতা ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। উশর ধার্য করার ক্ষেত্রে যেন কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা কারও প্রতি যুলুম করা না হয়। উশর শুধু মুসলিম নাগরিকদের ফসলের ওপর প্রযোজ্য হবে।

খারাজ

'আল-খারাজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ জমিনে উৎপাদিত ফসল।[১২৭] ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়, জমির ওপর যে নির্ধারিত পাপ্য ধার্য করা হয়, তাকে খারাজ বলে।[১২৮] ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের মালিকানাভূক্ত ও ভোগদখলকৃত জমি থেকে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তাকে খারাজ বলে। খারাজ রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। ভূমি বিশেষজ্ঞ দ্বারা জমির গুণাগুণ পরীক্ষা ও পরিমাণ নির্ধারণ করে বিশেষ সর্তকতার সাথে খারাজ আরোপ করতে হয়। হযরত উমার (রা.) ইরাক, সিরিয়া, মিশরের বিশাল উর্বর শস্য ভূমির ওপর খারাজ নির্ধারণের জন্য ভূমি রাজস্ব বিশেষজ্ঞ উসমান ইবন হানীফ (রা.) কে জমি জরিপ কর্ম সম্পন্ন করে খারাজ নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। খারাজের জন্য কিছু শর্তারোপ করা হয়-

ক) মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক আরোপিত হবে। অমুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত রাজস্বকে খারাজ বলা যায় না।

খ) জমির ফসলের এমন একটি অংশ খারাজ নির্ধারণ করতে হবে যা উৎপন্ন ফসলের অন্তত এক পঞ্চমাংশের কম হবে না এবং অর্ধেকের বেশী হবে না। জমিতে ফসল না হলে খারাজ ধার্য হবে না।

গ) জমির খারাজ উপরোক্ত উপায়ে ধার্য না হলে জমির পরিমাণ করে মান অনুসারে ফসলের পরিমানের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায় করতে হবে। এ খাজনার পরিমাণ সাধারনভাবে জমির উৎপন্ন ফসলের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের কম এবং অর্ধেকের বেশী হবে না। খারাজ দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে ব্যয় হবে। খারাজের ভূমি মূলত জিহাদের মাধ্যমে দখলৃত বা সন্ধির কারণে অমুসলিমদের হাত থেকে মুসলিমদের হাত আসা ভূমি। এ ক্ষেত্রে ভূমিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়-

প্রথমত : যে ভূমি কোন মুসলিম আবাদ করছে, তা তার মালিকানায় থাকবে। হাদিসে এসেছে, "মালিকানাহীন কোনো অনাবাদি জমি যে মুসলিম আবাদ করল, তা তার মালিকানায়।"[১২৯]
দ্বিতীয়ত : যে ভূমির আবাদকারী অমুসলিম। এরপর সে ইসলাম কবুল করল। তাহলে সে উক্ত জমির অধিক হকদার এবং সে-ই তার মালিক হবে।
তৃতীয়ত : মুসলিমগণ কাফিরদের থেকে যুদ্ধ করে যে ভূমি দখল করেছে, তা মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে না দেওয়া হলে সে সকল ভূমি মুসলিমদের সাধারণ মালিকানায় চলে যায়।
চতুর্থত : মুশরিকদের হাতে থাকা ভূমি সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসলে এ ধরণের ভূমির হুকুম আগের প্রকারের ন্যায়। অর্থাৎ এসব জমি খারাজি হিসেবে বিবেচিত হবে। তারা জিজিয়া দেওয়ার সাথে সাথে এগুলোর খারাজও দেবে।[১৩০]

---

[১২৫]. আল-কুরআন, ৬ : ১৪১
[১২৬]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১২৬
[১২৭]. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মুজামুল অসিত*, (ইসকানদারিয়া: দারুদ দাওয়া, তা.বি) পৃ. ২২৪
[১২৮]. আলি ইবন মুহাম্মদ জুরজানি, *আত-তারিফাত*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ- ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.) পৃ. ৯৮
[১২৯]. আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৭৮

জিজিয়া

জিজিয়া শব্দটি 'জাজা' থেকে এসেছে। এর অর্থ বিনিময়। পরিভাষায় আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানরা দারুল ইসলামে বসবাস করার সুবাদে ইসলামি রাষ্ট্রকে প্রতি বছর যে অর্থ দিয়ে থাকে তাকে জিজিয়া বলে। যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আহলে কিতাবদের নিরাপত্তা দানের বিনিময়ে এটি নেয়া হয়, তাই এটিকে জিজিয়া বলে।[১৩১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর; যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিজিয়া দেয়।"[১৩২] জিজিয়া শুধু স্বাধীন, বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ওপরই ওয়াজিব; নারী, শিশু, পাগল ও দাসের ওপর কোন জিজিয়ার বিধান নেই। কেননা নারী, শিশু, পাগল ও দাসদের স্বতন্ত্রতা নেই; বরং তারা সকল বিষয়ে কর্তা পুরুষদের অনুগামী।[১৩৩] ধনী আহলে কিতাবদের থেকে আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের থেকে চব্বিশ দিরহাম, নিম্ন বিত্তদের বারো দিরহামের বেশী বাৎসরিক জিজিয়া আদায় করা যাবে না।

কর বা রাজস্ব

সরকারের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ ও দায়িত্ব পালনের জন্য ধন-সম্পদের আবশ্যকতাও অনস্বীকার্য। ব্যক্তি যেখানে নিজস্ব উপায়-পন্থার সাহায্যে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ আহরণ করে, রাষ্ট্র-সরকার সেখানে দেশবাসীর নিকট হতে বিভিন্ন কর ও রাজস্বের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ইহাই গোড়ার কথা। আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক চেষ্টিবল রাজস্বের নিম্ন লিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন- 'রাজস্ব' বলতে কোন ব্যক্তি বা দলের সে অর্থ বুঝায়, যা সরকারী কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তার নিকট হতে বাধ্যতামূলক আদায় করা হয়।[১৩৪] বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডালটন রাজস্বের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, 'রাজস্ব' সরকার পক্ষ হতে অপহির্যরূপে ধার্যকৃত একটি দাবি বিশেষ।[১৩৫] রাজস্বের এ উভয় সংজ্ঞাই নির্ভুল বলে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু ইহাতে কোন নৈতিক দায়িত্ব বা সীমা রক্ষা করার ভাবধারা আদৌ খুঁজে পাওয়া যায় না।[১৩৬] ইসলামী অর্থনীতিতে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় করার ব্যাপারে এই মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইহা ধার্য করার ব্যাপারে যেমন অন্যায় ও শোষণের প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না; অনুরূপভাবে সংগ্রহীত রাজস্বের একটি ক্রান্তি পর্যন্তও অন্যায় পথে, যথেচ্ছভাবে ব্যয় করার কারো অধিকার নেই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ইহার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকেও ইসলামী রাষ্ট্রের আয় এবং ব্যয়কেও স্থায়ী নৈতিক নিয়মের বাঁধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং তা লংঘন করার অধিকার কারও থাকতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে যে কেন্দ্রীয় অর্থনীতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হয়, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর ভাষায় তা নিম্নরূপ- আনুগত্যের যোগ্য কোন ব্যক্তির এ মর্যাদা হতে পারে না যে, আল্লাহর নাফরমানী করেও তার আনুগত্য করতে হবে। 'তিনটি হালাল পন্থা ভিন্ন অন্য কোনভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদে হস্তক্ষেপ করার আমার কোনই অধিকার নেই।

প্রথম : সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা গ্রহণ করা হবে।
দ্বিতীয় : ন্যায় পথেই ইহা ব্যয় করা হবে এবং
তৃতীয় : ইহাকে সকল প্রকার অন্যায় নীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে।

---

১৩০. আবুল হাসান আলি ইবন মুহাম্মদ মাওয়ারদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০
১৩১. মুহাম্মদ জুবাইদী, *তাজুল আরুস* (কায়রো: দারুল হিদায়া, তা.বি) খ. ৩৭, পৃ. ৫৩
১৩২. আল-কুরআন, ৯ : ২৯
১৩৩. আবুল হাসান আলি ইবন মুহাম্মদ মাওয়ারদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩
১৩৪. অধ্যাপক ডালটন, *পাবলিক ফিনান্স*, খ. ৩, অ. ১, পৃ. ২৬১
১৩৫. প্রিন্সিপালস অব পাবলিক ফিনান্স, *প্রাগুক্ত*, অ. ৩ পৃ. ২৬
১৩৬. অধ্যাপক ডালটন, পাবলিক ফিনান্স, *প্রাগুক্ত*, অ. ৫, পৃ. ৩৩

অন্য কথায়, ইসলামী রাষ্ট্র কেবল সরকারী ব্যয়-বহনের জন্যই রাজস্ব আদায় করবে না, দেশের গরীব দুঃখী ও অভাবী মানুষের জন্য স্থায়ী কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যও পথিক, বেকার ও ঋণী লোকদের সাহায্য করার জন্যও রাজস্ব আদায় করবে। এ কর দু'ধরনের প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কর। যে রাজস্ব নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কিংবা অবস্থায় লোকদের উপর আইনত ধার্য করা হয়, ইহাকে 'প্রত্যক্ষ কর' বলা হয়। আর যে কর ধার্য করা হয় একজনের উপর; কিন্তু মূলত উহার সমগ্রটি কিংবা আংশিক পরিমাণ আদায় করিতে হয় অপর একজনকে, ইহাকেই বলা হয় পরোক্ষ কর।[১৩৭]

লাইসেন্স ফি

সব ব্যবসা ও স্বাধীন পেশার জন্য ট্রেড লাইসেন্স নিতে হয়। এমনকি ফুটপাতে বসে যিনি তাল পাতার পাখা বিক্রি করেন বা যিনি ঠেলাগাড়ি চালান তাকেও আইন মোতাবেক নির্ধারিত ফি দিয়ে যে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয় তাকে লাইসেন্স ফি বলে। ব্যবসা অনুসারে এ ফি নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর অধীন ৫শ টাকা থেকে ৫০ হাজার পর্যন্ত ফি রয়েছে। একজন ব্যক্তি সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভায় গিয়ে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে এ লাইসেন্স করতে পারেন।

রেজিস্ট্রি ফি

সব ধরনের লেনদেন তথা কাজী অফিসে বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন, উপজেলা বা জেলা রেজিস্ট্রি অফিসে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, বাড়ি-গাড়ি ক্রয়-বিক্রয়, কল-কারখানাসহ সকল কিছুর হস্তান্তরে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে ফি প্রদান করা হয় তাকে রেজিস্ট্রি ফি বলা হয়। এ রেজিস্ট্রির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সম্পত্তিটির মালিক হন। কেউ তা দাবী করলে তা রেজিস্ট্রি দলিল মালিকানার প্রধান ডকুমেন্ট হিসেবে পেশ করা হয়।

গ) মুআশারাত বা আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়-

পিতামাতার অধিকার

পিতামাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। তাঁদের মাধ্যমে আমরা এ পৃথিবীতে আগমন করেছি। আমরা ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাঁদের আদর-যত্নে বড় হয়েছি। তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা নফল নামায, সাদকা, সাওম, হজ্জ, উমরা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়েও উত্তম। আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পরেই পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের এক জন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।"[১৩৮] তারা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের বিশেষভাবে সেবা যত্ন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।"[১৩৯]

পিতা-মাতার কথা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। এমনকি পিতামাতা বিধর্মী হলেও পার্থিব ব্যাপারে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমার পিতা-মাতা যদি আমার সাথে শিরক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুস্মরণ কর।[১৪০] পিতা-মাতা দরিদ্র ও অসহায় হলে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা

---

১৩৭. প্রিন্সিপাল এন্ড মেথড অব টেকসেশন, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ২৪

১৩৮. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩

১৩৯. আল-করআন, ১৭ : ২৪

১৪০. আল-কুরআন, ৩১ : ১৫

বলেন, "তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা,আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।"[১৪১] পিতামাতার অসুখ-বিসুখ হলে যত্ন সহকারে সেবা যত্ন করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাদের অবাধ্য হওয়া যাবে না। পিতা-মাতার অবাধ্যতার অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা চাইলে সব গুনাহই ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এ ধরণের গুণাহগারদের শাস্তি মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই দেয়া হয়ে থাকে।"[১৪২] তারা মৃত্যুবরণ করলে তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আর মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিও।"[১৪৩]

পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার

ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় পরিবারের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। পারিবারিক সুখ-শান্তি পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ওপর নির্ভর করে। মুসলিম পরিবারে সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে ইমানদার ও আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলা পিতামাতার ওপর একান্ত কর্তব্য। সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর পিতাকে কতগুলো গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, পিতার ওপর সন্তানের অধিকার হচ্ছে তিনটি-জন্মের পর পরই তার সুন্দর নাম রাখতে হবে। জ্ঞান বুদ্ধি বাড়লে তাকে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। আর যখন সে পূর্ণবয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।"[১৪৪] শিশু ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর ডান কারে আযান ও বাম কানে ইকামতের ধ্বনি শোনাতে হবে। হাদিসে এসেছে, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবি রাফে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হযরত ফাতিমা (রা.) যখন হাসান (রা.) কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাঁর কানে নামাযের আযানের অনুরূপ আযান দিতে দেখেছি।"[১৪৫] সন্তান জন্মের পর প্রথম কিংবা সপ্তম দিনে ইসলাম সম্মত নাম ও আকিকা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "প্রত্যেক নবজাত শিশু আকিকার সাথে সম্পৃক্ত, তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করতে হবে। তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথার চুল মুণ্ডন করতে হবে।"[১৪৬] হৃদয় নিংড়ানো ঐকান্তিক দরদ, ভালবাসা ও স্নেহমমতার কোমল পরশে সন্তানদেরকে লালনপালন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেগ তাদেরকে (মাতাদের) খাবার ও পোশাক প্রদান করা।"[১৪৭] সন্তানের অধিকার হচ্ছে- তার খানা-পিনা, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, আশ্রয়, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা, নম্রতা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। যতদিন সে নিজস্ব ক্ষমতায় উপার্জন করতে সামর্থ না হবে। তাদেরকে সুশিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, " সাত বছর বয়স হলে তোমরা সন্তানেদেরকে সালাতের আদেশ কর। দশ বছর বয়স হলে শাস্তি দিয়ে হলেও সালাত আদায় করাও এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।"[১৪৮]

কোনো কারণে কন্যা যদি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়, কিংবা বিধবা বা অসহায় অবস্থায় পড়ে, তাকে সাদরে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় আশ্রয় ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কন্যা যদি তোমার নিকট অসহায় হয়ে ফিরে আসে তবে তার জন্য খরচ করাই তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ সাদকাহ।"[১৪৯]

---

[১৪১]. আল-কুআন, ২ : ২১৫

[১৪২]. আবুবকর বায়হাকী, ***শু'য়াবুল ঈমান*** (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রশদে লিন্নশরে ওয়াত্ তাওযী, ১ম সংস্করণ- ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.) খ. ১০, পৃ. ২৮৯

[১৪৩]. আল-কুরআন, ১৪ : ৪১

[১৪৪]. আবুল লাইছ সমরকন্দি, ***তানবিহুল গাফেলিন*** (বৈরূত: দারু ইবনি কাছির, ৩য় সংস্করণ- ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.) পৃ.৪৭

[১৪৫]. আত-সুনানুত্ তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৩, পৃ. ১৪৯

[১৪৬]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৭, পৃ. ৮৫; সুনানুত্ তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৩, পৃ. ১৫৩

[১৪৭]. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

[১৪৮]. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশআস, ***সুনানু আবিদাউদ***, (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল আছরীয়্যাহ, মাকতাবাতুশ শামেলা) খ. ১, পৃ. ১৩৩

[১৪৯]. ইবনু মাজাহ্, ***প্রাগুক্ত***, খ. ২, পৃ. ১২০৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমরা সন্তানদের বিপক্ষে কখনো বদদোয়া করোনা।"[১৫০] সন্তানের দোয়ার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর।"[১৫১] সন্তানের স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশের জন্য পিতামাতার দাম্পত্যজীবন সুখের হওয়া আবশ্যক। কেননা তাদের মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদ, কহল সন্তানের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তারা সৎ, সুন্দর বৈধ জীবন-যাপন করবেন। হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জন করবেন। সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সন্তানকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "সন্তানকে সুশিক্ষা দান করাই পিতার শ্রেষ্ঠ উপহার।"[১৫২] সন্তানকে দ্বীনের পথে, সৎ, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করা একান্ত কর্তব্য। হযরত লুকমান (আ.) ছিলেন একজন আদর্শ পিতা। তাঁর মতো করে সবাইকে আদর্শবান পিতা হিসেবে সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে। কুরআনের ভাষায় "হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[১৫৩]

স্বামী–স্ত্রীর অধিকার

মুসলিম পরিবারে বৈধভাবে ইসলামী রীতিতে দুইজন সাক্ষী ও নির্দিষ্ট মোহরের বিনিময়ে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেই কেবল স্বামী- স্ত্রী হওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী হলেই সব দায় দায়িত্ব শেষ নয়। ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অধিকার সংরক্ষণের জন্য একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে তাদের মধ্যে দাম্পত্য জীবন সুখী থেকে আরো সুখকর ও মধুময় হয়ে উঠে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার রয়েছে। এজন্য স্বামী-স্ত্রীকে জীবনের প্রিয়তমা হিসেবে গ্রহণ করে নিজের সুখ-শান্তি, আনন্দ-বেদনার সমানাধিকার দান করবে। স্ত্রীকেও অনুরুপ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "স্ত্রীদের ওপর যেমন স্বামীদের অধিকার আছে, তেমনি স্বামীদের ওপরও স্ত্রীদের অধিকার আছে।"[১৫৪] স্বামী পরিবারের কর্তা। তাকে স্ত্রীর ভরণপোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান সহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর।"[১৫৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তুমি যা খাবে, স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে এবং যা পরবে স্ত্রীকেও তা পরতে দেবে।"[১৫৬] জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী এক অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কেউ কাউকে ঘৃণা করবে না। স্ত্রীরাও স্বামীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। স্বামীকে খুশী রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যদি নফল ইবাদত ছেড়ে দিতে হয় তাও করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আমি যদি স্ত্রীকে আর কারও সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে আমি স্ত্রীকে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সিজদা করতে আদেশ করতাম।"[১৫৭] তাই স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, গোপনীয়তা রক্ষা, সম্পদের আমানত, মান-সম্মান, সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি সুরক্ষিত রাখবে। তাহলেই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন মধুর হবে এবং তাদের সংসারটা একটা সুখের নীড়ে পরিণত হবে।

ভাই-বোনের অধিকার

পৃথিবীর সকল নারী-পুরুষই পরস্পর ভাই-বোন। কেননা আমরা সবাই এক আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর সন্তান। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান।" ইসলাম ধর্মে ঔরসজাত ও

[১৫০]. সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৪, পৃ. ২৩০৪
[১৫১]. আল-কুরআন, ১৪ : ৪০
[১৫২]. সুনানুত্ তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৩, পৃ. ৪০২
[১৫৩]. আল-কুরআন, ৩১ : ১৭
[১৫৪]. আল-কুরআন, ২ : ২২৮
[১৫৫]. আল-কুরআন, ৪ : ১৯
[১৫৬]. আবু দাউদ, ***প্রাগুক্ত***, খ. ২, পৃ. ২৪৪
[১৫৭]. সুনানুত্ তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ২, পৃ. ৪৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সহোদর ভাই-বোনকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়াও দুগ্ধ, পোষ্য, কৃত্রিম, মূলগত, আদর্শগত ও বিশ্বজনীন ভাই-বোন রয়েছে। তাই ভাই-বোনকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়-

ক) ঔরসজাত
খ) আদর্শগত/ধর্মগত
গ) বিশ্বজনীন

রক্ত ও আত্মার সাথে সম্পর্কের কারণে ভাই-বোন হচ্ছে মুসলিম পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের মধ্যে মিল-মহব্বত ও সুসম্পর্ক বজায় থাকা এক স্বর্গীয় ব্যাপার। তারা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। একত্রে মিলেমিশে থাকলে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারে না। ভাই-বোনদের ভাল-মন্দের দেখা-শুনা করা, আদর-যত্ন করা, পিতার অবর্তমানে সার্বিক দায়িত্ব পালন করা, তাদের আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা, মার্জিত আচার-আচরণ, গঠনমূলক লেখাপড়া শিক্ষা প্রদান করতে হবে। একে অন্যকে সম্মান ও স্নেহ প্রদর্শন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ছোটকে স্নেহ করে না, বড়কে সম্মান করে না সে আমার দলভূক্ত নয়।”[১৫৮] তাদের প্রতি সাহায্য সহযোগিতা, ভালো আচরণ ও সাধ্য অনুযায়ী প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পুরণ করে দিবেন।”[১৫৯] পরিবারে ভাই-বোন মিলেমিশে বসবাস করবে, কেউ কারো সমালোচনা বা বিরোদ্ধাচরণ ও অকল্যাণ কামনা করবে না। বিপদাপদে একে অপরের সহযেগিতায় এগিয়ে যাবে। পিতার রেখে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ইনসাফ ভিত্তিক বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে কারো প্রতি জুলুম না হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”[১৬০]

পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার

আমাদের আশেপাশে যারা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন তারা সবাই আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের সুখে-দুখে, বিপদে-আপদে তারাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন। কোনো বিপদাপদ, অসুখ-বিসুখ হলে তারা সেবা ও যত্ন নেন। বিবাহ-সাদি বা অন্য যে কোন অনুষ্ঠানে তারা সাহায্য-সহযোগিতা করেন। অধিকারের দিক দিয়ে প্রতিবেশী তিন ধরণের হয়ে থাকে-

ক) মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী- যার তিনটি হক রয়েছে। প্রথমত মুসলিম হিসেবে, দ্বিতীয়ত আত্মীয় হিসেবে, তৃতীয়ত প্রতিবেশী হিসেবে।
খ) মুসলিম প্রতিবেশী- যার দুইটি হক রয়েছে। প্রথমত মুসলিম হিসেবে, দ্বিতীয়ত প্রতিবেশী হিসেবে।
গ) অমুসলিম প্রতিবেশী- যার একটি মাত্র হক রয়েছে। তা হলো প্রতিবেশী হিসেবে।
প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকা, তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সাহায্য-সহযোগিতা করা প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। তারা অভাবগ্রস্থ হলে অভাব মোচন করতে হবে। আর ক্ষুধার্ত হলে খাদ্যদান করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি পেট ভরে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে প্রকৃত ঈমানদার নয়।”[১৬১] তাদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করবে না, তাদেরকে কষ্ট দিবে না, ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ হতে নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১৬২] প্রতিবেশীর দোষত্রুটি প্রকাশ করবে না, স্ত্রী-কন্যাদের উত্যক্ত করবে না, সর্বাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে, তাদের উপহার-উপঢৌকন প্রদান, দাওয়াত দেয়া ও গ্রহন করা, অসুবিধা হয় এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

[১৫৮]. আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৮৬
[১৫৯]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৬
[১৬০]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫; সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৪৫৯
[১৬১]. শুআ'বুল ঈমান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ১০৫
[১৬২]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৬৮

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।"[১৬৩] সর্বোপরি প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে জানাজায় অংশ গ্রহন, দাফন-কাফনের ব্যবস্থা, ও সমবেদনা প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য।

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

আত্মীয় শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আত্মা থেকে। আত্মার সাথে যারা সম্পর্কিত তারাই আত্মীয়। আর যারা আপন সত্ত্বার সাথে সম্পর্কিত তারাই স্বজন। সুতরাং আত্মীয়স্বজন বলতে আত্মা ও আপন সত্ত্বার সাথে সম্পৃকত ব্যক্তিবর্গকে বুঝায়। আত্মীয়স্বজন বলতে তিন শ্রেণির মানুষকে বুঝায়। যেমন-

ক) রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনঃ তারা হলেন- পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভাইবোন, চাচা, মামা, খালা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ফুফু প্রমুখ।

খ) বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন : শ্বশুর-শাশুড়ি, শালা-শালি প্রমুখ।

গ) বন্ধুত্বের মাধ্যমে আত্মীয়স্বজন : নিকটস্থ বন্ধুবান্ধব এবং তাদের পরিবার-পরিজন। কুরআনে আত্মীয়স্বজনকে যাবীল আরহাম বলে উল্লেখ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে।"[১৬৪] তাদের মিরাসী সমূহ যথাযথভাবে আদায় করার জন্য ইসলামে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও।"[১৬৫] মৃত নিকট আত্মীয়দের সম্পদে অপর আত্মীয়ের হক নির্ধারিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা কমই হোক বা বেশীই হোক, নির্ধারিত অংশ।"[১৬৬] তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।"[১৬৭] তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, উপহার-উপঢৌকন প্রদান, দাওয়াত দেয়া এবং গ্রহন করা, দান করা, সেবা যত্ন করা, কল্যাণ কামনা করা, ভূলত্রুটি হলে নিজগুণে ক্ষমা করা। রাসূল (সা.) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশেত প্রবেশ করবেনা।"[১৬৮] রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং হায়াত বাড়িয়ে দেয়া হোক, সে যেন আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করে।"[১৬৯] সর্বোপরি তাদের সাথে এমন আচরণ করা যাবে না, যে কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

মানবাধিকার

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুয়তের দীর্ঘ ২৩ বছরে বর্বর আরব জাতিকে আদর্শ জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে তুলে ধরেন। তিনি বিশ্বে অধিকারহারা মানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং প্রতিষ্ঠায় যে অপরিসীম শ্রম ও দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন সেটি মানবাধিকারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তিনি একাধারে শিক্ষক, সেনাপতি, পরিবারের কর্তা, সমাজপতি, রাষ্ট্রনায়ক, যোদ্ধা, বিচারপতি, সরদার, নেতা, একজন আদর্শ পিতা ও স্বামী সর্বোপরি তিনি একজন নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি যে আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষ সোনার মানুষ ও শান্তির সমাজ তৈরী করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ

---

১৬৩. ফয়সাল বিন আব্দুল আজীজ, ***তাতরীযু রিয়াদিস্ সালেহীন*** (রিয়াদঃ দারুল আ'ছিমাতি লিন্নশরে ওয়াত্ তাওযী, ১ম সংস্করণ-১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.) পৃ. ২১৯

১৬৪. আল-কুরআন, ৪ : ১

১৬৫. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬

১৬৬. আল-কুরআন, ৭ : ৭

১৬৭. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

১৬৮. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৮, পৃ. ৫

১৬৯. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৩, পৃ. ৫৬

করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।"[১৭০] তারপর আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "তোমার যা কল্যাণ হয়, তা আল্লাহর নিকট থেকে এবং যা অকল্যাণ হয়, তা নিজের কারণে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল। এবং যে মুখ ফিরিয়ে নিল, আমি তাদের উপর তোমাকে প্রহরীরূপে প্রেরণ করিনি।"[১৭১] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর সাবধান হও। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব সুস্পষ্ট প্রচার।"[১৭২]

সহকর্মী/ সহপাঠীর সাথে সম্পর্ক

ইসলাম হচ্ছে সহজ, সরল ধর্ম। এ ধর্মে কোন সহকর্মীকে যেন কোনো কষ্ট বা সমস্যায় পড়তে না হয়, সে জন্য ইসলামে তার যথোপযুক্ত বিধানও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন।"[১৭৩] তাই সহকর্মীকে অযথা কষ্ট দেয়া বা তার সাধ্যের বাহিরে কোনো কাজ করতে দেয়াটা কখনো সমীচীন নয়। আল্লাহ ত'য়ালা বলেন, "আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থের বাইরে দায়িত্ব দেন না।"[১৭৪] সুতরাং ব্যক্তিগত শত্রুতার উর্ধ্বে উঠে সহকর্মীকে সহজতার পথ অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও,-সন্ত্রস্ত করো না।"[১৭৫] এ জন্য সহকর্মীদের প্রতি সহজতার পথ অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। অহেতুক বাড়াবাড়ি, গোঁড়ামি ও অপ্রয়োজনীয় কাঠিন্যতাকে বর্জন করতে বলা হয়েছে। সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কোন ধরণের অকল্যাণ বা ক্ষতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "ক্ষতি করাও যাবে না এবং ক্ষতি সহাও যাবে না।[১৭৬]

বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পর্ক

মানুষ সামাজিক জীব। কেউ একা বাস করতে পারে না। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মানুষকে অন্যের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে বন্ধু নির্বচনের প্রয়োজন পড়ে। কারণ বন্ধু জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ভাগিদার হয়। বন্ধুই পারে আত্মার মধ্যমণি হয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও দুঃখকে ভুলিয়ে একটু স্বস্তি ও শান্তনা দিতে। আর তাই বন্ধু হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারীদেরকে নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ। যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং তারা বিনীত। আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।"[১৭৭] উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে ঈমানদারকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা অনুযায়ী চরিত্র গঠন করেন, জীবন পরিচালনা করেন; একমাত্র তাঁরাই হতে পারেন দুনিয়ার জীবনে সকলের আদর্শ বন্ধু। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই লক্ষ্য রাখবে সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।"[১৭৮] তাই যে বিপদাপদে এগিয়ে আসবে, আদর্শ জীবন গঠনে সহযোগিতা করবে, সবকিছু ভাল ও পজিটিভ ধারণা পোষণ করবে, লাইনচ্যুত হতে দেখলে যে সঠিক পথে ফিরাবে, ভাল কাজে আদেশ করবে আবার অসৎ কাজে নিষেধ করবে, মানবতাবোধ ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবে তাকেই কেবল বন্ধু হিসেবে

---

১৭০. আল-কুরআন, ৪ : ৬৯
১৭১. আল-কুরআন, ৪ : ৭৯-৮০
১৭২. আল-কুরআন, ৫ : ৯২
১৭৩. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮
১৭৪. আল-কুরআন, ২ : ২৮৬
১৭৫. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ১৭
১৭৬. আবু আব্দুল্লাহ্ হাকেম, ***মুসতাদরাকু লিলহাকিম*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ- ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৬৬
১৭৭. আল-কুরআন, ৫ : ৫৫-৫৬
১৭৮. আত-সুনানুত্ তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত***, খ.৪ পৃ. ১৬৭

গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা বর্তমান সময়ে অনেকেই বন্ধুত্বের কারণে খুনী, সন্ত্রাসী, জঙ্গি, মাদকসেবী, রেগার, ইভটিজার ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

অধিনস্তদের সাথে সম্পর্ক

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র বিশ্বে যে যেখানে দায়িত্বশীল সেখানকার অধীনস্থদের সাথে সুম্পর্ক ও সুহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। দায়িত্বশীলদেরকে তার অধিনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "সাবধান! তোমরা সকলে রাখালের ন্যায় দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধিনস্তদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[১৭৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, দ্বীন হল কল্যাণ কামনার নাম। তিনি একথা তিনবার বলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কার কল্যাণ কামনা করা? তিনি বলেনঃ আল্লাহ, তাঁর কিতাবের, মুসলিম নেতৃবর্গের এবং মুসলিম সর্বসাধারণের।"[১৮০] উল্লেখিত হাদিসে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ যে সব সৎ কাজের আদেশ দিবে তাদের মান্য করবে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। আর সর্বসাধারণের কল্যাণ কামনা দ্বারা তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান এবং উপকার সাধনকে বুঝানো হয়েছে। দায়িত্বশীলদেরকে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে সামগ্রিক খোঁজ-খবর নেবে, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। তাদের আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি মানসিক সার্পোর্টও দিতে হবে। তাদের আবদার, অভিযোগ ধৈর্য ও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং হাসিমুখে ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে শান্ত্বনা দিতে হবে। কোনো ভাবেই তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "অধীনস্তদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১৮১] পাশাপাশি অধীনস্তদেরকেও দায়িত্বশীলদের প্রতি মান-সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের বৈধ আদেশ মেনে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো।"[১৮২] দায়িত্বশীল যদি আদর্শবান, ন্যায়পরায়ণ, সৎচরিত্রের অধিকারী হন, তাহলে অধীনস্তদেরকে তার সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "নাক, কান কর্তিত কোন হাবশী ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতৃত্বে নিয়োগ করা হয়, তবু তোমরা তার নির্দেশ শোন, আনুগত্য করো, যতক্ষণ সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে।"[১৮৩]

ছোট-বড়দের মধ্যে সম্পর্ক

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ছোট-বড় সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। ছোটরা বড়দেরকে শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন করবে। আর বড়রাও ছোটদেরকে আদর, স্নেহ ও সোহাগ করবে। কেননা তারা একে অপরের পরিপূরক। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ছোটকে স্নেহ করে না, বড়দের মান্য করে না, সে আমার দলভূক্ত নয়।"[১৮৪] এ হাদিসে সরাসরি নির্দেশনা প্রদান করেছে যে, নিজেদের মধ্যে সহানভূতি ও সহমর্মিতার পথ অবলম্বন করতে হবে। নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, রাহাজানি চিরতরে ভূলে যেতে হবে। বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে, ছোটদের প্রতি অনাদর ও অবহেলা

---

১৭৯. আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৩০

১৮০. আত-সুনানুত্ তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ.৭৪

১৮১. মামার ইবনে আবী আমর রাশেদ, *জামে মামার ইবনে রাশেদ* (বৈরুতঃ তানজি তাওজিউল মাকতাবাতুল ইসলামীয়্যাহ, ১ম সংস্করণ-১৪০৩ হি.) খ. ১১, পৃ. ৪৫৬

১৮২. ইবন মাযাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৯৫৪

১৮৩. ইবন মাযাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৯৫৫

১৮৪. আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৮৬

করার কারণে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠে। অনেকটা আবেগী হয়ে বিভিন্ন ধরণের অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বড়দের প্রতিও অসম্মান, অশ্রদ্ধা, অবমূল্যায়ন, অপমান ও অবহেলার কারণে তাদের মধ্যে প্রতিশোদের মনোভাব তৈরী হয়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে এক অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত পরিবেশ তৈরী হয়। যা তাদেরকে মহাবিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। এ জন্য সবাইকে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদায় বলিয়ান হয়ে বেড়ে উঠলে সমাজ ও রাষ্ট্র একটি শান্তির নীড়ে পরিণত হবে।

অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক

ইসলামই সর্বপ্রথম জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান বলে ঘোষণা করেছে এবং মুমিনগণকে নির্দেশ দিয়েছে অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য। তাদের সাথে শত্রুতা নয়, সকল ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করা। বিশেষত অমুসলিম প্রতিবেশী, সহকর্মী, এতিম, শ্রমিক, ক্রেতা বা অনুরূপ যারা আমাদের চারপার্শে থাকেন তাদের প্রতি অন্যায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ জন্য কুরআন ও হাদীসে তাদের বিষয়ে বেশি বলা হয়েছে। তাই অমুসলিম তথা জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাদের সকলের প্রতি মুমিনের দায়িত্ব হলো-

(১) সবার সাথে সাধ্যমত ভাল ব্যবহার করতে হবে এবং সাধ্যমত উপকার করতে হবে।
(২) কোনোভাবে কারো প্রাপ্য বা পাওনা নষ্ট করা যাবে না বা কম দেওয়া যাবে না।
(৩) কোনোভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না বা ক্ষতি করা যাবে না।
(৪) সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

কুরআনে এ বিষয়ক অনেক নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও কোন কিছুকে তার শরীক করো না এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক ও অহংকারীকে।"[১৮৫] কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অমুসলিম প্রতিবেশী তথা সকল সহকর্মীর বা পার্শবর্তী মানুষদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়! সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, যার প্রতিবেশী-পার্শবর্তী মানুষ তার কষ্ট থেকে রেহাই পায় না।"[১৮৬] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত-ভরাপেট থাকে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয়। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত-ভরপেট থাকে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয়। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,"যে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রিযাপন করে, অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে এবং সে তা জানে সে মুমিন নয়।"[১৮৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সাবধান! যদি কোনও মুসলিম কোনও অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেয় এবং তার কোনও বস্তু জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।'[১৮৮] এসব আয়াত ও হাদীসে অমুসলিম সহ অন্যান্য প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বলা হয়েছে। ইসলাম এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনও পার্থক্য করেনি বরং অমুসলিম প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেয়া, তাকে উপঢৌকন দেয়া, খাবার-দাওয়ায় তাকে শরীক করা, তার বাসায় যাতায়াত করা, তার সেবা করা, এভাবেই তাকে সম্মান করা হয়। প্রতিবেশীর সামাজিক অবস্থান ও উপলক্ষ্যের বিভিন্নতায় অধিকারও নানা রকম হতে পারে। প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনা করা, বিপদ-আপদ ও দুঃখ দুর্দশা লাঘব করা, এ সবই তার সম্পর্কের অংশ। এছাড়াও অমুসলিম প্রতিবেশী কষ্ট পেতে পারে এরূপ আচরণ না করা, বিপদে সাহায্য করা, শোকে

[১৮৫]. আল কুরআন, ৪ : ৩৬
[১৮৬]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ২২৪০; *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৬৮
[১৮৭]. আবুল হাসান নুরুদ্দিনহাইসামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, (কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৪১৪ হি.) খ. ৮, পৃ. ১৬৭
[১৮৮]. আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৩৬

সমবেদনা জানানো, রোগাক্রান্ত হলে সেবা করা, আনন্দে অভিনন্দন জানানো ইত্যাদিও অমুসলিম প্রতিবেশীর অধিকার। ইসলামে অমুসলিমদের জন্য প্রতিবেশী সংক্রান্ত সকল অধিকারই সংরক্ষিত।

ঘ) আত্মশুদ্ধি সম্পর্কিত বিষয়

আত্মশুদ্ধি একটি মহৎ মানবিক গুণ। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ তার ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। মানুষের মধ্যে যে হীনমন্যতা, চরিত্রহীনতা, কুপ্রবৃত্তি, মন্দস্বভাব থাকে তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি শব্দের অর্থ হলো, নিজের আত্মাকে গুনাহ ও পাপাচার থেকে পরিশুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে দেহ ও আত্মা এ দুয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। দেহের রয়েছে দুইটি অবস্থা: সুস্থতা ও অসুস্থতা। ঠিক তেমনি আত্মারও রয়েছে সুস্থতা ও অসুস্থতা। দেহ অসুস্থ হলে যেমনি চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা চালাতে হয়, তেমনিভাবে আত্মা রোগাক্রান্ত হলে আত্মিক চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ বা শুদ্ধ করে তুলতে হয়। আর একেই বলে আত্মশুদ্ধি। পবিত্র কুরআনে বান্দাকে তার নিজের প্রয়োজনে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধি অর্জন করে সে নিজের জন্যই পরিশুদ্ধি অর্জন করে।"[১৮৯] আত্মশুদ্ধিকে বলা হয় মানব চরিত্রকে সংশোধনের এবং শুদ্ধ পথে নিয়ে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। ইবাদতের মূল লক্ষ্য হলো আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। মানুষের মাঝে যেসব খারাপ অভ্যাস, হীনমন্যতা রয়েছে তা দূর করা। মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ণীত হয় তার চরিত্র দিয়ে। আর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তার আত্মা। কাজেই জীবনের ইহ-পরকালীন সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে আত্মার শুদ্ধতার উপর। পরিশুদ্ধ আত্মা অপরের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। সে কামনা করে সবার কল্যাণ। মানব প্রেমের জয়গান গায়, মানুষের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়। আবার কলুষিত আত্মা পৃথিবীতে অনিষ্টের কারণ হয়। যার ফলে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও অন্যায়-অপকর্মের মাধ্যমে ধ্বংস ডেকে আনে। আত্মশুদ্ধির জন্যই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে পৃথিবীতে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হেকমতশিক্ষা দেন।"[১৯০]

আত্মার পরিচয়

আত্মার আভিধানিক অর্থ: জীবাত্মা, মন, ইগো, জীবনীশক্তি[১৯১] আরবীতে বলা হয়- রূহ, নফস, নফস শব্দের অর্থ প্রবৃত্তি, মন, রিপু, কামনা, ভোগ, পাপ, অহঙ্কার ইত্যাদি।[১৯২] আত্মা অর্থ হলো দেহবিশিষ্ট চৈতন্যময় সত্ত্বা, অধিদেবতা, স্বরূপে স্বয়ং, অন্তর্নিহিত শক্তি, প্রাণের মধ্যবিন্দু , কেন্দ্র বিন্দু, প্রাণকে চঞ্চল করে তুলে এমন উজ্জীবক, গভীর অনুভূতিকে জাগ্রত করে এমন, Soul, Immoral part of the body, ego, essence ইত্যাদি।[১৯৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** "তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বলঃ রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত।"[১৯৪]

আত্মার পারিভাষিক সংজ্ঞা

আত্মার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, মানবদেহে যে প্রবাহমান রক্ত সেই রক্ত হলো আত্মা।
আবুল হায়সাম বলেন, আত্মা এমন বিষয় যার মাধ্যমে মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। যা মানুষের ভিতর হতে বের হয়ে গেলে মানুষ মারা যাবে।

---

১৮৯. আল-কুরআন, ৩৫ : ১৮

১৯০. আল-কুরআন, ২ : ১৫১

১৯১. মো: তফিজ উদ্দিন কাদেরী, **নফস ও রুহের পরিচয়** (দৈনিক ইত্তেফাক, শুক্রবার,১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭, ২৮ মাঘ ১৪২৩, ১২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৮)

১৯২. আলহাজ্জ হাকীম সৈয়দ সালেহ আহমদ, ***নিজেকে চিনলেই প্রভুকে চেনা যায়*** (দৈনিক ইত্তেফাক, শুক্রবার, শুক্রবার ১৪ নভেম্বর ২০১৪, ৩০ কার্তিক ১৪২১, ২০ মহররম ১৪৩৬।) পৃ. ৫

১৯৩. Asutosh Dev, Students Favourite Dictionary (Dhaka: Hakkani Publisher, 1st ed. 1903) P. 350

১৯৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৮৫

আল-ফাররার মতে, আত্মা হলো এমন বস্তু যার উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল।
ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, আত্মা হলো মানুষের দেহ সংশ্লিষ্ট এবং দেহোত্তীর্ণ আধ্যাত্মিক সত্তা।
ইবনুল আরাবীর মতে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের উপায় এবং মাধ্যম হলো আত্মা।
আল্লামা ইকবাল বলেন, আত্মা হলো এক ধরনের বাস্তব সত্তা যাকে অতীন্দ্রীয়নুভূতির মাধ্যমে জানা যায়। সারকথা হলো এই যে, আত্মা এমন এক বিষয় যা চিন্তন, অমর, অবিনশ্বর, অদৃশ্য এবং সর্বত্র বিরাজমান এবং যা মানুষের প্রাণশক্তিকে সঞ্চার করে। আরবী ভাষায় একে রুহ এবং কলব বলা হয়। পবিত্র কুরআনে মানুষের নফস বা আত্মার তিন ধরনের প্রকৃতি উল্লেখিত হয়েছে। যথা-

১. নাফসে আম্মারাহ্

(খারাপ কাজের নির্দেশদানকারী আত্মা): নফসে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তি; ইহা অতি জগণ্য, অশিক্ষিত ও অপবিত্র। সদা সর্বদা পাপ কাজে লিপ্ত থাকে, ভালো-মন্দ কিছু বুঝে না। এমনকি পাপ কাজ করার পর আতগ্লানিও হয় না। এককথায় অতি নির্লজ্জ, অতি বেহায়া।[১৯৫] নাফসে আম্মারার স্বভাবগত চাহিদা এটাই যে, মন্দ কামনা, শয়তানের অনুসরণ, কু-প্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ করা, যাতে করে হারাম কাজ করা তার জন্য সহজতর হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "(হযরত ইউসুফ আ. বলেন :) আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না, নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন; নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৯৬]

২. নফসে লাওয়্যামাহ্

(ধিক্কার দানকারী আত্মা): এ প্রকারের আত্মাও মন্দ বা অসত্য কাজের জন্য অনুতপ্ত মন অর্থাৎ দোটানা মন। ইহা কিছু বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন এবং পবিত্র হওয়ার দরুণ কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ তা বুঝতে পারে। কোন মন্দ কাজ করলে পরক্ষণেই আত্মগ্লানি হয়। শয়তানী, কুমন্ত্রণা ও কুপ্রবৃত্তির বাসনা ইত্যাদি জিনিসের উদয় হয়; তবে পরক্ষণেই এই নফসের অধিকারী ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য নিজেকে অধিক ধিক্কার দেয়, তিরস্কার করে, অনুশোচনা প্রকাশ করে, অনুতপ্ত হয় ও লজ্জাবোধ করে। কেনানা তাতে সামান্যতম হলেও ঈমানের জ্যোতি বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি শপথ করি ক্বিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করি সেই আত্মার, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।"[১৯৭]

৩. নাফসে মুত্বমায়িন্নাহ

(প্রশান্ত আত্মা): শুদ্ধ ও শান্ত মন; ইহা শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। যা কখনো অন্যায় ও পাপ কাজ করে না। উহার উপর আল্লাহর জ্যোতি প্রতিফলিত হওয়ায় উহা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে।[১৯৮] সে অন্তর যে তার প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর আনুগত্যেই সুস্থির হয়েছে। যে আল্লাহর দাসত্বে, তাঁর স্বরণে ও ভালোবাসায় প্রশান্তি অর্জন করেছে। এই প্রকারের আত্মা আল্লাহর আনুগত্য ও যিকির দ্বারা মনে প্রশান্তি অনুভব করে। সকল প্রকার আনুগত্যের কর্মকান্ড সম্পাদন করে ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ লাভ করে এবং সমস্ত অন্যায় ও সীমালংঘন থেকে সে পরিপূর্ণ রূপে মুক্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি প্রশান্তচিন্তে তোমার পালনকর্তার দিকে ফিরে চলো। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর"[১৯৯] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "শপথ প্রাণের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে, সে অবশ্যই সফলকাম হবে। আর যে নিজেকে কলুষিত করবে, সে নিশ্চয়ই ব্যর্থ-মনোরথ হবে"[২০০] সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি তার আত্মার পরিশোধনে এবং আল্লাহর আনুগত্যে নিবিষ্ট হতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

---

[১৯৫]. আলহাজ্জ হাকীম সৈয়দ সালেহ আহমদ, *নিজেকে চিনলেই প্রভুকে চেনা যায়*, দৈনিক ইত্তেফাক, ***প্রাগুক্ত***, পৃ.৪
[১৯৬]. আল-কুরআন, ১২: ৫৩
[১৯৭]. আল-কুরআন, ৭৫ : ১-২
[১৯৮]. আলহাজ্জ হাকীম সৈয়দ সালেহ আহমদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ***প্রাগুক্ত***, পৃ.৫
[১৯৯]. আল-কুরআন, ৮৯ : ২৭-৩০
[২০০]. আল-কুরআন, ৯১ : ৭-১০

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ দেহ ও অন্তরের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। দেহ হলো মানুষের হাত, পা, মাথা, ও বুক ইত্যাদি নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি আর অন্তর হলো আত্মা বা কলব। এ দুটোর মধ্যে কালবের সংশোধন প্রয়োজন, আর কলবের সংশোধনই হলো আত্মশুদ্ধি। আত্মা পরিশুদ্ধ হলে সকল কর্ম নিয়মতান্ত্রিক হয়, ইবাদতে স্বাদ সৃষ্টি হয়, খারাপ কাজের প্রতি অনীহাভাব সৃষ্টি হয় ও আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিঃসন্দেহে সে সফল হয়েছে, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর ব্যর্থ হয়েছে সে, যে তার আত্মাকে কলুষিত করেছে।"[২০১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আত্মা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হলো কলব।'[২০২] উপরোক্ত কুরআন ও হাদিসের আলোকে বুঝা যায় যে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য ও জরুরী। মানুষের আত্মিক উন্নতি, প্রশান্তি ও বিকাশ সাধনের জন্যও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মশুদ্ধি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। সদা-সর্বদা ভালো চিন্তা ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। আত্মশুদ্ধি মানুষের চরিত্রে প্রশংসনীয় গুণাবলীর চর্চা করে দেয়। পক্ষান্তরে যার আত্মা কলুষিত সে নানাবিধ পাপ চিন্তা ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকে। সে অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, দুর্নীতি, মাদক, হত্যা, ধর্ষণ,সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতি, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি করতে দ্বিধাবোধ করে না। ফলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাও বিনষ্ট হয়। অতএব, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা ও বিকাশের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রায়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আত্মশুদ্ধি মানুষকে বিকশিত করে, সফলতা দান করে। ইহ-জীবনে আত্মশুদ্ধি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে। এরূপ মানুষ সবধরনের কুপ্রকৃত্তি থেকে, সকল পাপাচার ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে সে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে। বস্তুতঃ আত্মশুদ্ধি হলো সফলতা লাভের মাধ্যম। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে ব্যর্থ সে দুর্ভাগা। সে কখনোই সফলতা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অবশ্যই সফলতা লাভ করেছে সে, যে আত্মার শুদ্ধতা অর্জন করেছে।"[২০৩] পরকালীন জীবনের সফলতা এবং মুক্তি আত্মশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ আত্মাকে পবিত্র রাখবে, পরকালে সেই মুক্তি লাভ করবে; তার জন্য পুরষ্কার হবে জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "সেদিন সম্পদ ও সন্তান কোন উপকারে আসবে না, বরং সেদিন সে ব্যক্তিই মুক্তি পাবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট পরিচ্ছন্ন-বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে।"[২০৪] মূলত ইহ ও পরকালীন সফলতা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। এজন্যই ইসলামে আত্মশুদ্ধির প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

উদারতা ও সম্প্রীতি

ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই বিশেষ গুণ দ্বারা পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সবখানেই বজায় থাকে স্থিতিশীলতা ও শান্তি। ছাড় দেওয়ার মানসিকতা না থাকলে কোথাও স্বস্তি মিলে না। ইসলাম উদারতা ও সম্প্রীতির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। দল-মত, পথ ও ধর্মের সহাবস্থানের জায়গাটি হলো ইসলাম। বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ইসলাম উদারতা, মানবিকবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার অপূর্ব নজির স্থাপন করে আসছে। রাসূল (সা.) এর ঐতিহাসিক মদীনার সনদ উদারতা ও সম্প্রীতির ঐতিহাসিক দলিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলাম যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা ইতিহাসে বিরল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও সদ্ব্যবহার ইসলামের

[২০১]. আল-কুরআন, ৯১ : ৯-১০

[২০২]. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল সহীহুল বুখারী, ***সহীহুল বুখারী,*** (বৈরূতঃ দারু তৃকীন নাজাত, ১ম সংস্করণঃ ১৪২২ হিঃ) খ. ১,ঈমান অধ্যায়, পৃ. ২০

[২০৩]. আল-কুরআন, ৮৭ : ১৪

[২০৪]. আল-কুরআন, ২৬ : ৮৮-৮৯

অনুপম শিক্ষা। অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচরণ, উদারতা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশ। ইসলাম সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। ইসলাম সারা পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করেছে তার আদর্শের শক্তিতে, তলোয়ারের জোরে নয়। অল্প দিনে ইসলাম অর্ধেক পৃথিবী জয় করার পেছনে মূল শক্তিটি ছিল আদর্শ, উদারতা ও সম্প্রীতির। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

"আল্লাহ নিষেধ করেন না ঐসকল লোকদের সাথে সদাচার ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের আবাসভূমি থেকে তোমাদের বের করে দেয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।"[২০৫] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"তারা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি দিয়ো না, তাহলে তারা অজ্ঞতাবশঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে। আমিতো এ রূপেই প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তারা কি কাজ করেছিল তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।"[২০৬] বিশ্বের সকল মানুষ সৃষ্টি হয়েছে একটি মানুষ হতে। এতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের মাঝে কোন ভিন্নতা নেই, কারণ সকলের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)। এ মূলতত্ত্বের মধ্য দিয়ে ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিপ্রয়াস রেখেছে। এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, আদর্শিক গোঁড়ামী ও মানব সমাজের পাশবিক হিংস্রতা দূর করে মুসলিম মানসে উদার মনোভাব সৃষ্টি করে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করেছে। মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে একটি সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করেছে।[২০৭] শান্তি, নম্রতা-ভদ্রতা, কোমলতা, সম্প্রীতি, উদারতা ও আত্মসমর্পণ। মহান আল্লাহর মনোনীত এ ধর্মের অনুসারীরা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তাদের মহান রবের নিকট উপস্থাপন করে ও তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করে। তাই এর অনুসারীকে মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমরা ওহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।"[২০৮] ইসলাম মানুষকে ত্যাগ ও বিসর্জনের শিক্ষা দেয়। যারা আত্মত্যাগ ও আমিত্বকে বিসর্জন দিতে জানে তারাই ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরিগণিত। আর যারা এ গুণে গুণান্বিত তারাই উদারতা ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টির প্রধান প্রতিবন্ধক সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক মর্যদা সম্পন্ন যে লোক অধিক মুত্তাকী।"[২০৯]

উল্লিখিত আয়াতে সাম্যের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম সাম্য ও সম্প্রীতির ধর্ম। এখানে সকল মানুষ সমান। জন্মগত, বর্ণগত, অঞ্চলগত, বংশগত কিংবা অর্থ সম্পদ ও পদমর্যাদার কারণে কারো কোন মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। যে যতবেশি তাকওয়াবান সে ততবেশি মর্যাদাবান। রাসুল (স:) বলেন, "হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রতিপালক এক।

أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى.

---

[২০৫]. আল-কুরআন, ৬০: ৮

[২০৬]. আল-কুরআন, ৬: ১০৮

[২০৭]. ড. এম. এয়াকুব আলী, *ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির তাৎপর্য,* (Department of Al-Quran & Islamic Studies, Islamic University, Kushtia: The Quranic Studies, A Half Yearly Research Journal, june- 2017) পৃ. ৭৩

[২০৮]. আল কুরআন, ৪২ : ১৩

[২০৯]. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

সাবধান! অনারবের উপর আরবের, আরবের উপর অনারবের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের এবং শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের একমাত্র তাকওয়া ব্যতিত কোন মর্যাদা নেই।"[২১০] প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) কে মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীর জন্য রহমত করে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"[২১১]

অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ দিয়ে তাকে সৃষ্টিকূলে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[২১২] রাসূল (সা.) মানবজাতির জন্য সর্বোচ্চ আদর্শ মডেল। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারীর শ্রেষ্ঠ মডেল। অবিস্মরণীয় ক্ষমা, উদারতা, মহানুভবতা, বিনয়-নম্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দিয়েই অসভ্য ও বর্বর আরব জাতির আস্থাভাজন হয়েছিলেন। রাসূল (সা.) জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে সকলের সাথে সদাচরণ করে দুনিয়ার বুকে নজিরবিহীন আদর্শ স্থাপন করেছেন। রাসূল (সা.) সর্বদা মানুষের সাথে উদার মনে মিশতেন। হাসিমুখে কথা বলতেন, সদালাপ করতেন। তাঁর মধুর বচনে সবাই অভিভূত হতো। ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানোর উপদেশ দেন। রাসূল (সা.) বলেন,

فُكُّوا العَانِيَ، يَعْنِي: الأَسِيرَ، وأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وعُودُوا المَرِيضَ.

"বন্দিকে মুক্ত করে দাও, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও ও অসুস্থ ব্যক্তির সেবা কর।"[২১৩]

নবীজির উদারতা ও মহানুভবতায় সিক্ত হযরত আনাস (রা.) বলেন,

خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ، ولاَ: لِمَ صَنَعْتَ؟ ولاَ: أَلَّا صَنَعْتَ.

"আমি ১০ বছর আল্লাহর রাসূল (সা.) এর খেদমত করেছি। আমার কোন কাজে আপত্তি করে তিনি কখনো বলেননি, এমন কেমন করলে? বা এমন করনি কেন?"[২১৪] রাসূল (সা.) অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মালয়কে সুরক্ষিত রাখার সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি। কোন অমুসলিমের উপর তিনি ইসলামকে চাপিয়ে দেননি। হেকমত ও চারিত্রিক মাধুর্য দিয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিতেন। এ জন্য তিনি জীবনে অনেক যাতনা-লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। কিন্তু কোন দিনই ব্যক্তিগত কারণে কোন অমুসলিমের প্রতি প্রতিশোধ নেননি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুমধুর আচরণ আকৃষ্ট করেছে হাজারো অমুসলিমকে। তাদের অনেকেই তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে কুফরী মতবাদের উপর অনড় থাকতে পারেনি। ফুলে মধু আছে জেনে মৌমাছি যেমন ফুলের স্পর্শে যেতে মরিয়া হয়ে ছুটে, ঠিক তেমনই ছুটেছিল অমুসলিমরা নবীর পরশে ইসলাম গ্রহণের মানসে।[২১৫] তিনি এ বৈশিষ্ট্য দিয়ে মদীনায় সকল ধর্মের লোকদের সমর্থনে এক উদারতা ও সম্প্রীতিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন। সুতরাং ইসলামের অনন্য বৈশিষ্টাবলীর মধ্যে উদারতা ও সম্প্রীতি উল্লেখযোগ্য।

উদারতার পরিচয়

উদারতা মানবজীবনের একটি মহান বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সবখানেই থাকে স্থিতিশীলতা ও শান্তি। উদারতা শব্দটি 'উদার' শব্দের বিশেষ্য। অর্থাৎ এটি বিশেষণের বিশেষ্য। উদার শব্দের অর্থ বদান্য, দানশীল, মহৎ, উচ্চ, প্রশস্ত, করুণাপূর্ণ, সরলতা বিশিষ্ট, অসংকীর্ণ। আর উদারতা শব্দের অর্থ ঔদার্য, বদান্যতা, দানশীলতা, ঋজুতা, সরলতা, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ও অকপটতা।[২১৬] উদারতা শব্দের

---

২১০. আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ* (বৈরূত: মুআ'স্সাতুর রিসালা, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.) খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৪

২১১. আল কুরআন, ২১ : ১০৭

২১২. আল-কুরআন, ৩৩: ২১

২১৩. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৬৮

২১৪. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ১৪

২১৫. মোঃ মাহমুদ বিন সাঈদ, *ইসলামে উদারতা ও অসহীহ মুসলিমদের অধিকার* (পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স,বাংলাবাজার, ঢাকা, তা.বি.) পৃ. ০৫

২১৬. জামিল চৌধুরী, *আধুনিক বাংলা অভিধান,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-২০১৬ খ্রী.) পৃ.২০০

ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Generosity, Liberality, Munificence, Bounty, Charity.[217] (Broadness)। Broadness শব্দটি (Noun) বা বিশেষ্য, যার অর্থ প্রশস্ততা[২১৮], width, breadth, girth, span, thickness, wideness[২১৯]। উইকশনারীতে Broadness এর অর্থ লেখা হয়েছে- breadth, eatness, extent, surface, liberality[২২০] প্রভৃতি।

আরবি ভাষায় উদারতা হলো **(السماحة)**। **(السماحة)** শব্দটি **(سمح)** মূল থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ বদান্যতা, সহৃদয়তা, মহানুভবতা প্রভৃতি।[২২১]

আর **(المسامحة)** হলো পারস্পরিক সহজতা। বলা হয়- **(وسمح بكذا يسمح سموحا وسماحة)** আন্তরিকভাবে দান করা, উৎসর্গ করা অথবা আমি তার নিকট যা চাই তার সাথে সে একমত হলো।[২২২]

মুরতাজা যুবাইদী ও ড. ইবরাহীম মোস্তফা বলেন, **(السماحة)** শব্দের অর্থঃ বদান্যতা, দানশীলতা, কোমলতা।[২২৩]

উদারতার পারিভাষিক পরিচয়

ইসলামী শরী'আহ এর আলোকে সমস্ত মানুষ একই পিতামাতার সন্তান। তাই এখানে জাতি, গোষ্ঠী ভাষা, বর্ণ, রাষ্ট্রীয় বা অঞ্চলগত সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, পার্থক্য বা ভেদাভেদ পরিত্যাজ্য। এটাকেই পরিভাষায় উদারতা বলে।[২২৪]

আল্লামা জুরজানী বলেনঃ 'অপব্যয় নয় এরূপ ব্যয়কেই উদারতা বলে।'[২২৫]

সালিহ ইবন আব্দুল্লাহ উদারতার সংজ্ঞায় বলেন,

"একে অপরের সাথে পারস্পরিক আচরণ, লেনদেন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়গুলোকে সহজ করে তোলা, কোমল ব্যবহার করা যেখানে যে কোনও প্রকারের কঠোরতার স্থলে কোমলতার প্রাবল্য দেখা যায়।'[২২৬]

Wiktionary তে (Broadness) এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 'The state, characteristic or condition of being broad' অর্থাৎ 'কোন রাষ্ট্র, বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার উদার হওয়াকে উদারতা বলে।[২২৭]

সম্প্রীতির শাব্দিক বিশ্লেষণ

জামিল চৌধুরী বলেন, সম্প্রীতি শব্দটি বিশেষ্য পদ; যার অর্থ সদ্ভাব, সৌহার্দ্য (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি), প্রেম, প্রণয়, সন্তোষজনক আচরণ, সুভাব (সামাজিক সম্প্রীতি), আনন্দ, সন্তোষ প্রভৃতি।[২২৮] ইংরেজি অভিধানে রয়েছে, Complete satisfaction, Joy, Delight, Pleasure, Good will, Friendship with,

---

২১৭. Mohammad Ali, Bengali-English Dictionary (Dhaka: Bangla Academy, 1st edition- 1994) p. 501

২১৮. সম্পাদনা পরিষদ, ***ইংলিশ বাংলা অভিধান*** (বাংলা একাডেমী, ঢাকা) পৃ. ১০২

২১৯. সম্পাদনা পরিষদ, ***থিজারাস ডিকশনারী***। www.thesaurus.com

২২০. সম্পাদনা পরিষদ, ***উকশনারী***। www.wiktionary.org

২২১. আবুল হাসান আলি ইবন ইসমাইল, ***আল-মুহকাম ওয়াল মুহিতুল আ'যম*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণঃ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.) খ. ৩, পৃ. ২১৬; ড. ফজলুর রহমান, ***আল মু'জামুল ওয়াফী*** (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ৫৭৩

২২২. জয়নুদ্দিন রাজি, ***মুখাতারুস্ সিহ্হাহ*** (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল আসরীয়্যাহ্, ৫ম সংস্করণঃ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৫৩; ইবন মানযুর, ***লিসানুল আরব*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি) খ. ৩, পৃ. ৯৯; ইবন ফারিস, ***মু'জামু মাকা'ঈসিল লুগাহ্***, খ. ৩, পৃ. ৯৯; আল ফাইয়ুমী, ***মিসবাহুল মুনীর***, খ. ১, পৃ. ২৮৮

২২৩. আবুল ফাইজ মুরতাজা যুবাইদী, ***তাজুল উরূছ*** (কায়রোঃ দারুল হেদায়া, তা.বি) খ. ৬, পৃ. ৪৮৫; ড. ইবরাহীম মুস্তফা, ***আল মু'জামুল ওয়াসীত*** (দেওবন্দঃ যাকারিয়া বুকডিপো, তা.বি.) পৃ. ৪৪৭

২২৪. আল্লামা তাকী উসমানী, ***ইসলাহী খুতুবাত*** (ঢাকাঃ বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, তা.বি) খ. ৬, পৃ. ৩১৩

২২৫. সাহেব ইবন আব্বাদ, ***আল-মুহীতু ফিল্ লাগাহ্*** (মাকতাবাতুশ্ শামেলা) পৃ. ২০২; আল্লামা জুরজানী, প্রাগুক্ত, আত-তা'রিফাত, পৃ. ১৬০

২২৬. সালেহ ইবন আব্দুল্লাহ, ***নাদরাতুন্ নায়ীম ফি মাকারিমী আখলাকীর রাসূল (সা.)*** (জিদ্দাঃ দারুল ওয়াসীলা, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি) খ. ৬, পৃ. ২২৮৭; আব্দুল কাদের আশ শাক্কাক, ***মাওসূ'আতুল আখলাক*** (রিয়াদঃ আদ-দুরারুস সুন্নিয়্যাহ, ১ম প্রকাশঃ ১৪৩৪ হি.) পৃ. ৬০৫

২২৭. সম্পাদনা পরিষদ, ***উইকশনারী***। www.wiktionary.org

২২৮. জামিল চৌধুরী, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ১৩০১

Frindly terms, amity, Love, attachment, affection, Harmony.[২২৯] আর (harmony) অর্থ (অনুভূতি, স্বার্থ, মতামত ইত্যাদির) সাদৃশ্য, মিল, প্রীতিকর সংমিশ্রণ।[২৩০]

ক্যামব্রিজ ডিকশনারীতে (harmony) শব্দটির একটি সুন্দর অর্থ তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'শান্তি ও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে উদ্ভূত মানুষের অবস্থা অথবা এমন অবস্থা যেখানে বিষয়গুলো সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়।'[২৩১]

পারস্পরিক হৃদ্যতা ও সম্প্রীতিকে আরবীতে (**التودد**) বলা হয়। (**الود**) শব্দের অর্থ হলো প্রত্যেক কল্যাণের কাজের প্রতি ভালোবাসা। (**التواد**) অর্থ (**التحاب**) তথা পারস্পরিক ভালোবাসা।

সম্প্রীতির পারিভাষিক পরিচয়:

আল্লামা জুরজানী বলেন, সম্প্রীতি হলো 'বিশেষ কোন উপায়ে সমজনে হৃদ্যতার কামনা, যা হৃদ্যতাকে আবশ্যক করে।'[২৩২]

আল্লামা ইবন হাজার বলেন, 'পছন্দনীয় কোনও উপায়ে কোনও ব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্তির কাছে আসা।'[২৩৩]

ইবন আবী হামযা বলেন, 'ভালোবাসাকে আবশ্যক করে এমন পারস্পরিক সম্পর্ক হলো সম্প্রীতি।'[২৩৪]

ক্যামব্রিজ ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, 'শান্তি ও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে উদ্ভূত মানুষের অবস্থা অথবা এমন অবস্থা যেখানে বিষয়গুলো সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়।'[২৩৫]

ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির আবশ্যকতা:

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র সত্তার বিকাশের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁর একত্ববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই মাবনজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) কে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে সৃষ্টি করেন। হযরত আদম (আ.) নবী হিসাবে সর্ব প্রথম মানুষের নিকট ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার শুরু করেনএবং এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহবান। কালের বিবর্তনে এবং যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে ইসলামের বিধিবিধানও পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু শয়তান ও প্রবৃত্তির ধোঁকায় মানুষ আল্লাহর দেয়া বিধিবিধান থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ফলে যুগে যুগে আল্লাহ পথভ্রষ্ট মানুষের হিদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা চান মানুষ তাঁর বিধান মেনে চলুক এবং বিনিময়ে পরকালে জান্নাত লাভ করুক। এজন্য রাসূলগণের উপর তিনি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। রাসূলগণ এ কিতাব অনুযায়ী দ্বীনের দাওয়াত দিতেন এবং বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক চাইতেন না। তাদের সকলেরই লক্ষ্য এক, আহবান এক, ধর্ম এক। অবশ্য ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠণের বিধি-বিধান দেয়া হয়েছে যুগের চাহিদা অনুযায়ী। কিন্তু ঈমান-ইতিকাদ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সর্বকালেই ছিল এক ও অভিন্ন। যা আদম আলাইহিস সালামের, তাই অন্যান্য নবী-রাসূলের এবং তাই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।[২৩৬]

ঈসায়ী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে যেমন নবুওয়াত ও রিসালাতের এই ধারা পূর্ণতা পায় তেমন ঘোষিত হয় সব নবীর সত্যতা, সত্যায়িত হয় সব আসমানী

২২৯. Mohammad Ali, Bengali-English Dictionary, Ibid, P. 801

২৩০. Zillur Rahman Siddiqui, English-Bangla Dictionary (Dhaka: Bangla Academy, 1st edition: 1993) c. 344

২৩১. ক্যামব্রিজ এ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারী, www.dictionary.cambridge.org

২৩২. আল্লামা জুরজানী, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৭১

২৩৩. আহমাদ ইবন আলি ইবন হাজার, ***ফাতহুল বারী*** (বৈরূতঃ দারুল মা'রেফা, ১৩৭৯ হি.) খ. ১, পৃ. ২০৪

২৩৪. আহমাদ ইবন আলি ইবন হাজার, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১০, পৃ. ৪৩৯

২৩৫. ক্যামব্রিজ এ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারী, www.dictionary.cambridge.org

২৩৬. ড. এম. এয়াকুব আলী, ***ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির তাৎপর্য***, (Department of Al-Quran & Islamic Studies, Islamic University, Kushtia: The Quranic Studies, A Half Yearly Research Journal, june- 2017) পৃ. ৭৩; মাওলানা রূহুল আমীন খান, ***সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে মহানবী (সা) এর আদর্শ এবং ইসলামী সমাজে তার প্রতিফলন*** (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা) ই.ফা.বা. বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ৪৬-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

কিতাব। আল্লাহ তা'আলা শান্তির সমাজ, শান্তির পৃথিবী গড়ার জন্য তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীবাহম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন। তাঁরই মাধ্যমে পূণতা দান করলেন দ্বীনের, তাঁর অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সুন্দর জীবন বিধানের। আল্লাহ হচ্ছেন খালিক, মালিক, রাব্বুল আলামীন, বিশ্ব স্রষ্টা, বিশ্ব প্রভু ও বিশ্ব প্রতিপালক। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন বিশ্বনবী, বিশ্ব কল্যাণ ও বিশ্ব জগতের জন্য রহমত-রহমাতুল্লিল আলামীন।[২৩৭] বিশ্ব পরিবারের লালন পালন, শৃঙ্খলা বিধান, সুখ-শান্তি নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব মানুষের। এই বিশ্ব বৈচিত্র্যময় এখানে নানা বর্ণ আছে, নানা ভাষা আছে, নানা ধর্মও আছে। আছে নানা রকম পার্থক্য। এ সবকিছু স্বীকার করে নিয়ে তার মাঝে ঐক্য গড়ে তোলা, সামঞ্জস্য বিধান করা, সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা এবং এভাবে এক সুশৃঙ্খল পৃথিবী গড়ে তোলাই হচ্ছে মহান আল্লাহর অভিপ্রায়। কিন্তু এই বিভিন্নতা, এই পার্থক্য ও রূপ-বৈচিত্র্য সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে, অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে, একজনের উপর আরেকজনের, এক বর্ণের উপর আরেক বর্ণের, এক ভাষার উপর আরেক ভাষার, এক ধর্মের উপর আরেক ধর্মের প্রাধান্যের দাবিদার হয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ। সেই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি হয়েছে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ। কিন্তু এই অনৈক্যের মধ্যে যে আছে এক মহা ঐক্য, এই বহুর মাঝে যে আছে একক ও এবং সব বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা একান্ত কাম্য রাহমাতুল্লিল আলামীন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পয়গামই নিয়ে এসেছেন।[২৩৮]মানবজাতির অমিল-অনৈক্যের প্রধান কারণ সাম্প্রদায়িকতাকে সমূলে ধ্বংস করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

"হে মানুষ! আমি তোমাদে সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান।"[২৩৯]

এজন্যই বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নিশ্চয় একমাত্র আমিই নবী, একমাত্র আমিই আল্লাহর বাণীবাহক। একমাত্র আমার উপর নাযিলকৃত কিতাবই সত্য, আর সব মিথ্যা। আমার প্রচারিত ধর্মই খোদাপ্রদত্ত, অন্যগুলো নয়। বরং তিনি বলেছেন, আদম, শীশ, নূহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, দাউদ, সুলায়মান, মুসা, ঈসা আলাইহিমুস সালাম প্রমুখ সকলেই সত্য নবী, সবাই প্রেরিত। যাবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল সকলই কুরআনের মত আল্লাহর কিতাব। সকল নবীর প্রচারিত দ্বীনই সত্য দ্বীন। সকল ভাষার মানুষই এক বংশজাত, সকল বর্ণের মানুষ একই পিতামাতার সন্তান। জাতিগত, বর্ণগত, বংশগত পার্থক্য যতই সৃষ্টি হোক না কেন সকলের আদি ও আসল এক। সকলের গন্তব্যস্থল এক। আল্লাহ তা'আলা এই মহাপরিবারের বিশৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অনৈক্য নয়, ঐক্য কায়েম, বিভেদ নয় সমন্বয় সাধনের জন্যই বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছিলেন।[২৪০]

তাই সকল মানুষের মাঝে কল্যাণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম মহাবিপ্লব সাধন করেছে। মানবতার মাঝে সকল বিভেদ দূর করে ইনসাফ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা হলো,

اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

"(হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দেবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন, তা কতই না উৎকৃষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।"[২৪১]

---

[২৩৭]. ড. এম. এয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩
[২৩৮]. ড. এম. এয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩
[২৩৯]. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩
[২৪০]. মাওলানা রূহুল আমীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
[২৪১]. আল কুরআন, ৪ : ৫৮

'মুসলিম বিশ্বাসে ইসলাম চূড়ান্ত ধর্ম ও জীবনবিধান হলেও ইসলামী শরিয়ত সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ইসলাম মানুষকে অভিন্ন মানবিক অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে থাকে।'[২৪২] ইসলাম মানবজাতিকে প্রদান করেছেন- সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিকবাদের নীতিমালা। মানব সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইসলামের প্রতিদিনের অনুশীলনের অংশ। কেবল তত্ত্বকথায় নয় মুসলিম সমাজে এর বাস্তবরূপ আজো পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমা উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণে সাম্য বলতে আইনের চোখে সকলের সমতা, নির্বাচিত হবার সমান অধিকার আর সামাজিক সকল নাগরিকের সমান সুযোগ লাভের অধিকারকে বুঝায়। কমিউনিজমের দৃষ্টিতে সাম্য হচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ লাভের অধিকার। আর ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে, রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার, আইনের চোখে সকল মানুষ সমান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণমুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থাকে বুঝায়। ইসলাম যে সাম্যের কথা বলে, তা কেবল মসজিদে সালাত আদায়ের সময় আমীর-ফকীর, ধনী-গরীব, প্রভু-গোলামের পাশাপাশি দাঁড়ানোর সাম্য নয়। এ আদর্শ ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রের সাম্য কামনা করে। ইসলাম উদারতা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে দেশ ও জাতির সকল ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ন্যায়বিচার, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সমান অধিকারের সুযোগ সৃষ্টি করে। জীবনের কোনও ক্ষেত্রে সমাজের কায়েমী সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিশেষ কোনও অধিকারকে ইসলাম স্বীকার করে না। সর্বক্ষেত্রে ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ সাম্যের দাবী করে। তবে প্রকৃতি বিরোধী কোনও অধিকার বা সাম্যের দাবীকে ইসলাম স্বীকার করে না।[২৪৩]

ইসলামী উদারতার মধ্য দিয়ে সমাজে যে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি হয় সেখানে মানুষে মানুষে কোনও ভেদাভেদ থাকে না। সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়।

হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন- **كونوا عباد الله إخوانا** "তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও" [২৪৪] রাসূল (সা.) বলেন, **النَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ** "সকল মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম মাটির তৈরি।"[২৪৫] মহানবী (সা.) বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে আরব-অনারব, সাদা-কালো, ভাষা-বর্ণে পার্থক্য চিরতরে সমূলে ধ্বংস করে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى.

"হে মানুষেরা! সাবধান! তোমদের রব এক। তোমাদের পিতা এক। সাবধান! তাকওয়া ব্যতীত কোনও অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোনও অনারবেরও আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনও কালোর উপর লালের বা লালের উপর কালোর কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"[২৪৬]

ইসলাম এভাবে বর্ণবাদ ও আভিজাত্যবাদকে ঘৃণা করে। ইসলামের ঘোষণা হলো মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলো তারপর তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম উদারতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে শাসক ও শাসিতের মাঝে প্রভুত্বের সম্পর্ক অস্বীকার করে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এ দুনিয়ায় মানুষ সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালার সুবিধার্থে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে; কিন্ত মালিকানা বা প্রভুত্ব কায়েম করতে পারেনা। প্রভুত্বের গুণ কেবলমাত্র মহান

---

২৪২. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৫ই অক্টোবর ২০২১ খ্রি. (ইসলামে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নির্দেশ)

২৪৩. ড. এম. এয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬; মোঃ ছফিউল্লাহ মাহমুদী, *ইসলাম বনাম মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা* (ঢাকা: পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ২৮

২৪৪. আবুবকর মুহাম্মদ ইবন জা'ফর আস-সামেরী, *মাকারিমুল আখলাক* (কায়রো: দারুল আ'ফাকিল আরাবিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ: ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ২৪৯; আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ* (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.) খ. ১৫, পৃ. ৪৭৫

২৪৫. আবুবকর আহমাদ ইবন উমর আল-বাজ্জার, *মুসনাদুল বাজ্জার* (মদীনা: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম সংস্করণ: ১৯৮৮ খ্রি.) খ. ১৫, পৃ. ১৭০; আবুবকর বায়হাকী, *শুআ'বুল ঈমান* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর্ রশদে লিন্নশরে ওয়াত্ তাওযী, ১ম সংস্করণ: ১৪২৩ হি./২০০৩ খি.) খ. ৭, পৃ. ১২৫; আহমাদ ইবন হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, ১৬, পৃ. ৪৫৫

২৪৬. আবুবকর বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ১৩২; আহমাদ ইবন হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৪

আল্লাহর। ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই সমান। প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করেছে ইসলাম।
ইসলামী আইনেও সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একই আইনে সকল মানুষের বিচার হবে। কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী আইনের উর্ধ্বে নয়। আইনকে তার নিজস্ব পথে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে হবে।

আল্লাহ রাসূল (সা.) এর মহান বাণীতে ইসলামের অনন্য আদর্শ বিশেষত জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মমতের অনুসারীরা পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে মিলেমিশে একত্রে বসবাসের মাধ্যমে আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার নির্দেশনা উজ্জ্বভাবে ফুটে উঠেছে। বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার ঐক্য সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার নামই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

ইসলাম শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। কোনরূপ সহিংসতা ঝগড়া-বিবাদের স্থান ইসলামে নেই। নূন্যতম শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, এমন আচরণকেও ইসলাম আদৌ প্রশ্রয় দেয় না। অমুসলিমদের প্রতিও কোন অন্যায় আচরণ ইসলাম অনুমোদন করেনা। শান্তি-সৌহার্দ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় ইসলামে রয়েছে শ্বাশ্বত আদর্শ ও সুমহান ঐতিহ্য। ভিন্ন ধর্মালম্বীদের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিটি আচরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল ও প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এক অমুসলিম বৃদ্ধার ঘটনা আমরা ইতিহাস থেকে জেনেছি যে, 'বৃদ্ধা প্রতিদিন রাসূল (সা.) এর চলার পথে কাঁটা দিত। একদিন রাসূল (সা.) দেখলেন, পথে কাঁটা নেই। তখন তিনি ভাবলেন, হয়ত ঐ বৃদ্ধা অসুস্থ হয়েছে বা কোন বিপদে আছে, তার খোঁজ নেয়া দরকার। এরপর দয়ার নবী মুহাম্মদ (সা.) এই বৃদ্ধার বাড়িতে পৌঁছে দেখেন, ঠিকই বৃদ্ধা অসুস্থ। তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। এতে বৃদ্ধা অভিভূত হয়ে গেল যে, আমি যাকে কষ্ট দেয়ার জন্য পথে কাঁটা পুঁতে রাখতাম, সে-ই আজ আমার বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। ইনিইতো সত্যিকার অর্থে শান্তি ও মানবতার অগ্রদূত।'[২৪৭]

ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও উপসনালয়-ইবাদতখানা শুধুমাত্র ধর্মীয় পণ্ডিতদের কাছে সীমাবদ্ধ থাকবে তা ইসলাম সমর্থন করেনা। সম্প্রীতির পরিচয় হলো যেকোন ধর্মের লোক পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন-গবেষণা করে সুপথ পাওয়ার অধিকার ইসলাম প্রদান করেছে। তাই ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মসজিদ ও ধর্মগ্রন্থ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সদামুক্ত। যে কোনও ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে ধর্মীয় নেতৃত্ব লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে এর পাশাপাশি শিক্ষার্জন অধিকার ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে।[২৪৮] ইসলামের শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো মানবিকতা, সম্প্রীতি, উদারতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। ইসলাম মানবজাতির মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তাই সরোজিনী নাইডু বলেন- 'ইসলামের এই অবিচ্ছেদ্য ঐক্যবোধ অবলোকন করে আমি বার বার মুগ্ধ হই। কারণ এ এমন এক ঐক্য যা মানুষের মাঝে সহজেই এক স্বতঃস্ফূর্ত ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। কেউ যখন লন্ডনে কোন মিসরবাসী, কি আলজেরীয়, ভারতীয় কি তুর্কী মুসলমানের সাক্ষাত পায়, সে বুঝতে পারে মাতৃভূমির বিচ্ছিন্নতায় কিছু আসে যায় না, সবাই এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।[২৪৯]

পবিত্র কুরআনে উদারতা ও সম্প্রীতির অবস্থান:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে একজন অপরজনের সাথে আচার-আচরণ, লেন-দেন, কথা-বার্তা, ভাব-বিনিময় আদান-প্রদানসহ সকল বিষয়ে উদারতা ও সম্প্রীতির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ক. উদারতা

---

২৪৭. আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক মু'আফিরি ইবনু হিশাম (রহ.) *সিরাতুন্নবী (সা.)* (ঢাকা: ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ৬১

২৪৮. মোঃ ছফিউল্লাহ মাহমুদী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৮

২৪৯. মোঃ ছফিউল্লাহ মাহমুদী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৮

ইসলাম সবসময় উদারতা ও সহজ পন্থায় বিশ্বাসী। ইবাদত, ইখলাস, দোয়া, দাওয়াত-ই-তাবলীগ, অধ্যাত্মিকতা মানবসেবা, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি চেতনার কারণে ইসলামকে বলা হয় শান্তির ধর্ম। কঠিন মুহূর্তে মূর্খের বেহুদা কর্ম নয় বরং উদারতা ও বিনম্রতার মাধ্যমে ঈমানের প্রকাশ ঘটে। ইসলামী জীবনধারার অন্যতম প্রধান কাম্য বস্তু হলো দ্বীনের মাঝে উদারতা ও যাবতীয় রূঢ়তা, কাঠিন্যতা, জটিলতা ও একরোখা মনোভাব পরিত্যাগ করা। ইসলামী আকীদা থেকে শুরু করে দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে সহজতা ও উদারতা কাম্য। সকল ধরনের সংকীর্ণতাকে পরিহার করে সমাজে উদারতা ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের একমাত্র লক্ষ্য। মূলত কষ্ট-কাঠিন্য দূর করতেই মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি কষ্ট ভোগ করবে।"[২৫০] ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সহজতা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না।"[২৫১]

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী জীবন বিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমা ও কাঠিন্য পরিহার। আল কুরআনে মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এই দু'টি বিষয়ে গুরুত্বসহকারে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

"(হে নবী!) তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর এবং (মানুষকে) সৎকাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদের অগ্রাহ্য কর।"[২৫২]

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুর রহমান আস্-সা'দী বলেন, উল্লিখিত আয়াতে মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার এবং পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রে করণীয় দায়িত্ব বিষয়ে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক রাখবে, লেনদেন করবে, তাকে ক্ষমার পথ অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কর্ম ও চারিত্রিক মাধুর্য্যের মাধ্যমে হৃদয়কে উদার করতে হবে, সহজ হতে হবে। মন থেকে যা গ্রহণীয় নয়; তা কারো উপর চাপিয়ে না দেয়া বরং যে কথা সে সহজে বলতে ও করতে পারে অথবা এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ে যে কাজ সে করতে পারে তাতেই পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারো দূর্বলতাকে অন্য মানুষের সামনে উপস্থাপন না করে তাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে এড়িয়ে যেতে হবে। সাধারণত তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং চোখ ফিরিয়ে রাখতে হবে। অধীনস্থ ও জুনিয়র হওয়ার কারণে তাদের উপর বড়ত্ব ও খবরদারি প্রয়োগ করা যাবে না। স্বল্পজ্ঞানীদের উপস্থাপিত ভুল-ত্রুটিকে কেন্দ্র করে তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের ভাব প্রকাশ করা যাবে না। গরীব মানুষের উপর তাদের দরিদ্রতা নিয়ে কোন অহমিকা-অহঙ্কার প্রকাশ করা যাবে না। বরং সকল ব্যক্তির সঙ্গেই নম্র-ভদ্র-কোমল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। সময় সাপেক্ষে তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময়, আলাপ-আলোচনা ও গল্প করতে হবে। তাদের উদ্দেশ্যে হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত রাখতে হবে।[২৫৩]

উদার ও সম্প্রীতির গুণ সম্পন্ন লোকদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.

"রাহমান' এর বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম"[২৫৪]

আল্লামা ইবনে কাছির (রহ.) বলেন, 'নির্বোধ লোকের যখন উদার, নম্র ও ভদ্র লোকদের সাথে মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করে তখন তারা মূর্খ লোকদের সাথে মন্দ বা রূঢ় আচরণ করে না। বরং তাদেরকে মাফ করে দিতেন এবং তাদের মন্দ ও মূর্খ কথার প্রতিউত্তরে অভদ্র বা মন্দ ব্যবহার করতেন না। যেমন রাসূল (সা.) এ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁর সাথে যতই মন্দ বা কড়া আচরণ করত; তিনি ততই নম্র ও কোমল ভাষায়

---

[২৫০]. আল কুরআন, ২০ : ০২

[২৫১]. আল কুরআন, ২ : ১৮৫

[২৫২]. আল কুরআন, ৭ : ১৯৯

[২৫৩]. আব্দুর রহমান ইবন্ নাসির আস্-সা'দী, ***তাইসীরুল কারীমির রহমান*** (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি.) পৃ. ৩১৩

[২৫৪]. আল কুরআন, ২৫: ৬৩

হাসিমুখে কথা বলতেন।'[২৫৫] যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে; আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্যে; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।[২৫৬]

রাসূল (সা.) বলেন,

وسَبّ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَهُ، قالَ: فَجَعَلَ الرّجُلُ الْمَسْبُوبُ يَقُولُ: عَلَيْكَ السّلَامُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى عَلَيْهِ وسَلّمَ: " أمَا إنّ مَلَكًا بَيْنَكُمَا يَذبّ عَنْكَ كُلّمَا يَشْتُمُكَ هَذا، قالَ لَهُ: بَلْ أنْتَ وأنْتَ أحقّ بِهِ، وإذا قالَ لَهُ: عَلَيْكَ السّلَامُ، قالَ: لَا بَلْ لَكَ أنْتَ، أنْتَ أحقّ بِهِ.

"একটি লোক অন্য একটি লোককে গালি দেয়। কিন্তু ঐ লোকটি উত্তরে বলে 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক' তখন রাসূল (সা.) লোকটিকে বলেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে ফেরেশতা বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তোমার পক্ষ থেকে গালিদাতাকে উত্তর দিচ্ছিলেন। সে তোমাকে যে গালি দিচ্ছিল, ফেরেশতা বলছিলেন: 'এ নয় বরং তুমি'। আর তুমি যখন বলছিলে: 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক' তখন ফেরেশতা বলছিলেন: তার উপর নয়, বরং তোমারই উপর শান্তি বর্ষিত হোক। শান্তি ও নিরাপত্তার হকদার তুমিই।"[২৫৭] সুতরাং অকথ্য ভাষা প্রয়োগকারী লোকদের সাথে তারা অশালীন ভাষা উচ্চারণ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

"অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অতঃপর তুমি যখন সংকল্প কর তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন।"[২৫৮]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

والّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزّورَ وإذا مَرّوا بِاللّغْوِ مَرّوا كِرَامًا.

"আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।"[২৫৯]

উদারতা ও কোমলতার আরো একটি গুণ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُنْفِقُونَ فِي السّرّاءِ والضّرّاءِ والْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والْعَافِينَ عَنِ النّاسِ واللهُ يُحِبّ الْمُحسِنِينَ .

"(খোদাভীরু তারাই) যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানবদেরকে ক্ষমা করে; এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"[২৬০]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে উদারতা, সম্প্রীতি ও ভদ্রতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন-

اعْفُ عَنْهُمْ واصْفَحْ إنّ اللهَ يُحِبّ الْمُحسِنِينَ.

"তুমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাক এবং তাদেরকে মার্জনা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সদাচারী লোকদেরকে ভালবাসেন।"[২৬১]

الَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَومَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وهُو أرْحَمُ الرّاحِمِين.

"সে বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।"[২৬২] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

২৫৫. হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবন কাসীর, অনূদিত: ড: মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ***তাফসীর ইবন্ কাসীর*** (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ৪র্থ সংস্করণ: ২০০৪ খ্রি.) খ. ১৫, পৃ. ২৮০

২৫৬. আল কুরআন, ২৮:৫৫

২৫৭. আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, ***আল-মুসনাদ*** (বৈরূত: মুআস্-সাসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ: ১৪২১ হি.) খ. ৩৯, পৃ. ১৫৪

২৫৮. আল কুরআন, ৩: ১৫৯

২৫৯. আল কুরআন, ২৫: ৭২

২৬০. আল কুরআন, ৩: ১৩৪

২৬১. আল কুরআন, ৫: ১৩

২৬২. আল কুরআন, ১২: ৯২

Dhaka University Institutional Repository

وَمَا خَلَقْنَا السّمَاواتِ والأَرْضَ ومَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحقّ وإِنّ السّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصْفَح الصّفْح الْجَمِيلَ.

"আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের অন্তবর্তী কোন কিছু আমি অযথা সৃষ্টি করিনি; এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।"[২৬৩]

উদারতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ ঘোষণা করে বলেন,

أولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ والسّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أولِي الْقُرْبَى والْمَسَاكِينَ والْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ لْيَعْفُوا ولْيَصْفَحوا أَلَا تحبّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ والله غَفُورٌ رَحِيمٌ .

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্থদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবেনা। তারা যেন তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৬৪] উদারতা ও সম্প্রীতির ফলাফল বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمَنْ عفَا وأَصْلَح فأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنّهُ لَا يُحبّ الظّالِمِينَ. ولَمَنِ انْتصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنّمَا السّبِيلُ عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ ويَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحقّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم. ولَمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ إِنّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ দ্বারা এবং যে ক্ষমা করে ও আপোষ-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তাতো হবে দৃঢ় সম্পর্কের কাজ।"[২৬৫]

স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وأَولَادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحذَرُوهُمْ وإِنْ تَعْفُوا وتَصْفَحوا وتَغْفِرُوا فَإِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ .

"হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতিদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৬৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দাও এবং তোমরা (বিবাহকালে) তাদের জন্য মোহর ধার্য করে থাক, তবে যে পরিমাণ মোহর ধার্য করেছিলে তার অর্ধেক (দেওয়া ওয়াজিব), অবশ্য স্ত্রীগণ যদি ছাড় দেয় (এবং অর্ধেক মোহরও দাবী না করে) অথবা যার হাতে বিবাহের গ্রন্থি (অর্থাৎ স্বামী), সে যদি ছাড় দেয় (এবং পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়), তবে ভিন্ন কথা। যদি তোমরা ছাড় দাও, তবে সেটাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। আর পরস্পর ঔদার্যপূর্ণ আচরণ ভুলে যেও না। তোমরা যা-কিছুই কর, আল্লাহ তা নিশ্চিত দেখছেন।"[২৬৭]

ইবন 'আশুর বলেন, '(আলোচ্য আয়াতে) 'ছাড় দেয়াকে' তাকওয়ার অধিক কাছাকাছি বলার অর্থ হলো- স্বীয় অধিকারকে আঁকড়ে থাকার চেয়ে 'ছাড় দেয়া' তথা ক্ষমা বা সহজ করে দেয়া তাকওয়ার গুণের অধিক নিকটবর্তী। কেননা স্বীয় অধিকার ধরে রাখা তাকওয়ার পরিপন্থী নয়। কিন্তু সেটা ব্যক্তি হৃদয়ের রূঢ়তা ও কাঠিন্যতার পরিচায়ক। ছাড় দেয়া, ক্ষমা করা ব্যক্তি হৃদয়ের উদারতা ও কোমলতার পরিচায়ক। যে অন্তরে নম্রতা, উদারতা ও কোমলতা রয়েছে সে অন্তর পাষাণ হৃদয়ের চেয়ে তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং যে অন্তর দয়া ও উদারতা ও কোমলতার বৈশিষ্ট্যে সুসজ্জিত, সে জুলুম-অত্যাচার ও নির্দয়-পাষাণ ব্যবহার থেকে দুরে থাকে। তাই সে হৃদয়ে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যাবলী অধিক হওয়ায় তাকওয়া তার অধিক নিকটবর্তী

[২৬৩]. আল কুরআন, ১৫: ৮৫
[২৬৪]. আল কুরআন, ২৪: ২২
[২৬৫]. আল কুরআন, ৪২: ৪০-৪৩
[২৬৬]. আল কুরআন, ৬৪: ১৪
[২৬৭]. আল কুরআন, ২ : ২৩৭

হয়।'[২৬৮] এ প্রসঙ্গে অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা একে অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অন্যকে দয়ার উপদেশ দিয়েছে।"[২৬৯] এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রূঢ় আচরণ করতে ও মানুষের উপর কঠোর হতে নিষেধ করেছেন।

আল্লামা সা'দী বলেন, তোমার এবং তোমার সাথীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ। বিশেষত আল্লাহ তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন যে জন্য তুমি তোমার পার্শ্বস্থ লোকদের সাথে কোমল আচরণ করেছ। তুমি তাদের আশ্রয় দিয়েছ, তাদের প্রতি নরম হয়েছ, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছ। ফলে তারা তোমার কাছে একত্রিত হয়েছে, তোমাকে ভালোবেসেছে, তোমার নির্দেশ পালন করেছে। আর যদি তুমি রূঢ় প্রকৃতির হতে অর্থাৎ খারাপ আচরণ করতে, কঠোর হৃদয় হতে অর্থাৎ কঠিন হতে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। কেননা যে ব্যক্তি রূঢ় প্রকৃতির হয়, কঠোর আচরণ করে মানুষ তার থেকে দূরে সরে যায়, তাকে ঘৃণা করে।

সুতরাং উত্তম আচরণ দ্বীনের এমন একটি মৌলিক বিষয় যা মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে টেনে আনে, দ্বীনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। এছাড়াও সে প্রশংসা ও বিশেষ সাওয়াবের অধিকারী হয়। আর খারাপ আচরণ দ্বীন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নেয়, দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করে। এছাড়াও খারাপ চরিত্রের লোকের নিন্দা ও বিশেষ শাস্তি প্রাপ্য হয়। নিষ্পাপ রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শানেই যদি এমন কথা আল্লাহ তা'আলা এমন কথা বলেন তাহলে অন্যদের ব্যাপারে কি হবে।'[২৭০]
অপর এক আয়াতে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের প্রতি উদার আচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং কোন (দেনাদার) ব্যক্তি যদি অসচ্ছল হয়, তবে সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। আর যদি সাদাকাই করে দাও, তবে তোমাদের পক্ষে সেটা অধিকতর শ্রেয়- যদি তোমরা উপলব্ধি কর।"[২৭১]
'উদারতা ইসলামী জীবনব্যবস্থার অন্যতম অনুসঙ্গ, উপরোক্ত আলোচনা তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়।

খ. সম্প্রীতি

পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা ইসলামী জীবনবিধানের অপর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ গুণ। মানবজাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটল রাখতে ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি কারো সাথে অসদাচরণ বা রূঢ় ব্যবহার করে যথাসম্ভব নম্রতা, ভদ্রতা ও কোমল আচরণ দ্বারা তা প্রতিহত করতে হবে।[২৭২] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ.

"তুমি মন্দকে প্রতিহত করবে এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে অবহিত।"[২৭৩]
মন্দের জবাব মন্দ দ্বারা প্রদান করে কখনো পরিবার ও সমাজে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সমাজের কোন ব্যক্তি যদি খারাপ আচরণ করে তাহলে তার আচরণে জবাব কঠোর করা বৈধ হলেও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে তা গণ্য করা যাবে না। আচরণগত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো কঠোরতার জবাবে নম্রতা প্রদর্শন করা। অনুরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তম আচরণের প্রভাবে দীর্ঘদিনের শত্রুও একদিন নিকটতম বন্ধুরূপে পরিগণিত হবে।[২৭৪] এভাবেই সমাজে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করা যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ ولَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ ولِيٌّ حَمِيمٌ.

---

২৬৮. ইবন 'আশুর তিউনিসী, *আত তাহরীর ওয়াত তানবীর* (বৈরূত: মুআসসাসাতুত তারীখিল 'আরাবী, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হি.) খ. ২, পৃ. ৪৪৫
২৬৯. আল কুরআন, ৯০ : ১৭
২৭০. আল্লামা সা'দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
২৭১. আল কুরআন, ২ : ২৮০
২৭২. আল্লামা তাকী উসমানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৩৭
২৭৩. আল কুরআন, ২৩ : ৯৬
২৭৪. আল্লামা তাকী উসমানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৪২

“ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। ফলে যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিলো, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।”[২৭৫]
সম্প্রীতি ও হৃদ্যতার প্রধান প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হলো পরিবার। পরিবারের লোকদের সাথে সম্প্রীতি ও হৃদ্যতার অনুশীলন করতে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামী শরী'আতের আলোকে বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী মিলে বৈধভাবে পরিবার গঠন করে। বিবাহের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের সাথে কোন সম্বন্ধ থাকেনা বা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি পরিবেশ থেকে উভয়ের পরিচয় হয়। এ বৈধ পরিচয়ের পর তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি, হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও মায়া-মমতা গড়ে উঠে। বিবাহত্তোর অতীতের ভিন্ন পরিবেশকে দূর করে নতুন এক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার অধ্যায় সূচিত হয়। দাম্পত্য জীবনের একপর্যায়ে একজন অপরজনকে ব্যতীত কোনকিছু ভাবতেই পারেনা ও একে অন্যের হয়ে যায়। পরবর্তীতে উভয়ের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততির প্রকাশ ঘটে; এক বৃহৎ পরিবারে রূপ লাভ করে। তাই ইসলামে পারিবারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।[২৭৬] পারিবারিক জীবন থেকে যদি কেউ তা শিক্ষা না পায়; তাহলে সর্বক্ষেত্রে তার নেতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হবে।
শুধূ পরিবারই নয়, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের সর্বত্র সম্প্রীতি ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা ইসলামী জীবনব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إنّ الّذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحمَنُ وِدًّا.

“(তবে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে নিশ্চয়ই দয়াময় (আল্লাহ) তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা।”[২৭৭]

আল হাদীসে উদারতা ও সম্প্রীতি

আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উদারতা। এই দ্বীনের মধ্যে কোনও সংকীর্ণতা বা কঠোরতা নেই। কোনও শিথিলতারও অবকাশ নেই। কেননা উদারতা হলো কঠোরতা ও শিথিলতার মাঝামাঝি একটি অবস্থা। এই উদারতা আল্লাহর নিকট অন্যতম প্রিয় একটি কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “আল্লাহর নিকট দ্বীনের অত্যন্ত প্রিয় আমল হলো একাগ্রতা ও উদারতা।”[২৭৮]
অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ-সরল। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাক। আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।”[২৭৯] হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُو عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فقَالُوا: السّامُ عَلَيْكَ، ففَهِمْتُهَا فقُلْتُ: عَلَيْكُمُ
ـامُ واللّعْنَةَ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: « ـلًا يَا عَائِشَةُ، فَإنّ اللهَ يُحِبّ الرّفْقَ فِي الأمْرِ كُلِّهِ»
ـسُولَ اللهِ، أولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " فَقَدْ قُلْتُ: وعَلَيْكُمْ.

“একবার ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নিকট এসে বললোঃ আস্‌সামু আলাইকা। (তোমার মৃত্যু হোক, নাউজুবিল্লাহ্) আমি এ কথার মর্ম বুঝে বললামঃ আলাইকুমুস্ সামু ওয়াল লানাতু। (তোমাদের উপর মৃত্যু ও লানত)। নবী (সঃ) বললেনঃ হে' আয়শা! তুমি থামো। আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই বিনয় পছন্দ করেন। আমি

[২৭৫]. আল কুরআন, ৪১ : ৩৪
[২৭৬]. আল্লামা তাকী উসমানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৮
[২৭৭]. আল কুরআন, ১৯ : ৯৬
[২৭৮]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮
[২৭৯]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮

বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ্! তারা যা বললোঃ তা কি আপনি শুনেন নি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ এ জন্যই আমিও বলেছি, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও)।"[২৮০]
অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সঃ) বলেন

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وإِيَّاكِ والعُنْفَ، أو الفُحشَ

"হে আয়েশা! তুমি একটু থামো। নম্রতা অবলম্বন করা তোমার কর্তব্য। রূঢ় ব্যবহার ও অশালীন আচরণ পরিহার করো।"[২৮১]

উল্লিখিত হাদীস সমূহ থেকে এটা সুস্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে সহজ-সরল বিধান সম্বলিত পন্থাই হলো ইসলাম। ইসলাম ধর্মে কোন ধরনের কঠোরতা, রূঢ়তা ও চরমপন্থা-বাড়াবাড়ির সুযোগ নেই। সর্বাবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বণ করতে ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে। লেন-দেন, কথা-বার্তা, আচার-আচারণে মানুষের সঙ্গে নম্র ও কোমল আচরণ করতে হবে। সংকীর্ণতা পরিহার করে সকলক্ষেত্রে উদারতা ও সম্প্রীতির প্রকাশ ঘটাতে হবে। তাই রাসূল (সা.) মুসলিম অমুসলিম সকলের সাথে নম্র ও ভদ্র ভাষায় কথা বলতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "মুমিনগণ কোমল, নম্র স্বভাবের।"[২৮২] অর্থাৎ মুমিনগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নম্র স্বভাবের হওয়া। মানুষের সাথে কোমল আচরণ করা। উদার মানসিকতার হওয়া। অন্য হাদিসে রাসূল (সা.) মানব সৃষ্টি ও তাদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছেন- "আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সকল প্রকার মাটি থেকে একমুষ্ঠি মাটি নিয়ে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আদম সন্তানের মাটির বর্ণের মতই পৃথিবীতে আগমন করলো। তাদের মধ্যে লাল, সাদা, কালো ও মাঝামাঝি একটি বর্ণ আছে। তাদের মাঝে নম্র, রূঢ়, নীচ ও উত্তম স্বভাবের লোক আছে।"[২৮৩]

আল্লামা তীবী বলেন,'যেহেতু মানুষ এবং মাটির মাঝে এই চারটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তাই তাকে প্রকৃত অর্থেই বিবেচনা করতে হবে আর শেষ চারটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করতে হবে। কেননা সেটা আভ্যন্তরিণ চরিত্র। এখানে **(السهل)** অর্থ কোমল, নম্র এবং **(الحزن)** অর্থ নির্বোধ, কঠোর। **(الطيب)** দ্বারা এখানে উর্বর ভূমি বুঝানো হয়েছে। আর মুমিন যার সবই কল্যাণ। **(الخبيث)** দ্বারা এখানে অনুর্বর পাথুরে জমি বুঝানো হয়েছে। আর কাফির যার সম্পূর্ণই অনিষ্ট।'[২৮৪]

উল্লিখিত হাদীসে উদার মনকে উর্বর ভূমির সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আব্দুর রহমান মায়দানী বলেন, 'উদার মন হলো উর্বর কোমল সমতল ভূমির ন্যায়। এ মাটি থেকে সকল ধরণের কল্যাণ আশা করা যায়। যদি তুমি এ মাটির উপর দিয়ে অতিক্রম করতে চাও তাহলে আনন্দ ও আরামের সাথে পার হতে পারবে। আর যদি কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে চাষ করতে চাও তাহলে তা নরম ও কোমল পাবে। আর যদি সেখানে কোন ভবন বা বাড়ি তৈরি করতে চাও তাহলে সহজেই নির্মাণ করতে পারবে। যদি বিশ্রামের জন্য ঘুমাতে চাও তাহলে সুন্দর বিছানায় পরিণত হয়ে যাবে।'[২৮৫] '"রাসূল (সা.) এর ঘরে একবার এক ইহুদী মেহমান হয়ে আসলে রাসূল (সা.) তাকে যথাযথ মেহমানদারী করলেন এবং রাত্রিযাপন করার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে সেই মেহমান অসুস্থতাবশত: বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করেন। রাসূল (সা.) তাকে কিছু বলবেন; এ ভয়ে সে অতি প্রত্যুষে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ভোরে ঐ মলমূত্র দেখে রাসূল (সা.) এই বলে চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে গেলেন যে, হায়! আমি ঐ ব্যক্তিকে যথাযথ আপ্যায়ন করতে পারিনি; এতে রাসূল (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। অত:পর বিশ্বনবী (সা.) নিজ হাতে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত

---

[২৮০]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৯, পৃ. ৫২৫
[২৮১]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৯, পৃ. ৪১৫
[২৮২]. আস- সুনানুল কুবরা লিল- বায়হাকী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১০, পৃ. ৪৪৭
[২৮৩]. সুনানে আবু দাউদ, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৪, পৃ. ২২২
[২৮৪]. আবুবকর আব্দুর রাজ্জাক, ***তাফসীরে আব্দুর রাজ্জাক*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ: ১৪১৯ হি.) খ. ১, পৃ. ২৬৭; নুরুদ্দিন মোল্লা হারয়ী আলী কারী, ***মিরকাতুল মাফাতিহ*** (বৈরূত: দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ ১৪২২ হি.) খ. ১, পৃ. ১৭৬; মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্, ***তাফসীরে মাযহারী*** (ইসলামাবাদ: মাকতাবাতুর রশদীয়্যাহ, ১ম সংস্করণ: ১৪১২ হি.) খ. ৩,পৃ. ২১৪
[২৮৫]. সম্পাদক- আলাবী ইবন আব্দুল কাদের আস সাক্কাফ, ***মাওসু'আতুল আখলাক*** (কায়রো: আদ দুরারুস সুন্নিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৪ হি.) পৃ. ৬০৯

বিছানাটি পরিস্কার করলেন এবং সেই ব্যক্তির কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন এভাবে যে, ভাই আমি আপনার যথাযথ আপ্যায়ন করতে পারিনি; আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন ইহুদী লোকটি অবাক হয়ে বলল, অপরাধ করলাম আমি, আর ক্ষমা চাচ্ছেন আপনি। ইসলামের আদর্শতো সত্যিই মহান। রাসূল (সা.) এর এমন উদার ও নম্রতায় মুগ্ধ হয়ে ইহুদী ব্যক্তিটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।"[২৮৬]

রাসূল (সা.) এর উদারতার এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যকে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন-

'তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।'[২৮৭]

অনুরূপভাবে রাসূল (সা.) এর কতিপয় হাদীসে প্রত্যেককে উদার হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে সম্প্রীতি ও উদার মনোভাব প্রতিষ্ঠা করে একটি আদর্শ পরিবার ও সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব। উদার, নম্র, কোমল ও সহনশীল ব্যক্তিদের জন্য আখিরাতে মহা প্রতিদানের কথা ঘোষণা করে রাসূল (সা.) বলেন, '(কিয়ামতের দিন) আল্লাহর এক বান্দাকে তাঁর নিকট নিয়ে আসা হবে, যাকে আল্লাহ অনেক সম্পদ দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বলবেন- দুনিয়াতে তুমি কী করতে? (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) তারা কোনও কথাই গোপন করতে পারবে না। সে বলবে- হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে আপনার সম্পদ দিয়েছিলেন। আমি মানুষের মাঝে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমার বৈশিষ্ট্য ছিলো অনুমোদন তথা ছাড় দেয়া। আমি ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর ক্রয় বিক্রয়কে সহজ করে দিতাম আর অভাবগ্রস্থকে অবকাশ দিতাম। তখন আল্লাহ বলবেন- আমি তোমার চেয়ে এই কাজ করার বেশি হক্বদান। সুতরাং তোমরা আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দাও।'[২৮৮]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয় ও পাওনা তাগাদায় নম্র ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহম করেন।"[২৮৯] অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন,

أَفْضَلُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ.

'সর্বোত্তম ঈমান হলো- সহিষ্ণুতা ও উদারতা।'[২৯০]

এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে উদার মানসিকতার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসাও ইসলামী জীবনব্যবস্থার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক কিছু দায়িত্বের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

"এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সে তার সাথে কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার প্রসঙ্গে মিথ্যা বলবে না, তাকে অপমান করবে না। প্রত্যেক মুসলমানের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তের (জীবন) উপর হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলমানের জন্য হারাম। তাক্বওয়া এখানে (অন্তরে)। কেউ মন্দ বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে সে তার অপর মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।'[২৯১] রাসূল (সা.) বলেন,

أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ.

---

২৮৬. আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিকম মু'আফিরি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

২৮৭. আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম* (ঢাক: আলকুর'আন একডেমী ল-ন, ২১তম প্রকাশ, ২০০৮ খ্রি.) পৃ. ৪৩৯

২৮৮. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৩

২৮৯. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৭৫

২৯০. আবুবকর বায়হাকী, শুআ'বুল ঈমান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৩, পৃ. ২৮৬

২৯১. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিজী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩২৫; আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ্, *প্রাগুক্ত* খ. ২, পৃ. ১৪০৯; আবুদাউদ সুলাইমান ইবন আশআস, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৭০

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন, প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তর বিশিষ্ট (হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, দুশমনী ও খিয়ানতমুক্ত অন্তর) ও সত্যভাষী ব্যক্তি। সাহাবীগণ বললেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কিভাবে চিনবো? তিনি বললেন, সে হলো পূত পবিত্র নিষ্কলুষ ব্যক্তি যার কোন গুনাহ্ নেই, নেই দুশমনী, হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা।"[২৯২]
এভাবে মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য কেউ যদি কারও সাথে খারাপ আচরণ করে, কষ্ট দেয়, তবে যতদূর সম্ভব নম্রতা, সদাচরণ ও চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা তার জবাব দিতে হবে।[২৯৩] মন্দ আচরণের অনুরূপ মন্দ আচরণ দ্বারা মানব সমাজে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো, তুমি তার মন্দ আচরণের বিপরীতে ভালো আচরণ করবে। এরূপ ব্যবহার করলে তোমার ঘোর শত্রুও একদিন তোমার পরম বন্ধু হয়ে যাবে।[২৯৪] এভাবেই সমাজে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করা যাবে। এজন্য ইসলামে সকল ক্ষেত্রে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়ে সৌহার্দ্যপূণ আচরণে গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে জানাব না সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম এবং জাহান্নাম যে ব্যক্তির জন্য হারাম। সে হলো প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে সহজ-সরল, কোমল এবং (দেনা-পাওয়া আদায়ে ও ক্রয়-বিক্রয়ে) নম্র ব্যবহার করে।"[২৯৫]
অপর এক হাদীসে মুমিনদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলনে,

تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وتَوَادِّهِمْ وتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى.

"তুমি দেখবে মুমিনদের পারস্পরিক হৃদ্যতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসা উপমা একটি শরীরের ন্যায়, যখন তাঁর একটি অঙ্গ কষ্ট পায় তখন সমস্ত শরীর অনিদ্র ও জ্বরে ভেঙ্গে পড়ে।"[২৯৬]
আলোচ্য হাদীসে মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি ও সাহায্য সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এভাবে সম্প্রীতিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে। এভাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে অপর এক হাদীসে এসেছে-
আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَنَّ رَجُلًا قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ ويَقْطَعُونِي، وأُحسِنُ إِلَيْهِمْ ويُسِيئُونَ إِلَيَّ، وأَحلُمُ عَنْهُمْ ويَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ ولَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.

জনৈক ব্যক্তি বললো- হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক আত্মীয় আছে যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আর আমি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি। আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করি আর সে আমার সাথে খারাপ আচরণ করে। আমি তার সাথে সহনশীল আচরণ করি আর সে আমার সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে। তখন রাসূল (সা.) তাকে বললেন- তুমি যেমন বলছো তেমনই যদি করে থাকো তবে তুমি তার মুখে উত্তপ্ত আগুন ঢেলে দিচ্ছ। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী তোমার সাথে থাকবে।'[২৯৭]
উল্লিখিত হাদীসে সুস্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, যেসকল আত্মীয়-স্বজন রাসূল (সা.) এর সাথে মন্দ আচরণ করত; তাদের সাথে তিনি সর্বোত্তম ব্যবহার করতেন। তাই তিনি অনুরূপ মন্দের বিনিময়ে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) এর অনুরূপ একটি ঘটনা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,"আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) এর সাথে মক্কার পথে এক বেদুঈনের সাক্ষাত হলো। তিনি তাকে

---

২৯২. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, আস্-সুনান, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৪০৯
২৯৩. আল্লামা তাকী উসমানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৩৭
২৯৪ *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৪২
২৯৫. মুল্লা আলী কারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ৩১৭৮
২৯৬. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ২০
২৯৭. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৯৮২; মুহাম্মদ ইবন হিব্বান, ***সহীহ ইবন হিব্বান*** (বৈরূত: মুআস্-সাসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ:১৪০৮ হি.) খ. ২, পৃ. ১৯৫

সালাম দিলেন। তাকে তিনি যে গাধার পিঠে চড়েছিলেন সেই বাহনে চড়ালেন এবং তাকে তাঁর মাথার পাগড়ী খুলে দিলেন। তাঁকে বলা হলো- আল্লাহ আপনার সংশোধন করুন! তারাতো বেদুঈন। সামান্য কিছুতেই তারা খুশি হয়। আব্দুল্লাহ বললেন- এই লোকের পিতার সাথে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- নিশ্চয়ই পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণের অন্যতম হলো- সন্তান তার পিতার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে।'[২৯৮]

অত্র হাদীসে পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদরে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে উত্তম আচরণ করে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য রাসূল (সা.) গুরুত্বারোপ করেছেন। মোটকথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজের মন-মানসিকতাকে উদার করে সকল ক্ষেত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

ইবাদত-বন্দেগী ও ঈমান আকীদাতে উদারতা ও সম্প্রীতির প্রকৃতি

পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা নবুয়াত ও রিসালাতের ধারা চলমান রেখেছেন। মানবজাতি যখন পথভ্রষ্টতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তাদেরকে সরল-সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নবী-রাসূল দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন।[২৯৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وصّى بهِ نُوحا والّذي أوحيْنَا إِلَيْكَ ومَا وصّيْنَا بهِ إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولَا ذذفرّقوا فِيهِ.

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং (হে রাসূল!) যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।"[৩০০]

সর্বশেষ রাসূল (সা.) কে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা নবুয়াত ও রিসালাতের পূর্ণতা দান করেন এবং সকল নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করেন। একটি শান্তিময় পৃথিবী গঠনের লক্ষ্যে এবং একটি শান্তিময় সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ সর্বশেষ রাসূল (সা.) কে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। আল্লাহ হচ্ছেন খালিক, মালিক, রাব্বুল আলামীন, বিশ্ব স্রষ্টা, বিশ্ব প্রভু ও বিশ্ব প্রতিপালক। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) হচ্ছেন বিশ্বনবী, বিশ্ব কল্যাণ ও বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ।[৩০১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি।"[৩০২] এই বিশ্ব বৈচিত্র্যময়। এখানে নানা বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, ও গোত্রের পার্থক্য রয়েছে। এ সবকিছু স্বীকার করে নিয়ে তার মাঝে ঐক্য গড়ে তোলা, সামঞ্জস্য বিধান, সমন্বয় প্রতিষ্ঠা এবং সুশৃঙ্খল পৃথিবী গড়ে তোলাই হচ্ছে মহান আল্লাহর অভিপ্রায়। কিন্তু এই পার্থক্য ও রূপ-বৈচিত্র্যের সুযোগে অন্যায়ভাবে একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। সেই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি হয়েছে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ। কিন্তু এই অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পয়গামই নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এসেছেন।

মহৎ মানুষের মহিমা ও মাহাত্ম্যের রূপ-কল্প বিদৃত করতে মনীষী এমারসন একটি চমৎকার বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাষায়-

---

২৯৮. সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৮, পৃ. ৬

২৯৯. মাওলানা রুহুল আমীন খান, ***সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে মহানবী (সা.) এর আদর্শ এবং ইসলামী সমাজে তার প্রতিফলন*** (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.) ই.ফা.বা. বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ৪৬-৪৭

৩০০. আল কুরআন, ৪২ : ১৩

৩০১. মাওলানা রূহুল আমীন খান, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৪৭

৩০২. আল কুরআন, ২১ : ১০৭

“It is easy in the world to live after the world’s opinion; it is easy in solitude to live after our own; but the great man is he who, in the midst of the crowd, keeps with perfect sweetness the independence of solitude.”[৩০৩]

‘জগদ্বাসীর মত অনুযায়ী জগতে বাস করা সহজ এবং নিজের মত অনুযায়ী নির্জনে বাস করাও সহজ। কিন্তু তিনিই মহৎ ব্যক্তি যিনি লোকালয়ের মধ্যেও নির্জনতার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখেন।’

ইসলামে মূল বিষয় হলো ঈমান ও আক্বীদা। এক্ষেত্রে ইসলামে সবচেয়ে বেশি উদারতার পরিচয় দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেননি- একমাত্র আমিই নবী, আমিই আল্লাহর বাণীবাহক। আমার ওপর নাযিলকৃত কিতাবই সত্য, আর সব মিথ্যা। আমার প্রচারিত ধর্মই আল্লাহ্ প্রদত্ত, অন্যগুলো নয়। বরং তিনি বলেন, আদম, শীশ, নূহ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, দাঊদ, সুলায়মান, মুসা, ঈসা (আ.) প্রমুখ সকলেই প্রেরিত সত্য নবী। যাবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল সকলই কুরআনের মত আল্লাহর কিতাব। সকল নবীর প্রচারিত দ্বীনই সত্য দ্বীন। সকল ভাষার মানুষই এক বংশজাত, সকল বর্ণের মানুষ একই পিতামাতার সন্তান। জাতিগত, বর্ণগত, বংশগত পার্থক্য যতই সৃষ্টি হোক না কেন সকলের আদি ও আসল এক। সকলের গন্তব্যস্থল এক। আল্লাহ তা‘আলা এই মহাপরিবারের বিশৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অনৈক্য নয়, ঐক্য প্রতিষ্ঠা, বিভেদ নয় সমন্বয় সাধনের জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রেরণ করেছেন।[৩০৪]

এজন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মানুষকে মুমিন বলে গণ্য হতে কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসেও তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এগুলিকে ‘আরকানুল ঈমান’ বলা হয়। এগুলোর প্রত্যেকটিতে রয়েছে ইসলামী উদারতা মানদণ্ড।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

الْبِرّ أَنْ ذولّوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ ولَكِنّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ والْيَومِ الْآخِرِ والْمَلَائِكَةِ والْكِذابِ والنّبيّينَ وآذى الْمَالَ عَلَى حبّهِ ذوي الْقُرْبَى والْيَذامَى والْمَساكِينَ وابْنَ السّبِيلِ والسّائِلِينَ وفِي الرّقَابِ وأَقامَ الصّلاةَ وآذى الزّكَاةَ والْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إِذا عَاهَدُوا والصّابرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضّرّاءِ وحينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الّذينَ صَدَقُوا وأُولَئِكَ هُمُ الْمُذقُونَ.

“পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোর মধ্যে কোনো পূণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য তার যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহে, পরকালে, মালাকগণে (ফিরিশতাগণে), গ্রন্থসমূহে এবং নবীগণে, এবং ধন সম্পদের প্রতি মনের টান থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন-অনাথ, অভাবগ্রস্থ, পথিক, সাহায্য প্রার্থনাকারিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ প্রদান করে, এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করে এবং অর্থ-সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করে। তারাই প্রকৃত সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী।”[৩০৫]

এখানে শুধু আনুষ্ঠানিকতার নাম ইসলাম নয়, প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতায় কোনো পূণ্য নেই। ইসলাম বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়। এখানে আল্লাহ মুমিনের বিশ্বাসের মৌলিক পাঁচটি বিষয় এবং তার মৌলিক কর্ম ও চরিত্রের বর্ণনা প্রদান করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

نَ الرّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ والْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ بِاللهِ ومَلَائِكَذهِ وكُذبِهِ ورُسُلِهِ لَا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحدٍ مِنْ رُسُلِهِ وقَالُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّنَا وإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

“রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুনিগণও। তারা সকলেই আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর ঈমান আনয়ন করেছেন। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য করি না।”[৩০৬] এখানে ঈমানের স্তম্ভগুলির মধ্য থেকে ৪টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে ৫টি বিষয়ের উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

---

৩০৩. সম্পাদনা কমিটি, ***শাশ্বত নবী (দ.)*** (ঢাকা: ইফাবা, জুন, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ৬০

৩০৪. মাওলানা রুহুল আমীন খান, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৪৮

৩০৫. আল-কুরআন, ২ : ১৭৭

৩০৬. আল- কুরআন, ২ : ২৮৫

يَا أَيّهَا نُوا آمِنُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ والْكِتَابِ الّذِي نَزّلَ عَلَى رَسُولِهِ والْكِتَابِ الّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ
ومَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ ومَلَائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর রাসূলের ওপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে গ্রন্থ তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন। এবং কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।"[৩০৭]

অমুসলিমদের সাথে আচার-আচরণে উদারতা ও সম্প্রীতি

একমাত্র ইসলামই বিশ্ব মানবতার মাঝে উদারতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে শান্তি প্রয়োগ করতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছেন। ইসলামে ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য প্রাধান্য পায়নি। সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়। সারা বিশ্বের মানব ইতিহাসও শুরু হয়েছে একটি মানুষ আদম (আ.) হতে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনও পার্থক্য নেই। এ মূলতত্ত্বের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, আদর্শিক গোঁড়ামী ও মানব সমাজের পাশবিক হিংস্রতা দূর করে মুসলিম মানসে উদার মনোভাব সৃষ্টি করে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করেছে। মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে একটি সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করেছে।[৩০৮]

এভাবে ঐতিহাসিক মদীনা সনদের মাধ্যমে শান্তির বার্তাবাহক বিশ্বনবী (সা.) ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, সাম্য-মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন রচনা করে আদর্শ কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধির বেশকটি ধারা ছিল মুসলিম স্বার্থবিরোধী। এতদ্সত্ত্বেও চিরস্থায়ী শান্তি ও প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসূল (সা.) এর নামের সঙ্গে 'রাসূলুল্লাহ্' লেখা যাবেনা মর্মে আপত্তি পেশ করে বলল যে, আমি যদি সাক্ষ্য দিতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহলে তো আপনার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো না, আপনাকে বায়তুল্লায় যেতে নিষেধ করতাম না। তখন রাসূল (সা.) সন্ধির লেখক আলী (রা.) কে 'রাসূলুল্লাহ্' কেটে দিয়ে শুধু 'মুহাম্মদ' নাম লেখার জন্য আদেশ করলেন। এতে আলী অপারগতা প্রকাশ করলে, রাসূল (সা.) নিজ হাতে কেটে দিয়ে এক ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উদারতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত পেশ করেন।'[৩০৯]

ওাসুলুল্লাহ (সা.) সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত। তাঁর রহমতের ছোঁয়া লেগেছিল মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুমধুর আচরণ আকৃষ্ট করেছে হাজারো অমুসলিমকে। তাদের অনেকেই তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে শিরক ও কুফরী মতবাদ ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছে। ফুলে মধু আছে জেনে মৌমাছি যেমন ফুলের স্পর্শে যেতে মরিয়া হয়ে ছুটে, ঠিক তেমনই ছুটেছিল অমুসলিমরা নবীর পরশে ইসলাম গ্রহণের জন্য।[৩১০]

ইসলামের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়, ৮ম হিযরীতে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা.) বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলে অমুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে আতংক ও ভয় ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু রাসূল (সা.) বিজিত শত্রুদের প্রতি কোন দুর্ব্যবহার ও প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। তিনি কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব বলে তোমরা মনে কর? তারা বলল: আপনিতো রহমতের নবী, আপনি ভাল ব্যবহার করবেন বলে আমাদের ধারণা। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, আমি সেই ঘোষণাই দিচ্ছি, যে ঘোষণা হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। যাও তোমরা সবাই মুক্ত।'[৩১১] প্রতিশোধের পরিবর্তে শত্রুদের প্রতি মহানবী (সা.) এর ক্ষমা ও মহানুভবতার এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের চিরন্তন আদর্শের জানান দেয়। পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম

---

৩০৭. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৬

৩০৮. মোঃ মাহমুদ বিন সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

৩০৯. সম্পাদনা পরিষদ, *সিরাতে ইবনে হিশাম* (ঢাক: ইফাবা, ২য় সংস্করণ: ২০০৮ খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ৬১

৩১০. মোঃ মাহমুদ বিন সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৫

৩১১. আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম* (ঢাকা: আল-কুরআন একাডেমী ল-ন, ২০০৮ খ্রি.) পৃ. ৪৩৯

বিনিময়ের যে বিধান ইসলামে রয়েছে, তাও সম্প্রীতির বন্ধন সুসংহতকরণের উজ্জ্বল প্রয়াস। এ সালামের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন তৈরি হয়।'[৩১২]

অমুসলিমদের সাথে আচার-আচরণে উদারতা ও সম্প্রীতি এবং এ বিষয়ক ইসলামী শিক্ষার প্রসার

ইসলাম মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে একটি সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করেছে।[৩১৩] ইসলামের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তা'আলা 'রাহমাতুল্লিল 'আলামীন' তথা জগতসমূহের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র সৃষ্টি তথা মানব-জ্বীন, প্রাণী ও পক্ষিকুলের জন্য রহমত। তাঁর রহমতের ছোঁয়া লেগেছিল মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ। এই জীবন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রশস্ততা, উদারতা ও সম্প্রীতি। সমগ্র মানবজাতির মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করার মাধ্যমে উদারনৈতিক ধর্মীয় জীবনব্যবস্থার ধারক বাহক ইসলাম। নিম্নে অমুসলিমদের সাথে আচার-আচরণে উদারতা ও সম্প্রীতি সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বসবাসের বিধান ও এক্ষেত্রে ইসলামের উদারতা

ইসলামী রাষ্ট্র বলতে এমন রাষ্ট্রকে বুঝানো হয় যে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছে মুসলমানদের হাতে, অথবা যে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলামান হয়ে গেছে অথবা যে রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়েছে অথবা যে রাষ্ট্রের সরকার ইসলামী সরকারকে জিযিয়ার বিনিময়ে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।[৩১৪] এসকল রাষ্ট্রে যখন কোনও অমুসলিম ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবার নিয়ে বসবাস করতে চায়; তখন সে নিরাপদেই বসবাস করতে পারবে। ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী এসকল অমুসলিমকে শরী'আতের পরিভাষায় যিম্মী বলা হয়। শরী'আতের পরিভাষায় যিম্মী চুক্তি হলো-

إِقْرَارُ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِ بِشَرْطِ بَذْلِ الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحكَامِ الإِسْلَامِ الدّنْيَوِيّةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ : أَنْ يَدْرُكَ الذمّيّ الْقِتَال مَعَ احتمَال دُخُولِهِ الإِسْلَامَ عَنْ طَرِيقِ مُخَالَطَتِهِ بِالْمُسْلِمِينَ ، ووقُوفِهِ عَلَى مَحاسِنِ الدّين . فَكَانَ عَقْدُ الذمّةِ لِلدّعْوةِ إِلَى الإِسْلَامِ ، لا لِلرّغْبَةِ أَو الطّمَعِ فِيمَا يُؤْخَذ مِنْهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ.

'কোনও অমুসলিম কর্তৃক জিযিয়া প্রদান ও দুনিয়াবী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান অনুসরণের স্বীকারোক্তি প্রদানপূর্বক কুফরীর উপর অবিচল থাকার শর্তে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি লাভ করা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা পরিহার করবে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের সাথে মেলামেশা, ইসলামের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে জানার মাধ্যমে তার ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনাও থেকে যায়। তাই যিম্মী চুক্তি ইসলামী দা'ওয়াতের অংশবিশেষ। তাদের নিকট থেকে যে জিযিয়া বা কর নেয়া সেটার প্রতি আগ্রহ বা লোভের কারণে যিম্মী চুক্তি সম্পাদন করা হয় না।'[৩১৫]

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পাদন করা হবে। এই চুক্তির আওতায় সে ইসলামী রাষ্ট্রে তার জান-মাল নিয়ে নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। কেননা সে জিযিয়া প্রদান করে কেবলমাত্র এজন্য যে মুসলমানদের জান-মালের ন্যায় তার জান-মালেরও নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। এই নিরাপত্তা সে ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ করবে যতক্ষণ না তার থেকে চুক্তিভঙ্গের কোনও নিদর্শন প্রকাশ পাবে।[৩১৬]

মক্কা-মদীনা ব্যতীত যে কোনও ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। বাড়িঘর তৈরি করতে পারবে। তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা চাইলে নির্দিষ্ট এলাকায় একত্রেও বসবাস করতে পারবে; যদি তাদের থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থহানিকর কোনও কর্মকাণ্ড প্রকাশ না পায়। এছাড়াও তার রাষ্ট্রের যে কোনও এলাকায় তাদের ব্যবসায়িক বা দৈনন্দিন যে কোনও প্রয়োজনে যাতায়াত করতে পারবে।[৩১৭]

---

৩১২. সম্পাদনা পরিষদ, ***সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ*** (ঢাকা: ইফাবা, তা.বি) খ. ২, পৃ. ৯৪

৩১৩. মোঃ মাহমুদ বিন সাঈদ, ***ইসলামে উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার*** (ঢাকা: পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, তা.বি.) পৃ. ০৫

৩১৪. আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, ***প্রাগুক্ত***, খ. ২, পৃ. ২৪৭

৩১৫. কাসানী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৭, পৃ. ১১১

৩১৬. আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৩, পৃ. ১২৬

৩১৭. আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৭, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

একটি মুসলিম দেশে ইসলাম মুসলিমকে শুধু অমুসলিমদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতেই বলে না, রাষ্ট্রে তাদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং সুখ-সমৃদ্ধিও নিশ্চিতকরে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহয় একাধিক স্থানে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার তুলে ধরা হয়েছে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তারা সমান। তাদের প্রতি কোনও প্রকার বৈষম্য ইসলাম বরদাশত করে না। যেসব অমুসলিমের সঙ্গে কোনও সংঘাত নেই, যারা শান্তিপূর্ণভাবে মুসলিমদের সঙ্গে বসবাস করেন তাদের প্রতি বৈষম্য দেখানো নয়; ইনসাফ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"আল্লাহ নিষেধ করেন না ওই লোকদের সঙ্গে সদাচার ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের আবাসভূমি হতে তোমাদের বের করে দেয়নি। নিশ্চয়আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।"[৩১৮]

এছাড়াও কোনও মুসলিম যদি কোনও অমুসলিমের উপর কোনরকম অন্যায় আচরণ করে অথবা তার ক্ষতি করে তাহলে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বধানে তার বিচার হবে। অন্যথায় কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করহে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রও যদি কোনও যিম্মীর উপর মাত্রাতিরিক্ত কর আরোপ করে অথবা তার সাধ্যাতীত কোনও কাজের ভার অর্পণ করে তবে সেক্ষেত্রেও তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার মুখোমুখি হতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
কোনও মুসলিম যদি কোনও অমুসলিমের প্রতি অন্যায় করেন, তবে রোজ কিয়ামতে খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিপক্ষে লড়বেন বলে হাদীসে এসেছে। একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'সাবধান! যদি কোনও মুসলিম কোনও অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেয় এবং তার কোনও বস্তু জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।'[৩১৯] ইসলাম মানুষের মৌলিক পাঁচটি বিষয় সংরক্ষণ করে যা জিম্মিদের (অমুসলিম নাগরিক) ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে সকল নাগরিককে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং এক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য বৈধ নয়। বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ
ক) **বিশ্বাসঃ** ইসলামী রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সংরক্ষণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।"[৩২০]
অর্থাৎ অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস লালন ও পালনের অধিকার সংরক্ষিত। অথচ আমরা দেখছি প-িমা ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি ধর্মকে ক্রমাগত আক্রমণের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইসলাম নয়, যে কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস, এমনকি খৃষ্টাণ ধর্ম এবং আমাদের পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণ যথা ঈসা আলাইহিস সালামকেও আক্রমণ এবং অসম্মান করার পিছনে তাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা অপরিমিত সময় অপচয় করেছে এবং করে যাচ্ছে।
খ) **সম্মানঃ** ইসলামে নারীর সম্ভ্রমকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখা হয় এবং নারীকে যে কোন প্রকার ক্ষতি, অপমান, অপবাদ থেকে কঠোরভাবে নিরাপত্তা দেয়া হয়। এটি রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক। যারা পেছনে/ অসাক্ষাতে কোন নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করে তাদের শাস্তি দেয়ার মাধ্যমেও ইসলাম নারীকে সুরক্ষা দিয়েছে। যিনা ব্যভিচার বন্ধের জন্যও কঠোর শাস্তির বিধান প্রদান করেছে।

---

[৩১৮]. আল কুরআন, ৬০: ৪
[৩১৯]. সুনানু আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৩৬
[৩২০]. আল কুরআন, ২: ২৫৬

গ) **চিন্তা/মন/মস্তিস্ক:** মদ পান এবং যে কোন বস্তু যা মস্তিস্ককে নেশাগ্রস্থ করে, তা ইসলামে নিষিদ্ধ। অমুসলিমদেরকে এক্ষেত্রে মদ পান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঘ) **সম্পদ:** ইসলামে সম্পদকে গুরুত্বসহকারে সংরক্ষণের নির্দেশ রয়েছে। বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: " أَيُّ بَلَدٍ هَذَا " قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ،قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: " إِنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا.

"হে মানুষেরা! আজকে কোন দিন? তারা বললো, আজ সম্মানিত দিন। তিনি বললেন: এটি কোন শহর? তারা বললো, সম্মানিত শহর। তিনি বললেন, এটি কোন মাস? তারা বললো, এটি সম্মানিত শহর। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের সম্পদ, তোমাদের জীবন এবং তোমার সম্মান একে অপরের নিকট এই দিবস, এই শহর, এই মাসের মত পবিত্র ও সম্মানিত।"[৩২১]

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক যিম্মী নাগরিকের সম্পদের নিরাপত্ত প্রদান করতে বাধ্য।

ঙ) **জীবন:** ইসলাম মানুষের জীবনকে সর্বাধিক মূল্যবান বস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ والْبَحرِ ورزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وفضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تفْضِيلًا.

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে উত্তম বিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৩২২] তাই ইসলাম মানব জীবনকে সর্বাধিক মূল্যবান ও সম্মানের বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তা রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। মানব জীবন সংহারকে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে। জীবন রক্ষার প্রতি গুরুত্ব ও জীবন সংহারের ভয়াবহতা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ قتلَ نَفسًا بغَيْرِ نَفْسٍ أَو فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فكَأَنَّمَا قتلَ النَّاسَ جَمِيعًا ومَنْ أَحيَاهَا فكَأَنَّمَا أَحيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

"নর হত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করা ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যার করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষেকেই হত্যা করলো আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো।"[৩২৩] অন্যত্র বলা হয়েছে,

ولا تقتلُوا النّفسَ الّذِي حرّمَ اللهُ إلّا بِالْحقِّ.

"আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেখে তাকে হত্যা করো না।"[৩২৪]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

'মুসলমানদের চুক্তিবদ্ধ কোনও যিম্মীকে যে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার ঘ্রাণ চল্লিশ বছর চলার পথের প্রান্ত হতেও পাওয়া যাবে।'[৩২৫] অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবী বাকরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ قتلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حرّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنّةَ.

'যে ব্যক্তি চুক্তিতে থাকা কোনও অমুসলিমকে অসময়ে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।'[৩২৬]

---

[৩২১]. আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩০
[৩২২]. আল কুরআন, ১৭: ৭০
[৩২৩]. আল কুরআন, ৫: ৩২
[৩২৪]. আল কুরআন, ১৭: ৩৩
[৩২৫]. সুনানে নাসাঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ২৫
[৩২৬]. সুনানে আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক বিদায় হজের দীর্ঘ ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজ ও রাষ্ট্রের সব দিক ও বিভাগ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি মাতাপিতার হক, সন্তান-সন্ততির হক, আত্মীয়-স্বজনদের হক, অনাথ ও দরিদ্রদের হক, প্রতিবেশীর হক, মুসাফিরের হক, চলার পথের সঙ্গী বা পথচারীর হক, দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানীর হক এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমের হক সম্পর্কেও নির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে মুসলিমদের কাছে অমুসলিমদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলিমদের তিনি অমুসলিমদের নিরাপত্তা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনে অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাদের ইজ্জত-আব্রু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তার জন্য প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ অমুসলিম জনগোষ্ঠী তারাও মানুষ, তারাও আল্লাহর বান্দা। ইসলাম সম্পর্কে তারা ভুল বা বিভ্রান্তির শিকার হলে তাদের প্রতি আক্রমণ না করে তাদেরকে মূল সত্য এবং ইসলামের মহানুভবতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। প্রত্যেক মানুষই এইসব নিরাপত্তা আকাঙ্খা করে যা শুধুমাত্র ইসলাম নিশ্চিতকরে। যে কোন পুরুষ বা নারীকে জিজ্ঞেস করুন, তারা জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম ইত্যাদির নিরাপত্তা চায়। আর ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন সমাজই এসব নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে না বরং প-িমে প্রায়ই এসব নিরাপত্তার লংঘন এবং অপব্যবহার ঘটে থাকে। মাথার উপর ঋণের বোঝা, তার সাথে অপরাধের উচ্চতার, বিশেষতঃ ধর্ষণ, চুরি ইত্যাদি এবং সেই সাথে এই সকল সমস্যার সমাধানহীন জীবন ব্যবস্থায় কোনভাবেই মানসিক প্রশান্তি অর্জন সম্ভব নয়।

অমুসলিমদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে উদারতা

ইসলাম মানুষের দ্বীন ও বিশ্বাসের সংরক্ষক। ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনাতেই মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণের ঘোষণা দেয়া হয়। মদীনা সনদ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে যে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছিলো সেখানে অমুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাদের আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিলো। মদীনা সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসী সমস্ত মুসলিম অমুসলিম নাগরিকদের নিয়ে যে গঠিত রাষ্ট্রের যে সংবিধান ঘোষণা করেন তার মৌলিক দু'টি ধারা অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে। সেগুলো হলো-

১. মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমানদের সমন্বয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠিত হবে এবং সবার নাগরিক অধিকার সমান থাকবে।

২. সকল সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অনুমতি থাকবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

এজন্য যিম্মী চুক্তির অধীনে কোনও অমুসলিম নাগরিক যদি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে তাহলে চুক্তির দাবী অনুযায়ী তাকে তার আকীদা-বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ প্রদান করতে হবে। কেননা সে তার ধর্মীয় স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা বজায় রাখার স্বার্থেই জিযিয়া কর প্রদান করে থাকে। তবে মুসলমানদের সাথে মেলা-মেশা, উঠাবসা ও চলাফেরার কারণে ইসলামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার সেই স্বাধীনতা থাকবে। নাজরানবাসীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সন্ধি চুক্তি হয়েছিল সেই সন্ধি চুক্তির পর তাদের অধিকার ও তাদের কাছে রাষ্ট্রের অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রশাসনিক পত্রে বলেন-

وحاشِيَذهَا جِوارُ اللهِ وذمّة مُحمّدٍ رَسُول اللهِ عَلَى أمْوالِهِمْ ومِلّذهِمْ وبِيَعِهمْ وكُل مَا ذحذ أيْدِيهِمْ.

'নাজরান ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের রক্ত, অর্থ, সম্পদ, ধর্ম, ধর্মশালা, ধর্মীয় নেতা, দেশে অবস্থানকারী ও প্রবাসী সকলের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা রয়েছে।'[৩২৭]

ইসলামের আলোকে অমুসলিমদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে উদারতার নীতিমালা নিম্নরূপ-

---

৩২৭ . বায়হাকী, ***দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হি.) খ. ৫, পৃ. ৩৮৫

অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না

ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য জোর-জবরদস্তির সুযোগ নেই। তবে স্বেচ্ছায় কেউ ইসলাম গ্রহণের পর যদি ধর্মত্যাগ করে তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে। তবে কোনও ব্যক্তি যদি জোর-জবরজস্তিতে ইসলাম গ্রহণ করে পরে সে ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাকে ধর্মত্যাগের শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া হবে।[৩২৮] কেননা ঈমান তার মনে বিশ্বাসের সাথে প্রবেশ করেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।"[৩২৯]

অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস লালন ও পালনের অধিকার সংরক্ষিত। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

"তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।"[৩৩০]

অথচ আমরা দেখছি প-িমা ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি ধর্মকে ক্রমাগত আক্রমণের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইসলাম নয়, যে কোন ধর্মীয় বিশ্বাস, এমনকি খৃষ্টাণ ধর্ম এবং আমাদের পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণ যথা ঈসা আলাইহিস সালামকেও আক্রমণ এবং অসম্মান করার পিছনে তাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা অপরিমিত সময় অপচয় করেছে এবং করে যাচ্ছে।

অমুসলিমদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দাবিদার প্রতিটি মুসলিমকে নির্দেশ দিয়েছেন পরমতসহিষ্ণুতা ও পরধর্মের বা মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে। অমুসলিমদের উপাস্যদের সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক আচরণ না করতে। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"তারা আল্লাহ তা'আলার বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি দিয়ো না, নইলে তারাও শত্রুতার কারণে না জেনে আল্লাহ তা'আলাকেও গালি দেবে, আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের কার্যকলাপ সুশোভনীয় করে রেখেছি, অতঃপর সবাইকে একদিন তার মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, তারপর তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা দুনিয়ার জীবনে কে কী কাজ করে এসেছে।"[৩৩১]

বিধর্মীদের উপসনালয় সংরক্ষণ

কোনও বিধর্মী উপসনালয়ে সাধারণ অবস্থা তো দূরের কথা যদ্ধাবস্থায়ও হামলা করা যাবে না। কোনও পুরোহিত বা পাদ্রীর প্রতি অস্ত্র তাক করা যাবে না। কোনও উপসনালয় জ্বালিয়ে দেয়া যাবে না। হাবীব ইবন অলীদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদল প্রেরণকালে বলতেন,

انْطَلِقُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، أَبْعَثُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَغْلُوا، وَلَا تَجْبُنُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلَا تُحْرِقُوا كَنِيسَةً، وَلَا تَعْقِرُوا نَخْلًا.

"তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যাত্রা কর। তোমরা আল্লাহর প্রতি কুফরকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আমি তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করছি : (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, (শত্রুপক্ষের) কারো চেহারা বিকৃতি ঘটাবে না, কোনও শিশুকে হত্যা করবে না, কোনও গির্জা জ্বালিয়ে দেবে না এবং কোনও বৃক্ষও উৎপাটন করবে না।'[৩৩২] অন্য হাদীসে আছে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[৩২৮] . ইব্রাহিম আহমাদ আল ওকফী, *তিলকা হুদুদুল্লাহ*, পৃ. ২৭৮

[৩২৯] . আল কুরআন, ২: ২৫৬

[৩৩০] . আল কুরআন, ১০৯: ৬

[৩৩১] . আল কুরআন, ৬: ১০৮

[৩৩২] . আবদুর রাযযাক, *আল মুসান্নাফ* (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ২য় সংস্করণ ১৪০৩ হি.) খ. ৫, পৃ. ২২০

كَانَ إذا بَعَثَ جُيُوشَهُ ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوامِعِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোনও বাহিনী প্রেরণ করলে বলতেন, ‘তোমরা গির্জার অধিবাসীদের হত্যা করবে না।’[৩৩৩] আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহুও একই পথে হাঁটেন। আপন খিলাফতকালে প্রথম যুদ্ধের বাহিনী প্রেরণ করতে গিয়ে তিনি এর সেনাপতি উসামা ইবন যায়েদ রাদিআল্লাহু আনহুর উদ্দেশে বলেন,

يا أيها الناس، فقوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعزقوا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحو شاة ولا بقرة، ولا بعيراً إلا لمأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.

‘হে লোক সকল, দাঁড়াও আমি তোমাদের দশটি বিষয়ে উপদেশ দেব। আমার পক্ষ হিসেবে কথাগুলো তোমরা মনে রাখবে। কোনও খেয়ানত করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, (শত্রুদের) অনুরূপ করবে না, ছোট বাচ্চাকে হত্যা করবে না, বয়োবৃদ্ধকেও না আর নারীকেও না। খেজুর গাছ কাটবে না কিংবা তা জ্বালিয়েও দেবে না। কোনও ফলবতী গাছ কাটবে না। আহারের প্রয়োজন ছাড়া কোনও ছাগল, গরু বা উট জবাই করবে না। আর তোমরা এমন কিছু লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে যারা গির্জাগুলোয় নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। তোমরাও তাদেরকে তাদের এবং তারা যা ছেড়ে নিজেদের জন্য তাতে ছেড়ে দেবে।’[৩৩৪]

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপাসনালয় নির্মাণ

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকগণ তাদের উপাসনার জন্য নতুন করে কোনও উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে কী না, তা নিয়ে ইসলামী আইনবিশেষজ্ঞগণের মাঝে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে যে সকল এলাকা ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে গেছে বা যেসকল এলাকাকে মুসলমানরা আবাদ করে শহরে পরিণত করেছে সেখানে তারা তাদের উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না বলে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ ، ولاَ يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا.

‘ইসলামী রাষ্ট্রে কোনও মন্দির নির্মাণ করা যাবে না, যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো পুনর্নির্মাণও করা যাবে না।’[৩৩৫] আর যে সকল এলাকা মুসলমানদের হাতে বিজিত সেখানেও তারা নতুন কোনও উপাসনালয় তৈরি করতে পারবে না বলেও ইসলামী আইনজ্ঞগণ একমত। তবে সেখানে যেসব উপাসনালয় পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিলো সেগুলো ধ্বংস করা যাবে না। আর যে সকল এলাকা মুসলমানদের হাতে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে যে এই এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাধীন আর এলাকাবাসীকে সুনির্দিষ্ট হারে খারাজ (ভূমিকর) দিতে হবে। সেখানে তারা চাইলে তাদের উপাসনার জন্য নতুন করে ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে। আর যদি সন্ধি চুক্তি এমন হয় যে এই এলাকা আমাদের আর তোমাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য জিযিয়া বা কর দিতে হবে। তাহলেও তারা সেখানে নতুন করে উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে।[৩৩৬]

মোটকথা ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের যে সকল উপাসনালয় পূর্ব থেকেই ছিলো সেগুলোতে তারা স্বাধীনভাবে উপাসনা করতে পারবে। তবে নতুন করে উপাসনালয় নির্মাণ করার বিষয়ে উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য।

অমুসলিমদের উপাসনা করার স্বাধীনতা

---

৩৩৩. ইবন আবী শায়বা, ***আল মুসান্নাফ*** (মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি.) খ. ১২, পৃ. ৩৮৭

৩৩৪. মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর, মুখতাসারু তারিখে দিমাশক, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৫২

৩৩৫. আল মাওসু‘আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৭, পৃ. ১২৯

৩৩৬. ***প্রাগুক্ত***, খ. ৭, পৃ. ১৩০

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিক স্বাধীনভাবে তাদের উপাসনার কাজ করতে পারবে। তাদের আকীদা বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা থাকবে। তারা তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইবাদত করবে। যেমন মন্দিরে বা গীর্জায় ঘন্টাধ্বনি দিতে পারবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে ধর্মীয় চর্চার জন্য তাওরাত, ইঞ্জিল বা অন্য যে কোনও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করতে পারবে। ইসলামের আলোকে যেটা গর্হিত কাজ তাদের ধর্মে যদি সেটা বৈধ হয় তাহলে সেই কাজ তাদের নিজেদের সীমানায় করতে কোনও বাধা দেয়া হবে না। যেমন মদপান করা, মদ বিক্রির জন্য উৎপাদন করা, রমজান মাসে দিনের বেলায় পানাহার করা ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে শর্ত এগুলো তারা প্রকাশ্যে করতে পারবে না। তাদের এলাকায় অথবা একাকী এসব কাজ করতে পারবে। যিম্মীদের শর্তের ব্যাপারে আব্দুর রহমান ইবন গানাম বলেন-

أَلاَّ نَضْرِبَ نَاقُوسًا إِلاَّ ضَرْبًا خَفِيًّا فِي جَوفِ كَنَائِسِنَا، ولاَ نُظْهِرَ عَلَيْهَا صَلِيبًا، ولا نَرْفَعَ أَصْواتَنا في الصّلاَةِ ولاَ الْقِرَاءَةَ فِي كَنَائِسِنَا، ولاَ نُظْهِرُ صَلِيبًا ولاَ كِذابًا فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ.

অর্থাৎ ‘আমরা হালকাভাবে আমাদের সিনাগগের অভ্যন্তরে ঘন্টাধ্বনির আওয়াজ করব, আমরা তার উপর ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখব না, সালাত ও কিরাআতে আমার স্বর উঁচু করব না, আমরা প্রকাশ্যে ক্রুশ ব্যবহার করব না, আমাদের ধর্মীয় পুস্তকাদি মুসলমানদের বাজারে বিক্রি করব না।’[৩৩৭]

অমুসলিমদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়নে উদারতা

সাধারণভাবে সকল ক্ষেত্রে মুসলমানগণ অমুসলিমদের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। বরং এ ব্যাপারে ইসলাম কতিপয় ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে, সুনির্দিষ্ট সেসব ক্ষেত্র ছাড়া অমুসলিমদের সাথে মুসলমানগণ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে না। ইসলাম নির্দেশিত সেসকল ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ-

(ক) অমুসলিমদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়াচরণ
(খ) অমুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি পূর্ণ করা
(গ) অমুসলিম নিকট সাহায্য কামনা করা
(ঘ) অমুসলিমদের সাথে সংলাপে শিষ্টাচার রক্ষা করা
নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

(ক) অমুসলিমদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়াচরণ

ইসলাম সত্য ও ইনসাফের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। ইনসাফের জন্য যে কেউই ইসলামের দ্বারস্থ হবে, ইসলাম উদারতার সাথে তার অধিকার আদায়ে বদ্ধপরিকর। সবলের থেকে দুর্বলের অধিকার, যালিমের থেকে মাযলুমের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলাম সক্রিয়। এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনও পার্থক্য নেই। কোনও অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম হাকিমের নিকট বিচার কামনা করলে ইনসাফের মানদ-সেখানে যুলুম কিংবা দলদর্শিতার স্বীকার হতে পারবে না। এর পাশাপাশি সদ্ব্যবহার ও সুমিষ্ট ভাষা তো তার প্রাপ্য থাকবেই। ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ভালোবাসা অর্জনের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো এ সদ্ব্যবহার ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে অমুসলিমদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধ তৈরি হবে এবং যার পরিণতিতে সে ইসলামের আদর্শে বিমোহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرّوهُمْ وتُقسِطُوا إِلَيْهِمْ إنّ ه يُحبّ الْمُقْسِطِين .

“আল্লাহ নিষেধ করেন না ওই লোকদের সঙ্গে সদাচার ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের আবাসভূমি হতে তোমাদের বের করে দেয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।”[৩৩৮]

---

৩৩৭. আল মাওসু‘আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ১৩০
৩৩৮. আল কুরআন, ৬০: ৪

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণযোগ্য মতানুসারে বর্ণিত আয়াতে 'দ্বীনের ব্যাপারে বিরুদ্ধাচরণকারী' দ্বারা সকল অনৈসলামিক ধর্মগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে এসেছে- আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন-

نَزَلَتْ فِي أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ لَهَا أُمٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالَ لَهَا قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى، فَأَتَتْهَا بِهَدَايَا وَسَمْنٍ، فَقَالَتْ: لَا أَقْبَلُ لَكِ هَدِيَّةً، وَلَا تَدْخُلِي عَلَيَّ حَتَّى يَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ.

"উপরোক্ত আয়াত আসমা বিনতে আবী বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। জাহেলী যুগে কাতীলা বিনতে আবদুল উজ্জা নামে তার মা ছিলো। সে একদিন আসমার জন্য কিছু উপঢৌকন নিয়ে আসে। কিন্তু আসমা রাদ্বয়াল্লাহু আনহা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেন, আমি এ উপহার গ্রহণ করবো না এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করবে না। অতঃপর আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থাপন করলে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।'[৩৩৯] মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব অমুসললিম যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফিরের সাথেও জরুরি। এতে যিম্মী, কাফির, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফির এবং শত্রু কাফির সকলে সমান।[৩৪০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন অমুসলিমদের ব্যাপারেও ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের নীতি অবলম্বন করেছেন। একদলীয়তা তাকে স্পর্শও করেনি। হাদীসে এসেছে -

مرّ النبي ﷺ بيهوديّ محمّم مجلود، فدعا النبي ﷺ رجلا من علمائهم فقال: أهكذا تجدُون حدّ الزاني فيكم؟ قال: نعم! قال: فأنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدّ الزنى فيكم؟ قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أحدّثك، ولكن الرجم، ولكن كثُرُ الزنا في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا:"تعالوا نجتمع فنضع شيئًا مكان الرجم، فيكون على الشريف والوضيع"، فوضعنا التحميم والجلد مكان الرجم! فقال النبى ﷺ: أنا أول من أحيي أمرك إذ أماتوه!

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দিয়ে জনৈক ইয়াহুদী ব্যক্তিকে মুখে কালো রং লাগানো অবস্থায় চাবুক মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে তাদেরকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, ব্যভিচারীর শাস্তি তোমাদের কিতাবে কি তোমরা এভাবে পেয়েছো? তারা বলল, জী; এভাবেই পেয়েছি। অতঃপর তিনি ঐ ধর্মের এক পণ্ডিতকে ডেকে বললেন, সেই আল্লাহর নামে শপথ করে জানতে চাই, যিনি মুসার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন; ব্যভিচারীর শাস্তি তোমাদের কিতাবে কি এভাবে পেয়েছো? জবাবে সে বলল, 'না, তবে আপনি যদি আল্লাহর নামে আমার নিকট থেকে জানতে না চাইতেন তবে আপনাকে জানাতাম না। আমরা কিতাবে পেয়েছি, প্রস্তর নিক্ষেপের কথা। তবে আমাদের সমাজপতিদের মাঝে যখনই কোনও সম্মানিত ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হয়, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যখন আমরা কোনও অসহায় দুর্বল লোককে পাকড়াও করি তখন তার শাস্তির ব্যবস্থা করি। আমরা বরং প্রস্তাব রাখছি, আসুন আমরা সকলে একত্র হয়ে সবল-সম্মানিত এবং দুর্বলের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আসুন, আমরা পাথর মারার বদলে চাবুক মারা ও মুখমণ্ডল কালো করার বিধান প্রবর্তন করি।' একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আমি প্রথম ব্যক্তি, যে তোমার একটি বিধান পুনর্জীবিত করছে, যা ওরা মেরে ফেলেছিল।[৩৪১] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিচের আয়াত অবতীর্ণ করেন-

---

[৩৩৯]. মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত তবারী, *জামি'উল বয়ান* (বৈরূত: দারুল হিজর, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.) খ. ২২, পৃ. ৩২২

[৩৪০]. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, *মা'আরিফুল কুরআন* (বাদশাহ ফাহাদ কুরআন একাডেমী, রিয়াদ) পৃ. ১০০৩

[৩৪১]. মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত তাবারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১০, পৃ. ৩০৫

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا.

"হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা, যারা দ্রুত কুফরীর দিকে ধাবিত হয়, তাদের মধ্য থেকে যারা নিজের মুখে বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা মিথ্যে শুনতে অভ্যস্ত, যারা তোমার কথা কান পেতে শুনে এমন এক কওমের জন্য, যারা তোমার কাছে আসেনি। তারা আল্লাহর কালাম বিকৃত করে তা যথাস্থানে সুবিন্যস্ত থাকার পরও তারা বলে, যদি তোমাদের এরূপ বিধান দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি না পাও, তবে তা বর্জন করবে।"[৩৪২]

এভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকালে ইনসাফের মানদণ্ডে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ব্যাপারে সমতা তৈরি করতে দেখা যায়। স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব করা কিংবা অবিচারের কোনও ইতিহাস তাদের শাসনকালে ঘটেনি। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. বর্ণনা করেন-

مُسْلِمًا وَيَهُودِيًّا اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِهِ فَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الحق عرجا وتركاهُ.

"এক মুসলিম ও এক ইহুদী উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট বিচারের জন্য আসে। সত্যাসত্য যাচাই করে তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেন। তখন উক্ত ইহুদী আল্লাহর নামে শপথ করে বলল, আপনি সত্য রায় প্রদান করেছেন। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু চাবুক দিয়ে তাকে আঘাত করে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কিভাবে বুঝলে (যে আমি সঠিক রায় দিয়েছি)? তখন ইহুদী বলল, আল্লাহর কসম, আমরা তাওরাতে পাই যে, কোনও কাযী যখন সঠিক রায় প্রদান করেন, তখন তার ডানে ও বামে দু'জন ফেরেশতা অবস্থান করে তাকে সত্যের দিকে চালিত করে। যতক্ষণ সে সত্যের উপরে থাকে। আর যখন সত্য পরিহার করে, তখন তারাও তাকে পরিহার করে।'[৩৪৩]

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনা তো ইসলামের মহানুভবতা ও উদারতার জন্য উৎকৃষ্ট নিদর্শন হয়ে আছে। তিনি তাঁর একটি বর্ম এক আহলে কিতাবীর নিকট পেয়ে উক্ত ব্যক্তিকে নিয়ে তাঁরই প্রধান বিচারপতি কাযী শুরাইহ্ এর নিকট গিয়ে বললেন- 'এ বর্মটি আমার। আমি এটি তার নিকট বিক্রি করিনি। এমনকি দানও করিনি।' বিচারপতি একথা শুনে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন- আমীরুল মুমিনীন যে দাবী করলেন সে ব্যাপারে তোমার কী জবাব? লোকটি বলল, এটা তো আমার বর্ম। আমীরুল মুমিনীনও মিথ্যাবাদী নন। অতঃপর শুরাইহ আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার দাবীর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ আছে কী? আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হেসে বললেন, শুরইহ ঠিকই বলেছে, আমার কোনও প্রমাণ নেই। অতঃপর বিচারপতি উক্ত অমুসলিমের পক্ষে রায় দিলেন। লোকটি বর্ম নিয়ে কয়েক কদম চলার পর ফিরে এসে বলল,

أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه، فيقضي لي عليه، أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين.

'আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ ধরণের রায় নিশ্চয়ই নবীদের রায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর শপথ, এ বর্মটি আপনারই। এ কথা শুনে বিমোহিত হয়ে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঐ ব্যক্তিকে বললেন, যেহেতু তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ, অতএব এটা তোমারই।[৩৪৪]

(খ) অমুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি পূরণ করা

৩৪২. আল কুরআন, ৫: ৪১

৩৪৩. আল মুনযিরী, *আত তারগীব ওয়াত তারহীব* (কায়রো: মাতবা'আতু মুস্তফা আল বাবী, ১৯৩৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৫৫

৩৪৪. সাইয়্যেদ কুতুব, আল *'আদালাত আল ইজতিমা'ঈয়্যাহ ফিল ইসলাম* (বৈরুত: দারুশ শুরূক, ১৯৮৫ খ্রি.) পৃ. ১৯২

অমুসলিমদের সাতে কোনও চুক্তি করা হলে তা পূরণ করতে হবে। তাদের সাথে কৃত চুক্তি পূর্ণ করার ব্যাপারে ইসলাম তাদেরকে মুসলিমদের মতই মনে করে। অমুসলিমদের সাথে কৃত এ চুক্তি পূরণ মূলত তাদের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, তাদের সাথে সদাচরণ, তাদের সংকট সমাধান ও তাদের প্রতি উদারতা প্রকাশ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রতি গভীর বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وأَوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করা। নিঃসন্দেহে অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।"[৩৪৫]

উল্লেখ্য কোনও মুসলিম যদি চুক্তি পূরণ না করে অমুসলিমের প্রতি অন্যায় করেন, তবে রোজ কিয়ামতে খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিপক্ষে লড়বেন বলে হাদীসে এসেছে। একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَو انْتَقَصَهُ، أَو كَلَّفَهُ فَوقَ طَاقَتِهِ، أَو أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ.

'সাবধান! যদি কোনও মুসলিম কোনও অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেয় এবং তার কোনও বস্তু জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।'[৩৪৬]

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী বদর যুদ্ধে হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তার পিতার ঘটনাটি চুক্তি রক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ত্যাগের বিরল প্রমাণ। তাঁরা পিতা-পুত্র মক্কায় কুরাইশ কাফিরদের হাতে বন্দী। ওদিকে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে। মুসলিম সেনাদল মক্কার কাফির মুশরিকদের আক্রমণের অপেক্ষায়। এদিকে তারা দু'জন এভাবে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, তারা দু'জনে মদীনায় যাবেন তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না। মদীনায় পৌঁছে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ ঘটনা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দিলেন,

انصرفان بعهدهم ونسذعين الله عليهم.

"তোমরা চলে যাও। আমরা তাদের সাথে গৃহীত চুক্তি রক্ষা করব। আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য কামনা করব।"[৩৪৭] ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মুসলমানদের উদারতা ও ত্যাগের ঘটনা বিশ্বমানবতার ইতিহাসে বিরল। কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল ইবন আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাতে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলো যে, যদি আমাদের কেউ আপনার নিকট আসে, সে যদি মুসলমানও হয়, তবে তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শর্তটি মেনে নিয়ে আবু জানদালকে তার পিতা সুহাইল ইবন আমরের নিকট ফেরত পাঠান এবং চুক্তির মেয়াদকালে তাদের পক্ষ থেকে যেই এসেছে, তাকেই তিনি ফেরত পাঠিয়েছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তির দিকে পথ চলার এ ইতিহাস ইসলামী শরী'আহ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ.

'মুসলিম উম্মাহর যিম্মা একটিই, যা রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের সাধারণ ব্যক্তিরও।'[৩৪৮]

(গ) অমুসলিমদের নিকট থেকে সাহায্য নেয়া

চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে অমুসলিম আহলে কিতাব এর নিকট থেকে সাহায্য নেয়ায় কোনও দোষ নেই। মদীনা হিজরতকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবন উরাইকিত নামক এক মুশরিক ব্যক্তিকে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে গাইড হিসেবে সঙ্গে নিয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হরো যার নিকট থেকে এই সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে, মুসলমানদের ব্যাপারে তার ভালো

---

[৩৪৫]. আল কুরআন, ১৭: ৩৪

[৩৪৬]. সুনানে আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৩৬

[৩৪৭]. মুসনাদে আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৯৫

[৩৪৮]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ১২০

ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। যদি মুসলমানদের ব্যাপারে সে নিরাপদ না হয় তাহলে তার সহযোগিতা নেয়া যাবে না।[৩৪৯]

(ঘ) অমুসলিমদের সাথে সংলাপে শিষ্টাচার রক্ষা করা

অমুসলিমদের সাথে নিরাপদ সংলাপের পদ্ধতির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আল তাঁর প্রিয় মুসলিম বান্দাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ.

"আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা জুলুম করে না, তাদের সাথে তোমরা সদ্ভাবে আলাপ করো।"[৩৫০]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাথে সংলাপের ক্ষেত্রে নম্র ব্যবহার করা, কঠোর আচরণ প্রদর্শন না করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কারণ মানুষ মমতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে যা অর্জন করতে পারে, কঠোরতা ও রূঢ় ব্যবহারের মাধ্যমে তা পারে না। পর্যালোচনা ও সংলাপের ক্ষেত্রে নম্রতা ও কোমলতার ব্যাপারে ইসলামের এ নির্দেশনা বাস্তবমুখী।

অমুসলিমদের সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উদারতা

অমুসলিমদের শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের অধিকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিলের শুরু থেকেই ইসলাম মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে আহবান করেছে। জ্ঞান অন্বেষনে উৎসাহ যুগিয়েছে। জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। উদারতার ধর্ম ইসলাম বংশ, গোত্র ও জাতীয়তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে জ্ঞানীদের সম্মানিত করেছে এবং তাদের অবদান মূল্যায়ন করেছে। ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে সাধ্যমত নিজের হিস্যা বুঝে নেয়ার অধিকার দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষানুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায় বদর যুদ্ধে অমুসলিম বন্দীদের মুক্তি দেয়ার কৌশল থেকে। দশজন মুসলমানকে লেখা-পড়া শেখানোর বিনিময় তিনি এক একজন বন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন। অমুসলিমদের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি কোনও অপরাধ খুঁজে পাননি। তাছাড়া নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অর্থের চেয়ে শিক্ষার প্রয়োজন বেশি ছিলো।

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম পণ্ডিতদের পরিচর্যায় ধর্মীয় কারণে কখনও কোনও ত্রুটি করা হয়নি। বিখ্যাত অমুসলিম ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের বই পুস্তকে পাওয়া যায় যে, ইসলামী খেলাফত আমলে খলীফা ও সাধারণ মুসলিম নাগরিকগণ অমুসলিম পণ্ডিতদেরকে যথেষ্ট সম্মান করেছেন।

প্রখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক ও দার্শনিক মি. ডারবর বলেন, মুসলিম খেলাফত আমলে বিভিন্ন খলীফা ও সাধারণ মুসলমানগণ অমুসলিম পণ্ডিতদেরকে সম্মান করেই ক্ষান্ত হননি বরং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তাদের হাতে ন্যস্ত করেছেন। এমনকি বড় বড় পদেও তাদেরকে আসীন করেছেন। যেমন বাদশাহ হারুনুর রশীদ রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হান্না মাসনিয়াহ নামক এক আহলে কিতাব এর নিয়ন্ত্রণে অর্পণ করেন। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড কখনও কখনও ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের হাতেও ন্যস্ত ছিলো। এসব বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত পণ্ডিতদের দেশ, ধর্ম কিংবা বর্ণের বিচার করা হতো না। বরং ইসলাম শুধু দেখতো জ্ঞান ও মেধার ক্ষেত্রে তার অবস্থান কতটুকু। ইসলামী রাষ্ট্রের বসবাসরত প্রখ্যাত অমুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে জিওরজিস ইবন বাখতীশু (একজন দার্শনিক ও চিকিৎসক), জ্যোতির্বিজ্ঞানী নুয়াইহাত ও তার পুত্র আবু সাহল, লেবাননী বংশোদ্ভূত জ্যোতির্বিজ্ঞানী তিওয়াইল ইবন তুমা, খ্রিষ্টান পণ্ডিত বাখতীশু ও তার পুত্র জিব্রীল এবং ইউহান্না, চিকিৎসক ইউহান্না আল বিতরীক, সাহল ইবন সাবুর ও তার পুত্র সাবুর, মিত্তি ইবন ইউনুস প্রমুখ অমুসলিম পণ্ডিতগণ খেলাফত আমলে রাষ্ট্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

---

[৩৪৯]. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম* (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৭৭ খ্রি.) পৃ. ২৪৮-২৪৯

[৩৫০]. আল কুরআন, ২৯: ৪৬

ইসলাম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদেরকে তাদের দেশ কিংবা ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তাদের প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করেছে, তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। তবে অমুসলিম পণ্ডিতদের নিকট থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত উপকৃত হওয়া যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাসের জন্য ক্ষতিকর না হবে।[৩৫১]

অমুসলিমদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করা

ইসলামই সর্বপ্রথম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান বলে ঘোষণা করেছে এবং মুমিনগণকে নির্দেশ দিয়েছে সকলের অধিকার বুঝে দিতে। বিশেষত প্রতিবেশী, সহকর্মী, এতিম, শ্রমিক, ক্রেতা বা অনুরূপ যারা আপনার চারিপার্শে থাকে তাদের প্রতি অন্যায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এজন্য কুরআন-হাদীসে এদের বিষয়ে বেশি বলা হয়েছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এদের সকলের প্রতি মুমিনের দয়িত্ব হলো (১) সবার সাথে সাধ্যমত ভাল ব্যবহার করতে হবে এবং সাধ্যমত উপকার করতে হবে (২) কোনোভাবে কারো প্রাপ্য বা পাওনা নষ্ট করা যাবে না বা কম দেওয়া যাবে না, (৩) কোনোভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না বা ক্ষতি করা যাবে না এবং (৪) সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। কুরআনে এ বিষয়ক অনেক নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاعْبُدُوا اللهَ ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبِالْوالِدَيْنِ إِحسَانًا وبِذِي الْقُرْبَى واليَتامَى والْمَسَاكِينِ والْجارِ ذِي الْقُرْبَى والْجارِ الْجُنُبِ والصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وابْنِ السَّبِيلِ ومَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنّ اللهَ لا يُحِبّ مَنْ كَانَ مُخْتالًا فَخُورًا.

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তার সাথে কোনো শরীক করো না। এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সাথী-সহকর্মী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[৩৫২]

কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশী-সহকর্মীর বা পার্শবর্তী মানুষদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لا يُؤْمِنُ واللهِ لا يُؤْمِنُ واللهِ لا يُؤْمِنُ قِيلَ ومَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوايِقَهُ.

'আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়! সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, যার প্রতিবেশী-পার্শবর্তী মানুষ তার কষ্ট থেকে রেহাই পায় না।"[৩৫৩]

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে প্রতিবেশীর প্রতি ভালো আচরণের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি। ইসলাম এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনও পার্থক্য করেনি। প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেয়া, তাকে উপঢৌকন দেয়া, খাবার-দাবারে তাকে শরীক করা, তার বাসায় যাতায়াত করা, তার সেবা করা, এভাবেই তাকে সম্মান করা হয়। প্রতিবেশীর সামাজিক অবস্থান ও উপলক্ষ্যের বিভিন্নতায় অধিকারও নানা রকম হতে পারে। প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনা করা, বিপদ-আপদ ও দুঃখ দুর্দশা লাঘব করা, এসবই তার অধিকারের অংশ।

এছাড়াও প্রতিবেশী কষ্ট পেতে পারে এরূপ আচরণ না করা, বিপদে সাহায্য করা, শোকে সমবেদনা জানানো, রোগাক্রান্ত হলে সেবা করা, আনন্দে অভিনন্দন জানানো ইত্যাদিও প্রতিবেশীর অধিকার। ইসলামে অমুসলিমদের জন্য প্রতিবেশী সংক্রান্ত সকল অধিকারই সংরক্ষিত। নাওফ আশ-শামী বলেন-

وقَالَ نَوفٌ الشَّامِيّ: (الْجار ذِي الْقُرْبَى) المسلم (والْجار الْجُنُبِ) اليهودي والنصراني.

উল্লেখিত আয়াতে **(الجار ذي القربى)** দ্বারা মুসলিম প্রতিবেশী এবং **(والجار الجنب)** দ্বারা ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টান প্রতিবেশী বুঝানো হয়েছে।[৩৫৪] ইমাম কুরতুবী বলেন, এই ব্যাখ্যার আলোকে প্রতিবেশী মুসলিম হোক

---

[৩৫১]. মোঃ মাহমুদ বিন সাঈদ, ***ইসলামে উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার*** (ঢাকা: পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, তা.বি.) পৃ. ৪১৪৩

[৩৫২]. আল কুরআন, ৪: ৩৬

[৩৫৩]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৫, পৃ. ২২৪০; সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ৬৮

[৩৫৪]. আল্লামা কুরতুবী, ***আল জামি' লি আহকামিল কুরআন*** (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি.) খ. ৫, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

অথবা অমুসলিম, তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। এপ্রসঙ্গে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেছেন,

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَار حذى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

"জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এতো বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমি ধারণা করেছিলাম নিশ্চয়ই সে প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবে।"[৩৫৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে মুজাহিদ বলেন-

ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.

'আমি আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পরিবারের জন্য একটি বকরী জবেহ করলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি আমার প্রতিবেশী ইয়াহুদীকে (এর গোশত থেকে) হাদিয়া দিয়েছ? তোমরা কি আমার প্রতিবেশী ইয়াহুদীকে (এর গোশত থেকে) হাদিয়া দিয়েছ? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, "জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এতো বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমি ধারণা করেছিলাম নিশ্চয়ই সে প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবে।'[৩৫৬]

অমুসলিমদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে উদারতা

অমুসলিমদের কাজের অধিকার

ইসলাম সকলকে কাজ করে উপার্জন করা অধিকার দিয়েছে এবং হালাল পথে উপার্জনকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে। সব ধরণের বৈধ কাজের ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহ যুগিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

"তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর।"[৩৫৭]

সালাত আদায়ের পর মসজিদে বসে না থেকে কাজে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ مْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে মুমিনগণ! জুম'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর। সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৩৫৮] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَا أَكَلَ أَحدٌ طَعَامًا (مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا) قطّ خَيْرًا (أَطيَب) مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَ يَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"স্বশ্রমে নিজের হাতে মানুষ যে উপার্জন করে তার চেয়ে উত্তম বা পবিত্রতর উপার্জন আর কিছুই হতে পারে না। আর আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম স্বশ্রমে নিজের হাতে উপার্জন করে খেতেন।"[৩৫৯]

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারছি যে, নিজে পরিশ্রম করে যে বৈধ উপার্জন মানুষ ভক্ষণ করে তাই হলো আল্লাহর প্রিয়তম খাদ্য এবং তা আল্লাহর নবী রাসূলগণ ও অন্যান্য প্রিয় বান্দাদের সুন্নাত ও রীতি। তাই বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ যেমন জেলে, তাতী, কামার, কুমার, মুচি, মেথর, শ্রমিক, কুলি, মুজুর, রিকশাচালক ও অন্যান্য অগণিত পেশায় নিয়োজিত পবিত্রতম খাদ্যভক্ষণকারী নবীরাসূলগণের প্রকৃত অনুসারী।

---

৩৫৫. আল্লামা কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ১৮৩

৩৫৬. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩

৩৫৭. আল কুরআন, ৬৭: ১৫

৩৫৮. আল কুরআন, ৬২:৯-১০

৩৫৯. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ.৭৩০

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন পেশা ও কাজে যোগদানের ব্যাপারে মুসলমানদের মতো অমুসলিমদেরও সমান স্বাধীনতা রয়েছে। নিজের অর্থে গড় প্রতিষ্ঠানে কিংবা অন্যের সাথে অন্যের কাজে তার যোগদান করতে পারে। ইসলামী আইনজ্ঞদের মতে বেচা-কেনা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, এবং সব ধরণের আর্থিক চুক্তি ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে তারা সমান। তবে সুদের লেনদেন করা নিষিদ্ধ।

কর্ম গ্রহণ বা পেশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ যিম্মীদের জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি কিংবা তাদের জন্য কোনও দ্বারও রুদ্ধ করেনি। যোগ্যতা, দক্ষতা, বিশ্বস্ততা এবং কর্মনিষ্ঠার শর্তে মুসলমানদের মতো যিম্মীদেরও মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্ন চাকরী গ্রহণ করার অধিকার আছে। আব্বাসী শাসনামলে বেশ কয়েকবার খ্রিষ্টানগণ মন্ত্রীত্বও গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে নাসর ইবন হারূন (৩৬৯ হি.) এবং ঈসা ইবন নাসতুরস (৩৮০ হি.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সারজুন নামক এক খ্রিষ্টানকে তাঁর সচিব নিযুক্ত করেছিলেন। সর্বশেষ উসমানী খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অনেক অমুসলিম নিয়োজিত ছিলো।[৩৬০]

ধর্ম ও জাতীয়তা নির্বিশেষে ইসলাম সকল শ্রমিকের জন্য সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা রেখেছে। সুস্থ-সবল, রুগ্ন-অক্ষম সর্বাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইসলাম নীতিমালা ও বিধি-বিধান তৈরি করেছে। খালিদ ইবন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বার্ধক্যজনিত কারণে কিংবা দুর্ঘটনার ফলে কাজ করতে অক্ষম শ্রমিককে সংরক্ষণের জন্য যে ঘোষণা দিয়েছেন তাতেই ইসলামের উদারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন-

وجعلت لهم أيما شيخ (عامل) ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام.

অর্থাৎ 'আমি তাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেছি যে, যদি তাদের কোনও বৃদ্ধ শ্রমিক কাজ করতে অক্ষম হয় অথবা কোনও দুর্ঘটনায় পতিত হয়, সে ধনী ছিল কিন্তু আজ গরীব হয়ে পড়ছে, তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে যেন দান সাদাকাহ দেয়, আমি তার জিযিয়া রহিত করলাম। দারুল হিজরাত ও দারুল ইসলামে সে যতদিন স্ব-পরিবারে অবস্থান করবে, ততদিন মুসলমানদের বাইতুল মাল হতে তাকে অর্থ দেয়া হবে।'[৩৬১]

অমুসলিমদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের উদারতা

যিম্মীদের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হলো যাবতীয় লেনদেন যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া চুক্তি, মুদারাবা, পারস্পরিক কৃষিচুক্তি এবং অন্যান্য সকল চুক্তির ক্ষেত্রে মুসলমানদের মতই। অর্থাৎ তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় তথা শরী'আত অনুমোদিত লেনদেন করতে কোনও বাঁধা নেই। কারণ তারা তো ইসলামী বিধি-বিধান মানতে বাধ্য। এজন্য সুদী লেনদেন, মদ বা শূকর ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি শরী'আত অনুমোদন করে এজাতীয় লেনদেন ব্যতীত সকল প্রকার আর্থিক বা ব্যবসায়িক লেনদেন করার অনুমতি ইসলামী শরী'আত প্রদান করেছে।

আবু বকর আল জাসসাস বলেন,

إنّ الذمّيّينَ فِي الْمُعَامَلاتِ والتِّجَارَاتِ كَالْبُيُوعِ وسَائِرِ التصرّفاتِ كَالْمُسْلِمِينَ.

'যিম্মীগণ লেনদেন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য যেমন ক্রয়-বিক্রয় এবং অন্যান্য সকল লেনদেনে মুসলমানদের মতই।'[৩৬২] আল্লামা কাসানী বলেন-

كُل مَا جَازَ مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ جَازَ مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الذمّةِ ، ومَا يَبْطُل أو يَفْسُدُ مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ يَبْطُل ويَفْسُدُ مِنْ بُيُوعِهِمْ ، إلاّ الْخَمْرَ والْخِنْزِيرَ.

'যে সকল ক্রয়-বিক্রয় মুসলমানদের সাথে বৈধ, তা যিম্মীদের সাথেও বৈধ এবং যে সকল ক্রয়-বিক্রয় বা আর্থিক লেনদেন শরী'আতের দৃষ্টিতে বাতিল বা ফাসিদ তার যিম্মীদের ক্ষেত্রেও বাতিল বা ফাসিদ হবে। তবে মদ এবং শূকরের ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণই হারাম।'[৩৬৩]

---

৩৬০. ড. ইউসুফ কারযাভী, গাইরুল মুসলিমীনা ফিল মুজতামা' আল ইসলামী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৫

৩৬১. আবু ইউসুফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৬

৩৬২. আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ১৩১

অমুসলিমদের সম্পদে মালিকানা

ইসলাম সম্পদে ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তির সামনে সম্পদ উপার্জনের পথ উন্মুক্ত করেছে। ব্যক্তি মালিকানার প্রতি ইসলামের এ স্বীকৃতির ফলেই মানুষ জীবন ও জীবিকা নির্বাহের মানসে দুনিয়ায় কাজের সন্ধানে বিচরণ করে। ইসলাম কোনও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জন্য কাজের দরজা উন্মুক্ত বা রুদ্ধ করে না। বরং ইসলাম বলেছে দক্ষতা, প্রচেষ্টা ও সাধ্যানুযায়ী ব্যক্তির কাজের সুযোগ দেয়া হবে এবং তার উপার্জিত সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

'আর এই যে মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়।'[৩৬৪]

তাই কোনও মুসলিম ব্যক্তি যদি হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করে, নিজের অধিকারে ও প্রয়োজনে তা ব্যয় করে এবং বিধিসম্মত নিয়মে তার প্রবৃদ্ধি ঘটায়, তবে সে মাল উপার্জনে কোনও অসুবিধা নেই। এমনিভাবে আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত কোনও অমুসলিমও যদি সম্পদ উপার্জন ও বৃদ্ধি করে তাতেও কোনও অসুবিধা নেই। তাদের উপার্জিত সম্পদ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّتُنَا، فَدَمُهُ كَدَمِنَا، ودِيَتُهُ كَدِيَتِنَا.

"যাদের জন্য আমাদের যিম্মাদারী আছে, তাদের রক্ত (জীবন) আমাদের রক্তের ন্যায় এবং তাদের রক্ত মূল্য আমাদের রক্ত মূল্যের ন্যায় (সংরক্ষিত)।'[৩৬৫] যিম্মীদের সম্পদ সংরক্ষণ ও হিফাযতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রম আমাদের সামনে বড় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিশর জয় করার পর সাধারণ ঘোষণায় বলেছিলেন-

لا يخرجون كنوزهم ولا أراضيهم.

'মিশরবাসীকে তাদের গুপ্ত ধন-সম্পদ এবং তাদের জমিন থেকে বিতাড়িত করা যাবে না।'[৩৬৬]

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অমুসলিমদের কর্তব্য

উল্লেখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমুসলিম যিম্মীরা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করে থাকে এবং ইসলাম প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিমদের মতই সুযোগ সুবিধা প্রদানের মতো উদারতা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি যিম্মীদেরকেও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে। সেগুলো নিম্নরূপ-

১. ইসলামী আইনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডারে অর্থ জমা দিতে হবে এবং এ জ্ঞান করতে হবে যে, যে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা, চাকুরী ও সাধারণ জীবন উপকরণ সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সে রাষ্ট্র তাদের মতো মুসলিম নাগরিকদেরকেও যাকাত আদায় করতে বাধ্য করেছে।

২. ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে, কারণ ইসলামী আইন হলো তারা যে রাষ্ট্রের নাগরিক এবং যে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা বিধানে অঙ্গিকারাবদ্ধ, সে রাষ্ট্রেরই সাধারণ আইন।

ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির মূলনীতি সমূহ

পবিত্র ইসলামে সকল বিষয় কুরআন ও হাদীসের মূলনীতির আলোকে নির্ধারিত হয়। তাই এই ধর্মে উদারতা ও সম্প্রীতি বিষয়ক নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহ এর আলোকেই নির্ধারিত হয়েছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে উদারতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কোনও ধর্মে যদি উদারতার বৈশিষ্ট্য থাকে তবে তা কেবলমাত্র ইসলামেই আছে। 'রাসূল (সা.) মক্কা হতে মদীনা হিজরত করার পর যে 'মদীনা সনদ' প্রণয়ন করেন তা ইসলাম তথা বিশ্ব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান এবং শান্তি-সম্প্রীতির ঐতিহাসিক দলিল। এ সনদের মাধ্যমে মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্র, উপগোত্র, সম্প্রদায় ও

---

৩৬৩. *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ১৩১

৩৬৪. আল কুরআন, ৫৩: ৩৯

৩৬৫. যাইলায়ী, নাসবুর রায়াহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৮১

৩৬৬. জামাল উদ্দীন আতাবেকী, *আন নুজুম আল জাহিরাহ ফী মুসুকি মিসর ওয়া আল কাহিরাহ* (বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৭০ খ্রি.) পৃ. ২০

গোষ্ঠী, দল ও উপদলের সহাবস্থান, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরেন।'[৩৬৭] এই সনদের ধারাসমূহ নিম্নরূপ-

১. মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমানদের সমন্বয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠিত হবে এবং সবার নাগরিক অধিকার সমান থাকবে।
২. সকল সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অনুমতি থাকবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।
৩. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সকলের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা তা প্রতিহত করা হবে।
৪. স্বাক্ষরকারীদের দ্বারা কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে এটা তার ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে। এজন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।
৬. সবরকম পাপ ও অনাচারকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। পাপী ও অপরাধী কোনভাবেই মুক্তি পাবে না।
৭. আজ হতে মদীনায় রক্তপাত নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো।

এছাড়াও আরও কয়েকটি ধারা রয়েছে। উল্লেখিত ধারাগুলো ইসলামী উদারতার মূলনীতি হিসেবে গৃহীত। এখানে মানবজাতির জন্য আদর্শ উদারতার মূলনীতি সাব্যস্ত করা হয়েছে। যুগে যুগে মূসলিম সম্প্রদায় তাদের ধর্মের আদর্শে তথা এই মূলনীতির আলোকেই তাদের উদারতার পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছে। উল্লেখিত ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামে উদারতার মূলনীতি হলো ইসলাম মুসলিমদের জন্য যেরূপ অধিকার নির্ধারণ করেছে তদ্রূপ সমগ্র মানবজাতির ধর্ম হিসেবে অমুসলিমদের জন্য অধিকার নির্ধারণ করেছে। এখানে ইসলামী শরী'আহ এর আলোকে মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য নির্ধারিত অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায় করাই প্রত্যেক খলীফা, আমীর ও মুসলিম নাগরিকের অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। এখানে সকলেই যেন পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ কোনও বিপদে পড়লে মুসলিম হওয়ার কারণে বা অমুসলিম হওয়ার কারণে বিশেষ কোনও সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ না করে। বিপদের সময়ে সকলের জন্যই সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। নফল দান-সদকা থেকে বিরত থাকা যাবে না।

ইসলামী আইন ও বিচার বিশেষত হুদূদ-তাযীর ও কিসাসের বিধান মুসলিম অমুসলিম সকল অপরাধীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে ইসলামী ফিকহে উল্লেখিত বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা অমুসলিম অপরাধীর ওপরও প্রয়োগ করা হবে। ইসলামের জিহাদ হয় যুদ্ধবাজ ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। অমুসলিম দেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নয়। তবে এর জন্যও ইসলামে পৃথক বিধান ও নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে, যার যথার্থ অনুসরণের মাধ্যমেই জিহাদ হয় রহমত। বিপরীতে অমুসলিম জনগোষ্ঠী যে যুদ্ধ করে তা বাস্তবতা, প্রজ্ঞা ও বিধান সকল দিক থেকে ইসলামী জিহাদ থেকে ভিন্ন। সেটা কখনো রহমত হয় না; বরং তা হলো আগাগোড়া ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা। বর্তমান ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইসলামে উদারতার অর্থ এটা নয় সে সেখানে সব ধর্মকেই সঠিক বলা হয়েছে এবং যে কোনও ধর্মের অনুসরণকেই বৈধ বলা হয়েছে। আবার এমনও নয় যে, উদারতা প্রমাণের জন্য মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন, তাদের ধর্মীয় শা'আইর ও প্রতীক এবং আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের আকাইদ ও দর্শনকে ভালো চোখে দেখা বা উপস্থাপন করতে হবে। আবার এমনও নয় যে উদারতা ও শান্তির স্লোগান দিয়ে ইসলাম গুরুত্বপূণ কোনও বিধানকে অস্বীকার করতে হবে। জিহাদ বাতিল ঘোষণা করতে হবে। কেননা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ইসলাম জালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরজ করেছে। যা কিয়ামত পর্যন্ত এক অমোঘ বিধান। এর বিধান ও সীমারেখা সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহয় পূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বিস্তারিতভাবে ফিকহী কিতাবসমূহে 'কিতাবুল জিহাদ', কিতাবুস সিয়ার প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। এসকল বিধান ও সীমারেখা পালনের মধ্য দিয়ে জিহাদ হয়ে ওঠে রহমত এবং সকল ফিতনা ও

[৩৬৭]. দৈনিক ইনকিলাব, ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ খ্রি., সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মদীনা সনদ, পৃ. ৭

বিশৃঙ্খলা প্রতিবিধানের একমাত্র প্রতিষেধক।[৩৬৮] ইসলামের উদারতার এ মূলনীতি কুরআন সুন্নাহর আলোকে সাব্যস্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وهُو يَعِظُهُ يَا بُنَيِّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ووصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهْنًا عَلَى وهْنٍ وفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي ولِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি- (কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে- তুমি শোকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে। তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোনও জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ভাবে থাকবে। এমন ব্যক্তির পথ অবলম্বন করো, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। অতঃপর তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা যা-কিছু করতে।"[৩৬৯] অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وإِخْوانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ومَنْ يَتَولَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وأَبْنَاؤُكُمْ وإِخْوانُكُمْ وأَزْواجُكُمْ وعَشِيرَتُكُمْ وأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ وجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ واللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

"হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, তবে তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিও না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবক বানাবে তারাই জালিম। (হে নবী! মুসলিমদেরকে) বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষ বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসা, যার মন্দা পড়ার আশংকা কর, এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফয়সালা প্রকাশ করেন। আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না।"[৩৭০]

উল্লিখিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোন মুসলিম দুনিয়াতে এমন কারও সাথে কোনও সম্পর্ক রাখবে না, যা তাদের দ্বীনি কর্তব্য আদায়ে বাঁধা সৃষ্টি করে। নিজেদের ঈমান রক্ষা করা ও দ্বীনি কর্তব্যসমূহ আদায় করার পাশাপাশি তাদের সাথে সদাচরণ করার বিষয়টি ইসলামে উপেক্ষণীয় নয়; বরং কুরআন তাকে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করেছে।[৩৭১] অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে এই সম্পর্কে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ

---

৩৬৮. নবী করীম (সা) মক্কা হতে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমন করলে তখন তিনি কতগুলো সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেন। সমস্যার মধ্যে ছিল-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার সমস্যা, মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয় শিক্ষাব্যবস্থা, মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন দল ও উপদলের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। তৎকালে মদীনায় ইয়াহূদীদের দশটি গোত্র এবং আওস ও খাযরায গোত্রদ্বয়ের বারটি উপগোত্র বসবাস করছিল। তাদের মধ্যে মুসলমান ও পৌত্তলিক ছিল। মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্র,গোষ্ঠী, দল ও উপদলের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, দায়িত্ব কর্তব্য ও নিরাপত্তা সুনি-িত করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে মদীনার সনদ নামে খ্যাত। মদীনা চুক্তি পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র - The first written Constitution in the world. মদীনা চুক্তি বা সনদ দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ২৪টি ধারা এবং দ্বিতীয় অংশে ২৯টি ধারা। প্রথম অংশ মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক। দ্বিতীয় অংশে আছে মুসলমান এবং ইয়াহুদী ও অন্যান্য মদীনাবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ক।

৩৬৯. আল কুরআন, ৩১ : ১৩-১৫

৩৭০. আল কুরআন, ৯: ২৩-২৪

৩৭১. আবুল হাসান আলি ইবন মুহাম্মদ আল-মাওরিদী, *তাফসীরে মাওরিদী* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি) খ. ২, পৃ. ৩৪৯

إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّةِ وأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْذمْ ومَا أَعْلَنْذمْ ومَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَواءَ السّبِيلِ. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً ويَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وأَلْسِنَذهُمْ بِالسّوءِ ووَدّوا لَو ذكْفُرُونَ. **لَنْ ذنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ ولَا أَولَادُكُمْ** ـمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ واللهُ بِمَا ذعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَدْ كَانَذ لَكُمْ أُسْوةٌ حسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ والّذِينَ مَعَهُ إِذ لِقَومِهِمْ إِنّا بُرَآءُ مِنْكُمْ ومِمّا ذعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وبَدَا بَيْنَنَا وبَيْنَكُمُ **الْعَدَاوةُ والْبَغْضَاءُ أَبَدًا حتى ذؤْ** ـنُوا بِاللهِ وحدَهُ إِلّا قَولَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْذغْفِرَنّ لَكَ ومَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيْكَ ذوكّلْنَا وإِلَيْكَ أَنَبْنَا وإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. رَبّنَا لَا ذجْعَلْنَا فِذنَةً لِلّذِينَ كَفَرُوا واغْفِرْ لَنَا رَبّنَا إِنّكَ أَنْذ الْعَزِيزُ الْحكِيمُ. ـنَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوةٌ حسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ والْيَومَ الْآخِرَ ومَنْ يَذولّ فَإِنّ اللهَ هُو الْغَنِيّ الْحمِيدُ.

"হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা; তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে; রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যা-কিছু গোপনে কর ও যা-কিছু প্রকাশ্যে কর আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হলো। তোমাদেরকে বাগে পেলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং নিজেদের হাত ও মুখ বিস্তার করে তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। তাদের কামনা এটাই যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও। কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোনও কাজে আসবে না। আল্লাহই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা-কিছু করছো আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন। তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে। যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকীদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। তবে ইবরাহীম তার পিতাকে অবশ্যই বলেছিল, আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করব, যদিও আমি আল্লাহর সামনে আপনার কোন উপকার করার এখতিয়ার রাখি না। হে আমার প্রতিপালক! আমরা আপনারই ওপর নির্ভর করেছি, আপনারই দিকে রুজু হয়েছি এবং আপনারই কাছে ফিরে যেতে চাই। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না এবং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই কেবল আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাদের (কর্মপন্থার) মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ, প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (সে যেন মনে রাখে) আল্লাহ সকলের থেকে অভাবমুক্ত, প্রশংসা।"[৩৭২] অন্য এক সূরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنّ ـ اشْذرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وأَموالَهُمْ بِأَنّ لَهُمُ الْجَنّةَ يُقَاذلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْذلُونَ ويُقْذلُونَ وعْدًا عَلَيْ حقًا فِي الذورَاةِ والْإِنْجِيلِ والْقُرْآنِ ومَنْ أَوفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْذبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْذمْ بِهِ وذلِكَ هُو الْفَوزُ الْعَظِيمُ. **الذائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحامِدُونَ السّائِحونَ الرّاكِعُونَ السّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِـ** ـعْرُوفِ والنّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ والْحافِظُونَ لِحدُودِ اللهِ وبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ. مَا كَانَ لِلنّبِيّ والّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْذغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ولَو كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا ذبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ. **ومَا كَانَ** اسْذغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلّا عَنْ مَوعِدَةٍ وعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمّا ذبَيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُو لِلهِ ذبَرّأَ مِنْهُ إِنّ إِبْرَاهِيمَ لَأَواهٌ حلِيمٌ.

"বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে- এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে হত্যা করে ও নিহতও হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাওরাত ও ইঞ্জিলেও নিয়েছেন এবং কুরআনেও। আল্লাহ অপেক্ষা বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে। সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য তোমরা আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য। (যারা এই সাফল্য সওদা করেছে, তারা কারা? তারা) তাওবাকারী,

---

[৩৭২]. আল কুরআন, ৬০: ১-৬

(আল্লাহর) ইবাদতকারী, তাঁর প্রশংসাকারী, সাওম পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। (হে নবী!) এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও। এটা নবী ও মুমিনদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাতে তারা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা জাহান্নামী। আর ইব্রাহীম (আ.) নিজ পিতার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেছিলেন, তার কারণ এছাড়া আর কিছুই ছিলো না যে, সে তাকে (পিতাকে) এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরে যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। ইব্রাহীম তো অত্যধিক উহ-আহকারী (অর্থাৎ কোমলপ্রাণ) ও বড় সহনশীল ছিলো।"[৩৭৩]

উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে ইসলামে উদারতা ও উদারতা মূলনীতির বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির নামে মুদাহিন ও শৈথিল্য প্রদর্শন কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।'[৩৭৪] ঈমান আকীদা বিসর্জন দিয়ে সৃষ্টিকে খুশি করার জন্য স্রষ্টার বিরাগভাজন হওয়া, নিজের ঈমান আকীদা বিসর্জন দেয়া ইসলামে অনুমোদিত নয়। রাসূল (সা.) বলেন, **لاطاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ**'স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।'[৩৭৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুমিন তো ঘোষণা করে,

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

"বলে দাও! নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।"[৩৭৬] তিনি অন্যত্র বলেন, একজন প্রকৃত মু'মিনতো বলে-

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

"আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্ত্বার দিকে নিজের মুখ ফেরালাম, যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভূক্ত নই।"[৩৭৭] সুতরাং একজন প্রকৃত মু'মিন তাওহীদের ইমাম সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদ (সা.), ইব্রাহীম (আ.) ও অন্য সকল নবী (আ.) । তাই সে তার উদারতা ও সম্প্রীতির সীমারেখা সকল নবীদের থেকে প্রাপ্ত আদর্শের আলোকে নিরূপণ করবে। আধুনিক জগতের কোন ব্যক্তি, পণ্ডিত বা কোন বূজর্গ থেকে প্রাপ্ত কোন আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে নয়।

ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। কোনরূপ সহিংসতা, বিবাদ-বিসংবাদের স্থান ইসলামে নেই। নূন্যতম শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এমন আচরণকেও ইসলাম সমর্থন করে না।

পার্থিব জীবনে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করাই উদারতার উদ্দেশ্য।। ধর্মে-ধর্মে, গোত্রে-গোত্রে এবং বর্ণে-বর্ণে ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা; যাতে কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। কারণ আল্লাহ তা'আলা চান এ নম্র গুণাবলীর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ুক। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

"তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। তোমার প্রভু ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে।"[৩৭৮] ফিতনা-ফাসাদ ও অরাজকতা কায়েম করে দ্বীনের দাওয়াত করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** "ফিৎনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও

---

৩৭৩. আল কুরআন, ৯: ১১১-১১৪

৩৭৪. ইবন আবি জামিনীন আল-মালিকী, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীজ* (কায়রো: আল-ফারুকুল হাদীসাহ্, ১ম সংস্করণ: ১৪২৩ হি.) খ. ৪, পৃ. ৩৭৫

৩৭৫. আবুবকর ইবন আবি শায়বা, *আল-কিতাবুল মুসান্নাফ* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর্ রশদে, ১ম সংস্করণ: ১৪০৯ হি.) খ. ৬, পৃ. ৫৪৫

৩৭৬. আল কুরআন, ৬ : ১৬২

৩৭৭. আল কুরআন, ৬ : ৭৯

৩৭৮. আল কুরআন, ১৬: ১২৫

কঠিন অপরাধ।"[৩৭৯] উদারতা আল্লাহর নিকট অন্যতম প্রিয় একটি কাজ এবং ইসলামী বিধানের অন্যতম উদ্দেশ্য। এখানে কোনও সংকীর্ণতা বা কঠোরতার স্থান নেই। তাই রাসূল (সা.) কে এক বিশিষ্ট সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! **ما الإيمان؟ قال: "السماحة والصبر** 'ঈমান কি? রাসূল (সা.) বলেন, উদারতা ও ধৈর্য।'[৩৮০]

ইসলাম উদারতা, সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে তার আদর্শের শক্তিতে, তলোয়ারের জোরে নয়। রাসূল (সা.) ও তাঁর সহযোগী সাহাবায়ে কেরামের আদর্শই হলো মূল শক্তি। স্বল্প সময়ে ইসলাম অর্ধ পৃথিবী জয় করার পেছনে মূল শক্তিটি ছিল উদারতা ও সম্প্রীতির। প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম মানুষের ভেতরে তার প্রকৃতিগত গুণ তথা মুনষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে। ইসলামের শিক্ষা হলো প্রথমে ভাল মানুষ হতে হবে। তারপর একজন খাঁটি মুসলিম হতে হবে। রাসূল (সা.) বলেন,

لا تدْخُلوا الْجَنّةَ حتى تؤْمِنُوا، ولا تؤْمِنُوا حتى تحابّوا.

"তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার পরস্পরকে ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না।"[৩৮১]

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন,

إنّ الدّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشَادّ الدّينَ أحدٌ إلا غلَبَهُ، فَسَدّدُوا وقاربُوا، وأَبْشِرُوا، واسْتَعِينُوا بالْغدْوةِ والرّوحةِ وشَيْءٍ مِنَ الدّلْجَةِ.

"নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ-সরল। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাক। আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।"[৩৮২] কষ্ট দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য কুরআন নাযিল করেননি; কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى**

"তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।"[৩৮৩] দ্বীনের বিধান সহজ করে মানবজাতিকে প্রদান করা হয়েছে। এ জীবনবিধানে কঠোরতা আরোপ করেননি। তাই আল্লাহ তা'আলা ইসলামী জীবনব্যবস্থার সহজতা ও উদারতার প্রসঙ্গে বলেন,

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"তোমাদের পক্ষে যা সহজসাধ্য আল্লাহ তা'ই ইচ্ছা করেন ও তোমাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য তা ইচ্ছা করেননা।"[৩৮৪] তাই দুর্বল মানুষের জন্য শরী'আতের বিধানাবলীকে আসান করা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

"আল্লাহ তোমাদের বোঝা লঘু করতে চান যেহেতু মানুষ দুর্বল (রূপে) সৃষ্ট হয়েছে।"[৩৮৫]

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী আচরণের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমা ও কাঠিন্য পরিহার। আল কুরআনে মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এই দু'টি বিষয়ে গুরুত্বসহকারে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন, **خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ**

"(হে নবী!) তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর এবং (মানুষকে) সৎকাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদের অগ্রাহ্য কর।"[৩৮৬]

---

[৩৭৯]. আল কুরআন, ২: ১৯১

[৩৮০]. আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ* (বৈরূত: মুআস্‌ সাসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ: ১৪২১ হি.) খ. ২৪, পৃ. ১২৩

[৩৮১]. আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আসআস সিজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ* (বৈরূত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা.বি) খ. ৪, পৃ.৩৫০

[৩৮২]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৬

[৩৮৩]. আল কুরআন, ২০ : ২

[৩৮৪]. আল কুরআন, ২ : ১৮৫

[৩৮৫]. আল কুরআন, ৪ : ২৮

[৩৮৬]. আল কুরআন, ৭ : ১৯৯

আল্লামা সা‘দী বলেন, “উল্লিখিত আয়াতে একজন অপরজনের সঙ্গে নম্র- কোমল ব্যবহার এবং পারস্পরিক সম্পর্কের নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম আমাদের জন্য যে আসমানী বিধান নিয়ে এসেছে এটা নতুন নয় বরং মানবজাতির সূচনা থেকেই আল্লাহ তা‘আলা মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

এই কোমল আচরণ, উদার মানসিকতা কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বৈশিষ্ট্য নয় বরং এই বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত উম্মতে মুহাম্মাদী। অত্র বৈশিষ্ট্য ধর্মের নির্দেশিত পালনীয় গুণ। কারণ বিশ্ব পরিবারের লালন পালন, শৃঙ্খলা বিধান, সুখ-শান্তি নি-তিকরণের দায়িত্ব মানুষের। এই বিশ্ব বৈচিত্র্যময়। এখানে নানা বর্ণ আছে, নানা ভাষা আছে, নানা ধর্মও আছে। আছে নানা রকম পার্থক্য। এ সবকিছু স্বীকার করে নিয়ে তার মাঝে ঐক্য গড়ে তোলা, সামঞ্জস্য বিধান করা, সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা এবং এভাবে এক সুশৃঙ্খল পৃথিবী গড়ে তোলাই হচ্ছে মহান আল্লাহর অভিপ্রায়। কিন্তু এই বিভিন্নতা, এই পার্থক্য ও রূপ-বৈচিত্র্য সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে, অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে, একজনের উপর আরেকজনের, এক বর্ণের উপর আরেক বর্ণের, এক ভাষার উপর আরেক ভাষার, এক ধর্মের উপর আরেক ধর্মের প্রাধান্যের দাবিদার হয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ। সেই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি হয়েছে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ। কিন্তু এই অনৈক্যের মধ্যে যে আছে এক মহাঐক্য, এই বহুর মাঝে যে আছে একক ও এবং সব বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা একান্ত কাম্য রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই পয়গামই নিয়ে এসেছেন।[৩৮৭]
উদারতা ও সম্প্রীতির কতিপয় উদ্দেশ্য হলো-

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি

পৃথিবী ব্যাপী মানুষে মানুষে যে অরাজকতা, বিশৃংখলা, সংঘাত, হিংসা, রাহাজানি ও মারামারি চলমান। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিভাষাটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। লংমেন ডিকশনারিতে রয়েছে-

When people live or work together without fighting or disagreeing with each other. ‘যখন মানুষ কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা একে অপরের মতানৈক্য ত্যাগ করে একসাথে বসবাস বা কাজ করে থাকে; তাকে Communal harmony (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি) বলা হয়।’[৩৮৮]
সুতরাং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও গোত্রের অন্তর্ভূক্ত একই সমাজ বা রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করাকে বুঝায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ইসলাম কর্তৃক ফরয করে দেয়া হয়েছে। যার কারণে এ সম্প্রীতি নষ্ট হবে, তাকে বিচারের মাঠে জবাবদিহিতার মুখোমুখী হতে হবে। যে অমুসলিম ব্যক্তির সাথে খারাপ আচরণ করে; তার জবাবদিহিতার বিষয়ে রাসূল (সা.) বলেন,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَو انْتَقصَهُ، أَو كَلَّفَهُ فَوقَ طَاقَتِهِ، أَو أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ.

“সাবধান! যদি কোন মুসলিম কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেয় এবং তার কোন বস্তু জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।”[৩৮৯] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وإِنْ أَحدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قومٌ لَا يَعْلَمُونَ.

“মুশরিকদের মধ্য হতে যদি কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দান কর; অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও, এই আদেশ এ জন্য যে, এরা এমন লোক যারা জ্ঞান রাখে না।”[৩৯০]

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গঠন

---

[৩৮৭]. মাওলানা রূহুল আমীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
[৩৮৮]. Longman Dictionary of Contemporary English (Essex: Pearson Education Limited, England, 2010) P. 802
[৩৮৯]. আবুদাউদ সুলাইমান ইবন আসআস সিজিস্তানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৭০
[৩৯০]. আল কুরআন, ৯ : ৬

আল্লাহ্ তা‘আলা সকল মানুষকে অভিন্ন মাতা-পিতার উৎসমূল ঘোষণা করে বা একই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করে তাদের মাঝে এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। কারণ মুসলিম-অমুসলিম সকলেই একই মাতা-পিতা তথা আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি। মক্কা বিজয়ের দিন যখন হযরত বিলাল আযান দিলেন; তখন কুরাইশ নেতা সুহাইল বিন আমর ও আবু সুফিয়ান তাকে কালো কাক বলে সম্বোধন করেন। তখন সকল মানুষ অভিন্ন উৎসমূল থেকে সৃষ্টির কথা আল্লাহ্ তা‘আলা স্মরণ করিয়ে দেন,
‘হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি।’ উল্লিখিত আয়াত তাদের মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করেন।’[৩৯১] তাই উদারতা ও সম্প্রীতির মাধ্যমেই কেবল বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গঠন করা সম্ভব; হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে তা কখনো সম্ভব নয়।

নিজ ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা সর্বোচ্চ উদারতা ও সম্প্রীতির শিক্ষা প্রদান করে। অমুসলিমদেরকে তাদের স্ব স্ব ধর্ম পালনে ইসলাম পুরোপুরি সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। যেসকল কাজ ইসলামে হারাম; তা ত্যাগ করতে তাদেরকে বাধ্য করা হয় না। আল্লামা কুরতুবি (**لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ**) ব্যাখ্যায় দুটি অর্থ প্রকাশ করেছেন,
‘(ক) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন; যার তোমরা অনুসরণ কর তা কুফর আর আমার জন্য আমার দ্বীন যা আমি অনুসরণ করি তা ইসলাম। (খ) তোমাদের কর্মের প্রতিফল তোমাদের জন্য, আমার কর্মের প্রতিদান আমার জন্য।’[৩৯২] সুতরাং তাদের ধর্ম পালনে বাধা দেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ অমুসলিমদের কর্মের প্রতিফল তারা ভোগ করবে; আর মুসলিমগণ তাদের কর্মের ফলাফল বা প্রাপ্তি তারা উপভোগ করবে।

সদাচরণ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা

ইসলাম শান্তি ও উদারতার ধর্ম। কারণ একমাত্র ইসলামই ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য বিচার ও সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাসূল (সা.) বিচারিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষণা করলেন, **لَوسَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا** ‘যদি স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.) এর কন্যাও চুরি করত তাহলে অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।’[৩৯৩] মুসলিম অমুসলিম সকলের মধ্যে সমভাবে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

“সুতরাং তুমি ওর দিকে আহবান কর এবং ওতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করনা। বলঃ আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহই আমাদের প্রভু এবং তোমাদের প্রভু। আমাদের কাজ আমাদের এবং তোমাদের কাজ তোমাদের। আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তারই নিকট।”[৩৯৪]

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান অপরিসীম। আল্লাহ্ তা‘আলা শান্তির পথের ঘোষণা দিয়ে বলেন,

---

৩৯১. আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) ***তানবীরুল মিকবাস বিন তাফসীরে ইবন আব্বাস*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, তা.বি) খ. ১, পৃ.৪৩৭

৩৯২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবী, ***তাফসীরে কুরতুবী*** (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রি.) খ. ৬, পৃ. ৩৫৮

৩৯৩. আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসাঈ, ***আস-সুনান*** (হালব: মাকতাবুল মাতবুয়া’তিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ: ১৪০৬ হি.), খ. ৮, পৃ. ৭৪

৩৯৪. আল কুরআন, ৪২: ১৫

يَا أَهْلَ الْكِذَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْذَمْ ذخْفُونَ مِنَ الْكِذَابِ ويَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ
نَ اللهِ نُورٌ وكِذَابٌ مُبِينٌ. دِي بِهِ اللهُ مَنِ اذبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ويُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاذ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ ويَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْذَقِيمٍ.

"হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছে। তোমাদের কিতাবের যেসব বিষয় গোপন কর তন্মধ্য হতে বহু সে তোমাদের সামনে পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করে, আর বহু বিষয় বর্জন করে, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এক আলোকময় বস্তু এসেছে এবং তা একটি স্পষ্ট কিতাব। তা দ্বারা আল্লাহ এরূপ লোকাদেরকে শান্তির পন্থাসমূহ বলে দেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং তিনি তাদের নিজ করুণায় কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে ঈমানের আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।"[৩৯৫] রাসূল (সা.) এর কল্যাণমণ্ডিত পুরো জীবনটাই এ বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষী। তিনি উদারতা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার এক মহান মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে জীবন পরিচালনা করেছেন। প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন কুরআনি শিক্ষামালার উপর আমল করে উদারতা ও সম্প্রীতির গুণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা ইসলামই শিখিয়েছে। পশ্চিমা উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণে সাম্য বলতে আইনের চোখে সকলের সমতা, নির্বাচিত হবার সমান অধিকার আর সামাজিক সকল নাগরিকের সমান সুযোগ লাভের অধিকারকে বুঝায়। কমিউনিজমের দৃষ্টিতে সাম্য হচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ লাভের অধিকার। আর ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে, রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার, আইনের চোখে সকল মানুষ সমান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণমুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থাকে বুঝায়। ইসলাম যে সাম্যের কথা বলে, তা কেবল মসজিদে সালাত আদায়ের সময় আমীর-ফকীর, ধনী-গরীব, প্রভু-গোলামের পাশাপাশি দাঁড়ানোর সাম্য নয়। এ আদর্শ লোটা, বদনা, কম্বল, লাঙ্গল তথা সকল ক্ষেত্রের সাম্য কামনা করে। ইসলাম উদারতা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে দেশ ও জাতির সকল ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ন্যায়বিচার, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সমান অধিকারের সুযোগ সৃষ্টি করে। জীবনের কোনও ক্ষেত্রে সমাজের কায়েমী সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিশেষ কোনও অধিকারকে ইসলাম স্বীকার করে না। সর্বক্ষেত্রে ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ সাম্যের দাবী করে। তবে প্রকৃতি বিরোধী কোনও অধিকার বা সাম্যের দাবিকে ইসলাম স্বীকার করে না।[৩৯৬]অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণমুক্ত অর্থব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা তথা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম। ইসলামের ঘোষণা হলো কোনও মানুষকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান।

ইসলামী আইনেও সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একই আইনে সকল মানুষের বিচার হবে। কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী আইনের উর্ধ্বে নয়। আইনকে তার নিজস্ব পথে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে হবে। ইসলামের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে মুগ্ধ হয়ে সরোজিনী নাইডু বলেন- 'ইসলামের এই অবিচ্ছেদ্য ঐক্যবোধ অবলোকন করে আমি বার বার মুগ্ধ হই। কারণ এ এমন এক ঐক্য যা মানুষের মাঝে সহজেই এক স্বতঃস্ফূর্ত ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। কেউ যখন লন্ডনে কোন মিসরবাসী, কি আলজেরীয়, ভারতীয় কি তুর্কী মুসলমানের সাক্ষাত পায়, সে বুঝতে পারে মাতৃভূমির বিচ্ছিন্নতায় কিছু আসে যায় না, সবাই এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।[৩৯৭]

সুতরাং পৃথিবীতে উদারতা ও সম্প্রীতির উদ্দেশ্যই কেবলমাত্র আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তি-সাম্য-মৈত্রী ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। উল্লিখিত গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই কেবল মানুষের মন জয় করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর ইসলামী দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এ গুণের বিকল্প

---

[৩৯৫]. আল কুরআন, ৫: ১৫-১৬

[৩৯৬]. আল কুরআন, ৪ : ৫৮

[৩৯৭]. মোঃ ছফিউল্লাহ মাহমুদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

নেই। ইসলামী দায়ী ও সুফিদের ব্যক্তি-মাধুর্য, নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, উদারত, সম্প্রীতি ও উত্তম ব্যবহারে অগণিত মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি আরো বলেন, **صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وأَعْطِ مَنْ حرَمَكَ، واعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ** 'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে তুমি প্রদান কর, যে তোমার উপর অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।'[৩৯৮]

---

৩৯৮. ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২৮, পৃ. ৬৫৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়
সহিংসতা, ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদের পরিচয়, কারণ, বিস্তৃতি ও প্রতিকার

সহিংসতা ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা
চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ -এর পারিভাষিক পরিচিতি
পারিভাষিক পরিচিতির বিশ্লেষণ
ইসলামে চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ
সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রকারভেদ
সন্ত্রাসের নেপথ্যে আসলে কারা
বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের উৎস
সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সূত্রপাত ও বিস্তার
সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের কারণ
সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের প্রতিকার

দ্বিতীয় অধ্যায়
সহিংসতা ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের পরিচয়

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। মহান আল্লাহর প্রেরীত এমন একটি জীবনব্যবস্থা; যা নিজেদের মত অন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রকেও ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সকল শ্রেণির জন্য সুখ, শান্তি, মৈত্রী, সাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য

সক্রিয় ভূমিকা পালনে ও ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা জোগায়। আর তাতেই বিশ্ববাসীর জীবনধারায় প্রশান্তি আনয়ন করে এবং হানাহানি, অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, নিরীহ নিরপরাধ মানুষ হত্যা, আত্মহত্যা ও আত্মঘাতি হামলা দূর করে চির শান্তি সৃষ্টি করে। ইসলাম সকল ধরনের অপকর্ম তথা দুনিয়া ও আখিরাতে অকল্যাণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেখানে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, ধর্মান্ধতা, সহিংসতা, ও অশ্লীলতা সেখানে ইসলাম নেই। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ্ পৃথিবীতে ইসলাম ধর্ম প্রেরণ করেন। যারা সামাজিক পরিম-লে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, রক্তপাত ঘটায়, ধ্বংসযজ্ঞ ও নৈতিকতা বর্জিত ইসলামিক কর্মকাণ্ড চালায়, তারা কখানো শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী হতে পারে না। রাসূল (সঃ) বলেন, "তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে) সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠোরতা করো না, মানুষকে সুসংবাদ শোনাও, বিরক্ত বা বিতৃষ্ণ করো না।"[৩৯৯] যে কাজে মানুষের শান্তি বিনষ্ট হয়, নিরপরাধ মানুষের প্রাণ হরণ করা হয়, সেটাকে ইসলাম সমর্থন করে না। নিম্নে সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

সহিংসতা ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা

সহিংসতা শব্দটি সহিংস শব্দ হতে উদ্ভূত যার ইংরেজি হলো- Violence। সহিংসতার আরবি হলো- (العف, ضد مشقة)[৪০০] যেমন হাদিসে এসেছে, **إذا زَنَدْ أمَةٌ أحدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، ولَا يُعَنِّفْهَا** 'যখন তোমাদের কারো দাসী যিনা করে তাহলে তাকে কশাঘাত কর; হিংস্রতা বা সহিংসতা প্রদর্শন করো না।'[৪০১]
আবু লাইস বলেন, ضد الرفق (সহানুভূতির বিপরীত, কঠোরতা)[৪০২] **خِلَافِ الرِّفْقِ** (দয়ার বিপরীত)[৪০৩] সহিংস শব্দের অর্থ হলো হিংস্র, হিংসাত্মক, প্রচণ্ড, প্রবল, অত্যুগ্র, আবেগমথিত, তীব্র, উগ্র, সাংঘাতিক, মারাত্মক, ভয়ানক ইংরেজিতে Violent,[৪০৪] যা হিংসার সাথে; হিংসা যুক্ত।[৪০৫] আর সহিংসতা বলতে যে কোন ধরণের সহিংস আচরণ বুঝায়। আরবীতে সহিংসতা অর্থে (**العف**) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। (**العف**) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- কঠোরতা, কঠোর আচরণ, জোর, বল, প্রচ-তা, তীব্রতা, সহিংসতা।[৪০৬] ইবনু আছির বলেন, اللوم. ,الذقريع ,الذوبيخ [৪০৭] ইবনু মানযুর বলেন, সহিংসতার অর্থ- **الْخُرْقُ بِالأمر وقِلّةُ الرِّفق بِهِ** [৪০৮]
ড. ইব্রাহিম মাদকুর বলেন, "নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে কোন কিছু আয়ত্তে আনয়ন করা। নিন্দা করা, লজ্জা দেয়া"।[৪০৯]
পরিভাষায়- বিশেষ কোন লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কোন ব্যক্তির মাধ্যমে কোন কর্ম আদায় করে নেয়ার জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যে শারীরিক জোর ও ক্ষমতা ব্যবহার করাকে সহিংসতা বলা হয়।

---

[৩৯৯]. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন সালামা আল-কাযায়ী আল-মিসরী, ***মুসনাদুস্ সিহাব*** (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিছালা, ২য় সংস্করণ: ১৪০৭ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৬৫; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, ***আস-সহীহ্*** (বৈরূত: দারু তৃকীন্ নাজাত, প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি), খ. ১, পৃ. ২৫; আবুল আব্বাস আলকুতুবী আল-উন্দুলূসি, ***ইখতিসারু সহীহীল বুখারী*** (দামেস্ক: দারুন্ নাওয়াদের, ১ম সংস্করণ: ১৪৩৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ৪৬৪; আবু দাউদ সুলাইমান ইবন দাউদ আত্-তায়ালিসী আল-বসরী (কায়রো: দারু হিযর, ১ম সংস্করণ: ১৪১৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ৫৬০

[৪০০]. আবু আব্দুর রহমান খলিল আল-বসিরী, ***কিতাবুল আইন*** (কায়রো: মাকতাবাতুল হেলাল, তা.বি), খ. ২, পৃ. ১৫৭

[৪০১]. আবু আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ, ***আস্-সুনানুল কুবরা*** (বৈরূত: মুআস্ সাসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ: ১৪২১ হি.), খ. ৬, পৃ. ৪৫২

[৪০২]. আবু মনসুর মুহাম্মদ ইবন আহমদ, তাহযীবুল্ লুগাহ্ (বৈরূত: দারু ইহইয়াঈত্ তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ: ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫; নাশওয়ান ইবন সায়ীদ আল-ইয়ামিনী, ***শামছুল উলূম ওয়া দাওয়াউ কালামিল আরব*** (বৈরূত: দারুল ফিকরিল মুয়া'সার, ১ম সংস্করণ: ১৪২০ হি.), খ. ৭, পৃ. ৪৭৯৬

[৪০৩]. আহমাদ ইবন ফারিস আর-রাজী, ***মু'জামু মুকায়াসুল লুগাহ্*** (বৈরূত: দারুল ফিক্র, প্রকাশের সন, ১৩৯৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৫৮;

[৪০৪]. A Bilingual Dictionary of Words & Phrases, Bengali-English Dictionary.com

[৪০৫]. সম্পাদনা পরিষদ, ***ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*** (বাংলা একাডেমী, দ্বাদশ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১০) পৃ. ১১৩৬

[৪০৬]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ***আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*** (ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, মে ২০০৯) পৃ. ৭১৫

[৪০৭]. মাযদুদ্দিন ইবন আছীর, ***আন-নিহায়াতু ফি গারিবীল হাদিস ওয়াল আছার*** (বৈরূত: মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ্, ১৩৯৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ৩০৯;

[৪০৮]. জামালদ্দিন ইবন মানযুর, ***লিসানুল আরব*** (বৈরূত: দারু সাদের, ৩য় সংস্করণ: ১৪১৪ হি.), খ. ৯, পৃ. ২৫৭; মুরতাজা যুবাইদী, তাজুল উরূছ (কায়রো: দারুল হিদায়া, তা.বি), খ. ২৪, পৃ. ১৮৬

[৪০৯]. ড. ইবরাহীম মাদকুর, ***আল মু'জামুল ওয়াসীত*** (দেওবন্দ, মাকতাবাতু যাকারিয়া, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ৬৩১

'ইচ্ছাকৃতভাবে শারিরীক শক্তি, ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো ক্ষতি করা বা ক্ষতি করার হুমকি দেয়াকে সহিংসতা বলে।'[৪১০] সহিংসতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "বিরোধী পক্ষের ওপর কোন ব্যক্তির শারীরিক ক্ষমতা আরোপ অথবা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধণের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তিকে দিয়ে কোন কাজ করতে বাধ্য করার জন্য যে শক্তি প্রয়োগ করা হয় তাকে সহিংসতা বলা হয়।"[৪১১]

সহিংসতা হলো কঠোরতা, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা ও রূঢ়তা; যা আল্লাহ্ খুবই অপছন্দ করেন। যেমন, হাদিসে এসেছে- إنّ اللهَ رَفِيقٌ، يُحبّ الرِّفقَ ويرْضَى بِهِ ويُعِينُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ কোমল আর তিনি কোমলতা ও নম্রতাকেই পছন্দ করেন এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকেন ও সাহায্য করেন; সহিংসতায় কোন সহযোগিতা করেন না।'[৪১২]

সহিংসতা বলতে ইংরেজিতে Violence শব্দটি ব্যবহৃত হয়। Violence এর শাব্দিক অর্থ হলো- Behaviour involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something. কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তুকে আহত, ধ্বংস অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে শারীরিক শক্তির প্রায়োগিক আচরণ। Violence এর পরিচয় প্রদানে WHO এর বক্তব্য হলো-

"the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, which either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation," although the group acknowledges that the inclusion of "the use of power" in its definition expands on the conventional understanding of the word. 'কোন ব্যক্তি নিজেকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে অথবা একটি দল বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ অথবা প্রকৃতভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে শারীরিক শক্তি বা ক্ষমতার ব্যবহার, যার ফলে ব্যক্তি বা সমষ্টি মারাত্মকভাবে আহত হয় অথবা মৃত্যু ঘটে অথবা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয় বা বঞ্চিত করা হয়। যদিও দলটি স্বীকার করে যে, এই সংজ্ঞার আলোকে 'শক্তির ব্যবহার' অভিধানটির অন্তর্ভূক্তি এর বিধিসম্মত ব্যবহারকেও ব্যাপকার্থে প্রশ্নবিদ্ধ করে।'[৪১৩] 'জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার বা অর্জন করার চেষ্টা করার নাম সহিংসতা।'[৪১৪] মোটকথা যে কোন কাজ বা উদ্দেশ্য অর্জনে শারীরিক শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগের সহিংস পন্থাকেই সহিংসতা বলা হয়। এ অর্থে বাংলা ভাষায় চরমপন্থা, উগ্রপন্থা, সন্ত্রাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।[৪১৫] 'একটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শক্তি এবং ভয় দেখানোর নাম সহিংসতা।'[৪১৬] সন্ত্রাস শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো কোন উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা, অতিশয় শঙ্কা বা ভীতি। আর সন্ত্রাসবাদ বলতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যাকা- সংঘটনের পক্ষপাতি বুঝানো হয়।[৪১৭] সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো (terrorism)।

মানুষের প্রভুত্ব ও পশুত্ব এই দুই ধরনের প্রবৃত্তি রয়েছে। সহিংসতা হলো পশুর স্বভাব আর শান্তি হলো প্রভুত্ব স্বভাব। শান্তিপ্রিয় মানুষ কামনা করে প্রেম-ভালোবাসা, হৃদ্যতা, মিলন, দয়া-মায়া-মমতা, ক্ষমা ও পুণর্মিলন। আর সহিংস মানুষ কামনা করে মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ, খুন, বোমাবাজি, দলাদলি, রেষারেষি, অত্যাচার-নির্যাতন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ।

---

৪১০. https://www.bissoy.com.

৪১১. *মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, ১৬শ বৈঠক, মক্কা, ২১/১০/১৪২২-২৬/১০/১৪২২ হি.

৪১২. আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ কুরতুবী, ***আল-বায়ানু ওয়াত্ তাহসীল*** (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, ২য় সংস্করণ: ১৪০৮ হি.), খ. ১৭, পৃ. ২৪৭

৪১৩. https//: en.wikipedia.org/wiki/violence

৪১৪. https://bn.emsayazilim.com

৪১৫. সম্পাদনা পরিষদ, ***ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*** (বাংলা একাডেমী, দ্বাদশ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১০) পৃ. ৪০১-৪০২

৪১৬. https://bn.encyclopedia-titanica.com

৪১৭. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, শিপ প্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত, ***বাংলা একাডেমিক ব্যবহারিক বাংলা অভিধান;*** ঢাকা : বাংলা একাডেমি; ২০০৭; পৃ. ১১১৩

'সহিংসতা তথা হিংস্রতা বা হিংসাত্মক মানের। এটি একটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শক্তি এবং ভয় দেখানো ব্যবহার action এটি ক্রিয়া এবং সহিংসতার ফলাফলও। এ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন হিংস্র থেকে। সহিংসতা সাধারণত আগ্রাসনের সাথে সম্পর্কিত। যা বিশেষ করে উচ্চতর প্রাণির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।'[৪১৮]

চরমপন্থা ও সন্ত্রাস শব্দকে আরবীতে (الإرهاب) বলা হয়। (الإرهاب) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- ভীতিপ্রদর্শন,[৪১৯] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, এর অর্থ: সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ, আতঙ্কবাদ।[৪২০]

মুহাম্মদ সেলিম নুয়াইমী বলেন, الإرهاب এর অর্থ- **ذهديد، ذفزيع، وذخويف، مرعب، مخيف** [৪২১] পবিত্র কুরআন মাজীদে এ শব্দটির ব্যবহার রয়েছে-

وأعِدّوا لَهُمْ مَا ذطَعْذمْ مِنْ قوةٍ ومِنْ رِباطِ الْخَيْلِ ذرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وعَدُوكُمْ "তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে।"[৪২২]

আরবীতে (الإرهاب) ছাড়াও আরও কয়েকটি শব্দ সহিংসতা, চরমপন্থা, উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাস অর্থে ব্যবহার করা হয়। মুরতাজা যুবাইদী বলেন, **الإزعاجُ والإخافةُ** 'ভীতি প্রদর্শন বা অস্থিরতা সৃষ্টি'[৪২৩] এখানে (**العنف**) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- কঠোরতা, কঠোর আচরণ, জোর, বল, প্রচণ্ডতা, তীব্রতা, সহিংসতা। (**التطرف**) শব্দের অর্থ হলো চরমপন্থা, উগ্রপন্থা, বাড়াবাড়ি, উগ্রবাদ। আর (**الغلو**) অর্থ হলো বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন।[৪২৪]

'রাজনৈতিক বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সন্ত্রাস ও উগ্রতার পথ অবলম্বন করার নাম সহিংসতা।'[৪২৫]

ধর্মান্ধতা শব্দটি ধর্মান্ধ শব্দ হতে গঠিত। ধর্মান্ধ শব্দটি 'ধর্ম ও অন্ধ' এ দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে ধর্ম শব্দের অর্থ হলো- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি-বিধান; religion (ইসলাম ধর্ম)।[৪২৬]

ধর্মীয় ক্ষেত্রে অতি বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন ও উগ্রতা প্রদর্শন করা; যেমন: আবু আব্দুর রহমান খলিল বসরী বলেন, **جواز الحد** 'সীমালঙ্ঘন বা সীমাতিক্রম'[৪২৭]

আর ধর্মান্ধ শব্দের অর্থ হলো নিজ ধর্ম অন্ধের মতো বিশ্বাসী ও পরধর্ম বিদ্বেষী।[৪২৮]

Fanaticism: অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, অন্ধ গোঁড়ামি, অন্ধ অনুরোগ, গোঁড়ামি; Zealotry: ধর্মোন্মত্ততা, ধর্মান্ধতা, উৎসাহীতা, অত্যুৎসাহ, কোন কিছু নিয়ে প্রবল মাতামাতি; Bigotry: ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি'[৪২৯]

ধর্মান্ধতা: ধর্মান্ধ (বিশেষণ) তথা নিজ ধর্মে অন্ধবিশ্বাসী কিন্তু পরধর্মবিদ্বেষী, আরবীতে ধর্মান্ধতা বলতে (ذعصب ديني) বুঝানো হয়। (ذعصب) বলতে যে কোন প্রকারের গোঁড়ামী বা সংকীর্ণ ধ্যান ধারণাকে বুঝানো হয়। ইংরেজি ভাষায় ধর্মান্ধতা শব্দটি Fanatic/Fanatism হিসেব ব্যবহৃত হয়। Fanatic শব্দের অর্থ হলো (সাধা. ধর্ম সম্পর্কে) অতিশয় গোঁড়া ব্যক্তি। অতিমাত্রায় একরোখা ও উগ্র। Fanatism অর্থ হলো- উগ্র যুক্তিহীন।[৪৩০] ধর্মান্ধতার পরিচয় প্রদানে উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে- **Fanaticism** (from the

---

[৪১৮]. https//bn.encyclopedia-titanic....
[৪১৯]. নাশওয়ান ইবন সায়ীদ আল-ইয়ামিনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৬৬০
[৪২০]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, মে ২০০৯) পৃ. ৭১
[৪২১]. মুহাম্মদ সেলিম নুয়াইমী, *তাকমিলাতুল মাআ'জিমীল আরাবিয়্যাহ্* (বাগদাদ: উজারাতুস্ সাক্বাফাতি ওয়াল ই'লাম, ১ম ংস্করণ: ১৯৭৯ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৩৯
[৪২২]. আল-কুরআন, ৮: ৬০
[৪২৩]. মুরতাজা যুবাইদী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৪১
[৪২৪]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১৫, ২৯০, ৭৩৬
[৪২৫]. ড. আহমদ মুখতার আব্দুল হামীদ উমর, *মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাতিল মুআ'ছারা* (বৈরূত: আ'লামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ: ১৪২৯ হি.), খ. ২, পৃ. ৯৪৯
[৪২৬]. বাংলা একাডেমী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩৯
[৪২৭]. আবু আব্দুর রহমান খলিল বসরী, *কিতাবুল আইন* (বৈরূত: দারু ওয়া মাকতাবাতুল হেলাল, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ৪৪৬
[৪২৮]. বাংলা একাডেমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪০
[৪২৯]. http://www.bangladict.com
[৪৩০]. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা একাডেমী ইংলিশ বাংলা অভিধান* (বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৩শ মুদ্রণ, ২০০৬ খ্রি.) পৃ. ২৬৪

Latin adverb *fānāticē* (fren-*fānāticus*; enthusiastic, ecstatic; raging, fanatical, furious) is a belief or behavior involving uncritical Zealots or with an obsessive enthusiasm. Fanaticism বা ধর্মান্ধতা হলো ইহুদী যীলটদের অযৌক্তিক একটি বিশ্বাস অথবা আচরণ অথবা চরম গোঁড়া ধারণা।[৪৩১]

'Fanaticism is an extreme and often unquestioning enthusiasm, devotion, or zeal for something, such as a religion, potitical stance, or cause. It can also refer to behvior motivated by such enthusiasm or devotion.'[৪৩২]

প্রখ্যাত দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা fanaticism এর সংজ্ঞা প্রদানে বলেন- "redoubling your effort when you have forgotten your aim". যখন তুমি তোমার লক্ষ্য ভুলে যাবে তখন তা অর্জনে নিজ উদ্যমকে দ্বিগুণ করাকে fanaticism বলা হয়।[৪৩৩] বর্তমান বিশ্বে জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় উল্লিখিত চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের অর্থে বহুল ব্যবহৃত দু'টি শব্দ। জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ইংরেজি হলো- (militant, militancy)। 'জঙ্গি, জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিবাদী শব্দগুলোর মূল হলো জঙ্গ। এটি ফার্সী ও উর্দু ভাষার শব্দ। জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, তুমূল ও প্রচ- ঝগড়া। জঙ্গি অর্থ যোদ্ধা। ধর্মীয় কারণে রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে চোরাগোপ্তা হামলা, অতর্কিত আক্রমণ, হত্যা করা, আত্মঘাতী হামলা কিংবা কোন নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে জঙ্গিবাদ বলে।'[৪৩৪] শাব্দিক বা রূপক ভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্তু বুঝাতে এ শব্দগুলি ব্যবহৃত হতো। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গিলাট' বলা হতো।[৪৩৫]

'ধর্মীয় কারণে রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে চোরাগোপ্তা হামলা, অতর্কিত আক্রমণ, হত্যা করা, আত্মঘাতী হামলা কিংবা কোন নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে জঙ্গিবাদ বলে।'[৪৩৬] জঙ্গিবাদ শব্দটির মূল জঙ্গ। এটি একটি উর্দু ভাষার শব্দ। যার অর্থ যুদ্ধ, তুমূল কলহ, লড়াই, প্রচ- ঝগড়া।[৪৩৭] জঙ্গিবাদ শব্দটি উর্দু বা ফার্সী 'জঙ্গ' শব্দ হতে উৎপন্ন। এর অর্থ যুদ্ধ। এই জঙ্গ শব্দের সাথে বাদ যুক্ত হয়ে জঙ্গিবাদ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী।[৪৩৮] জঙ্গি অর্থ যোদ্ধা সেভাবে জঙ্গিবাদ অর্থ জঙ্গিদের মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শ। ইংরেজীতে বলা হয় militant, militancy কিংবা military activities.[৪৩৯] শক্তিমত্ত্ব বা উগ্র বুঝাতেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

(Oxford Advanced Learnear's Dictionary) militant; Using or willing to use forse or strong pressure to achieve your aims, especially to achieve social or political change.[৪৪০]Chamber's Twentienth century Dictionary militant adj, fighting, engaged in warfare.[৪৪১] অর্থাৎ সংগ্রামরত বা যুদ্ধরত। আরেক জায়গায় বলা হয়েছেঃ Using violence[৪৪২] অর্থাৎ সহিংসতা অবলম্বন করা। Merriam-wepster's collegiate Dictionary তে বলা হয়েছে militant 1: engaged in warfare or combet:fighting 2: aggressively active (as in cause). অর্থাৎ মিলিট্যান্ট (জঙ্গি) : যুদ্ধ বা সম্মুখ সময়ে লিপ্ত ব্যক্তি, যুদ্ধরত, উগ্রভাবে সক্রিয়। দ্বিতীয় অর্থটিকে আরো একটু ব্যাখ্যা

---

[৪৩১]. https://en.wikipedia.org/wiki/Fanaticism

[৪৩২]. https://www.dictionary.com

[৪৩৩]. https://en.wikipedia.org/wiki/Fanaticism

[৪৩৪]. মু. আবুল খায়ের, ***ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের স্থান নেই*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৫৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী- মার্চ ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৩৬

[৪৩৫]. শ্রী শৈলেন্দ বিশ্বাস, ***সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধান,*** পৃ ৪৬২

[৪৩৬]. মু. আবুল খায়ের, ইফাবা, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৩৬

[৪৩৭]. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, **সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকা** : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬, পৃ. ২১৬

[৪৩৮]. ড. আমিনুল ইসলাম, ***"জঙ্গিবাদ : ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মূল্যায়ন",*** ঢাকা : মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০১১, পৃ. ৪৫

[৪৩৯]. মোহাম্মদ আলী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ***বাংলা ইংরেজী অভিধান,*** ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০-, পৃ. ২১৬

[৪৪০]. A. S Hornby, Ibid

[৪৪১]. A.M Macdonald, *Chambers Twentith Century Dictionary*, Great Britain: The Pitman Press, 1981, P. 430

[৪৪২]. Ibid, p. 430

করে মাইক্রোসফট এনকাটা অভিধানে জঙ্গি শব্দের অর্থ বলা হয়েছে, aggressive : extremely active in the defense or support of a cause, often to the point of entremism. "আগ্রাসী কোন বিষয়ের পক্ষে বা সমর্থনে চরমভাবে সক্রিয়, যা প্রায়শ চরমপন্থা পর্যন্ত পৌঁছায়। এ সকল অর্থ কোনোটিই সরাসরি বে-আইনী অপরাধ বুঝায় না। এ সকল অর্থে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক, আদর্শিক, পেশাজীবি ও সামাজিক দলই মিলিট্যান্ট বা জঙ্গি। কারণ সকলেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা প্রেসার প্রয়োগ পছন্দ করেন এবং সকলেই তাদের নিজেদের আদর্শ ও স্বার্থ রক্ষায় বা প্রতিষ্ঠায় উগ্রভাবে সক্রিয়। কিন্তু বর্তমানে জঙ্গি বলতে বুঝায় বে-আইনী সহিংসতা ও খুনখারাপি।

এ অর্থে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত পরিভাষা হল সন্ত্রাসবাদ (terrorism)। কিন্তু বাংলায় পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখি থেকে বুঝা যায় যে, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র বা সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হন তাদেরকে চরমপন্থী (extremist) বলা হয়। আর যারা ইসলামের নামে বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হয়, তাদেরকে বলা হয় জঙ্গি। আর যারা প্রচলিত সাধারণ রাজনৈতিক দলের নামে বা কোনো দল, মতবাদ বা আদর্শের নাম না নিয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হয় তাদেরকে সন্ত্রাসী বল হয়।

এরূপ বিভাজন বা পার্থক্যের কোনো ভাষাগত বা তথ্যগত ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। বরং ইংরেজি ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, militant/ militancy জঙ্গি বা জঙ্গিবাদ শব্দ সরাসরি বে-আইনী কর্ম বা অপরাধ বুঝায় না। বরং বেআইনী বা আইন-সম্মত যে কোনো প্রকারের উগ্রতা বুঝাতে (militant, militancy) জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে সন্ত্রাস (terrorism) শব্দটিই সরাসরি অপরাধ ও বে-আইনী কর্মকাণ্ড বুঝায়।[৪৪৩] চরমপন্থা ও চরমপন্থী (extremism/extremist) শব্দদ্বয়ও সরাসরি অপরাধ বা বে আইনী কর্মকাণ্ড বুঝায় না। জঙ্গিবাদ যেহেতু নতুন শব্দ তাই এর আরবী প্রতিশব্দ অভিধানে পরিলক্ষিত হয় না। তবে এর কাছাকাছি যে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় তাহলো 'ইরহাব' অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা, ভীতি প্রদর্শন করা।[৪৪৪]এভাবে দেখা যায় যে, জঙ্গিবাদ শব্দটি কোনোরূপ ভাষাগত ভিত্তি ছাড়াই ইসলামের নামে সহিংসতা অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। অথচ মূল ভাষাগত অর্থে ইসলামের নামে, অন্য কোনো ধর্মের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, অন্য যে কোনো মতবাদ, আদর্শ বা অধিকারের নামে উগ্রতার আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তিই জঙ্গি এবং তার মতামতকে জঙ্গিবাদ বলা হয়। ইংরেজি ব্যবহার এটিই প্রমাণ করে।[৪৪৫] উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ বলতে যা বুঝায় সে অর্থটি প্রকাশের সঠিক শব্দ হলো সন্ত্রাস।

চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ -এর পারিভাষিক পরিচিতি

চরমপন্থা বা চরমপন্থাবাদ হচ্ছে কোন কিছুকে সীমা বা চরম দিকে ধাবিত করা। চরমপন্থী হওয়ার প্রক্রিয়া বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চরম মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষ সমর্থন করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরমপন্থাবাদ হচ্ছে কোনও রাজনৈতিক চিন্তার ফলাফল, হিতাহিত, সম্ভাব্যতা, যৌক্তিকতা, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নির্বিচারে শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা; এবং মুখোমুখি সংঘর্ষে আসাই শুধু নয়, বিরোধী পক্ষকে খতম করাও অভীষ্ট বিষয়। এই ধারায় অপরের সবকিছু চিন্তার প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং অহিংসায় অনীহা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।[৪৪৬] সাধারণত সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র বা সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা রক্তারক্তি প্রভৃতি কর্মকা-কে চরমপন্থা বলা হয়। আর যারা উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাবিতে লিপ্ত হন তাদেরকে চরমপন্থী" (extremist) বলা হয়। এনসাইক্লোপিডীয়া অব ব্রিটানিকায় সন্ত্রাস সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ terrorism: the systematic use of violence to create a general climate of fear in a

---

৪৪৩ . *Encyclopaedia Britannica*, Ibid

৪৪৪ . ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, ***আল-কামূসুল আসরী***, দারুল জাইল, বৈরুত, তা.বি, পৃ. ২৬

৪৪৫ . A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, p 738.

৪৪৬ . https://www.roddure.com

population and thereby to bring about a particular political objective: "সন্ত্রাস : নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে সমন্বিতভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা।"[৪৪৭]

মার্কিন সরকারের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই) terrorism বা সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলেছেঃ "the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives: কোনো সরকার বা সাধারণ নাগরিকদেরকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা।" সন্ত্রাস এর সংজ্ঞায় 'মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী' এর বক্তব্য হলো- "মানুষের (ধর্ম, জান,মাল, সম্মান) এর প্রতি বিদ্বেষ বশত ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা দেশের সাথে শত্রুতাপোষণকে সন্ত্রাস বলা হয়। সকল প্রকারের ভীতি প্রদর্শন, কষ্টদান, হুমকি, অন্যায় হত্যা, যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট নানা অপকর্ম, ছিনতাই, ডাকাতি এবং সকল প্রকার সহিংস অথবা ভীতিপ্রদ কর্মকাণ্ড যা ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অপরাধ ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের মাঝে ভীতি সৃষ্টি করা, তাদেরকে কষ্ট দিয়ে বা জীবনহানি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাহীনতার হুমকির মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করা অথবা মানুষের সার্বিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার লক্ষ্যে সংঘটিত হয় তাকে সন্ত্রাস বলে। এর আরও কিছু প্রকারের মধ্যে পরিবেশের ক্ষতি করা অথবা ব্যক্তি বা সাধারণ মালিকানাধীন কোন কিছু ক্ষতিসাধন, দেশজ বা প্রাকৃতিক সম্পদহানির চেষ্টা করা।[৪৪৮] এসব কিছুই আল্লাহর জমিন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নানা প্রকার; যা থেকে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, "জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করো না; নি-য়ই আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।[৪৪৯]

জঙ্গিবাদ সম্পর্কে ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন, ধর্মীয় কারণে রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে চোরা গোপ্তা হামলা, অতর্কিত আক্রমণ, হত্যা করা, আত্মঘাতী হামলা কিংবা কোন নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে জঙ্গিবাদ বলে।[৪৫০]
ড. আমিনুল ইসলাম বলেন, কোন কিছু চাওয়া, কোন কিছু পাওয়া, কোন বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ, কোন অত্যাচার বা অনাচার প্রতিরোধ বা তার বিরুদ্ধে শক্ত ও সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহন এই সকল তথাকথিত সুন্দর সুন্দর উদ্দেশ্য ও শ্লোগানকে সামনে রেখে যে অনৈতিক রীতি-নীতি পৃথিবী ব্যাপী এক বিধ্বংশীরূপ ধারণ করেছে এটিকেই বর্তমানে জঙ্গিবাদ হিসেবে আখ্যা দেয়া হচ্ছে।[৪৫১]
ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন, জঙ্গিবাদ শব্দটি কোনরূপ ভাষাগত ভিত্তি ছাড়াই ইসলামের নামে সহিংসতা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ মূল ভাষাগত অর্থে ইসলামের নামে, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, অন্য কোন মতবাদ, আদর্শ বা অধিকারের নামে উগ্রতার আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষকে জঙ্গি বলা চলে এবং তার মতামতকে জঙ্গিবাদ বলা চলে।[৪৫২]

পারিভাষিক পরিচিতির বিশ্লেষণ

চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ উল্লিখিত সংজ্ঞায় কর্মের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। শক্তি, ক্ষমতা বা সহিংসতার ব্যবহার যদি বেআইনী হয় তবে তা সন্ত্রাস বলে গণ্য হবে। আর যদি তা আইন-সম্মত হয় তবে তা সন্ত্রাস বলে গণ্য হবে না। এখানে সমস্যা আইন ও বে-আইনী নির্ণয় নিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ ইরাকে রাজনৈতিক পরিবর্তন, স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি আনয়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে শক্তি ও সহিংসতা ব্যবহার করেছে। এ

---

৪৪৭ . *Encyclopaedia Britannica*, Ibid

৪৪৮ . *মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, ১৬শ বৈঠক, মক্কা, ২১/১০/১৪২২-২৬/১০/১৪২২ হি.

৪৪৯ . আল কুরআন, ২৮ : ৭৭

৪৫০ . ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ*, মোশাররফ হোসেন খান সম্পাদিত, সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন ২০০৯, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ২১২

৪৫১ . ড. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৫

৪৫২ . ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ*, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ১০

ব্যবহারকে তারা আইনসম্মত ও তাদের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব বলে মনে করছেন। কাজেই তারা একে সন্ত্রাস বলে মানতে রাজি নন, যদিও বিশ্বের অনেক মানুষই একে সন্ত্রাস বলেই মনে করছেন। পক্ষান্তরে ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া ও লিবিয়ায় প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ বিদেশী দখলদারিত্ব মুক্ত হতে মার্কিন সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে শক্তি ও সহিংসতা ব্যবহার করছেন এবং আফগানিস্থানে তালিবানগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে আফগান সরকারের সেনাবাহিনী, কর্মকর্তা ও বিদেশী সৈন্যদের বিরুদ্ধে শক্তি ও সহিংসতা ব্যবহার করছেন। আবার ফিলিস্তিনিরা বর্বর ইসরাঈলী বাহিনীর বিরুদ্ধে, কাশ্মীরীরা ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। তাদের এ কর্মকে আইনসঙ্গত দায়িত্ব বলে মনে করেন, পক্ষান্তরে অন্যরা একে সন্ত্রাস বলে গণ্য করছেন। আবার ফিলিস্তিনে অসহায়, নিরস্ত্র মানুষদের ওপর ইসরায়েলী বর্বরতাকে সন্ত্রাস মনে করছেন না। কেননা ইসরায়েলীরা আত্মরক্ষার্থে এমনটা করছে। এভাবে দেখা যে, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা কঠিন এবং এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ প্রায় অসম্ভব। এ জন্য অন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী কর্মের ওপর নির্ভর না করে আক্রান্তের ওপর নির্ভর করে সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের ভাষায় : "terrorism is premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets: রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অযোদ্ধা লক্ষের বিরুদ্ধে সহিংসতা সন্ত্রাস।”

মার্কিন সরকার এ সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন বলে এনসাইক্লোপীডিয়া অব ব্রিটানিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ সংজ্ঞার দ্বারা সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী চিহ্নিত করাও বিতর্কিত হতে বাধ্য। নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী যুবকগণ যখন সশস্ত্র ইসরাঈলী সৈন্যদের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেন অথবা ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধাগণ যখন সশস্ত্র ইসরাঈলীয় সৈন্যদেরকে আক্রমণ করেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য বিশ্ব তাকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করে। অথচ অযোদ্ধা নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী শিশু ও নারীপুরুষদের প্রতি ইসরায়েলী সৈন্যদের গুলি ছোড়া, বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি কর্মকে তারা সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন না। বরং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক অধিকার বলে দাবি করেন।

ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধা নিরস্ত্র অযোদ্ধা মানুষদের হত্যা করলে তাকে সকলেই সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন। কিন্তু মার্কিন বাহিনী ফালুজা, বসরা, হেরাত, বোগদাদ এবং অন্যান্য স্থানে অযোদ্ধা নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যা করলে তাকে সন্ত্রাস বলে কখনোই স্বীকার করা হয় না। যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। সর্বোপরি, যুগে যুগে সকল স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলন সহ বিভিন্ন জাতি, দল বা রাষ্ট্র এরূপ সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করেছেন। এর বিপরীতে স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করা স্বৈরাচার, দখলদার বা সাম্রাজ্যবাদীদের চিরাচরিত নিয়ম।

এজন্য বলা হয়: "One man's terrorist is another man's freedom fighter". দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ প্রতিপক্ষের সামরিক ও বেসামরিকদের মাঝে ত্রাস বা শঙ্কা সৃষ্টি করতে প্রস্তুত থাকে। সন্ত্রাস ও যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য হলো- সাধারণ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই যোদ্ধারা মুলত যোদ্ধা বা যুদ্ধ বিষয়ক লক্ষবস্তুতে আঘাত করতে প্রস্তুত থাকে এবং সামরিক জয়ই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে সামরিক বিজয় উদ্দেশ্য থাকে না। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যই হলো সামরিক ও বেসামরিক নির্বিচারে বা নির্মমভাবে সকল লক্ষবস্তুতে হামলা করে ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা। "Terrorism proper is thus the systematic use of violence to generate fear, and thereby to achieve political goals, when direct military victory is not possible. This has led some social scientists to refer to guerrilla warfare as the 'weapon of the weak' and terrorism as the 'weapon of the weakest'."
তাই সন্ত্রাস হলো যেখানে সামরিক বিজয় সম্ভবপর নয় সেখানে রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহিংস ও নিষ্ঠুর আচরণের দ্বারা ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা।[৪৫৩]

ইসলামে চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ

---

[৪৫৩] . Encyclopaedia Britannica, CD Version, 2005, Article: Terrorism.

ইসলামের শত্রুদের মাঝে ভয়-ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করা, প্রয়োজনে কুরআনী আইনের আলোকে সশস্ত্র জিহাদ বা যুদ্ধ করাকে ইসলামী শরীয়তে প্রশংসিত নীতি কর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ইসলামী যোদ্ধা বা মুজাহিদদেরকে সার্বক্ষণিক সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কুরআন নির্দেশিত এ নীতি কর্মকে ইসলাম সন্ত্রাস ও চরমপন্থা বলে আখ্যায়িত করেনি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

'তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জাননা, কিন্তু আল্লাহ্ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না।'[৪৫৪] তবে কোন মুসলিম দল বা সম্প্রদায় যদি কোন অমুসলিম তথা জিম্মিদের উপর হামলা করে বা ভয়-ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করে তাহলে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাকে চরমপন্থা বা সন্ত্রাস বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামে তাদের কঠিন শাস্তির ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া হবে। এটাতো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।"[৪৫৫]

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কোনো কাজ করার পূর্বে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যহীন কাজ কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। তাই একটি দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টির পিছনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, যারা সরাসরি সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মকা-ের সাথে জড়িয়ে হত্যা, খুন ও বোমা হামলা ও আত্মঘাতী হামলা চালায়, তারা নিজেরাও জানে না কি উদ্দেশ্যে এ কাজটি করছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের নেতৃত্বে থাকে, তাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু কোথাও কোন বড় ধরণের বোমাবাজি বা সন্ত্রাসী বা জঙ্গি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে জঙ্গিগোষ্ঠী বিবৃতি দিয়ে এটি তারা করেছে বলে গণমাধ্যমগুলোতে ফলাও করে প্রচার করে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানান দেয়। আর যে নিরীহ বোমাবাজরা ধরা পড়ে তারা বিবৃতি শোনার পরেই কেবল জানতে পারে তারা কাদের হয়ে এ কাজটি সংঘটিত করেছে। নিম্মে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল–

আতংক তৈরী

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রে আতংক তৈরী করা। মানুষ ঘর থেকে বের হলেই তাদের মনে এ ভয় কাজ করে যে কখন, কোথায় বোমা হামলা বা আত্মঘাতী বোমা হামলার শিকার হয়ে যায়। কেননা জঙ্গিরা হাট, ঘাট, বাজার, সমাবেশ এমনকি সপিংমলগুলোতে হঠাৎ বোমা ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। তাই সার্বক্ষনিক মানুষের মনে এক অজানা আতংক বিরাজ করে। ফলে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করে। ফলে মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি

---

[৪৫৪]. আল-কুরআন, ৮ : ৬০

[৪৫৫]. আল-কুরআন, ৫ : ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

একটি দেশে যখন কোন সন্ত্রাসী বা জঙ্গিগোষ্ঠী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, তখন সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। সবদিকে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করে। অশান্ত পরিবেশে কেউ বাড়ির বাইরে যেতে চায় না। নিজেকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। যেখানে নিজের জীবনের নিরাপত্তা নেই, সেখানে জীবিকার তাগিদে বাহিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এমনতাবস্থায় মানুষের জীবনে স্বস্তি থাকে না। এক অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়।

অরাজকতা তৈরী

সমাজ ও রাষ্ট্রে যখন সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলা হয়, তখন মানুষ নিজের জীবন নিয়ে শংকিত হয়ে পড়ে। ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সহায়-সম্পদ সব কিছুই ঝুকির মধ্যে পড়ে যায়। তখন একটা অরাজকতার পরিবেশ তৈরী হয়। কেউ কাউকে নিয়ে ভাবনার সময় নেই। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে কোন মানামানি থাকে না। আর সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডাকাতি শুরু করে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে সমাজের অন্যান্য দুষ্ট লোকেরাও যে যেভাবে পারে অন্যের সম্পদ লণ্ঠন করে নিয়ে যায়।

পার্থিব সম্পদ অর্জন

সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব সম্পদ অর্জন। যে সমস্ত লোকেরা এ সব জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িত তারা অনেকটা অভাবী ও হতদরিদ্র ঘরের মানুষ। অভাবই যাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। কখনো সুখের ছোঁয়া পায়নি। ইয়াহুদি ও খৃষ্টান চক্রের খপ্পরে পড়ে টাকা-পয়সা পেয়েছে। তাদের প্ররোচনায় এ জগতে প্রবেশ করে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তারা সন্ত্রাসী বা বোমা হামলা সুযোগে মানুষের অর্থ-সম্পদ, মূল্যবান জিনিস-পত্র ছিনিয়ে নিয়ে রাতারাতি অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকে।

ক্ষমতা দখল

ক্ষমতার দ্বন্ধ সারা পৃথিবী জুড়েই আছে। আর ক্ষমতাবানরা সব সময় চায় তাদের ক্ষমতা তাদের হাতে অটুট থাকুক। তাই বিশ্বক্ষমতাবানরা তাদের মতাদর্শের বিরোধী কাউকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না। এমনটাই যদি হয় তাহলে তারা তাদের মতাদর্শের লোকদেরকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করে থাকে। আর এ সামরিক বাহিনী ও সে দেশীয় লোকদেরকে বিভিন্ন অস্ত্র-সস্ত্র ও অন্যান্য সহযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে তাদের মতাদর্শের সরকার ক্ষমতায় বসানো হয়। লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা, অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ, রক্ষিত সম্পদ ও খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনপদকে ধ্বংশস্তূপে পরিণত করা হয়।

আধিপত্য বিস্তার

একটি দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যায় তখন উন্নত বিশ্বের ক্ষমতাবানরা তথা মার্কিনিরা তা মেনে নিতে পারে না। তারা চায় দেশটি সব সময় গরীব থাকুক। তাদের কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে থাকুক। তাদের সাহায্য পেলেই তারা পথ চলবে। যখনই কোনো দেশ স্বাবলম্বী বা উন্নয়নশীল হওয়ার চেষ্টা করে তখনই তারা তা মেনে নিতে পারে না। তাই তারা সে দেশের অগ্রগতি থামানোর জন্য অস্ত্র, অর্থ সম্পদ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি তৈরী করে। আর এ প্রশিক্ষিত জঙ্গিবাহিনী দিয়ে সারাদেশে জঙ্গি হামলার উৎসবে মেতে উঠে। তখন সরকার বাধ্য হয়ে নিজের ক্ষমতা টিকানোর জন্য আধিপত্যবাদীদের দ্বারস্থ হতে হয়। ফলে সে দেশে তাদের এক ছেটিয়া আধিপত্য বিস্তার লাভ করে।

শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা

প-িমারা একটা কাজে সফলতা লাভ করেছে যে, অনুন্নত দেশে তাদের এমন কিছু লোক প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করেছে যে, তারা তাদের নির্দেশ মোতাবেক সব কিছুই করবে। তাদেরকে পবিত্র কুরআনের জিহাদ সম্পর্কিত কিছু খন্ডিত আয়াতের ভূল ব্যাখ্যা শিখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের সাথে

তোমরা লড়াই কর, যতদিন ফিতনা নি-হ্নি হয়ে না যায় এবং একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত না হয়।"[৪৫৬] এ আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, ইসলামি আইন ছাড়া সকল আইনই বাতিল এবং ফিতনা। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। তাদেরকে আরো শিখানো হয়েছে যে, এ পৃথিবী আল্লাহর, তাই আইন চলবে আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, " আইন চলবে একমাত্র আল্লাহর।"[৪৫৭] তাই দুনিয়ার বুকে তাঁরই বিধান অনুসারে আইন-কানুন প্রবর্তন করে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। কারো খেয়াল খুশী অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা যাবে না। তাদেরকে আরো বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন বিধি-বিধান চলবে না। একমাত্র আল্লাহর আইন চালু থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী তাদের বিচার কর, তোমাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর না।"[৪৫৮]
ইসলামী আইন পরিপন্থী আইন প্রয়োগকারীকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ সে ব্যক্তি কাফিরদের অর্ন্তভূক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিচার করে না, তারাই কাফির।"[৪৫৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিভিন্ন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, জিহাদ করে মরে গেরে সে শহীদ এবং সে সাথে সাথে জান্নাতে চলে যায়। এভাবে তাদের ভুল তথ্য দিয়ে ব্রেন ওয়াশ করা হয়। ফলে তারা ভাল-মন্দ বুঝার মতো ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই তারা অতি আবেগী হয়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন

ইয়াহুদি ও খৃষ্টানরা সারা পৃথিবীতে তাদের এজেণ্ডা ও মিশন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও তারা তাদের মিশন পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এ দেশের মানুষ অত্যধিক ধর্মপ্রিয়। তাই তারা এ দেশের গরীব, অসহায়, অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষত ও সাধারণ শিক্ষিতদের বিভিন্ন ধরণের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের আয়ত্বে নিয়ে যায়। তাদেরকে অর্থ-সম্পদ, বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সমাজে অশান্তি ছড়ায়। এক পর্যায়ে তারা তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য তাদেরকে জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে। আর তারা না জেনে-শুনে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন

প্রত্যেকটি দেশে কিছু না কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে। সে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি নজর পড়ে বিশ্বশক্তিধরদের। তারা কুটকৌশলে সে দেশের এ মুল্যবান সম্পদ আহরণের জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করে থাকে। তারই অংশ হিসেবে সৃষ্টি করা সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ। জঙ্গিবাদের অজুহাতে সে রাষ্ট্রটিকে জঙ্গিরাষ্ট্র
হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর এ জঙ্গিবাদ দমনের নামে সামরিক অভিযান পরিচালনার আড়ালে প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করা হয়। কেননা তখন সাধারণ মানুষ তাদের জীবন নিয়েই ব্যস্ত থাকে, দেশের সম্পদ নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ নেই। আর সরকারও তার গদি হারানোর ভয়ে নিজের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে পারে না।

দেশে বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টি

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দেশে বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা। শিল্পোন্নত দেশগুলো এ দেশে তাদের একছেটিয়া বাজার সৃষ্টির জন্য জঙ্গিবাদকে প্রধান অবলম্বন বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশীয় শিল্পগুলোকে ধ্বংশ করে দেয়। আস্তে আস্তে দেশীয় কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। ফলে বিদেশীদের ওপর নির্ভরতা অনেকাংশে বেড়ে যায় এবং দেশে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হয়।

---

[৪৫৬]. আল-কুরআন, ২ : ১৯৩
[৪৫৭]. আল-কুরআন, ৬ : ৫৭
[৪৫৮]. আল-কুরআন, ৫ : ৪৯
[৪৫৯]. আল-কুরআন, ৫: ৪৪

চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রকারভেদ

মানব সমাজে নানাভাবে চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ হচ্ছে। এ সবের ধরণ ও প্রকৃতি ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ব্যক্তিতান্ত্রিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় সন্ত্রাসের ঘটনা বিশ্বব্যাপী। অন্যত্র সন্ত্রাসের ঘটনা ধর্মীয় কারণে চাপা পড়ে যায়।[৪৬০] ধর্মকে অবলম্বন করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উদ্ভব হলেও ধর্ম ছাড়াজাতিগত, বর্ণগত, রাজনৈতিক, আদর্শিখ, ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রভৃতি কারণেও সন্ত্রাসবাদের আর্বিভাব ঘটে।[৪৬১] ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ নামক গ্রন্থে চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণত সন্ত্রাসকে তিনভাগে ভাগ করা হয়-

১) Revolutionary Terrorism (বৈপ্লবিক সন্ত্রাস)

২) Subrevolutionary Terrorism (বিপ্লবোত্তর সন্ত্রাস)

৩) Establishment Terrorism(প্রতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস)

১) Revolutionary Terrorism (বৈপ্লবিক সন্ত্রাস) : এর অর্থ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে সেখানে অন্য একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইটালীর রেড ব্রিগেড, জার্মানীর রেড আর্মি, বাস্ক বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ (ইটিএ), পেরুর শাইনিং পাথ ইত্যাদি অগণিত উদাহরণ রয়েছে এ জাতীয় সন্ত্রাসী কর্মকা-ের।

২) Subrevolutionary Terrorism (বিপ্লবোত্তর সন্ত্রাস) : রাজনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিলুপ্তি না ঘটিয়ে সহিংসতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমাসীনদের সরিয়ে আংশিক পরিবর্তনের জন্য যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা

করা হয় তাকে বিপ্লবোত্তর সন্ত্রাস বলা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও আয়ারল্যান্ডের আই. আর. এ. এর কর্মকাণ্ড কে এ পর্যায়ে ফেলা যায়।

৩) Establishment terrorism (প্রতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস) : রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বা রাষ্ট্র পরিচালিত সন্ত্রাসকে প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস বা (state or state-sponsored terrorism) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলা হয়। অনেক সময় সরকার বা সরকারের কোনো সংস্থা তারই নাগরিকদের, অথবা সরকারের মধ্যকার কিছু মানুষদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য দেশের সরকার বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। শীতল যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমর্থক দেশগুলি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করেছে। অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এঙ্গোলার (UNITA) বিদ্রোহীদের সমর্থন ও তাদের সাথে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেঅংশগ্রহণসহ সারা বিশ্বে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেঅংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করেছে এবং করছে। সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত রোহিঙ্গা মুসলিম নিধনও এ জাতীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ।[৪৬২] ধর্মকে অবলম্বন করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উদ্ভব হলেও ধর্ম ছাড়াও জাতিগত, বর্ণগত, রাজনৈতিক, আদর্শিক, ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রভৃতি কারণে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবা দের উদ্ভব ঘটছে। এ সব সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়-

১. **ব্যক্তিগত সন্ত্রাস (PersonalTerrorism)** জীবন বা অঙ্গহানির ভয় দেখিয়ে অর্থ-সম্পদ আহরণ কিংবা জিঘাংসা চরিতার্থকরণকে ব্যক্তিগত সন্ত্রাস বলে।

২. **জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাস (Nationalist Terrorism)**
আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম, যদি তার সাথে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়।

৩. **রাজনৈতিক সন্ত্রাস (Political Terrorism)**
ভয় বা আতঙ্কিত করে দেশ বা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াস বা পদ্ধতি।

১. **ধর্মীয় সন্ত্রাস (Religious Terrorism)**

---

[৪৬০] . এম সাখাওয়াত হোসেন, *আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা আফগানিস্তান হতে আমিরিকা,* ঢাকা : পরক পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ১৫

[৪৬১] . এ কে এম শাহনেওয়াজ, *বাংলাদেশে মৌলবাদ: ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও সমকাল,* তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও রাজনীতি, ঢাকা: উত্তরণ প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১৭৭

[৪৬২] . ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩-১৪

২. ইসলাম ধর্মকে পুঁজি করে অনেক গোষ্ঠী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে লিপ্ত হয়েছে।
যেমন: আই এস, হরকাতুল জিহাদ, জেএমবি, আনসার আল ইসলাম।

৩. নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাস (Anarchist Terrorism)

আত্মহনন এবং লক্ষ্যহীন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কার্যকলাপই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ।

৪. রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস (State Sponsored Terrorism)

রাষ্ট্র কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোশকতা করা। যেমন হিটলার, মুসোলিনি, কার্লমার্ক, লেলিন ও স্টালিনের শাসনামলে রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাস পরিলক্ষিত হয়।

৫. বামপন্থী সন্ত্রাস (Leftwing Terrorism)

শ্রেণিশত্রু খতম করারপ্রত্যয়ে থেকে সন্ত্রাস। বামপন্থী গ্রুপের বা ক্রিমিনাল গ্রুপের সন্ত্রাস।

৬. ডানপন্থী সন্ত্রাস (Rightwing Terrorism)

অন্যের অধিকার হরণ ও আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে হত্যা নির্যাতন এই সন্ত্রাসের দৃষ্টান্ত।

১০.তথ্য সন্ত্রাস (Media Terrorism)

তথ্যের মাধ্যমে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয় তাই তথ্য সন্ত্রাস। মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দ্বারা ঝড়ো হাওয়া সৃষ্টি করে শত্রুকে ঘায়েল করার যে প্রক্রিয়া তারই নাম তথ্য সন্ত্রাস। যার অপর নাম মিডিয়া সন্ত্রাস। আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে তথ্য সন্ত্রাসী হলো ইহুদী গোষ্ঠী। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইসরাঈলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হলো তথ্য সন্ত্রাসের ওপর ভিত্তি করে। তথ্য সন্ত্রাস হলো সেই সন্ত্রাস, যার মাধ্যম হলো তথ্য। আর সে তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ধূম্রজার তৈরী করে বিবেককে বিভ্রান্ত করা হয়।

১০ . কম্পিউটার তথ্য সন্ত্রাস (Cyber Terrorism)

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং কম্পিউটার সংযোগ তথ্য আদান-প্রদানে ব্যাপক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সাইবার টেরোরিজম।

১১. মাদক সন্ত্রাস (Narco terrorism)

মাদক সন্ত্রাস বলতে যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে বুঝায় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবৈধ মাদক চাষ, উৎপাদন, বিপনণ এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যান্য সন্ত্রাসী গ্রুপকেও মাদক সন্ত্রাসী কর্তৃক সঠিক সহযোগিতা করতে দেখা যায়।

১. শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বা ক্যাম্পাস সন্ত্রাস[৪৬৩]

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামে সন্ত্রাসকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

ক) জাতীয় সন্ত্রাস
খ) আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাস

ক) জাতীয় সন্ত্রাস

এটি যে কোন দেশের অভ্যন্তরীন সমস্যা। এই সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত রয়েছে সমাজের উচুঁ-নীচু স্তরের বৈষম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ও অশহায়-দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের কুপ্রবৃত্তি। আর কুপ্রবৃত্তির বিজয় মানে সুকুমার বৃত্তিগুলি হারিয়ে যাওয়া। ফলে মানুষ যে কোন অমানবিক কাণ্ড ঘটাতে দ্বিধা করে না। ফলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, অপহরণ, সুদ-ঘোষ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সহ সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ড তারই পরিণতি। বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ যে বীভৎসরূপ ধারণ করেছে তার পুরেটাই এর অর্ন্তভূক্ত।

খ) আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাস

কোন শক্তিশালী দেশ নিজেদের আধিপত্য বিস্তার, কর্তত্ব প্রতিষ্ঠা, খনিজ সম্পদ আহরণ, কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য কোন দূর্বল রাষ্ট্রের ওপর সামরিক অভিযান চালিয়ে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করা। এই সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে দূর্বল দেশের মানুষ যখন তাদের জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে

[৪৬৩] . মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা,* ঢাকা: আহসান পাবরিকেশন্স, ২০০৯, পৃ. ৬৩৮-৬৩৯

অবতীর্ণ হয়, অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তখন ইয়াহুদি নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য মিডিয়া সেগুলোকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বলে অভিহিত করে।[৪৬৪]

সন্ত্রাসের নেপথ্যে আসলে কারা

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মূল হোতা ইসরাঈল, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি ও খৃষ্টান মিশনারীগণ। যারা শুরু থেকেই ইসলামের ঘোর শত্রু হিসেবে কাজ করছে। এখনো তারা তাদের মিশন অব্যাহত রেখেছে। তারা কোনো দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ চালু করতে চাইলে সে দেশের ধর্মীয় ও সাধারণ লাইনের লোকদেরকে দিয়ে খুব সহজে এ কাজটি করাতে পারে। আবার রাজনৈতিক লাইনে বিরোধীদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেও এ কাজটি করাতে পারে। তারা সে দেশীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে দেশে রাজনৈতিক প্রতি হিংসা, দমন-পীড়ন, ক্ষমতার লোভ-লালসা, হত্যা, গুম, খুন ও ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার উচ্চভিলাসী মনোভাব থেকেই জন্ম নেয় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। নীতি-নৈতিকতা, মানবতাবোধ, জ্ঞান-আদর্শ বর্জিত উপাদানই সন্ত্রাসের জনক। কিছু স্বার্থন্বেষী মহল এ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে লালন করছে। তারা চেহারায় মানুষ হলেও ভিতরটা পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে সবচেয়ে নীচদের চেয়ে নীচে নামিয়ে দিয়েছি। অবশ্য তাদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে।"[৪৬৫] আয়াতে দৈহিক কাঠামো সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও নীচদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "একে অপর থেকে বেশী (পাওয়ার চিন্তা থেকেই) তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।"[৪৬৬] সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, ক্ষমতা, আভিজাত্যতা ও সম্পদের মোহই সন্ত্রাসী ও জঙ্গি বানায়। সমাজের পাড়া-মহল্লা থেকে বিশ্ব দরবার পর্যন্ত সকলের মধ্যে একটা মোহ কাজ করে যে, সারা বিশ্ব তার করায়ত্ব থাকবে, তার আঙ্গুলের ইশারায় (মার্কিনিদের ন্যায়) সারা পৃথিবী পরিচালিত হবে। যেমনটা নমরুদ, ফেরাউন,কারুন, হামান সবাই সন্ত্রাসী ছিল তার একটাই কারণ। প্রাক ইসলামি যুগে আরবে সন্ত্রাস একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। সে সমাজে বসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা দিলেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন সানা থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত অলঙ্কারে সজ্জিতা এক সুন্দরী রমণী একা একা ভ্রমণ করতে পারবে, পথে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না।"[৪৬৭]

এ ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল। কারণ ইসলামের বিধি-বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার কারণে সেটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আজ সমাজ ইসলাম থেকে যতদূরে ততই সন্ত্রাস আমাদেরকে ঘাপটি মেরে ধরছে। যুগে যুগে সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখগণ দ্বীনের খেদমত যেমন অব্যাহত রেখেছেন, তেমনি দ্বীন থেকে বিচ্যুত, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট দুষ্টচক্র বা গোষ্ঠী সব সময় দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই ত্রুটি-বিচ্যুতি ভ্রষ্টতা সর্বপ্রথম তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদাতের মাধ্যমে এর গোড়াপত্তন হয়। তারপর হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর দ্বন্দ্ব এবং ইয়াজিদ ক্ষমতা গ্রহণ থেকে শুরু করে অদ্যবধি ইসলামের বিরুদ্ধে সেই বিচ্যুতি, বিভ্রান্তি,পথভ্রষ্ট মুনাফিক চক্রের সেই জঘন্য তৎপরতা এখনও অব্যাহত আছে। তারা কখনও দ্বীনের নিয়ম পরিবর্তনের মাধ্যমে, কখনও জোর পূর্বক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে, কখনও ইসলামের বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করার মাধ্যমে, আবার কখনও উগ্র সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় শত্রু, বিদেশী চক্র ও ইহুদিদের ষড়যন্ত্র বিচ্যুত, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মানুষদের উগ্র ও সন্ত্রাসী হতে প্ররোচনা দেয়।[৪৬৮] এরূপ সন্ত্রাসী গ্রুপের মূলহোতা আইএস মূলত 'মোসাদ' ও 'সিআইএ' কর্তৃক একটি ধর্মীয় নামধারী জঙ্গি সংগঠন। বাংলাদেশের দু'টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আইএস (ইসলামিক স্টেট) ইসরাঈলের

---

[৪৬৪]. ড. ময়নুল হক, *সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ ও এর প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ*; নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত; ***প্রাগুক্ত***, প. ১৩৮

[৪৬৫]. আল কুরআন, ৯৫ : ৪-৬

[৪৬৬]. আল কুরআন, ১০২: ১-২

[৪৬৭]. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, ***সহিহুল বুখারী*** (দারু ইবন কাছির, আর-যামামা,বৈরুত, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৭ হি:/১৯৮৭ খ্রি.,খ.৬, পৃ. ১৩২২

[৪৬৮]. সামীম মুহাম্মদ আফজল, ***সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে ইসলাম***, ই.ফা.বা, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ২০১৬, পৃ. ১৯

গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' এবং আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ'- এর সৃষ্ট একটি জঙ্গি সংগঠন।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে আইএস এক আতংকের নাম। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন অংশে আইএস এর সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে। আইএস এর জঘন্য তৎপরতায় সমগ্র বিশ্বে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা। সার্বজনীন শান্তির ধর্ম ইসলামকে আজ বিতর্কিত করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। তাদের নৃশংস কর্মকাণ্ডে মুসলিম উম্মাহ সহ গোটা বিশ্ব চিন্তিত ও আতংকিত।[৪৬৯] আইএস এর সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) প্রেসিডেন্ট বক্তব্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'খলিফা বাগদাদি ইহুদি আইএস মোসাদের সৃষ্টি'[৪৭০] এবং 'কিয়ামতের মিশনে আইএস' শিরোনামে দু'টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা দু'টিতে বলা হয়েছে যে, মার্কিনপ্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও অকপটে স্বীকার করেছেন যে, 'ইরাক যুদ্ধই আইএস এর গোড়াপত্তন করেছিল।'[৪৭১]

ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর আইএস এর উত্থান ঘটে। বিশ্লেষকদের মতে, ইসরাঈলের মোসাদ এবং আমেরিকার সিআইএ-এর সহযোগিতায় আইএস এর জন্ম হয়েছে। ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেন যে, "আইএস এর উত্থানের পিছনে ইরাক যুদ্ধই মূল কারণ। আমাদের বুঝতে ভূল হয়েছিল, ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের শাসনের পতন হলে কী পরিণতি হতে পারে। এই ঘটনার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।"আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন যে, জর্জ ডব্লিউ বুশের সময় ইরাকে আমাদের আগ্রাসনের কারণেই আল-কায়দা থেকে আইএস এর উত্থান হয়েছে।[৪৭২] পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায় যে, সন্ত্রাসী সংগঠন আইএস এর শীর্ষ নেতা

খলিফা আবু বকর আল-বোগদাদী মুসলমান নন। তিনি একজন ইয়াহুদি। তার আসল নাম আকা ইলিয়ট শিমন। ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এ জঙ্গি গোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের প্রত্যেকেই মোসাদের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। মোসাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতেই আইএস জঙ্গিদের যুদ্ধ কৌশল শিখানো হয়। পত্রিকায় আরো বলা হয়, সুসংগঠিত এ জঙ্গিগোষ্ঠীটি 'ইসলামিক স্টেট নামে আত্মপ্রকাশের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের সিনিয়র সিনেটর ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ম্যাককেইনের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেছেন। গোড়ার দিকে ওই গোপন বৈঠক গুলোতে মোসাদের বেশ কয়েকজন সদস্য ও আাইএস প্রধান বাগদাদি উপস্থিত ছিলেন। সন্ত্রাসী সংগঠন আইএস র শীর্ষ নেতা খলিফা আবু বকর বাগদাদি মুসলমান নন। তিনি একজন ইহুদি। তার আসল নাম আকা ইলিয়ট শিমন। ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এ জঙ্গি গোষ্ঠীর শীর্ষস্তানীয় নেতাদের প্রত্যেকেই মোসাদের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। মোসাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতেই আইএস জঙ্গিদের যুদ্ধ কৌশল শিখানো হয়। এতে আরো বলা হয়েছে যে, লেবানন, ফিলিস্তিন, ইসরাঈল, সিরিয়া, ইরাক, তুরস্ক ও সাইপ্রাসের একাংশ নিয়ে বৃহত্তর রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখছে আইএস।[৪৭৩]

এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় যে, "আইএস- এর বার্ষিক আয় ২০ কোটি ডলার।" প্রতিবেদটিতে রাশিযার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আইএস জঙ্গিদের অর্থের যোগান ৪০টি দেশ থেকে আসছে। এর মধ্যে জি-২০ জোটের কয়েকটি দেশও রয়েছে। "ইরাক ও সিরিয়ার দখলে থাকা তেলক্ষেত্র থেকে তেল বিক্রি, অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায়, লুটতরাজ, ব্যাংক ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে বিপুল অর্থ আয় করছে তারা।"[৪৭৪] আইএস এর কার্যক্রম কুরআন- সুন্নাহর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অথচ ইসলামের নবী সকল সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ। তিনি দুনিয়ার সকলের জন্য ইসলামের বাণী নিয়ে এসেছেন। এক প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মক্কা ও তায়েফে অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে তিনি দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য ও রাসুলুল্লাহ (সা.) এর চারিত্রিক মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে

[৪৬৯]. সামীম মোহাম্মদ আফজল : ***জঙ্গিবাদের উৎস মওদুদীপন্থীদের ভ্রান্ত শিক্ষা রাজনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা,*** ইফাবা, তৃতীয় প্রকাশ (রাজস্ব),মার্চ ২০১৬, পৃ. ১১-১২

[৪৭০]. দৈনিক যুগান্তর ১৮-১১-২০১৫

[৪৭১]. বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৯-১১-২০১৫

[৪৭২]. দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৯-১১-২০১৫

[৪৭৩]. দৈনিক যুগান্তর, ১৮-১১-২০১৫

[৪৭৪]. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৮-১১-২০১৫

এসেছিলেন। স্বার্থন্বেষী মহল অপব্যাখ্যার মাধ্যমে শান্তির ধর্ম ইসলামকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক স্টেট বিশ্বব্যাপী ভয়ংকর এক জঙ্গি সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে তারা বিশ্বরাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে। তাদেরকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর দু'পরাশক্তি আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরী করেছে।[৪৭৫] মালোশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রশিদ আব্দুল মতিন তাঁর `Political Science: An Islamic Perspective' (রাষ্ট্র বিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত) শীর্ষক বইয়ে বলা হয়েছে যে,"এ পরিভাষাটি (ইসলামী রাষ্ট্র) যেমন কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি, তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময়েও প্রচলিত ছিল না।" এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে যে, '--ইসলামী রাষ্ট্র পরিভাষাটি ভাষার একটি অপপ্রয়োগ।' তিনি আরো বলেন, "রাষ্ট্রের পাশ্চাত্য মডেল মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইসলাম শুধুমাত্র ভূ-খণ্ডের অভিলাষী নয় বরং সমগ্র বিশ্বের ভূ-খণ্ডকে একমাত্র স্রষ্টার ঐশী ইচ্ছার বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে পরিণত করতে চায়। ইসলাম হচ্ছে বিশ্বজনীন, এক টুকরা ভূ-খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চায় না। একই সাথে ইসলামের বাণী কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতিসত্তার জন্য নয় বরং সমগ্র মানব সমাজের জন্য।" ১৮ জুলাই, ২০১২ মালয়েশিয়ার পেনাং ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক এভারগ্রীণ হোটেলে, পেনাং-এ আয়োজিত 'A civil State- Ideas and challenge' শীর্ষক আলোচনায় তারিক রামাদান আরো বলেন, 'ইসলামী রাষ্ট্র' গঠনের সকল স্ট্রাটেজী ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা পশিচমা দর্শন থেকে গৃহীত। কিন্তু রাষ্ট্রকে 'ইসলামিক স্টেট, মুসলিম স্টেট' ইত্যাদি নামে নামকরণ করতে হবে সে কথাটি ইসলামের কোথাও উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণের পরিবর্তে ইসলামের নামে রাষ্ট্রের নামকরণ শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে, ১৯৭৮ সালে ইরানে এবং পরবর্তীতে চাদ ও আফগানিস্তানে। ওআইসিভূক্ত বাকী ৫৩টি দেশ নিজেদেরকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' বলে অভিহিত করেনি, এমনকি সৌদি আরবও 'ইসলামিক রিপাবরিক' লিখে না। তারা লিখে কিংডম অব সৌদি এরাবিয়া। এই বিবৃতি ইসলামিক স্টেট এর ধারণা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ৬১০ সালে নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩৩৭ বছর পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানকে দিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব শুরু করে।

ইসলামিক স্টেট, মুসলিম স্টেট, ইসলামিক রিপাবলিক স্লোগান সর্বস্ব ধারণা। ইসলামিক স্টেট, মুসলিম স্টেট, ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার নামে জঙ্গিবাদী তৎপরতা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্র। এগুলোর প্রচারণা মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দ্বীনের পরিপন্থী। দ্বীনি ক্ষেত্রে প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি, ইসলামকে বিকৃত করা, ধ্বংশ করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এটা আর্ন্তজাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র।[৪৭৬] রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া সাধারণভাবে সন্ত্রাস মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য এক প্রকারের যুদ্ধ। তবে যুদ্ধের সাথে এর পার্থক্য এই যে, যুদ্ধ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের দাবিদার কর্তৃক পরিচালিত হয়, ফলে সে ক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের বৈধতা বা আইনসিদ্ধতার দাবি করা হয়। এতে সাধারণত যোদ্ধাদেরকে লক্ষবস্তু করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য হয় সামরিক বিজয়। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নয়। তবে তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। এ জন্য তারা যোদ্ধা-অযোদ্ধা সবাইকে নির্বিচারে লক্ষবস্তুতে পরিণত করে প্রচুর প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে থাকে। যেন এক পর্যায়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট সরকার ও জনগণ অভিষ্ট রাজনৈতিক পরিবর্তন করতে রাজি হয়। সাধারণভাবে যারা সম্মুখ বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের ওপর সামরিক বিজয় লাভ করতে পারবে না বলে মনে করেন তারাই এরূপ সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

তবে এরূপ সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের সাথে ইসলাম এর সম্পর্ক নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে ইসলাম কে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জনক বলে চিত্রিত করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। অথচ ইতিহাস ও বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সন্ত্রাস বলতে যা বুঝানো হয় তার শুরু হলো ইহূদী উগ্রবাদীদের দ্বারা।[৪৭৭] পক্ষান্তরে ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ দেখা গেলেও সন্ত্রাস খুবই কম দেখা যায়। ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ হয়েছে। যেমন মুসলিম রাষ্টের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম

---

৪৭৫. সামীম মোহাম্মদ আফজল : ***জঙ্গিবাদের উৎস মওদুদীপন্থীদের ভ্রান্ত শিক্ষা রাজনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা,*** ই.ফা.বা, তৃতীয় প্রকাশ (রাজস্ব),মার্চ ২০১৬, পৃ. ১৩

৪৭৬. ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১৫

৪৭৭. Encyclopaedia Britannica, Articles: Terrorism & Ideology

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম সমাজে মুসলমানদের মধ্যে, অথবা অমুসলিমদের মধ্যে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উদাহরণ খুবই কম। তবে বর্তমানে কিছু মুসলিম বিভিন্ন দেশে অযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষ হত্যা করছে বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে বলে শোনা যায়। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমাণিত নয়। সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ঘটনা আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস। বিন লাদেন বা তার বাহিনী এ হামলা করেছে বলে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্র। এ দাবির ভিত্তিতে আফগানিস্তান ও ইরাকের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র অযোদ্ধা নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এখন পর্যন্ত কোনোভাবেই বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করতে পারেনি। উপরন্তু এ অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের গুয়ান্তানামো-বে কারাগারে সকল মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বর্বর অত্যাচারের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায়ের অপচেষ্টা চালিয়েছিল। বাহ্যত তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণ ও বিচারকদের সামনে গ্রহণযোগ্য কোনো তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি।

যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়া বা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে সন্ত্রাসের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, সন্ত্রাসের উৎপত্তি ও বিকাশে মুসলমানদের কোনো অবদান নেই। আসলে সন্ত্রাসের উৎপত্তি ইহূদী যীলটদের (Zealots) হাতে। আধুনিক ইতিহাসে ভারতে, ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে অগণিত সন্ত্রাসী দল ও সন্ত্রাসী ঘটনা দেখা যায়, তাদের প্রায় সকলেই ইহূদী, খৃস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। ভারতে, আমেরিকায় বা অন্যত্র কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা হলেই প্রথমে মুসলিমদেরকে দায়ী করা হয় এবং প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করে প্রচার করা হয়। পরবর্তী তদন্তে অনেক সময় এদের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করা যায় না, অথবা প্রমাণিত হয় যে, অন্যরা তা করেছে। কিন্তু সাধারণত প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয় না। এরপরও যদি মুসলিমদের নামে কথিত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তবে তা বিশ্বের সকল সন্ত্রাসী ঘটনার একেবারে নগণ্য। ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও হত্যার বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার। এরূপ মিথ্যা প্রচারণার পাশাপাশি দেখা যায় যে, প্রকৃতই কিছু মুসলিম ইসলামের নামে, ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে বা অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে মানুষ হত্যা বা ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। যা আদৌ ইসলাম সমর্থন করে না।

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের উৎস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ, আদিপত্যবাদী মনোভাবই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের উৎস হিসেবে মনে করা হয়। কেননা মার্কিনীরা চায় এ পৃথিবীতে তাদের নেতৃত্ব ও কতৃত্ব চলবে। কোন দেশ তাদের সামনে নেতৃত্ব দেবে তা তারা মেনে নিতে পারে না। কোন দেশ যদি মাথা নাড়া দিয়ে উঠতে চায় তাহলে সে দেশকে নামমাত্র অজুহাত দিয়ে প্রথমে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ ও পরবর্তীতে সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। আর সেখান থেকে জ্বলে উঠে প্রতিশোধের আগুন। সে আগুনে আজ সারা বিশ্ব ধ্বংশ স্তুপে পরিণত হচ্ছে। আমেরিকার টুইন টাওয়ারে নাইন ইলেভেনের হামলার পর বিশ্বের অনেক কিছুই বদলে গেছে। সে দিনের টুইন টাওয়ারে বিমান হামলায় কতজন লোক নিহত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান আজ পর্যন্ত উদঘাটন হয়নি। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও জানা যায়নি। তবে অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও আরো নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দশকের পর দশক ধরে তারা নিজ দেশে নিরাপদ ও স্বস্বিতে ছিল। সারাবিশ্বে নিরাপদে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু এখন তারা বিশ্বের কোথাও নিরাপদ নয়। নিরাপত্তার জন্য বহু আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে, কোন কাজে আসেনি প্রকারান্তরে তারা নিজ দেশে বন্দি হয়ে পড়েছে। এ ধরণের একটি সন্ত্রাসী হামলার জবাবে মার্কিনীরা সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে সেটাই স্বাভাবিক। এ ধরণের ঘৃণ্য হামলা চালানোটা কোন ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। আর আমেরিকাও চাইবে, ভবিষ্যতে কেউ যেন এ ধরণের হামলা চালাতে সাহস না পায়, সে ব্যবস্থা নিশ্চিতকরা। কিন্তু অধিকাংশ মার্কিনী মনে করেন, আজ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ লালনের কারণে তারা নিজেরাই সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলার শিকার হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে নিম্মরুপ তথ্য পাওয়া যায়- The world terrorism first appeared during the French Revolution (1789-1799), Some of the Revolutionaries Who seized power in France adopted

a policy of violence against their enemies. An American groupthe ku-klux klan used violence to terrorize blacks and their sympathizers in 1865 and during 1900's. in 1930's the dictators AdloF Hitlar of Germany, Benito Mussolini of Italy and Joseph Stalin of Soviet Union used terrorism to discourage opposition to their governments. অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ প্রথমে ১৭৮৯-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিপ্লবের সময় দেখা দেয়। ঐ সময় যারা ক্ষমতা দখল করেছিল সে বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার নীতি অবলম্বন করে। একটি আমেরিকান গ্রুপ, 'কু-ক্লাক্স ক্লান' ১৮৬৫ এবং বিংশ শতাব্দীতে সহিংসতা অবলম্বন করে কালোদের এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। ১৯৩০ সালের দিকে জার্মানীতে স্বৈরশাসক হিটলার ও মুসোলিনী এবং রাশিয়ার স্টালিন সরকার বিরোধীদের নিরুৎসাহিত করার জন্য সহিংসতার প্রয়োগ করে।

অন্যত্র পাওয়া যায়, Another wave of terrorism began during the 1960's. terrorist groups that surfaed included the Red Brigades in Italy and the Red Army Faction in West Germany. Before the independence of Israel in 1948, a Jewish group used terrorto speed the end of the Britishrule in Palestine and create a Jewish homeland. Since 1960's various Palestinian groups carried out campaign of terrorism aimed at ...the establishedment of an independent Palestinian state.

The Provisional Irish Republican Army,established in 1970 used violence in fight to rid Northern Ireland of Britishrule. A Puerto rican Nationalist group called FALN Committed numerous bombings in US during 1970's. অর্থাৎ আরো একটি সন্ত্রাসবাদের ঢেউ ১৯৬০ সালের দিকে শুরু হয়। যে সকল সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলো আবির্ভাব হয় তার মধ্যে ইটালীর 'রেড বিগ্রেড' এবং জার্মানীর রেড আর্মি অন্যতম। ১৯৪৮ সালে ইসরাঈলের জন্ম লাভে সন্ত্রাসকে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য। ১৯৬০ সাল থেকে বিভিন্ন ফিলিস্তিনি গ্রুপ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র লাভের উদ্দেশ্যেই সহিংস আন্দোলন চালিয়ে আসছে। ১৯৭০ সালে গঠিত 'আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি' সহিংসতার পথ অবলম্বন করে উত্তর আয়ারল্যা‌- ব্রিটিশ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে। ১৯৭০ সালের দিকে একটি পূর্টোরিকান জাতীয়তাবাদী গ্রুপ এফএএলএন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলো বোমা বর্ষণের ঘটনা ঘটায়।[৪৭৮] অতএব, এ সকল আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মূলত পাশ্চাত্যের তৈরী। উল্লেখ্য যে, সুখ ও শান্তিময় জীবন প্রতিটি মানুষের কামনা। এই কামনা ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো কোন উন্নত দেশের নাগরিকের, তেমনি এশিয়া, আফ্রিকার মতো কোনো অনুন্নত দেশের নাগরিকেরও। দেহের রং সাদা হলে এই কামনা করতে পারবে আর কালো হলে করতে পারবে না এমনটিও কাম্য নয়। এই ক্ষেত্রে অভিজাত ও অনঅভিজাতের মধ্যেও কোনো তফাৎ নেই। সুখ-শান্তির কামনা কেবল পণ্ডিত ব্যক্তিরাই করবে মূর্খরা করতে পারবে না তেমনটিও নয়। এই ব্যাপারে লিঙ্গ, জাতি ও বয়সের বৈষম্য নেই। এই কামনা ইয়াহুদী-খৃষ্টান হলে কৃষিজীবীদের জন্য নয় এরূপ চিন্তা করারও সুযোগ নেই। রাজা, বাদশাহ ও শাসকরাই কেবল সুখের জীবন ভোগ করবে আর প্রজা ও সাধারণ মানুষ পারবে না এমন কথা কোথাও নেই। সুখ-শান্তির জীবন মানুষের মৌলিক ও জন্মগত অধিকার। যেই ব্যক্তি মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করবে সে এ অধিকার প্রাপ্য হবেন। কিন্তু সকল মানুষ এ অধিকার সমভাবে ভোগ করতে পারে না।

কেননা এর পেছনে রয়েছে অনেক কারণ। ধন-সম্পদ, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ধর্ম-বর্ণ, ভাষা-সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, এবং নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাবে সৃষ্টি হয় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, বৈষম্য, শোষণ, নির্যাতন, বঞ্চনা, গঞ্চনা ইত্যাদি। আর এসব বাড়তে বাড়তে সীমা অতিক্রম করে ফেলে তখন দেখা দেয় অসন্তোষ, সন্দেহ, সংশয়,অবিশ্বাস ও প্রতিশোধের স্পৃহা। ইহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে জন্ম নেয় উগ্রতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ।[৪৭৯] অসন্তোষের আগুন একবার জ্বলে উঠলে সহজে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বোপরি সারাবিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে। তখন সারা বিশ্বে দেখা

---

[৪৭৮] . Dictionary, The world Book Encyclopedia, 1989 edition, P. 178

[৪৭৯] . সংক্ষিপ্ত বিবরণ, *মাসিক অগ্রপথিক*, প্রকাশনা বিভাগ, ই.ফা.বা, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ৩৩

দেয় মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। আর এক পর্যায় গিয়ে তৈরী হয় আত্মঘাতী সন্ত্রাসী ও জঙ্গি। ফলে সুখ-শান্তি ও স্বস্তি কারো ভাগ্যে জুটে না। আত্মঘাতী আক্রমণের ভয়ে তটস্থ থাকতে হয় ক্ষমতাবানদের। বিস্ফোরক ও মারণাস্ত্রের সহজ লভ্যতা এ কাজটিকে আরো সহজ করে দিয়েছে। স্যাটেলাইট, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তি, গণমাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি মানুষের আবাসস্থল বিরাট এ পৃথিবীটাকে ছোট করে একবারে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি মানুষের দখলে আসার আগে মানুষ কোথায় কি হচ্ছে জানত না। অসন্তোষ, মনোমালিন্য, কলহ, ঝগড়া-বিবাদ মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শোষণ, নির্যাতন, ধর্ম ও বর্ণ বৈষম্য, জাত-অভিজাত এ সবই ছিল স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে। পৃথিবী যতই ছোট হচ্ছে এসব সমস্যার বিস্তার ততই বাড়ছে। কোনো কিছু ঘটলে ক্ষনিকের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। পৃথিবীর পশ্চিমাংশে অবস্থিত কোনো নিভৃত স্থানে জাপানী হওয়ার কারণে অথবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে বা বিদ্যা-বুদ্ধি কম হওয়ার কারণে বা কোনো ক্ষুদ্র জাপানী নাগরিক হওয়ার কারণে কোনো আমেরিকান দ্বারা লাঞ্ছিত বা নিগৃহীত হয় তাহলে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মূহুর্তের মধ্যে জাপানিদের কাছে পৌঁছে যাবে। এতে প্রথমে জাপানিদের মধ্যে অসন্তোষ তারপর প্রতিশোধের স্পৃহা জাগরিত হয়। আর এ প্রতিশোধের স্পৃহা থেকে তৈরী হয় আমেরিকানদের ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণ। সৃষ্টি হবে দু'দেশের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয়। বিভক্ত হয়ে পড়বে গোটা পৃথিবী। এক অংশ সমর্থন দেবে জাপানকে আর অপর অংশ আমেরিকাককে। এভাবে আমেরিকার কোনো এক নিভৃত পল্লীর ছোট একটা ঘটনা থেকে সমগ্র পৃথিবী জ্বলে উঠবে অশান্তির আগুনে। বাস্তবতা ও ইতিহাসের সাক্ষী এরূপই। সাম্প্রতিক বিশ্বের ঘটনা প্রবাহের দিকে লক্ষ্য করলে বেরিয়ে আসবে পৃথিবী ব্যাপী আজ যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছে তার পেছনে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দু'টি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ ও এ নিয়ে বিশ্বে মার্কিনীদের এক চোখা নীতি। সুতরাং বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কর্মকাণ্ড চলছে, তার পেছনে রয়েছে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা। কিছু স্বার্থন্বেষী মহলের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসী ও জনগণের স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে। যারা সমাজ ও রাষ্ট্র হাতের মুঠোয় রাখতে চায় আর আভিজাত্যের বিস্তারের জন্য সর্বদা ব্যস্ত, যাদের মধ্যে আল্লাহ ভীতি ও ইসলামী জ্ঞানের অভাব রয়েছে, তারাই মূলত সন্ত্রাসী ও জঙ্গি লালন এবং জনবিধ্বংশী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে।[৪৮০]

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সূত্রপাত ও বিস্তার

মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে জ্বিন জাতি বসবাস করত। কিন্তু তারা পৃথিবীতে সীমাহীন বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, বিপর্যয় ও সংঘাত সৃষ্টি করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কঠোর শাস্তি দিয়ে তদস্তলে মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদের নিকট মানব সৃষ্টির ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তখন ফেরেশতারা অশান্তি, বিপর্যয় ও সংঘাত সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করেছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে আমাদের রব, আপনি পৃথিবীতে এমন একটি জাতি সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তারাক্তি করবে।"[৪৮১] এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন,"নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"[৪৮২] মানব সৃষ্টির পরপরই সংঘাত শুরু হয় শয়তানের সাথে। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী ফরমান জারি করলেন, এই শয়তানই হবে তোমাদের চিরশত্রু।

আর জেনে রেখো তোমাদের পথ দু'টি, একটি হল "সিরাতাল মুস্তাকীম' এবং আপরটি হলো 'সাবিলে তাগূত' বা শয়তানের পথ। মূলত এ দু'টি পথ ধরেই পৃথিবীতে সংঘাতের সৃষ্টি। যুগে যুগে শয়তান প্রদর্শিত পথের অনুসারীরা পৃথিবীতে সংঘাত সৃষ্টি করেছে। মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.) যখন বেহেশতে অবস্থান করছিলেন তার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু প্রধানত শয়তানের প্রলোভনে তারা আল্লাহর বাণী ভুলে

---

[৪৮০]. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫

[৪৮১]. আল-কুরআন, ২ : ৩০

[৪৮২]. আল-কুরআন, ২ : ৩০

গিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, 'ইহবিত' অর্থাৎ আদম ও হাওয়া এবং শয়তান সকলেই পৃথিবীতে নেমে যাও। পৃথিবীতে শুধু হল পরস্পরের দ্বন্দ্ব। তাগূত বা শয়তানের দলে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তি হল হযরত আদম (আ.) এর সন্তান কাবিল। এই কাবিল অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে সর্বপ্রথম তার সহোদর ভাইকে খুন করেছিল।[৪৮৩]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি তাদেরকে আদমের দুই ছেলের সত্য কাহিনী শুনিয়ে দাও। তারা দু'জন যখন কোরবানী দিল, তখন তাদের একজনের কাছ থেকে তা গৃহীত হলো। কিন্তু অন্য জনের কাছ থেকে গৃহীত হলো না। সে (কাবিল) বলল ? আমি তোমাকে হত্যা করবো। সে (হাবিল) বললো : আল্লাহতো শুধু সংযতদের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াও। তবে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিতে হাত বাড়াবো না মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই, তুমি আমার পাপ ও তোমার পাপের দায় ঘাড়ে নাও, অতঃপর দোজখবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হও। ওটাই হত্যাকারীদের কর্মফল। অতপর তাঁর প্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করলো। তাই সে তাকে হত্যা করলো ও ক্ষতিগ্রস্থ হলো।"[৪৮৪] দ্বিতীয় আদম নামে খ্যাত হযরত নূহ (আ.) এর পুত্র কেনান পিতার আদেশ অমান্য করে আল্লাহদ্রোহী হয়েছিল। হযরত নূহ (আ.) এর জামানায় তাগূতী শক্তির এতই প্রাধান্য পেয়েছিল যে, তিনি তাদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وقَالَ نُوحٍ رَبّ لَا تذرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّارًا . إِنّكَ إِنْ تذرْهُمْ يُضِلّوا عِبَادَكَ ولَا يَلِدُوا إِلّا فَاجِرًا كَفّارًا.

"নুহ (আ.) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী কাফের।"[৪৮৫] হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও মূসা (আ.) এর সময় নমরুদ ও ফিরাউনের ইতিহাস সাক্ষ দেয়, যে তারা ছিল স্বৈরাচারী ও ভয়ানক সন্ত্রাসী। পৃথিবীর মানুষকে তারা জিম্মি করে ফেলেছিল। তাগূতী শক্তির তাগূত আর তাদের বিপরীতে আল্লাহর মনোনীত নবী রাসূলদের জিহাদ হযরত আদম (আ.) থেকে সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত চলেছে এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত চলবে।[৪৮৬] মানব সভ্যতার ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা মানব সভ্যতার ইতিহাসের ন্যায় একই রকম দীর্ঘ। এ দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গ্রীক ঐতিহাসিক জেনোফোন খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১-৩৫০ এ শত্রুদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর কথা বলেছেন এবং তিনি তার নিজের উপর মানসিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার কথাও করেছেন। প্রথম শতাব্দীতে রোমের রাজা তহবিল আত্মসাৎ করলে তিনি তার বিরোধিতাকারীদেরকে দমন করার নিমিত্তে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন। যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে তিনি সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন করছিলেন।[৪৮৭]

প্রাচীন যুগ থেকে ইহূদী উগ্রবাদী ধার্মিকগণ 'ধর্মীয় আদর্শ ও ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মানব ইতিহাসে প্রাচীন যুগের প্রথম প্রসিদ্ধ সন্ত্রাসী কর্ম ছিল উগ্রপন্থী ইহুদী যীলটদের (Zealots) সন্ত্রাস। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে রোমান সম্রাজ্যের অধীনে বসবাসরত উগ্রবাদী এ সকল ইহুদীরা নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপোসহীন ছিল। যে সকল ইহূদী রোমান রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করত বা সহাবস্থানের চিন্তা করত তারা তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করত। এজন্য তারা সিকারী (the sicarii: dagger men) বা ছুরি-মানব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তারা প্রয়োজনে আত্মহত্যা করত কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে ধরা দিত না। তাদের হত্যাকান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণ ও

---

৪৮৩. মাওলানা কাজী আবু হুরায়রা, *বিশ্ব সংঘাত নিরসনে মহানবী (সা.) এর আদর্শ.* নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***সন্ত্রাস প্রতিরোধ ইসলাম*** (ঢাকা: ই.ফা.বা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৯), পৃ. ১৫৫

৪৮৪. আল-কুরআন, ৫ : ২৭- ৩০

৪৮৫. আল-কুরআন, ৭১: ২৫-২৬

৪৮৬. ম্ওলানা কাজী আবূ হোরায়রা, বিশ্ব সংঘাত নিরসনে মহানবী (সা.) এর আদর্শ, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১৫৬

৪৮৭. মুহাম্মদ আবদুল আজিজ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৬৬

প্রশাসনকে ভীতসন্ত্রস্ত করা। এজন্য তাদের টার্গেটকে প্রকাশ্য দিবালোকে বাজার, উপাসনালয়, উৎসবকেন্দ্র বা অনুরূপ জনসমাবেশের মধ্যে আক্রমণ করে হত্যা করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ সকল হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করা এবং রোমান প্রশাসন ও তাদের দালালদেরকে তাদের কর্মকান্ডের সংবাদ জানানোর ব্যবস্থা করা।[৪৮৮]

মধ্যযুগে খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা দেখা যায়। বিশেষত ধর্মীয় সংস্কার, পাল্টা-সংস্কার (the Reformation and the CounterReformation)-এর যুগে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে অগণিত যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধ বহির্ভুত সন্ত্রাসের অনেক ঘটনা দেখা যায়।[৪৮৯] সন্ত্রাস শব্দটা প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হয়েছিল ১৭৯০ এর দশকে ফরাসি বিপ্লবের সময়। আর ১৭৯০ এর দশকে এডমন্ড বার্ক নামে ব্রিটিশ কূটনীতিক এই শব্দটা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন সে সময়ে ফ্রান্সের জ্যাকোবিন সরকারকে। ১৭৯৩ এবং ১৭৯৪ সালকে বলা হয়ে থাকে সন্ত্রাসের সময়কাল। ম্যাক্সমিলিয়ান রোবস্পিয়ার ছিলেন এ সরকারের প্রধান। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ৩ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলেন, গিলেটিনে চড়িয়েছিলেন। ইতিহাস বলে রোবস্পিয়ার তখন ৫ লক্ষাধিক মানুষকে আটক করে ৪০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। ২ লক্ষাধিক মানুষের হয়েছিল নির্বাসন। আরো ২ লক্ষাধিক মানুষ জেলখানায় অনাহার, অর্ধাহার ও অত্যাচারে মারা গিয়েছিল। তাহলে বুঝা যায় সন্ত্রাস শব্দটা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ফরাসি সময় বিপ্লবীদেরকে বোঝানোর জন্য।[৪৯০] অষ্টাদশ শতাব্দীতে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের মূল অনুপ্রেরণা ছিল ধর্ম। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সন্ত্রাসবাদে অনেক বেশি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ দেখা দেয়। ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন অ্যানর্কিস্টদের (Anarchist) সন্ত্রাসবাদ কর্মকাণ্ড লিপ্ত হতে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনফুসীয় অনুসারীগণ তাদের সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্য সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদের অংশ হিসেবে তারা তাদের দেশের অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হত্যাও করেছিল।[৪৯১] রাশিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সেখানে সন্ত্রাবসাদী কর্মকাণ্ড একটি বড় ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮০ সালে নিহিলিস্ট মতবাদ ও নিহিলিস্টদের কার্যকলাপের ফলে রুশ সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছিল ও নিহিলিস্ট বিপ্লবীদের হাতে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছিল (১৮৮১)। নিহিলিস্টরা ছিলেন উগ্র। তবে তাঁরা শিক্ষিত ছিলেন। একটি আদর্শকে সামনে রেখে তারা বিপ্লবী তৎপরতা শুরু করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এই আন্দোলন সন্ত্রাসবাদে রূপান্তরিত হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।[৪৯২]

১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিকদের মিছিলের মধ্যে একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল যেখানে ১২ জন নিরীহ মানুষ, ৭জন পুলিশ এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তা (নাম ডি জেন) মারা গিয়েছিল। এ কাজটা মুসলমানরা করেনি যারা করেছিল তারা নৈরাজ্যবাদী ৮ জন অমুসলিম। আর বিংশ শতাব্দীর হামলাগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ১৯০১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলি তাকে লিওন নামে এক নৈরাজ্যবাদী দুবার গুলি করে হত্যা করেছিল এবং সে ছিল অমুসলিম। ১৯১০ সালের ১ অক্টোবর লস এঞ্জেলসে টাইম নিউজ পেপার (বিল্ডিং) ভবনে একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। এখানে ২১ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। এর জন্য যারা দায়ী তারা ছিল জেমস ও জোসেফ নামে দুই খ্রিস্টান। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন সারায়েভোতে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের আর্কডিউক ফ্রানজ, ফার্ডিন্যান্ড এবং তার স্ত্রী নিহত হয়েছিলেন। এখান থেকেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । এর জন্য যারা দায়ী ছিল তারা ইয়ং বসনিয়া নামে একটি দল যাদের অধিকাংশ ছিল সার্বিয়ান অমুসলিম।

---

৪৮৮. Encyclopaedia Britannica, Aricel: Terrorism & Aricel: Zealot, Microsoft Encarta, 2007, 1993-2006, Terrorism

৪৮৯. Encyclopaedia Britannica, Aricel: Terrorism & Ideology

৪৯০. ডা. জাকির নায়েক, সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২-২৩

৪৯১. মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ সম্পাদিত, *সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম* (ঢাকা: বি.আই.আই.টি. ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৬৭

৪৯২. তারেক শামসুর রহমান, *নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২য় সংস্করণ, ২০০৮), পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৫ সালের ১৬ এপ্রিল বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার সেইন্ট ন্যাডেলিয়া চার্চে ১৫০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল, আহত হয়েছিল ৫০০ জনেরও বেশি। এটা ছিল বুলগেরিয়ার মাটিতে তখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী আক্রমণ। আর এ কাজটা করেছিল বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৩৪ সালের ৯ অক্টোবর যুগোস্লাভিয়ার রাজা প্রথম আলেকজান্ডারকে ভ্লাদা জার্জিফ নামে এক অমুসলিম বন্দুকধারী হত্যা করে। বিশ্বের প্রথম যে বিমানটি হাইজ্যাক করা হয় সেটা ওরটিজ নামে এক অমুসলিম ব্যক্তি করেছিল। সে বিমানটি ছিনতাই করে কিউবাবায় নিয়ে যায় এবং সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়।[৪৯৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) বিজয়ী শক্তির দ্বারা একটি বড় দুষ্ট চক্র সৃষ্ট হয়। এ যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর কাছে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয়। এরপরও পরাজিত শক্তি ইহুদীবাদকে সমর্থন করে এবং উপনিবেশবাদ থেকে কখনও ফিরে আসেনি। এর ফলে আলজেরিয়ার ওপর ফ্যান্সের আগ্রাসন ও পালেস্টাইনের উপর ইসরাইলী আগ্রাসনে অনেক গেরিলার জন্ম হয়।[৪৯৪]

১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ জাপানীকে নিমিষের মধ্যে হত্যা করে। এটাও চরম সন্ত্রাস।[৪৯৫] ১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই কিং ডেভিড হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। মেনাফেম বেগেন এর নেতৃত্বে ইরগুন কর্তৃক এ বিস্ফোরণটা ঘটে। যেখানে ৯১ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। তার মধ্যে ২৮ জন ব্রিটিশ, ৪১ জন আরব, ১৭ জন ইহুদি এবং অন্য আরো ৫ জন। এই ইরগুন গ্রুপ আরবদের ন্যায় পোশাক পরিধান করেছিল, যাতে লোকজন মনে করে আরবরাই এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আর এটা ছিল ব্রিটিশ ম্যানডেটের বিরুদ্ধে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আক্রমণ। সেই সময়টাতে মেনাফেম বেগানকে ব্রিটিশ সরকার এক নম্বর সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করেছিল। কিন্তু দেখা গেল পরবর্তী কয়েক বছর পর তিনিই হলেন ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী এবং আরো কিছুদিন পর তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। যে মানুষটা খুনি, যে মানুষটা খুন করেছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে সে-ই ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী হয়, কিছুদিন পর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায়। আর তখন ইরগুন, হ্যাগানা, স্টার্নগ্যাং এসব সন্ত্রাসী দলও তাদের নেতারা যেমন আইজ্যাক রবিন, মেনাফেম বেগান, এরিয়েল শ্যারন তারা সবাই পরবর্তীতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী অথবা উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা হয়েছিলেন এবং তারা সবাই যুদ্ধ করে ছিল ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য।

যদি পৃথিবীর মানচিত্র দেখা হয়, তাহলে ১৯৪৫ সালের আগে ইসরাঈল নামে কোনো দেশ ছিল না। এ ইহুদি দলগুলো, খোদ ব্রিটিশরা যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে ডাকত তারা একটা ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য লড়েছিল। পরে তারা শক্তি দিয়ে ইসরাঈল দখল করে প্যালেস্টাইনদের তাড়িয়ে দেয়। এখন এ লোকগুলোই প্যালেস্টাইনের লোকদেরকে বলছে সন্ত্রাসী। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টানীদের আবাসভূমি দখল করে ইংগ-মার্কিন গোষ্ঠী অভিশপ্ত যাযাবর ইহুদীদের জন্য ইসরাঈল-রাষ্ট্র গঠন করে। তখন হতে ইসরাঈল আরবদের মধ্যে শত্রুতা-লড়াই চলে আসছে। ইহুদীদের সার্বিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এই বিশ্বমোড়ল আমেরিকা। বহুবার জাতিসংঘে আরব প্যালেস্টাইনীদের বিরুদ্ধে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়েছে। এখনও অন্যায়ভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলী দস্যু-দানবকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এই ৮ বছরের মধ্যে ২৫৯ টি সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে শুধু ইহুদি সন্ত্রাসীরা।

তাদের অনেক দল ছিল যেমন ঃ ইরগুন, স্টার্নগ্যাং, হ্যাগানা ইত্যাদি। ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র তার গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এর মাধ্যমে সিরিয়ার নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে। ১৯৫৩ সালে ইরানের মোসাদ্দেক সরকার উৎখাত করে স্বৈরাচারী একনায়ক রেজাশাহ্ পাহলভিকে ক্ষমতায় বসায় আমেরিকা। সিরিয়া অভিযোগ করে যে, ১৯৫৪ সালে ইসরাঈল একটি সিরীয় বিমান গুলি করে ভূপাতিত করার মাধ্যমে সন্ত্রাস শুরু করে।১৯৬৩ সালে ইরাকের কমিউনিষ্টদের হত্যা করার জন্য বাথ-পার্টিকে দিক নির্দেশনা দিয়ে একটি

[৪৯৩]. ডা. জাকির নায়েক, *সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?* হাফেজ মোঃ সাইদুর রহমান ও মোঃ সফিউল্লাহ্ সফি অনূদিত (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, ২য় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.) পৃ. ২৩, ২৪

[৪৯৪]. ড. আব্দুর মুগনী, ইসলাম ও সন্ত্রাস, নূরুল ইসলাম সরকার অনূদিত, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ সম্পাদিত, *সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম* (ঢাকা: বি.আই.আই.টি, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫৭

[৪৯৫]. কে. এম. এ. হোসাইন, *ইসলাম কি ও কেন?* (ঢাকা: ধর্মীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ইসলাম প্রচার মিশন, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১১

হত্যা তালিকা প্রদান করে, যা আমেরিকার নির্দেশে বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে সেই বাথ পার্টিতেই সাদ্দাম হোসাইনকে পার্টি প্রধান করা হয়। আবার সেই সাদ্দাম হোসেনই আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম শত্রু। সন্ত্রাসী আক্রমণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৬৮ সালের ২৮ আগষ্ট গুয়াতেমালার রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছিল একজন অমুসলিম। ১৯৬৯ সালে জাপানের রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছিল একজন জাপানি অমুসলিম।[৪৯৬] একই বছর ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতকে অপহরণ করেছিল তাও একজন অমুসলিম। ১৯৬৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জার্মানিতে অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ইটালির রেগব্রিগেড তারাও অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। এমনকি ১৯৭৮ সালে তারা ইটালির প্রধানমন্ত্রী অ্যালডো মোর কে অপহরণ করে ৫৫ দিন পর তাকে হত্যা করে। জাপানেও এ রকম সন্ত্রাসী চক্র দল আছে। যেমন: দ্যা জাপানিজ রেড আর্মি, ওম শিরিফি ও বৌদ্ধ কান্ট প্রভৃতি। তারা একবার নার্ভ গ্যাস দিয়ে টোকিও পাতাল রেলে হাজার হাজার মানুষকে মারতে চেয়েছিল; কিন্তু ভাগ্য ভাল, তারা খুব একটা সফল হতে পারেনি। সেখানে মারা গিয়েছিল মাত্র ১২ জন। তবে নার্ভ গ্যাসের কারণে ৫ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষ এ ঘটনায় আহত হয়েছিল। এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল তারা সবাই ছিল বৌদ্ধ। ইংল্যান্ডে ১০০ বছরেরও বেশি সময় আই.আর. এস (আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি) বিভিন্ন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে খোদ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তারা সবাই ক্যাথলিক, তবে তাদেরকে ক্যাথলিক সন্ত্রাসী বলা হয় না, যদিও তারা অনেক সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। শুধু ১৯৭২ সালেই ৩টা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় যার প্রথমটাতে ৭ জন, দ্বিতীয়টাতে ১১ জন এবং তৃতীয়টাতে মারা যায় ৯ জন। ১৯৭৪ সালে গিলফোর্ড বারে তারা আরো দুটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। যেখানে ৫ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে আর আহত হয়েছে ৪৪ জন। বার্মিংহাম বারে একই ঘটনায় ২১ জন নিহত ও ১৮২ জন আহত হয়।

১৯৭৮-৮৯ সালে ইরানে একনায়ক স্বৈরচার রেজা-শাহ পাহলভিকে উৎখাত করে ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী সরকার গঠন করা হয়। তখন হতেই ইমাম খোমেনীকে দমনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য বহুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ১৯৮০-৮৮ তে ইরাক-ইরান যুদ্ধ আমেরিকা বাধিয়ে দেয়, উদ্দেশ্য ইরানের ইসলামী সরকার উৎখাত, দুই ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে অস্ত্রবিক্রি করা ও মুসলিম শক্তি দুর্বল করা। পারস্য সাগরে অবস্থানকারী মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ হতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরানী যাত্রীবাহী বিমানের ২৯০ জন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়। ১৯৮১-৮৬ সময়ে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীকে হত্যার জন্য সমুদ্রে সামরিক মহড়ারত বিমান হতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে গাদ্দাফীর পালিত কন্যাসহ অসংখ্য বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়। ১৯৮০ সালে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে হাজার হাজার কুর্দিকে হত্যা করা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। আজ সেই যুক্তরাষ্ট্রই পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর অভিযোগে সাদ্দামকে উৎখাত করে। ১৯৮১ সালে ইসরাঈলকে দিয়ে ইরাকের পারমাণবিক চুল্লি ধ্বংস করানো হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ফ্রান্স আর স্পেনে সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম ইটিএ। তারা এ পর্যন্ত ৩৬টি আক্রমণ চালিয়ে। আফ্রিকায়ও অনেক সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। তার মধ্যে একটা প্রধান কুখ্যাত দল হলো 'লর্ডস সালভেশন আর্মি'। এটা একটা খ্রিস্টান সন্ত্রাসী সংগঠন। তারা বাচ্চাদেরকেও সন্ত্রাসী আক্রমণের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আর শ্রীলংকার এলটিটিই, তামিল টাইগারস (বর্তমানে বিলুপ্ত) তারাও পৃথিবীর সবচেয়ে কুখ্যাত, সবচেয়ে হিংস্র সন্ত্রাসী সংগঠন ছিল। তাদের সদস্যরা আত্মঘাতী বোমার ব্যাপারেও যথেষ্ট দক্ষ ছিল। এমনকি তারা বাচ্চাদের (রেড ডেভিল)- কে কাজে লাগায়, প্রশিক্ষণ দেয়; আত্মঘাতী হামলা চালায়। সাধারণভাবে ফিলিস্তিনি ও ইরাকি আত্মঘাতী হামলাকারীর কথা শুনা যায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ দেয় যারা আত্মঘাতী হামলাকে জনপ্রিয় করেছে তা হলো এলটিটিই বা তামিল টাইগারস। তারা হিন্দু কিন্তু ভারতের সাংবাদিকরা তাদেরকে হিন্দু সন্ত্রাসী বলত না; বলত এলটিটিই। ভারতে বেশির ভাগ সন্ত্রাসী আক্রমণের ক্ষেত্রে বলা হয় কাশ্মীরি বিদ্রোহের কথা। শিখ সন্ত্রাসীদের বিন্দ্রানওয়ালা গ্রুপের কথা সকলের জানা। ভারতের সরকার ১৯৮৪ সালের ৫ জুন পাঞ্জাবে শিখদের স্বর্ণ মন্দিরে আক্রমণ করে এবং

[৪৯৬]. ডা. জাকির নায়েক, সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য? *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪

দখল করে। সেখানে ১০০ জন মানুষ মারা যায়। প্রতিশোধ হিসেবে কয়েক মাস পর ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করে তার একজন নিরাপত্তা রক্ষী, যে ছিল শিখ। কেউ যদি অমুসলিম কর্তৃক উদ্ভাবিত দক্ষিণ এশিয়া সন্ত্রাসবাদের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে, তাহলে সেখানে সন্ত্রাসী আক্রমণের তালিকা দেখা যাবে। সন্ত্রাসী আক্রমণে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বা অবদান খুবই কম। তবে মিডিয়া বা গণমাধ্যম এটা যথার্থরূপে প্রকাশ করে না। ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রদেশের ত্রিপুরায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। যেমন : এটিটিএফ (অল ত্রিপুরা টাইগারফোর্স), এনএলএফটি (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অভ ত্রিপুরা) প্রভৃতি এরা অনেক হিন্দু হত্যা করেছে। ২০০৪ সালের ২ অক্টোবর ৪৪ জন হিন্দু মারা যায় এবং তাদের আক্রমণে অনেকে আহত হয়।

আসামে আছে 'উলফা' তারা একাই ১৯৯০-২০০৬ পর্যন্ত গত ১৬ বছর সময়ের মধ্যে ইন্ডিয়ার মাটিতে ৭৪৯টি আক্রমণ চালিয়েছে। ৭৪৯ টি নিশ্চিতসন্ত্রাসী আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও খবরের কাগজে শুধু কাশ্মীরিদের আক্রমণই প্রকাশিত হয়েছে। আসামে বহু সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। উলফাদের ট্রেনিং দেয়া হয় শুধু মুসলমানদেরকে হত্যা করার জন্য। এ দেশের অন্য একটি সন্ত্রাসী দল নকশালপন্থী ও মাওবাদী। মাওবাদিরা কমিউনিস্ট। আর ভারতে কমিউনিস্টদের যতগুলো আক্রমণ হয়েছে বেশিরভাগই করেছে মাওয়িটরা। শুধু নেপালেই গত সাত বছরে তারা ৯৯টি সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। আর ভারতে ৬০০টি জেলার মধ্যে (ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী) প্রায় ১৫০টি জেলার মাওয়িটরা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সন্ত্রাসী ঘটনার এক-তৃতীয়াংশ সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ পর্যন্ত যত গুলো আক্রমণ করেছে, কাশ্মীরের সাথে তুলনা করলে কোনো তুলনাই করা যাবে না। তারা ভারত সরকারের জন্য অনেক বড় হুমকি।[৪৯৭]

১৯৯০-৯১ সময়ে ইরাককে দিয়ে কুয়েত আক্রমণ করায়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ৩৩টি দেশের জোট গঠন করে একযোগে ইরাকের ওপর আক্রমণ করে লক্ষ লক্ষ টন বোমা ফেলে শিশু-নারী-বৃদ্ধসহ হাজার হাজার নিরীহ লোককে হত্যা করে। ইরাকের ওপর অন্যায় অবরোধ করে প্রায় ৩ লক্ষ শিশুকে হত্যা করে। তাদেরই পোষ্য সরকার প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাথেকে উৎখাত করে। ১৯৯৮ সালে সুদানে কথিত রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর অভিযোগে সুদানী ঔষধ কারখানায় ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করে কারখানাটি ধ্বংস করা হয়। ১৯৯২-৯৩ সালে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় হাজার হাজার মুসলিম মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘর বাড়ী ছাড়া করে হত্যা করা হয়। কারণ, তারা মুসলমান। ইউরোপের মাটিতে যাতে কোন মুসলিম-রাষ্ট্র গঠন করতে না পারে, সে জন্য এ নির্যাতন। এ সবই পরাশক্তি মার্কিনিদের কারসাজি। ৫০ বছর পূর্ব হতে কাশ্মীরের জনগণ স্বাধীনতা চাইছে, জাতিসংঘে এই বিষয়ে প্রস্তাব পাশ হলেও গণভোটের কোন ব্যবস্থা নেই। হাজার হাজার কাশ্মীরী প্রতিদিন নির্যাতিত, নিগৃহীত হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের দ্বারা। কারণ, কাশ্মীরীরা মুসলমান। কিন্তু পূর্বতিমুর খ্রিস্টান অধ্যুষিত বলে বিশ্ব-মোড়ল আমেরিকার প্রেমের টানে তিন দিনের মধ্যে জাতিসংঘ গণভোটের ব্যবস্থা করে পূর্বতিমুরকে স্বাধীন করে দেয়। কারণ, তারা মুসলমান নয়, খ্রিস্টান।[৪৯৮]

১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল হয়েছিল ওকলাহোমা বোম্বিং। সেখানে বোমা ভর্তি একটা ট্রাক ওকলাহোমার ফেডারেল ভবনে আঘাত করে। মারা যায় ১৬৬ জন নিরীহ মানুষ, আহত হয় আরো কয়েকশো। প্রথম দিকে পত্রিকায় লেখা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র । কিন্তু কিছুদিন পর জানা গেল কাজটা করেছিল টিমোথি ও টেরি নামে ডানপন্থী দলের সমর্থক দুই খ্রিস্টান। তারা বোমার বিস্ফোরণের জন্য দায়ী কিন্তু মিডিয়া মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করে। ১৯৯৬ সালে তারা লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় যেখানে ২জন নিহত ও ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়। এরপর তারা বোমা ফাটায় ম্যানচেস্টার শপিং সেন্টারে, যেখানে আহত হয় ২০৬ জন। ১৯৯৮ সালে ক্যামব্রিজে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানে একটা গাড়িতে ৫০০ পাউন্ড ওজনের একটা বোমা ছিল, এ ঘটনায় আহত হয় ৩৫ জন। সেই একই বছর ৫০০ পাউন্ড

[৪৯৭]. ডা. জাকির নায়েক, সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য? *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬
[৪৯৮]. কে. এম. এ. হোসাইন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১২, ১১৩

ওজনের আরেকটি বোমা একটি গাড়িতে বিস্ফোরিত হয়, যেখানে ২৯ জন নিহত ও ৩৩০ জন আহত হয়েছিল। আর এ রেকর্ড বিবিসি, সিএনএন, অ্যামনেস্টির মতো অমুসলিম মিডিয়া সূত্রে প্রাপ্ত। তবে অনেক সময় সংখ্যাটা কখনো কম-বেশি হয়ে থাকে। বিভিন্ন মাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। যেমন একটা প্রতিবেদনে জানা যায় যে, মারা গেছে ২৯৬ জন। আবার অন্য এক তথ্যে ২৯৩ জন। তাই বলা যায় ২৯০ জনের বেশি। ২০০১ সালে আইআরএ বিবিসি-তে বোমা ফাটাল কিন্তু আইআরকে কখনোই ক্যাথলিক সন্ত্রাসী' বলা হয় না। আজকে ইংল্যান্ড সরকার খুব বেশি ভয় পাচ্ছে মুসলমান সন্ত্রাসীদের। এমনকি ২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনের বোমা বিস্ফোরণের কোনো নিশ্চিতপ্রমাণ নেই, তা সত্ত্বেও সন্দেহ করা হচ্ছে মুসলমানরা এটা ঘটিয়েছে। সেখানে ৫০ জনের বেশি মারা গেছেন। যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া হয় মুসলমানরাই এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তারপরেও এটা আইআরএ- এর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তুলনায় একেবারে নগণ্য। তারা হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছে। তারপরেও ইংল্যান্ড সরকার মুসলমানদেরকে ভয় পায়। আইআরএ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে আছে; কিন্তু ১০০ বছরের পুরাতন আইআরএ যেন কোন সমস্যাই নয়।"[৪৯৯]

২০০১-এর সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ঘটে গেল এক প্রকার প্রলয়ংকরী দুর্ঘটনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবলু বুশ তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এর জন্য দায়ী করেন আল-কায়দাকে। তারপর দেখা গেল মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে প্রচার চালানো হল- এ দুর্ঘটনায় নায়ক হচ্ছে মুসলিম সন্ত্রাসীরা। তাদের দাবি মতো যদি মেনে নেয়া হয় এই ঘটনার হোতা আল-কায়দা। আর এর জন্যই সারাবিশ্বে মুসলিম সন্ত্রাসী বলে প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে, ইহুদি, খ্রিস্টান, ক্যাথলিক, তামিলরা যখন এর চেয়ে অধিক ভয়ংকর সন্ত্রাসী হালমা চালিয়ে গোটা বিশ্বে অশান্তির সৃষ্টি করল তখন ইহুদি, খ্রিস্টান, ক্যাথলিক, মাও, তামিল সন্ত্রাসবাদী বলে কেন প্রচারাভিযান চালানো হল না? যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দুর্ঘটনা ঘটল তখন জর্জ বুশ আল-কায়দার ওপর সম্পূর্ণ দোষ চাপিয়ে শান্তির দোহাই দিয়ে আফগানিস্তানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলেন তার হিংস্র মানবতাসম্পন্ন সেনাবাহিনী দিয়ে। বিশ্ববাসী তার এমন গর্হিত কাজ দেখল এবং অনেক তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ ও নিন্দা জানালো।[৫০০] ২০০২ সালে ভারতের গুজরাটে কাপালিক হিন্দুরা পরিকল্পিতভাবে ট্রেনে নিজেরাই আগুন লাগিয়ে মুসলমানদের উপর দোষ চাপিয়ে প্রায় ৮০০০ নর-নারী শিশুকে দিনের বেলা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। জাতিসংঘ বা বিশ্বমোড়লরা (মার্কিনিরা) কোন টু-শব্দটি করেনি। কারণ, নিহত ব্যক্তিরা মানুষ নয়, মুসলমান। স্বাধীন দেশ পানামারপ্রেসিডেন্ট নরিয়েগাকে জলদস্যুর মত ধরে নিয়ে কারাগারে গিনিপিগের মত আবদ্ধ করে রাখা হয়।[৫০১]

২০০৮ সালের মুম্বাই জঙ্গি হামলা যা সাধারণত ২৬ নভেম্বর বা ২৬/১১ নামে পরিচিত। গণমাধ্যমের বরাদ দিয়ে জানা যায়, পাকিস্তান থেকে জলপথে অনুপ্রবেশকারী কয়েকজন ইসলাম জঙ্গি কর্তৃক ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক শহর মুম্বাইয়ে ১০টিরও বেশি ধারাবাহিক গুলি চালনা ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা এটি। এ হামলাটি ২৬ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত একযোগে চালানো হয়। মুহূর্তেই মুম্বাইয়ের ব্যস্ততা পরিণত হয় ত্রাসে। প্রাণ হারান ১৬৬ জন নিরীহ মানুষ।[৫০২] সন্ত্রাস কোনো ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। সন্ত্রাসীরা কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী কারণ সব ধর্মের সন্ত্রাসী আছে। খ্রিস্টান, ক্যাথলিক, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ এভাবে বিভিন্ন ধর্মের সন্ত্রাসী আছে। তবে বেশির ভাগ ধর্মই নিরীহ মানুষকে হত্যা করাকে সর্বদা নিন্দা করে। যদি জরিপ করে দেখা যায়, এক নম্বরে পৃথিবীর যে লোকটা সবচেয়ে বেশি নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে, তিনি হলেন হিটলার। গ্যাস চেম্বারে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছে, আর পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত মানুষ মারা গেছে প্রায় ৬ কোটি মানুষ। সে কি মুসলমান ছিল? সে একজন খ্রিস্টান। জোসেফ স্ট্যালিন ২ কোটি মানুষকে হত্যা করেছিল এবং তার নির্দেশে প্রায় ১ কোটি ৪৫

---

[৪৯৯]. ডা. জাকির নায়েক, সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য? *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

[৫০০]. আফতাব চৌধুরী, ***সন্ত্রাস: মুসলমানদের উপর অযৌক্তিক দোষারোপ***, দৈনিক ইনকিলাব, ১লা আগস্ট, ২০১১ খ্রি. পৃ. ১১

[৫০১]. কে. এম. এ. হোসাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

[৫০২]. হাসানুর রহমান, *ভয়াবহ যত সন্ত্রাসী হামলা*, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২১শে আগস্ট, ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৩০, ৩১

লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছিল। চায়নার মাও সে তুং দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ হত্যা করেছে। এদের কেউই মুসলমান নয় সবাই অমুসলিম। ইতিহাস সাক্ষ দেয় মুসোলীনি শুধু ইটালিতেই প্রায় ৪ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। যার নামে ফরাসি বিপ্লবের নামকরণ করা হয়েছে সেই ম্যাক্সমিলিয়ান রোবসপিয়ার তার অত্যাচারে ও নির্যাতনে মারা গেছে ২ লক্ষের বেশি মানুষ। অশোক শুধু কলিঙ্গের একটা যুদ্ধেই হত্যা করেছিল এক লক্ষেরও বেশি মানুষ। এখন প্রশ্ন হলো সে কি মুসলমান ছিল? না সে তো ছিল হিন্দু। ইসলাম ধর্মেও বেশ কিছু কুলাঙ্গার আছে। যেমন সাদ্দাম হোসেন, সে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল, কিন্তু শুধু ইরাকের ওপর আমেরিকা জাতিসংঘ ও জর্জ বুশের একটা নিষেধাজ্ঞার কারণে শুধু ইরাকেই একটি আঘাতে মারা গেছে ৫০ হাজার শিশু। ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তো প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। তবে হিটলারের তুলনায় বা আঙ্কেল জো, জোসেফ স্টালিন, ও মাওসেতুং-এর তুলনায় এটা কিছু না এবং এদের প্রত্যেকের কাছেই মুসলমানদের সব হত্যাকা- একেবারে নগণ্য। কেননা তারা সবাই তাদের ধর্ম মেনে চলতো। আসলে তারা কেউই ধার্মিক বা তাদের নিজ নিজ ধর্মের প্রকৃত অনুসারী ছিল না। যদি তাই হতো তাহলে তারা কখনোই এভাবে মানুষ হত্যা করতে পারতো না। তারপরও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় মুসলমানদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে। তাদেরকে মৌলবাদী, চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী ইত্যাদি বলা হচ্ছে।[৫০৩]

সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের কারণ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ শান্তি শুধু মুসলিমের জন্য নয়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য এবং সব সৃষ্টিজগতের জন্য। রাসূল (সা.) কেবল মাত্র মুসলিম জাতির জন্য পেরিত হননি বরং সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.

"হে মানব জাতি আমি (মুহাম্মদ) তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।"[৫০৪] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"[৫০৫] অতএব, মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ ও নীতি পৃথিবীর যেই অনুসরণ করবে, সে কল্যাণ লাভ করবে। রাসূল (সা.) একটি বিড়ালকে অভু3 বেঁধে রাখার জন্য তিরস্কার জানিয়েছেন অথচ তাঁর উম্মত মানুষ হত্যা করতে পারে, এটি কল্পনা করা যায় না। অথচ মনুষ্যত্বহীন মানুষেরা কোন প্রকার অন্যায় ছাড়া হাজার হাজার মানুষ হত্যা করছে, যাদেরকে হত্যা করছে তারা জানে না যে, কি অপরাধে তাদের হত্যা করা হল। সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ তথা সন্ত্রাস একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। শান্তি ও কল্যাণের একমাত্র ধর্ম ইসলামে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। বরং এটি বিকৃতিমনা মানুষের উদ্ভাবিত গুটিকতক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করে তাদেরকে ধবংস করার উদ্দেশে একটি চরমপন্থা বা সংক্রমক। বাংলাদেশ সহ গোটা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ এখন আতঙ্কের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। ব্যি3গত সন্ত্রাস, গোষ্ঠিগত সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এক কথায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদ গ্রাস করে নিচ্ছে। বর্তমানে মুসলিম নামধারী ইসলামের নামে যারা উগ্র সন্ত্রাসী কাজ করছে, তারা দ্বীন ইসলামের কোন উপকার তো করছেনেই না, বরং প্রচ- ক্ষতি করছেন। তাদের এহেন কর্মকান্ডে দ্বীন-ইসলামের সহীহ দাওয়াত ও তাবলীগই আজ হুমকীর সম্মুখীন। প্রকৃতপক্ষে এরা মুসলিম জাতির জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনছেন।

সহিংসতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ একটি আর্ন্তজাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়াও সাধারণভাবে সন্ত্রাস মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এক প্রকারের যুদ্ধ বা হাতিয়ার। তবে যুদ্ধের সাথে এর মূল পার্থক্য হলো, যুদ্ধ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের দাবিদার কর্তৃক পরিচালিত হয়, ফলে সে ক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের বৈধতা বা আইনসিদ্ধতার দাবি করা হয়। এতে সাধারণত যোদ্ধাদেরকে লক্ষবস্তু করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য হয় সামরিক বিজয়। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসী বা জঙ্গিগোষ্ঠী কোন ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্রক্ষমতার

---

[৫০৩]. ডা. জাকির নায়েক, সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য? *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩০, ৩১

[৫০৪]. আল কুরআন, ৭: ১৫৮

[৫০৫]. আল কুরআন, ২১: ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী নয়। তবে তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। এ জন্য তারা সামরিক ও বেসামরিক সবাইকে নির্বিচারে লক্ষবস্তুতে পরিণত করে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করতে থাকে। যেন এক পর্যায়ে ভীত হয়ে সংশ্লিষ্ট সরকার ও জনগণ অভিষ্ট রাজনৈতিক পরিবর্তন করতে রাজি হয়। সাধারণভাবে যারা সম্মুখ বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের ওপর সামরিক বিজয় লাভ করতে পারবে না বলে মনে করেন, তারাই এরূপ সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের আশ্রয় নেন। এরূপ সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামের বিন্দু পরিমাণ সম্পর্ক নেই। বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ইসলাম কে সন্ত্রাসের জনক বলে চিত্রিত করা হচ্ছে। অথচ ইতিহাস ও বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

মূলত ইসলামের নামে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও হত্যা এর বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ এক প্রকার অপরাধ হলেও এর উৎস কিন্তু একটি নয় বরং একাধিক।[৫০৬] নানা কারণে ও অবস্থাভেদে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্ম ও বিস্তার লাভ করে।[৫০৭] আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্যমতে বিশ্বের সকল জঙ্গিদের একটি বিষয় মিল রয়েছে: সবাই ধর্মীয় মতাদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত দর্শনের সন্ধান পাচ্ছে না বলেই তাদের মধ্যে জঙ্গিবাদের মনোভাব তৈরি হয়েছে।'[৫০৮] এরূপ মিথ্যা প্রচারণার পাশাপাশি দেখা যায় যে, প্রকৃতই কিছু মুসলিম ইসলামের নামে, ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে বা অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে হত্যা বা ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো সুশৃঙ্খল সমাজে জঙ্গিবাদের উত্থান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। তাই মানবতার প্রতিরক্ষায় সন্ত্রাস নামক এই সর্বনাশা ব্যাধির প্রতিকার সাধন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে একটি পবিত্র ও অপরিহার্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে প্রধান করণীয় হচ্ছে: সন্ত্রাসের কারণগুলো সনা৩ করা। আর্থ-সামাজিক জীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে আলাপ-আলাচনার মাধ্যমে আমার দৃষ্টিতে যে সব বিষয় সহিংসতা, ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদের মত সন্ত্রাস প্ররোচক কার্যকারণ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব

ইসলাম প্রত্যেক মানুষের বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়েছে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় অনুচ্ছেদ ১৮-এর মধ্যে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে " ।[৫০৯] কিন্তু দুঃখের বিষয় হলোঃ আপন ধর্মের প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ থাকলেও ধর্মজ্ঞান, ধর্মের পুর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও অনুশাসনগুলো জানার আগ্রহ নেই অধিকাংশ মানুষের। এ কারণেই ধর্ম বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতাই সহিংসতা, হত্যাসহ বিভিন্ন অপকর্ম করতে তারা দ্বিধা করেনা। না জেনে, না বুঝে তারা অনেকে ধর্মের নামে অধর্মের অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠায় মেতে ওঠে; কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু, বৃদ্ধ ও নারীসহ নিরীহ নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করেনা। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ইসলাম (আল-কুরআন,আল-হাদীস) শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞানার্জন ব্যতীত ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" ।[৫১০] রাসূল (সা.) বলেছেন, "জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারীর) উপর ফরজ।"[৫১১] ইসলামের নাম দিয়ে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা খুবই অল্প শিক্ষিত এবং কুরআন ও হাদিসের সঠিক জ্ঞান, আকিদা, চিন্তাদর্শন ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ধর্মের নামে যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মকা-ের সাথে যুক্ত হয় তারা কুরআনের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আয়াত

[৫০৬]. ড. মোঃ ময়নুল হক, সন্ত্রাস, সন্ত্রাবাদ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ; নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে ইসলাম*** (ঢাকা: ইফাবা.,৩য় সংস্করণ; ২০০৯), পৃ. ১৩৫

[৫০৭]. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ***ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা,*** ঢাকা; আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৯, পৃ. ৬৩৬

[৫০৮]. মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার, ***সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা*** (ঢাকা: ইফাবা, ৫৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৮) পৃ. ১১২

[৫০৯]. আবুল ফজল হক, ***আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিল,*** (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্কর, ১৯৭৭ খৃ.) পৃ. ৩২৬

[৫১০]. আল-কুরআন, ৯৬ : ১

[৫১১]. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাযাহ* (বৈরূত: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা.বি) খ. ১, পৃ. ৮১

বা আয়াতের অংশ ও কয়েকটি হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার শিকার। প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞান তাদের নেই। তারা কেবল আন্দাজের তথা ভ্রান্ত ধারনার ওপর ভিত্তি করে সরল বিশ্বাসে প্ররোচনাকারীদের সমর্থন করেন। ধর্ম অজ্ঞতার কারণে সন্ত্রাসের মূল ব্যক্তিগণ স্বল্প শিক্ষিত লোকের মাধ্যমে সহিংসতা, সন্ত্রাস, হত্যাসহ আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে নিরাপরাধ মানুষের হত্যা করে থাকে। নিজেকে হত্যার মাধ্যমে জান্নাত লাভের আশা করে, যেটা ইসলামের সাথে এ ধরণের কোন সম্পর্ক নেই। এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা।[৫১২] এসব প্ররোচনাকারীরা তাদেরকে আসল উদ্দেশ্য বুঝতে দেয় না। তাদেরকে সহজে বেহেশত পাওয়ার লোভ দেখিয়ে ইসলামের নামে জীবন বিলিয়ে দেয়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। তাদেরকে বুঝানো হয় যে, এ দুনিয়ার জীবন কিছুই না বরং পরকালের অনন্ত জীবনই মুমিনের পরম পাওয়া। তখন এসব কোমলমতি লোকেরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পথ বেঁছে নেন। তারা মনে করেন যে, রাষ্ট্রে যে সমস্ত লোকেরা দায়িত্বশীল, তারা সঠিক ইসলামে নেই। তাই তাদেরকে বোমা মেরে হত্যা করতে পারলে তারা সফল হবে। আর যদি তারা সরকারী বাহিনী বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে বা তাদেরকে হত্যা করা হয়, তাহলেও তারা অনায়াসে জান্নাতে যেতে পারবে। সন্ত্রাসের মূল হোতারা সেগুলোকেই তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। বল প্রয়োগ করে কোন লোক বা সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণ করানো যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি উপদেশ দিতে থাক; তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের উপর কর্মনিয়ন্ত্রক নও।[৫১৩]

বর্ণবাদ বা আভিজাত্যের গৌরব

মানুষ যখন বর্ণ নিয়ে গর্ববোধ করে বা বংশের আভিজাত্য নিয়ে বিভোর হয়ে ওঠে, তখন সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা,অরাজকতা, হত্যা, লুন্ঠণ ও অশান্তি অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। মানুষে মানুষে তৈরি হয় দ্বিধা-দ্বন্দ ও দুরত্ব। তখন মানুষ মানুষকে ভাবতে পারে নীচ, হীন, বৈরিতা, ও তাদের প্রতি বিদ্বেষ ফলশ্রুতিতে তাদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতে দ্বিধা করেনা। তাদের মতে বেঁচে থাকার অধিকার নীচ বর্ণের মানুষের নেই। পৃথিবীর বর্ণবাদী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যলোচনা করলে এর অনেক হৃদয়বিদারক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে অত্যাচারিত ও অবহেলিত ছিল। একমাত্র ইসলামই তাদের মানবতার ঐশ্বর্যে মহিমন্বিত করে সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেছে। ইসলামের প্রতিটি নির্দেশই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্য প্রযোজ্য।[৫১৪] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করনা। নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৫১৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ভূপৃষ্ঠে দম্ভবরে বিচরণ করোনা; তুমি তো কখনো পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং কখনই পর্বতসম হতে পারবে না"।[৫১৬]

সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সমস্যা

অভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী আর তাদের এক একটি জনগোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলে। এক সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করা, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, ধর্ম পালনে বাধা দেয়া, হত্যা, মারামারি, নিপীড়ন ও দাঙ্গাহাঙ্গামা করে তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলাকে বলা হয় 'সাম্প্রদায়িকতা'। ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি অন্ধপ্রীতি পোষণ করাই সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ। যা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তদরূপ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক সংখ্যালঘুদের উপর আধিপত্য বিস্তার, কিংবা অন্য কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন মানষিকতা থেকেও সহিংসতা ও জঙ্গিবাদের উদ্ভাব ঘটে। আল্লাহ

[৫১২]. মুহাম্মদ তাহের হোসেন,*জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম*,ই.ফা.বা., প্রকাশকাল; ২০১১, পৃ. ৩৭

[৫১৩]. আল-কুরআন, ৮৮ : ২১-২২

[৫১৪]. রওশান আলী খন্দকার, *সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.)*, ই.ফা.বা, প্রকাশনা; ২৩১৭, প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ৭

[৫১৫]. আল কুরআন, ৩১ : ১৮

[৫১৬]. আল কুরআন, ১৭: ৩৭

তা'আলা বলেন, তোমরা যাদের ইবাদত করেছ, আমি তাদেরও ইবাদতকারী নই। আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন"।[৫১৭]

জিহাদ বিষয়ক অপপ্রচার

কেউ কেউ জিহাদ বলতে ঐড়ষু ডধৎ বা পবিত্র যুদ্ধ বা Religious War বা ধর্মযুদ্ধ বা Crusade (ক্রুসেড) বলে অভিহিত করেন। অথচ এগুলো সব খ্রিস্টান চার্চ ও যাজকদের আবিষ্কৃত পরিভাষা।[৫১৮] ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ অর্থ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকে ইসলামে জিহাদ বলে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হলো দাওয়াত। দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা প্রচারের জন্য হত্যা, সহিংসতা, জিহাদ বা যুদ্ধ করা তথা শ³প্রয়োগও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"[৫১৯]

দ্বীন বিজয়ের ভুল ব্যাখ্যা

আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে দ্বীনকে প্রকাশ বা বিজয় দান করার কথা অনেক আয়াতে বলেছেন। এ দ্বীন বিজয়ের ভুল ব্যাখ্যার কারণেও জঙ্গিবাদের উৎপত্তি হয়। দ্বীনের বিজয় ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। তবে এ বিজয়ের অর্থ ও পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিদের মাধ্যমে জানতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"[৫২০] ইসলাম গ্রহণ করা না করার বিষয়টি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ছেড়ে দিয়েছেন এবং বলপ্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, " আর বলুন , সত্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা কুফুরী করুক।"[৫২১]

আদর্শ ও মূল্যবোধের লড়াই

সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে বিশ্বের বড় বড় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে নবী রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের যে সংঘাত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে তা একমাত্র আদর্শ ও মূল্যবোধের লড়াই। হিযবুল্লাহ ও হিযবুস শায়তানের মধ্যে আদর্শ ও মূল্যবোধের সংগ্রাম অব্যাহত আছে। যুগে যুগে নমরুদ, ফিরাউন, শাদ্দাদ, আবু জেহেল ও আবু লাহাব, উতবা, সায়বাদের প্রেতাত্মারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব থেকে ফিরিয়ে তাদের নিজেদের দাসত্বে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে।[৫২২] পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "জ্বিন ও মানব জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি শুধু আমারই দাসত্ব করার জন্য।"[৫২৩] মানুষ যদি আল্লাহর দাসত্ব কবুল করে সকলেই সমান হয়ে যায়, আর দাসসুলভ আচরণ তথা স্রষ্টার বিধান পালন করে, তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকবে না। এরই বিপরীত অবস্থা তথা সংঘাতময় পৃথিবীর জন্ম হয়েছে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল (সা.) এর আদর্শ গ্রহন না করা।[৫২৪]

দুনিয়ামুখিতা বা ফলাফল-মুখিতা

---

[৫১৭]. আল কুরআন, ১০৯ : ৪-৭

[৫১৮]. বাংলাদেশ প্রতিদিন , *জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসের কারণ ও প্রতিরোধ,* মুফতি ড. ইমাম হোসাইন, মঙ্গলবার, ১৯ জুলাই, ২০১৬, পৃ. ৫

[৫১৯]. আল কুরআন, ২ : ২৫৬

[৫২০]. আল কুরআন, ৯ : ৩৩

[৫২১]. আল কুরআন, ১৮ : ২৯

[৫২২]. মাওলানা কাজী আবূ হুরায়রা, বিশ্ব সংঘাত নিরসনে মহানবী (সা.) এর আদর্শ, নূরুল আমিন মানিক সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫৬

[৫২৩]. আল-কুরআন, ৫১: ৫৬

[৫২৪]. মাওলানা কাজী আবূ হুরায়রা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫৭

অন্য যে বিষয়টি উগ্রতার পথ উন্মুক্ত করে তা হলো দাওয়াতের দুনিয়ামুখিতা ও দুনিয়ার ফলাফল বিচার। রাতারাতি, অল্প কিছু দিনে বা বৎসরে বা পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে সব কিছু ভাল করে ফেলার বা কোনো জাগতিক ফল অর্জন করার চিন্তা যেমন অবাস্তব ও আল্লাহর সুন্নাতের বিরোধী, তেমনি কিছুই হবে না বলে হতাশ হয়ে পড়া অথবা বলে কিছু লাভ হবে না মনে করে দাওয়াতের দায়িত্বে অবহেলা করাও ধ্বংসাত্মক ও আল্লাহর আদেশের বিরোধী। ইসলামের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন এবং তিনিই একে এগিয়ে নিবেন। মুমিনের দায়িত্ব সুন্নাতের আলোকে নিজের কর্ম আঞ্জাম দেওয়া।

ঈমান ও তাকওয়ার দুর্বলতা

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ লালনকারীদের ঈমান ও তাকওয়া প্রচ- দুর্বল। ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো আল্লাহর ওপর বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, আসমানী কিতাবে বিশ্বাস, নবী ও রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, তাকদীর তথা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস তাদের মধ্যে পুরোপুরি অনুপস্থিত। একজন মু'মিন বান্দার কি করণীয়, মানুষ ও সমাজের প্রতি তার কি দায়বদ্ধতা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কি দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন এসব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকায় এবং দুর্বল ঈমান ও তাকওয়ার অভাবে তারা অনেক সময়েই সহজ পন্থায় পরকাল লাভের প্রত্যাশায় সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়। তাদের হৃদয়ে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। ফলে তারা জীবনকে তুচ্ছ করে সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বোমা মেরে মানুষ হত্যা করতে বা আত্মহত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কেননা তাদের মধ্যে তাকওয়ার যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে "(আল্লাহকে বিশ্বাস, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, কুরআনে বিশ্বাস, পূর্ববর্তী সকল কিতাবে বিশ্বাস এবং পরকালে বিশ্বাস)[৫২৫] তা তাদের জীবনে পরিপূর্ণভাবে অনুপস্থিতিও এর অন্যতম কারণ। কেননা কোন মুমিন ও মুসলিমের এমন গুণাবলী বিদ্যমান থাকলে তার পক্ষে এমন ধরণের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে যুক্ত হওয়া কখনো সম্ভবপর নয়।

চারিত্রিক বিভিন্ন ত্রুটি

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রহীনরা চেহারায় মানুষ হলেও ভিতরটা পশুত্বে ভরা। চরিত্র ঠিক না থাকলে তার দ্বারা যে কোন অন্যায়-অপরাধ করা সম্ভব। তাই অসৎ চরিত্রের লোকেরা ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশের প্রতি সীমাহীন আসক্ত থাকে। এ সব আসক্তি পূর্ণ করার জন্য অনেকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেযুক্ত হয়। তাদের অনেকেই মাদকাসক্তিতেও জড়িয়ে পড়ে এবং মাদকের অর্থ যোগানের জন্য তারা কোন নীতি-নৈতিকার তোয়াক্কা না করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ক্রীড়নে পরিণত হয়। আবার অনেক এজেন্সি বা সংগঠন বা সংস্থা এসব লোকদের অভাব অনটনের সুযোগ নিয়ে আর্থিক স্বাবলম্বী করার প্রয়াসে তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন অনৈতিক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে দেয়। তাদের এসব দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখান থেকে তাদের ফিরে আসা আদৌ সম্ভবপর নয়। ফলে তাদেরকে বরণ করতে হয় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী জীবনকে। পরিশেষে তাদের পরিণাম হয় অকাল মৃত্যু অথবা যাবতজীবন কারাদ-।

নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ

নেতৃত্ব ও ক্ষমতার প্রচ- লোভ ও মোহ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অন্যতম কারণ। এ পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্য যত ধরণের অবৈধ ও অন্যায় পন্থা আছে সকল পন্থাই মানুষ গ্রহণ করে থাকে। তার অন্তরে একটি বদ্ধমূল ধারণা থাকে যে তাকে যে করে হোক ক্ষমতায় যেতেই হবে। তাই মানুষ যোগ্যতা, মেধা, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সমাজের মানুষের প্রতি কর্মবোধের আদর্শ না থাকা সত্ত্বেও মানুষকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে সহজ পন্থায় ক্ষমতা ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এভাবে

---

[৫২৫]. আল-কুরআন, ২: ১-৬

নেতৃত্বের লোভ, একগুঁয়েমি ও ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি চারিত্রিক ত্রুটি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সমাজে অযোগ্য, অসৎ ও চরিত্রহীন লোক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও বেকারত্ব

কর্মব্যস্ত ও পরিতৃপ্ত মানুষের মনে ক্ষোভ বা আবেগ বেশী স্থান পায় না। পক্ষান্তরে বেকার ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার মানুষের মনে ক্ষোভ ও হতাশাকে উস্কে দেয়।[৫২৬] সমাজ ও রাষ্ট্র এখন অর্থের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। অর্থ ছাড়া মানুষ কোন কিছুই চিন্তা করতে পারে না। যে কোন পন্থায় হোক তাকে অর্থ উপার্জন করতেই হবে। অর্থনৈতিক দন্যতা তাকে দূর করতেই হবে। কেননা অনেক সময় দারিদ্রতা মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। ফলে লোকেরা অর্থ উর্পাজনের নেশায় সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়। সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে বেকারত্ব। উচ্চ শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত বেকার যুবসমাজ তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মের সুযোগ না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন যে কেউ তাদের বেকারত্বের হতাশার সুযোগ গ্রহণ করে তাদেরকে উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে প্রচুর পরিমাণে অর্থ-সম্পদ দেন। এ অর্থ-সম্পদের আড়ালে ও সুকৌশলে তাদেরকে সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। বিশেষ করে এক্ষেত্রে ধনী পরিবারের শিক্ষার্থীদের টার্গেট করা হয়।

দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব

দেশ প্রেম একটি মহৎ গুণ। সকল নবী-রাসূল ও মহামানবের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেশ প্রেম ছিল। রাসূল (সা.) সম্পাদিত মদিনা সনদের প্রতিটি ধারায় দেশ প্রেম ফুটে উঠেছে। সনদের একটি ধারায় বলা হয়েছে, মদিনার কোনো সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে সব সম্প্রদায়ের লোকেরা একত্রিত হয়ে তা প্রতিহত করবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী (সা.) ছিলেন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। রাসূল (সা.) বলেছেন, দেশ রক্ষার জন্য সীমান্ত পাহারায় আল্লাহর রাস্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করা দুনিয়া ও মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।[৫২৭] দেশ ও জাতির সমুন্নত অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে অনেকেই সন্ত্রাস ও জঙ্গি হোতাদের প্ররোচনায় নিজেদের ভুখ- এবং তাদের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর ওপর আঘাত হানতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সন্ত্রাসীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা ও ইতিহাস ঐতিহ্যের পীঠস্থানগুলোর ওপর বোমা হামলা চালিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের মূল সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা না থাকার কারণে তারা নিমিষেই এসব স্থাপনা ধ্বংস করতে দ্বিধাবোধ করে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব

ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এবং শান্তির বাণী নিয়েই যে যুগে যুগে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন ইসলামী দর্শনে আলোকিত এবং প্রাজ্ঞ মনীষীরা তা ইতিহাসেই সুস্পষ্ট।[৫২৮] পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে, তাদের সবাই কোন না কোন ধর্মের অনুসরণ করে আর যত মানুষ আসবে তারাও কোন না কোন ধর্মের অনুসরণ করবে। ধর্ম পালনের বিষয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই।"[৫২৯] ধর্ম পালনে যখন বাধাগ্রস্থ হয় তখন ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠে। প্রকাশ্যে প্রতিরোধ বা

[৫২৬]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬১
[৫২৭]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৮, পৃ. ১১৭
[৫২৮]. সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, ইসলামে জবরদস্তির কোন স্থান নেই, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৭
[৫২৯]. আল-কুরআন, ২: ২৫৬

প্রতিবাদ করতে না পারলে তখন তারা গোপনে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মত পথ বেঁচে নেয়।

সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব

সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব, লড়াই চিরকাল চলবে। মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী এবং সত্য চিরস্থায়ী। আল্লাহ মিথ্যাকে ধ্বংস এবং সত্যকে বিজয়ী করেন। আদিকাল হতেই আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করে বিশ্বব্যাপী মানুষকে আল্লাহর আইন-বিধান মেনে সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ গোত্র-গোষ্ঠী-জাতিকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন ও তদ্বারা সমাজ সংস্কার ও বিবর্তন করতে চেয়েছেন। কিন্তু শয়তানের অনুসারী শয়তানরূপী রাজা-বাদশাহ ও সমাজপতিগণ আল্লাহর আইন অস্বীকার করে নিজেদের তৈরী আইন-বিধান দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। আর তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বকে শুধু অস্বীকারই করেনি বরং আহবানকারী নবী-রাসূলদের হত্যা পর্যন্ত করেছেন। আল্লাহকে অস্বীকারকারী শক্তিকে কাফের-অবিশ্বাসী এবং আল্লাহ ও তার আইন-বিধান মান্যকারী শক্তিকে মুমিন-বিশ্বাসী বলা হয়। সৃষ্টির আদি হতেই এই নিয়ম ও বিধান জারী রয়েছে। সর্বকালেই এই কাফের-অবিশ্বাসী ও মুমিন বিশ্বাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-লড়াই চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

এ ধারারই সর্বশেষ নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ও কাফের-অবিশ্বসীরা তথা ইহুদী, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকরা মুমিন মুসলমাদের বিরুদ্ধে অকারণে ষড়যন্ত্র করে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ তথা ধর্ম-যুদ্ধ-ক্রুসেড পরিচালনা করেছে। ইসলাম ও মুসলমানদের দুনিয়ার বুক হতে চিরদিনের জন্য নির্মূল করতে দলবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করছে কিন্তু পরিণামে তারা পরাজয় বরণ করছে। মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। সেই ষড়যন্ত্রের ইতিহাস থেমে যায়নি। ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাস, অর্ধ-পৃথিবী বিজয় ও শাসনের ইতিহাস, পবিত্র জেরুজালেম দখলের ইতিহাস, ইউরোপে সভ্যতার মশাল জ্বালানোর ইতিহাস ইহুদী-খ্রিস্টানদের গাত্রদাহের কারণ হয়। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়। তারা তাদের পবিত্র ক্রুস নিয়ে শপথ নেয়। ক্রুস হতেই তাদের প্রিয় ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেড। ১০৯৬ সালে রোমান ক্যাথলিক পোপ দ্বিতীয় আরবন পবিত্র জেরুজালেম মুসলামানদের হস্ত হতে ছিনিয়ে নেবার জন্য[৫৩০] ফিলিস্তিনসহ মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশসমূহ দখলের জন্য এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদ করায়াত্ত করার জন্য খ্রিস্টান জাতিকে ডাক দিয়েছিলেন। তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন গোটা খ্রিস্টান জাতিকে। তিনি ডাক দিয়েছিলেন ক্রুসেডের নামে। ক্রুসকে বানিয়েছিলেন ক্রুসেডের পতাকা আর সেই পতাকা তুলে দিয়েছিলেন খ্রিস্টান সেনাদের হাতে। উম্মাদ প্রায় খ্রিস্টান সেনারা প্রতিশোধের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুসলিম জাতি ও মুসলিম দেশের উপর। এই ক্রুসেড Crusade যুদ্ধ চলছিল দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর (১০৯৬-১২৯২ খ্রি.) ধরে। এই ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ও করুণ। খ্রিস্টানরা একসময় ছলে-বলে, কৌশলে ষড়যন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে মুসলমানদের পতন যুগে তাদের মধ্যে ভোগ বিলাসী, খোদাদ্রোহী শাসকদের হাত করে মুসলিম জাতির মধ্যে অনৈক্য-বিভেদ-স্বার্থপরতার বীজ বপন করেছিল। এই বীজরূপী আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ (Nationalism and Secularism) মুসলমানদের মধ্যে একটা স্থায়ী অনৈক্য, জাত্যাভিমান কৌলিণ্যবোধ সৃষ্টি করে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাজ্য, তুর্কী সালতানাত বা ওসমানিয়া সাম্রাজ্য (Ottoman Empire) টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, ফ্রান্স ওলেন্দাজরা তা ভাগ বাটোয়া করে নিয়ে শাসন ও শোষণ করতে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকার কোন মুসলিম দেশই খ্রিস্টান কলোনীর বাইরে ছিল না। রাজা হলো প্রজা, আর প্রজা হলো রাজা। এরপর দীর্ঘ সময় ও সংগ্রামের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মুসলিম কলোনীগুলো স্বাধীনতা পেলেও খ্রিস্টানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি সবই মুসলমানদের রক্তে মাংসে মিশিয়ে দিয়ে যায়, যেন কোনদিন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে। তুর্কী-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে বহু ছোট ছোট আরব-অনারব দেশ করা হয়। ইরাক থেকে কুয়েতকে, মালয়েশিয়া ভেঙ্গে সিঙ্গাপুরকে পৃথক রাষ্ট্র করা হয়। আবার ভারত পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীরকে অমিমাংসিত রেখে যাওয়ায় বিরোধ আজও মিটেনি।

---

[৫৩০]. কে এম এ হোসাইন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০৮-১১০

Dhaka University Institutional Repository

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতায় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো একদম পঙ্গু হয়ে যায়। মুসলিম দেশগুলো ভৌগোলিক স্বাধীনতা পেলেও প্রকৃত স্বাধীনতা এখনও পায়নি। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ. প্রভৃতি সংঘ ও উপ-সংঘের নামে দরিদ্র অনুন্নত মুসলিমদেশগুলোকে বিশ্বায়ন ও উন্নয়নের কথা বলে প্রকৃতপক্ষে দেশগুলোর জাতীয় সম্পদ পরোক্ষভাবে লুণ্ঠন করে যাচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোর স্বাধীনতা-স্বাধীকারকে সম্মান না করে সেবাদাস-করদ রাজ্য বানিয়ে রাখতে চায়। মুসলমানরা যাতে আদৌও কোনদিন বিশ্বনেতৃত্ব দিতে না পারে, সে জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ভোগবাদী, সিংহাসনলোভী, ক্ষমতাবিলাসী মুসলমান নামধারী একদল ধর্মনিরপেক্ষ মডারেট মুসলমান, লিভারেল মুসলমান, আধুনিক মুসলমান তৈরী করে ক্ষমতায় বসিয়ে পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টানদেশগুলোই মুসলিম দেশগুলোকে শাসন-শোষণ করছে। তাদের কথা যে বা যারা মানতে অস্বীকার করে তাদের ওপর নেমে আসে নানা অপবাদ। তারা হন-মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, মানবতা ও গণতন্ত্র বিরোধী। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা আদর্শ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামাজিক-রাজনৈতিক সুন্নায় বিশ্বাসী খাঁটি মুসলমানগণ যখন ইহুদী-খ্রিস্টান-ব্রাহ্মণদের পরাধীনতা, আধিপত্য, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব হতে প্রকৃত মুক্তি লাভের জন্য সংগঠিত হন, আন্দোলন-লড়াই করতে চান, তখনই তারা আর মুসলমান থাকেন না; হয়ে যান মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, গোড়াধর্মান্ধ, প্রগতিবিরোধী, মানবতা, গণতন্ত্রবিরোধী, সন্ত্রাসী ও জঙ্গি।[৫৩১]

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ও অজ্ঞতা

ইসলামী জ্ঞানের উৎসের ব্যাপারে মুসলিম সমাজে প্রচলিত তালিকা হলো কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস কিন্তু ইসলামী জ্ঞানের আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎসের তালিকা হলো- কুরআন, সুন্নাহ্ ও Common sense। তার মধ্যে কুরআন হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত গ্রন্থ আর সুন্নাহ হলো এ প্রমাণিত জ্ঞানের ব্যাখ্যা। এ দুটি বিধান ত্যাগ করে কিয়াসের ভিত্তিতে কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে জঙ্গিবাদের উত্থান।'[৫৩২]সমগ্র বিশ্বের প্রায় শতকরা ২০% লোক হচ্ছে মুসলমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর বেশির ভাগ ধর্মের মানুষেরই ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে। অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নেয় এবং ইসলামের অনেক বিধি বিধানসমূহকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও ভুল মনে করেন। আর এ ধারণা পোষণ করেন তারাই যারা ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন না। ধর্মের নামে যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা পরিচালনা করছে তারা কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করছে অথবা অপরের অপব্যাখ্যায় প্রভাবিত হচ্ছে।'[৫৩৩] তারপরও ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ গতিতে বেড়েই চলছে।[৫৩৪] ইসলামী জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে দায়ী করা এবং ইসলামী শিক্ষা কে দায়ী করা উভয় মতের পিছনে অজ্ঞতা একটি বড় কারণ। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের টার্গেট করছে মিডিয়া। যদি কোনো মুসলমান মহিলা হিজাব ব্যবহার করেন, তাকে টার্গেট করা হবে। একই সাথে গির্জার মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে কেন? পার্থক্যটা কোথায়? যদি কোনো মুসলমান দাঁড়ি রাখে তার মানে হচ্ছে সে একজন সন্ত্রাসী। কিন্তু শিখরাও দাঁড়ি রাখে, পাগড়ি পরে তাতে কোনো সমস্যা নেই। বেশিরভাগ ধর্মেই ধার্মিক লোকদের দাঁড়ি আছে। যীশুখ্রিস্ট, যিনি ইসলাম ধর্মে একজন নবী, আবার অনেক খ্রিস্টানরা তাঁকে তাদের সৃষ্টিকর্তা মনে করেন, তাঁরও দাঁড়ি ছিল। সাধু-সন্তদেরও দাঁড়ি আছে। বিশেষ করে ওপরের সারির লোকদের দাঁড়ি আছে। তাই দাঁড়ি থাকলে সমস্যা কী? এটা হচ্ছে মিডিয়ার প্রতারণা। এর মাধ্যমে মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে। আর এর ফলে সবার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে সাধারণ অভিযোগ করা হয় যে, ইসলামের প্রসার ঘটেছে তরবারির মাধ্যমে। এটা ইসলামের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপবাদ। আর ইসলাম প্রথাগতভাবেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে। কিন্তু কোনো উপায় না থাকলে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। এ পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই পুলিশ আছে। যখন

---

[৫৩১]. ডা. জাকির নায়েক, *সন্ত্রাস ও জিহাদ*, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৭৩

[৫৩২]. প্রফেসর, ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান, FRCS (Glasgow), ***যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানো হয়েছে*** (ঢাকা: কুরআন রিচার্স ফাউন্ডেশন, গবেষণা সিরিজ ৩০, ২য় সংস্করণ: ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৯

[৫৩৩]. মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১১৮

[৫৩৪]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ*, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

কোনো সাধারণ নাগরিক সেই দেশের কোনো আইন ভঙ্গ করে, তখন পুলিশ সে দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। তাহলে প্রত্যেক দেশেই পুলিশ আছে, তারা শক্তি প্রয়োগ করে, সঙ্গে অস্ত্রও রাখে। সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা শান্তি চায় না। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, শেষ উপায় হিসেবে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধের অনুমতি দেয়। ইসলাম তরবারি দিয়ে ছড়ানো হয়েছে এ ভুল ধারণার উত্তর বেশ ভালভাবেই দিয়েছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডিলেসি ওলেরি । তিনি তাঁর বই 'ইসলাম অ্যাট দ্যা ক্রুসেড' গন্থে লিখেছেন যে, "ইতিহাসে এটা পরিষ্কার যে, মুসলমানদের তরবারি হাতে নিয়ে ইসলাম ছড়ানো আর বিভিন্ন দেশ জয় করার আজগুবি গল্পটা একটা অসাধারণ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই না, যে মিথ্যাটা বার বার বলা হয়েছে। আর আমরা জানি যে, (মুসলমানরা) আমরা যেখানে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছি। সেখানে তরবারি দিয়ে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা এসে মুসলমাদের সরিয়ে দিলো, সে সময় একজন মুসলমানও প্রকাশ্যে আযান দিতে পারতো না।"[৫৩৫]

মুসলমানরা গত ১৪০০ বছর ধরে আরব বিশ্বে রাজত্ব করছে। কিছু সময় ব্রিটিশ ও ফরাসিরা রাজত্ব করেছে। এ সময়টা বাদে পুরো ১৪০০ বছর ধরে মুসলমানরা আরব বিশ্বে রাজত্ব করছে। এ আরব বিশ্বের প্রায় দেড় কোটি লোক কপটিক খ্রিস্টান। কপটিক খ্রিস্টান মানে যারা বংশ পরম্পরায় খ্রিস্টান। আরবের এ দেড় কোটি কপটিক খ্রিস্টান সাক্ষ দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারির মুখে ছড়ায়নি। মুসলমানরা প্রায় এক হাজার বছর ধরে ভারত শাসন করেছে। যদি তারা চাইত তাহলে প্রত্যেক ভারতীয়কে তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারত। আজকে এক হাজার বছর পরেও ভারতে ৮০% লোক অমুসলিম। এ ৮০% অমুসলিম সাক্ষ দেবে যে, ইসলাম তরবারির মুখে প্রসার লাভ করেনি। কোনো মুসলমান আর্মি কি মালয়েশিয়া গিয়েছিল? সেখানে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি মুসলমান। কোনো মুসলমান আর্মি কি ইন্দোনেশিয়াতে গিয়েছিল? ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি? কোনো মুসলমান আর্মি কি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? ইউরোপের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কালাইল অবশ্য এর একটা উত্তর দিয়েছেন। আর তিনি তরবারির কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি নতুন আইডিয়া মানুষের মাথায় জন্ম নেয় পুরো পৃথিবীর বিপক্ষে। তখন সে যদি সেটা তরবারির মাধ্যমে ছড়াতে চায় তাহলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না। তিনি প্রথমে বুদ্ধির তরবারির কথা বলেছেন।[১৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর উত্তম পন্থায়।"[৫৩৬] অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে দায়ী করেন। তাদের মধ্যে কেউ মনে করেন, ইসলামে অনেক ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহাবস্থান সম্ভব। তবে ইসলামের মধ্যে ভাল বিষয়ের সাথে জিহাদ, ধর্মত্যাগ, বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ক কিছু উগ্র ও অসহিষ্ণু বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেগুলি মানবাধিকার বা সভ্যতার সহাবস্থান বা বিকাশের বিপক্ষে। এ সকল শিক্ষা থেকেই জঙ্গিবাদের জন্ম। অন্য অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিত মনে করেন যে, ইসলামের মূল শিক্ষাই জঙ্গি। তাদের মতে, ইসলাম তার অনুসারীদের অসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। ইসলামে জিহাদের নামে অমুসলিমদেরকে হত্যা করার উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে। আর এর ফলেই মুসলিমদের মধ্যে জঙ্গিবাদের উত্থান। তাদের মতে, ইসলামী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বন্ধ করার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করা। তারা দাবি করেন যে, ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের উত্থান সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের সঠিকত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ইহূদী-খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মীয় উগ্রবাদীরাই শুধু নয়, পাশ্চাত্যের অনেক "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতা বা রাজনৈতিক নেতাও বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম ও সন্ত্রাস সমার্থক এবং ইসলামকে প্রতিরোধ করাই সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করা। অনেকে চক্ষু লজ্জায় বা কুটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে তা সরাসরি বলেন না। তারা বলেন না যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, বরং বলেন, ইসলামী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

[৫৩৫]. ডা. জাকির নায়েক, *সন্ত্রাস ও জিহাদ*, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৩৯

[৫৩৬] . আল-কুরআন, ১৬: ১২৫

হবে। কিন্তু অনেকেই মনের কথাটি বলে ফেলেন, তাঁরা ইসলামী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন।[৫৩৭] সাধারণ আমেরিকানদের বেশীর ভাগই জিহাদ, পবিত্র যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে যে তত্ত্বগত পার্থক্য রয়েছে তা বুঝতেই পারেন না। কারণ ইসলাম সম্বন্ধে তাদের তেমন জ্ঞান নেই অথবা যা আছে তা অতি সামান্য। তাদের এই অজ্ঞতার ইতিহাস বুঝার জন্য চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলামের সাথে ইউরোপের যে মুখোমুখি অবস্থান ছিল তার ধারাবাহিকতাকে স্মরণ করতে হবে । তখনকার ঐ ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে এখনও যাকে পাশ্চাত্য বলে জ্ঞান করা ইসলামের ব্যাপারে ঐ পাশ্চাত্যের আওতাটুকুও একই রকমের। ইসলাম সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ভুল বুঝাকে প্রথম কারণ বলে মনে করা হয়। আর ঐতিহাসিকভাবে যে কারণ সেটা হলো, ইসলামকে মনে করা হয় ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্ম পরিত্যাগকারী এক ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায়। তারা মনে করেন যে ইসলাম উগ্রবাদী ধর্ম অথচ ইসলামের অনেক বৈশিষ্ট্যে খ্রিষ্ট ও ইহুদী ধর্মের সাথে মিল আছে যা তাদের জানা নেই। জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য না করার বিষয়টি তাদের মনস্তাত্ত্বিক।

দ্বিতীয়ত : পবিত্র যুদ্ধের অর্থও এখানে ভুলভাবে করা হয়েছে। অথচ এগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকলেও একটি অন্যটি থেকে আলাদা।[৫৩৮] বিশেষত ইসলাম বিদ্বেষী অপপ্রচারের জোয়ারের মধ্যে নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য যাচাই করা অনেকের জন্যই খুব কঠিন। এজন্য প্রচলিত প্রচারের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, জঙ্গিবাদের জন্য ইসলামই দায়ী এবং ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করাই এ সমস্যা দূরীকরণের একমাত্র উপায়। মুসলমানের সন্ত্রাসের জন্য তার ধর্ম ইসলামকে অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বিশ্বের সর্বত্র ও সকল জাতির মধ্যেই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে। অন্য কোনো ধর্মের সন্ত্রাসীর জন্য তার ধর্মকে কখনোই দায়ী করা হয় না। কিন্তু মুসলিমের সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে ঢালাওভাবে দায়ী করা হয়। আসাম, মনিপুর, মিজোরাম, বিহার, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স বা অন্য কোনো স্থানের হিন্দু খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ক্যাথলিক, প্রটেসট্যান্ট বা অন্য ধর্মের সন্ত্রাসীদের বিষয়ে তাদের ধর্ম উল্লেখ করা হয় না বা ধর্মকে দায়ী করা হয় না। তাদের দেশ বা জাতির পরিচয় দিয়ে বলা হয় আইরিশ, তামিল, মনিপুরী, আসামীয়, বাস্ক, ইটালীয়, স্পেনীয় বা জার্মান সন্ত্রাসী। কিন্তু কোথাও কোনো মুসলিম এরূপ করলে তার ধর্মকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, ফিলিপাইন, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা কাশ্মীরের ইসলামী বা মুসলিম সন্ত্রাসী বা জঙ্গি। অথচ সকল ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসের কারণ ও দাবী একই। সকলেই তাদের ধারণা অনুসারে অধিকার রক্ষার সাধারণ পথে ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের পথ ধরে এবং সকলেই সন্ত্রাসের বৈধতা ও অনুপ্রেরণার জন্য নিজেদের ধর্মের বাণী ও শিক্ষা ব্যবহার করে।[৫৩৯] সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সকল ধর্মের, দেশের ও মতাদর্শের মানুষদের মধ্যে বিরাজমান। এ বিষয়ে মুসলিমদের শেয়ার নিতান্তই সীমিত। আর ইহূদী, আইরিশ, জার্মান, সার্ব, তামিল, আসামীয়, মনিপুরি, নেপালী, তিব্বতী, চীনা, আমেরিকান ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের জন্য যেমন ইহূদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম দায়ী নয়, তেমনি মুসলিমদের সন্ত্রাসের জন্য কখনোই তার ধর্ম দায়ী নয়। কারো অপরাধের জন্য তার ধর্মকে দায়ী করা শুধু অপরাধই নয়, বরং তা অপরপাধীর পক্ষে জনমত তৈরি করে এবং অপরাধ দমন বাধাগ্রস্ত করে। যদি কোনো ব্যক্তি খোলা মনে ইসলামের বিধি বিধানগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তবে সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, ইসলাম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রেই উপকারী। কমরেড এম এন রায় লিখেছেন, আবেগহীন ও বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের ফলে যখন ইতিহাস থেকে কিংবদন্তি আর ভয়ঙ্কর সব কল্পকথা মুছে যায় তখন এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে ইসলামের অভ্যুত্থান মানব জাতির জন্যে অভিশাপ নয় বরং এক আর্শীবাদ।[৫৪০] ভারতের এক শ্রেণীর সংকীর্ণমনা, সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট, ধর্মান্ধ হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের ইসলামের সমালোচনার জবাবে তিনি এই বক্তব্য রাখেন। ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী ১৯৪০ সালে The Harijan পত্রিকায় লিখেন, "ইসলামকে আমি মহান নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ একটি ধর্ম হিসেবে নিশ্চিতভাবে জ্ঞান

---

[৫৩৭]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮

[৫৩৮]. আসমা বারলাস, *জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ অপব্যাখ্যার রাজনীতি*, মেসবাহ উদ্দীন আহমদ অনুদিত, মুহাম্মদ আবদুল আজিজ সম্পাদিত, *সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম* (ঢাকা : বিআইটি, ২০০৫), পৃ. ৪৮

[৫৩৯]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

[৫৪০]. komored M.N.Roy, The Historical Role of Islam, pub. 1931, p.88

করি। তাই আমি পবিত্র কুরআনকে মনে করি মহান আদর্শের ভান্ডাররূপে এবং মুহাম্মদ (সা.) কে শ্রদ্ধা করি একজন পয়গাম্বররূপে।"[৫৪১]

আলিম ও 'দায়ী'গণের করণীয়

জঙ্গিবাদে যেহেতু ইসলামের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে সেহেতু এর নিয়ন্ত্রণে আলিম, ইমাম, আল্লাহর পথে দাওয়াতের লিপ্ত ব্যক্তি বা "দায়ী ইলাল্লাহ" এবং ধার্মিক মুসলিমদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী স্বাধিকার আন্দোলনকে জঙ্গিবাদ নাম দেওয়া হচ্ছে এবং জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে সারাবিশ্বে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে নিন্দিত করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের প্রয়োজনে 'জঙ্গি' তৈরি করেছে এবং তাদের কর্মকা-ের জন্য ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে দায়ী করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি একথাও সত্য যে আমাদের দেশে ও বিভিন্ন দেশে কিছু মানুষ ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ইসলামী রাষ্ট্র বা বিচার প্রতিষ্ঠা, অন্যায় প্রতিরোধ, অন্যায়কারীর শাস্তি ইত্যাদি ইসলাম-নির্দেশিত কর্মের নামে ইসলাম-নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন। এদের বিভ্রান্তি দূর করার মূল দায়িত্ব আলিম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের।

জঙ্গিবাদের জন্য পাশ্চাত্যকে, সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণাকে বা ইসলামের শত্রুদেরকে দায়ী করে বক্তব্য দিলেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। পাশাপাশি বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। ইসলামের নামে উগ্রতা বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত সকলেই অমুসলিমদের এজেন্ট বা ক্রীড়ানক বলে মনে করার কারণ নেই। এদের মধ্যে কেউ এমন থাকলেও অন্য অনেক মানুষ রয়েছেন যারা দীনী আবেগ নিয়ে সাওয়াবের ও নাজাতের উদ্দেশ্যে উগ্রতা, সহিংসতা ও খুনখারাপিতে লিপ্ত হচ্ছেন। এদেরকে সঠিক জ্ঞান প্রদান ও বিভ্রান্তি অপনোদনের দায়িত্ব আলিম সমাজের। ইসলামী শিক্ষার বিকৃতি রোধ করার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসারে ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ও দীনী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়া আলিমগণের দায়িত্ব।

ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ফেসবুক, টুইটার, অডিও, কম্পিউটার বা ইনফরমেশন টেকনোলজি, আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন, রেডিও ব্রডকাস্টিং স্টেশন, ওয়েবসাইট অথবা টিভি স্যাটেলাইট চ্যানেল এগুলোতে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা খবর প্রচার করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যার বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল, তারা এমনটি বলছে যে যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কিংবা কিছু আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল আছে তারা বলছে শান্তির জন্য যুদ্ধ। তারা এখানে যা করছে তাহলো শান্তির জন্য যুদ্ধ নয় শান্তির (ইসলামের) সাথে যুদ্ধ। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মিডিয়া সামগ্রিকভাবে ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম হিসেবে তুলে ধরছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলিমরা কেউ তাদের মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিবাদ করেন না। তারা বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে ইসলামকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে প্রচার করছে।[৫৪২] তারা সুকৌশলে স্থান, কাল, পাত্রভেদে কোন প্রসঙ্গ ছাড়াই কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়। যা সমালোচকদের কাছে খুব বেশি পছন্দনীয়। যেমন সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যখন তোমরা কোন কাফিরদের দেখবে তাদের মেরে ফেলবে।" তবে এটি প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। এর প্রসঙ্গটা প্রথমদিকের আয়াতে আছে, বলা হয়েছে যে, একটি শান্তি চুক্তি হয়েছিল সেখানকার মুসলিম আর মক্কার মুশরিকদের মধ্যে এবং মক্কার মুশরিকরাই সেই শান্তি চুক্তির শর্তগুলো ভেঙ্গেছিল। আর তখনি আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা তাওবার ৫ নং আয়াত নাযিল করলেন, তিনি এখানে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত প্রস্তাবটি দিয়েছেন, "তোমরা আগামী ৪ মাসের মধ্যে সব ভুল শুধরে ফেল, না হলে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে, আর সেই যুদ্ধে আল্লাহ বলেছেন মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে, আল্লাহ তা'আলা

---

[৫৪১]. সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *পাণ্ডুক্ত*, পৃ. ২৯

[৫৪২]. ডা. জাকির নায়েক, *মিডিয়া এ- ইসলাম*, মো: মারুফ হাসান ও মাওলানা মো: শরিফুল ইসলাম অনূদিত (ঢাকা : পিস পাবলিকেশন, ২০০৯), পৃ. ১৮-১৯

বলেন, "অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাস সমূহ অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদের ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটি সমূহে অবস্থান কর ।"[৫৪৩] যদি এখনো আমেরিকা আর ভিয়েতনাম, বা আফগানিস্তান, বা ইরাকীদের সাথে যুদ্ধ চলতো তাহলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যুদ্ধক্ষেত্রে কোন আর্মি জেনারেল সৈন্যদের মনোবল বাড়াতে বলতেন যে, তোমরা যেখানেই ভিয়েতনামী বা আফগানী বা ইরাকীদের দেখবে মেরে ফেলবে। এটা হলো প্রসঙ্গ। কিন্তু প্রসঙ্গ ছাড়া প্রেসিডেন্ট বললো, তোমরা যেখানেই ভিয়েতনামী, আফগানী বা ইরাকীদের দেখবে তাদের মেরে ফেলবে। তাহলে লোকজন বলতো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একটা সন্ত্রাসী। এটা প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি ।

আর ভারতে অরুনশুরি ইসলামের একজন বিখ্যাত সমালোচক। তিনি তার বইতে লিখেছেন 'দি ওয়ার্ল্ড অব ফতোয়াদ' তিনি সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতের পর লাফ দিয়ে চলে গেছেন ৭ নং আয়াতে। কারণ এই ৬ নং আয়াতেই তার এ অভিযোগের উত্তর দেয়া আছে। সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলছে, "কাফিরদেরকেও অর্থাৎ শত্রুদের কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করলে শুধু সাহায্য করলে হবে না; বলা হয়েছে তাদের নিরাপদ কোন স্থানে পৌঁছে দেবে, যেন সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়"। একজন সবচেয়ে দয়াবান আর্মি জেনারেল হয়তো এমনটি বলবেন যে, শত্রু যদি চলে যেতে চায়, তাহলে তাকে চলে যেতে বল। কিন্তু কুরআন এমনটি বলছে না। কুরআন বলছে, শত্রুরা যদি শান্তি চায় তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও এবং কুরআনের প্রায় সব আয়াতেই যেখানে বলা হয়েছে যুদ্ধের বা যুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে। তারপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, শান্তিই সবচেয়ে ভাল কারণ ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। বর্তমানে এক শ্রেণির ইসলাম ধর্মের রক্ষক নামধারী মুসলমানরা আল কুরআন ও হাদীসের কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এর অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম মানবতা বিরোধী কোন কাজকে কখনোই সমর্থন করে না। সমাজে এ ধরণের অন্যায়-অবিচার, ফিতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রতা দেখা দিলে যারা বিপদগামী তাদের উচিত জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাস করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর।"[৫৪৪] ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"[৫৪৫]

পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র

বিশ্বের সর্বত্রই উলামা-মাশায়েখ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী দলসমূহ জঙ্গিবাদের বিরোধিতা ও নিন্দা করছেন। তাঁরা দাবি করেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কারণেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান। ইসলামকে কলঙ্কিত করতে, ইসলামী দেশগুলির আর্থসামাজিক উন্নতি রুদ্ধ করতে এবং এ সকল দেশে সামরিক আধিপত্য বিস্তার করতেই তারা গোপন অর্থায়নে কিছু মুসলিম যুবককে বিভ্রান্ত করে এরূপ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করছেন। তাঁরা তাদের এ দাবির পক্ষে যুক্তি পেশ করেন যে, বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও জঙ্গি ইত্যাদি মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে কখনো দেখা যায় না। সভ্যতার সংঘাত থিওরি আবিষ্কারের পূর্বে বিগত দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে জিহাদ বা কিতাল নামে এরূপ সন্ত্রাস কখনোই দেখা যায় না। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোথাও কোনো মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা দলগত ভাবে কাউকে গুপ্ত হত্যা, আত্মঘাতী, জঙ্গি, বোমা হামলা, অগ্নি সংযোগ করেছে ইত্যাদির কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। সভ্যতার সংঘাত থিওরি আবিষ্কারের পরে পাশ্চাত্য বিশ্ব নিজ প্রয়োজনেই এ অবস্থা তৈরি করেছে।[৫৪৬]

---

[৫৪৩]. আল কুরআন, ৯: ৫
[৫৪৪]. আল-কুরআন, ১৬ : ৪৩
[৫৪৫]. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১
[৫৪৬]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মনোভাব কোনকালেই ইতিবাচক ছিল না। ইসলামের সূচনাতেই আরব বিশ্ব হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, পরবর্তীতে ক্রুসেড, উসমানিয়া সালতানাতের বিজয়াভিযান, পাদ্রীদের একগুয়ে মনোভাব, গোড়ামী সর্বোপরি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে তারা ইসলাম তথা মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি হিসেবে প্রমাণিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অপশক্তিসমূহ ইসলামের ক্রমাগত বিস্তার এবং বিশ্বব্যাপী এর সৌন্দর্য প্রসারকে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তির ধূম্রজাল বিস্তার করছে। ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে জনমনে ব্যাপক ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটার ফলেই আজকের দুনিয়ায় ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন অশোভন এবং অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটছে।[৫৪৭] ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণ ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ১ম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও মুসলিম বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ক্রুসেডের সমাপ্তি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন তারা। বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত সেভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরে তারা হিসাব নিকাশ পাল্টে ফেলেন। তারা সভ্যতার সংঘাতের থিওরী উপস্থাপন করেন। তারা ভালভাবেই উপলদ্ধি করেন যে, মুসলিম বিশ্বকে তার নিজের গতিতে অগ্রসর হতে দিলে ২১শ শতকের প্রথমার্ধেই মুসলমানগণ বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হবে। অর্থনৈতিক স্থিতি, প্রযুক্তিগত শক্তি ও সমর শক্তিতে তারা শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং তাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরানোর কোনো সুযোগ থাকবে না। মুসলিম উম্মাহকে ঠেকাতে হলে তাদেরকে (সামরিক) আঘাত করতে হবে। কিন্তু আঘাত তো কোনো কারণ ছাড়া করা যায় না। স্বভাবতই কোনো মুসলিম দেশই পাশ্চাত্যের সাথে কোনো সংঘাতে যেতে রাজি নয়। কিন্তু সংঘাত না হলেও তো কাজ উদ্ধার করা যাচ্ছে না। বিশেষত দুর্বলকে সংঘাতের মধ্যে নামাতে পারলে বিজয় নিশ্চিত থাকে। এজন্যই তাঁরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়েছেন। 'ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য নানা ধরনের মারাত্মক ভুল তথ্য তৈরি করে। অতঃপর বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তাতে মুসলিম মণীষীদের নাম জুড়ে দেয়; তথা জাল হাদীস তৈরি করে এবং বিভিন্ন উপায়ে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে তা প্রচারের ব্যবস্থা করে।'[৫৪৮] খুলাফায়ে রাশেদার পর থেকে ইসলামী দেশগুলিতে ক্রমান্বয়ে ধর্মপালনে শিথিলতা, অনাচার, অশ্লীলতা, ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও আকীদার প্রসারে ব্যাপকতা লাভ করে। রাষ্ট্র, প্রশাসন ও আমীর-ওমরাগণ এ অবক্ষয় রোধের চেষ্টা করেননি, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে তারা এসব প্রসারে সহযোগিতা করেছেন।

আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও ধার্মিক মানুষেরা সাধ্যমত দাওয়াত বা প্রচার ও উপদেশের মাধ্যমে এগুলোর সংশোধনের চেষ্টা করেন। তবে তারা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের নামে বল প্রয়োগ বা শাস্তি প্রয়োগ করেননি। সর্বোপরি তারা অনাচার ও অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী প্রসারের জন্য রাষ্ট্র বা সরকারকে দায়ী করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি বা ধার্মিকদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। বরং তারা এ সকল রাষ্ট্র ও সরকারের আনুগত্য বজায় রেখেছেন এবং বহিশত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ গ্রহন করেছেন। মূলত এ কারণেই দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের ক্রুসেড যুদ্ধে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আগ্রাসন রোধ করতে মুসলমানরা সক্ষম হয়েছিলেন । কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন অনেক মুসলিম দ্বীন প্রতিষ্ঠার নামে মুসলিম দেশের স্থিতি নষ্ট করছেন, যাতে মুসলিমরা বহির্শত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধের ক্ষমতা হারাচ্ছে । উদাহরণ হিসেবে তারা বলেন যে, ইরাক, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে মার্কিন অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কতিপয় মুজাহিদ এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা থেকে আগত কোনো কোনো ছাত্র ইসলামী আইন বা শরীয়া আইন বাস্তবায়ন, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শ্লোগানের ভিত্তিতে এমন কর্মকাণ্ড পরিচালন করছেন যা রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় ঐক্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামারিক শক্তি কঠিনভাবে ব্যাহত করছে। ইসলামপন্থীদের এ সকল দাবি-দাওয়া ও যুক্তি-তর্ক যতই জোরালো হোক এর পক্ষে কোনো জোড়ালো প্রমাণ নেই। এছাড়া তাদের এ দাবী সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ সহায়তা করে না। শত্রু তো শত্রুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেই। যদি কেউ সত্যিই ইসলামের শত্রু হয় তবে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

---

৫৪৭. ড. মুহাম্মদ আবদুর রশিদ ও মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, ***সন্ত্রাস প্রতিরোদে ইসলামের ভূমিকা,*** নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম,*** (ঢাকা : ইফাবা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৯), পৃ. ১০৮

৫৪৮. প্রফেসর, ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান, FRCS (Glasgow), ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১৯

করাটাই স্বাভাবিক। এজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া বা তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করা অর্থহীন। এখানে দেখতে হবে, কি কারণে মুসলিম যুবকগণ তাদের ষড়যন্ত্রের শিক্ষার হচ্ছেন। কারণগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির প্রতিকার না করতে পারলে দোষারোপ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁদের ষড়যন্ত্র সফলতা লাভ করবে।[৫৪৯]

ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি

সমকালীন বিশ্বের সকল অশান্তি, যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অন্যতম কারণ ফিলিস্তিনে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। পবিত্র বাইবেল থেকে জানা যায় যে, ফিলিস্তিনে ইহূদীদের অবস্থান বিশ্বে অশান্তির অন্যতম কারণ। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ ইসরাঈল-সন্তানগণকে আল্লাহর বিধান পালন ও মানবজাতির কল্যাণের বিনিময়ে ফিলিস্তিনে তাদের বাসস্থান প্রদানের ওয়াদা করেন। কিন্তু পুরোহিতদের বিকৃতির কারণে তারা এ ওয়াদাকে তাদের জাতিগত সম্পদ বলে গণ্য করে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়। ইসরাঈল-সন্তানগণ খ্রিস্টপূর্ব ১২৮৫ সালের দিকে মূসা (আ.) এর নেতৃত্বে মিসর থেকে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। প্রায় আড়াইশত বৎসর বিভিন্ন স্থানে বসবাসের পর খৃস্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে তালুতের এবং এরপর দাউদ (আ.) এর নেতৃত্বে তারা ফিলিস্তিনে ইহূদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। দাউদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.) এর রাজত্বকালের প্রায় ৬৫ বৎসর এ রাজ্য ভালভাবে চলে। সুলাইমান (আ.) এর ইন্তেকালের পরে তাঁর রাজত্ব দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পরবর্তী প্রায় তিনশত বৎসরের ইতিহাস হলো রাজত্বের উভয় অংশের পারস্পরিক এবং পার্শবর্তী রাজ্যগুলির সাথে তাদের অভাবনীয়-অবর্ণনীয় রক্তারক্তি ও হানাহানির ইতিহাস।

খ্রিস্টপূর্ব ৬০৬ থেকে ৫৮৭ সালের মধ্যে ব্যাবিলনের শাসক নেবুকাদনেজার কয়েকবার আক্রমণের মাধ্যমে জেরুজালেম সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন এবং ইসরাঈলীদেরকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে তারা মুক্তি লাভ করে এবং জেরুজালেমে ফিরে আসে। পরবর্তী প্রায় ৫০০ বৎসর ইসরাঈলীরা গ্রীক, সিরিয়া বা রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে জেরুজালেমে বসবাস করে। সর্বশেষ ১৩৬ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট হার্ডিয়ান (১১৭-১৩৮ খ্রি.) জেরুজালেম ও মসজিদে আকসা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। তিনি ইহূদীদেরকে ফিলিস্তিন থেকে চিরতরে বিতাড়িত করেন। অধিকাংশ ইহূদীকে বন্দী করে রোমে নিয়ে যান। তিনি ইহূদীদের জন্য জেরুজালেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। শুধু বৎসরে নির্ধারিত একদিন ক্রন্দন করার জন্য আগমনের অনুমতি ছিল তাদের। এ হলো জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনে ইহূদীদের প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস। এ ইতিহাস শুধু রক্তের ইতিহাস। ইহূদীগণ যতদিন জেরুজালেমে ছিল ততদিন এতদাঞ্চলের কোনো মানুষই শান্তিতে থাকতে পারে নি। তারা নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও রক্তারক্তি করেছে, নবী-রাসূলগণকে হত্যা করেছে, পার্শবর্তী দেশগুলিতে রক্তারক্তি ও হানাহানি রফতানি করেছে এবং পুরো অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করেছে। ইহূদী-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেল থেকে তাদের প্রতারণা, জবরদখল, গণহত্যা, গণধ্বংসযজ্ঞ, অনাচার ও ধর্মদ্রোহিতার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে জানা যায়। ইসরাঈলীদের রক্তারক্তি ও হানাহানি এতই অস্বাভাবিক ছিল যে, পার্শবর্তী রাজাগণ তাদের রাজ্য দখল করার পরে একাধিকবার তাদেরকে এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়ন করেছেন। বিশ্বের ইতিহাসে জয়-পরাজয়ের অনেক ঘটনা রয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে বিতাড়নের এরূপ ঘটনা তেমন দেখা যায় না। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় দু হাজার বৎসর ইহূদীগণ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করেছে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপ ও আমেরিকার সহায়তায় হাজার হাজার বৎসর ধরে ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আররদেরকে হত্যা ও বিতাড়ন করে ফিলিস্তিনে আবার ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'বিশ্বের ১৯৩ টি রাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত রাষ্ট্র হলো ইসরাইল। মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির মূলে রয়েছে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলেন কূটচাল। এটি জবরদখলকারী এক রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং জীবাণুযুক্ত অস্ত্র ব্যবহার দেশটিকে বেয়ারা ও ঘৃণিত রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করেছে।'[৫৫০] বাইবেলের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ফিলিস্তিনে ইহূদীদের প্রথম অবস্থানের প্রায় হাজার বছরে কখনোই তারা পার্শবর্তী কোনো

---

৫৪৯ . ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫১-৫২

৫৫০ . Primenewsbd.com, 2 May 2021 (http://www.primenewsbd.net/2021/05/02.)

দেশের মানুষদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, ফিলিস্তিনে ইসরাঈলীদের অবস্থান এতদাঞ্চলের অশান্তির মূল কারণ। যতদিন তারা তথায় থাকবে ততদিন কোনোভাবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।[৫৫১]

মিডিয়ায় ইসলামের অপবাদ

আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে। তাদেরকে মৌলবাদী, চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ও জঙ্গি ইত্যাদি বলা হচ্ছে।[৫৫২] যখনই সমকালীন বিশ্বে ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা হয় তখন মুসলমানদেরকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। মুসলমানগণ অব্যবহিত কাল থেকেই সব ধরনের মিডিয়া থেকে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ মিথ্যা তথ্য ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা প্রায়শই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সহিংসতার সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন মিডিয়া কর্তৃক একলাহোমায় বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মুসলিম বিরোধী অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে আমেরিকান সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলো তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করল যে, এটি মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র। পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসল অপরাধী হল এক মার্কিন সেনা সদস্য।[৫৫৩] পুঁজিবাদী মিডিয়া ইসলামকে বর্বর, সন্ত্রাসী, জঙ্গি ধর্ম হিসাবে অনবরত প্রচার করে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে তাকে অবিরত নিন্দিত হতে হয়। উদ্দেশ্য, কোনো কিছুকে নিন্দিত না বানাতে পারলে তাকে ধরাশায়ী করা যাবে কেমন করে! কেবল শক্তিশালী মিডিয়ার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামের সঙ্গে শত্রুতাকে আজ জায়েয করে নিচ্ছে।’[৫৫৪] যাদের দাঁড়ি আছে, টুপি পরে, প্যান্ট গোড়ালির ওপর পরে। আসলে তারা রকেট লাঞ্চারের চেয়েও বিপদজনক? কেন এভাবে টার্গেট করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে? এর উত্তর হলো এ কাজটি করছে পশ্চিমা মিডিয়া। কারণ, মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতি ও কুটনীতিবিদরা।

পশ্চিমারা বিশ্বব্যাপী মিডিয়া জগতের প্রচার মাধ্যমের ওপর একচেটিয়া প্রধান্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব স্থাপনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে। তথ্য বিকৃতি ও ভুল তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে বিশেষত মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করছে। নানা কায়দায় ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা ও আকীদা-বিশ্বাসকে সমূলে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। মুসলিম জনগোষ্ঠির ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও জাগরণকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িত আখ্যা দিয়ে তারা বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল চালাচ্ছে। দুনিয়ার সব কটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ও টিভি নেটওয়ার্ক ইহুদী এবং পশ্চিমা জগতের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তাদের দেয়া তথ্য ও সংবাদ এবং প্রচারণার দ্বারা বিশ্বের মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে। যার ফলে তারা আজ ইসলাম, সন্ত্রাস ও জঙ্গিকে একই সরল রেখায় নিয়ে দু'টোকে পরস্পরের সমার্থক হিসেবে বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করছে। খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টারস'- এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস রয়টার একজন ইহুদী। ‘এসোসিয়েটেড’ প্রেসের ৯০ ভাগ পুঁজি ইয়াহুদী পুঁজিপতিদের। ‘ইউনাইটেড প্রেস’ দু'জন মার্কিন ইয়াহুদী ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি বিখ্যাত ফরাসী নিউজ এসেন্সী এ.এফ.পি.'- এর জন্ম ফ্রান্সে হলেও এর প্রতিষ্ঠাতা ও ফ্রান্সের ইয়াহুদী পরিবার হাভাস। এইসব নিউজ এজেন্সীর নিউজ প্রচারের জন্য রয়েছে লন্ডন, নিউইয়র্ক ও হংকং থেকে প্রকাশিত শত শত নামী দামী পত্রিকা, বিবিসি, সিএনএন, বিওএ, রয়টার, স্টার এর মতো রেডিও- টেলিভিশন কেন্দ্র এবং শত শত ওয়েব সাইট।[৫৫৫]

মিডিয়া ইসলামকে যেভাবে অপবাদ দেয় তার প্রথম কৌশলটি হলো, প্রায়ই দেখা যায় যে, তারা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু ভাড়াটিয়া কুলাঙ্গারকে তুলে ধরে। আর প্রচার করে যে এটাই হলো মুসলমানদের দৃষ্টান্ত। তারা এভাবে বলে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা অন্যায়কে উৎসাহ দেয়। আমরাও

---

[৫৫১]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৫৩-৫৪

[৫৫২]. ডা. জাকির নায়েক, *সন্ত্রাস কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?*, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ . ৩১

[৫৫৩]. ডা. জাকির নায়েক, *সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ*, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৭২

[৫৫৪]. https://www.pinterest.com/pin/793548396846192168.

[৫৫৫]. এম আবদুর রশিদ, ***বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও এর উৎস*** (ঢাকা : শব্দরূপ,২০০৬) পৃ. ৩৮

মানি যে, আমাদের মধ্যেও কুলাঙ্গার আছে। কিন্তু কিছু মুসলিম আছে যারা অন্যায় কাজ করে। মিডিয়া এসব মুসলিমদের তুলে ধরে প্রচার করে যে তারাই হলো ইসলামের দৃষ্টান্ত ও ইসলাম এসব অন্যায় কাজ করাকে উৎসাহ দেয় অথচ এই কাজগুলো মানবতার বিরুদ্ধে। এভাবে মিডিয়ার মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিছু ভাড়াটিয়া কুলাঙ্গার তুলে ধরে বলে তারাই মুসলিমদের দৃষ্টান্ত। যদি কেউ ইসলাম ধর্মকে বিচার করতে চায় তাহলে মুসলিমরা বা মুসলিম সমাজ কি করে সেটি বিচার করলে হবে না। ইসলাম ধর্মকে ইসলামের মূল ধর্ম গ্রন্থগুলো কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহর আলোকে বিচার করতে হবে।[৫৫৬]

দ্বিতীয় কৌশলটি হলো তারা স্থান, কাল, পাত্রভেদে প্রসঙ্গ ছাড়াই কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়। তৃতীয় কৌশলটি হলো তারা যে সমস্ত কুরআন ও হাদীস উদ্ধৃতি দেয় , তার তার ভুল ব্যাখ্যা করে । আর চতুর্থ কৌশলটি হলো এমন অপবাদ যেটি ইসলামে নেই, সেটিকে ইসলামের সাথে জড়িয়ে দেয়। মিডিয়ার পঞ্চম কৌশলটি হলো তারা যদি ইসলামের আলোকে ঠিক ব্যাখ্যাই দেয়, তবে সেটিকে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। তারা ভাবে যে মানবজাতির জন্য এটি একটি সমস্যা। তারা বলতে চায় যে ইসলাম মানবজাতির সমস্যার সমাধান, সমস্যা নয়। এভাবেই বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মিডিয়া ইসলামের অপপ্রচার করে। আর এখন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় দেখা যায় যে, তারা মুসলিমদের মৌলবাদী, চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ও জঙ্গি বলছে।

জিহাদ সম্পর্কে অপব্যাখ্যা

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের শুরু থেকে ক্রুসেড যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ইসলাম ধর্ম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দানব রূপে চিত্রিত করার জন্য ইউরোপের চার্চ ও রাষ্ট্রপ্রশাসন ইসলামের বিরুদ্ধে কয়েকশত বৎসর যাবত যে সকল জঘন্য মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েছে সেগুলির অন্যতম ছিল ইসলামের জিহাদ বিষয়ক নির্দেশনার অপব্যাখ্যা। এজন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ইসলামী দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ ও তাদের দেশগুলির নীরব ইসলামায়ন রোধে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ইস্যুকেই সর্বোত্তম বিবেচনা করে নিজেদের স্বার্থেই এসব সৃষ্টি করেন। এ সকল মুসলিম পণ্ডিত আফগান জিহাদকে অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেন। সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রতিবাদে আফগানিস্থানের মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা এ সুযোগে এ সকল প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে অস্ত্র, ট্রেনিং, প্রযুক্তি ও সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে। সারা বিশ্বে তাদের পক্ষে প্রচার চালায়। তারা তাদেরকে উস্কানির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করে। এরপর তারা বেপরোয়া হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলেন। পরিত্যক্ত ও উত্তেজিত এ সকল মানুষ আবেগ তাড়িত হয়েও অনেক কাজ করতে থাকেন। এছাড়া এ সকল মুজাহিদদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজস্ব অনুচর রয়েছে। যারা এদেরকে সংঘাতের পথে যেতে প্ররোচিত করে। তারা জিহাদ ও কিতাল বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলির অপব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহকে অকাল সংঘাতের পথে উস্কানি দেয়। এভাবে সারা মুসলিম বিশ্বে জিহাদের বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়।[৫৫৭] মুসলমানরা তাদের প্রতিপক্ষ ও শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার অনুমোদন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[৫৫৮] কিন্তু জিহাদের জন্য এ অনুমোদন কতিপয় শর্তসাপেক্ষ। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"[৫৫৯] ধর্মের মধ্যে কোন জোর জবরদস্তি নেই। ফলে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের বিকাশ ঘটানোর কোন সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "দ্বীনে কোনো জবরদস্তি নেই। ভ্রান্তি থেকে সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূতকে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।"[৫৬০] জিহাদের নামে যে কোনো গোষ্ঠী বা দল সন্ত্রাস এবং

[৫৫৬]. ডা. জাকির নায়েক, *মিডিয়া এ- ইসলাম*, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ১৯-২০
[৫৫৭]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ*, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৫০
[৫৫৮]. আল-কুরআন, ২২: ৩৯
[৫৫৯]. আল-কুরআন, ২: ১৯০
[৫৬০]. আল-কুরআন, ২: ২৫৬

নাশকতার চর্চা করবে তারা ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী এবং ইসলামকে ধ্বংস করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে, আবার যারা জিহাদের মতো পবিত্র ইবাদতকে সন্ত্রাস আখ্যা দিতে চায় তারাও ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু।[৫৬১]

ইসলামী শিক্ষার বিকৃতি

অনেকেই মনে করেন যে, ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্‌রাাসা শিক্ষার প্রসার সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য মূলত দায়ী। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিস্তারে মাদ্‌রাাসা শিক্ষার এ দায়িত্বের প্রকৃতি নির্ণয়ে এ সকল পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির অমুসলিম পণ্ডিতগণও ইসলামী শিক্ষাকেই মূলত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য দায়ী করছেন। তবে দায়িত্বের প্রকৃতি নির্ণয়ে তাদের মধ্যে এবং তাদের সাথে মুসলিম পণ্ডিতদের বিভিন্নতা রয়েছে। কেউ মনে করছেন যেহেতু ইসলামের মধ্যেই জঙ্গিবাদের শিক্ষা রয়েছে, সেহেতু ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার মানেই জঙ্গিবাদের প্রসার। যত বেশি কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ইত্যাদি ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা প্রসার লাভ করবে, ততই বেশি জিহাদী মনোভাব, অন্য ধর্ম ও মতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব ও মোল্লাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকার জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাব প্রসার লাভ করবে। এজন্য ইসলামী শিক্ষা বা ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসাররোধই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের প্রধান উপায়। অন্যরা মনে করেন যে, ইসলামের মধ্যে মূলত জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই, তবে ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বা মাদ্‌রাসাগুলিতে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথবা এগুলির পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ইসলামকে জঙ্গিবাদী রূপদানের সহায়ক। অথবা ইসলামী আবেগের অপব্যবহার করে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদেরকে সহজেই জঙ্গিতে রূপান্তরিত করা যায়। কেউ কেউ মনে করছেন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবেই ইসলামের শিক্ষা প্রদান কিছু ত্রুটি রয়েছে, যে কারণে এগুলি জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছে। এদের মতে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রোধের উপায়। মূলত ইসলামী শিক্ষাকে সন্ত্রাসী শিক্ষা হিসেবে বিশ্বের বুকে পরিচিত করার জন্য মূখ্য ভূমিকা পালন করছে ব্রিটিশরা, ইসলাম বিদ্বেষী ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের একটি ডায়রি পাওয়া যায়। এ বইটি Hakikat kitabevi ওয়েব সাইটে Confession of a British Spy নামে আছে। এ বইতে ইসলামী বিধ্বংসী কার্যক্রম বিষয়ে ষড়যন্ত্রমূলক আলোচনা রয়েছে। ২০০৬ সালে ঐ বইটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশনা করেছেন মোঃ এ, আর, খান ও এ, জে, আব্দুল মোমেন।'[৫৬২] পাশ্চাত্য অমুসলিম পণ্ডিতগণ যেমন কোনো কোনো মুসলিমকে সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত দেখে সন্ত্রাসীর ধর্মকে দায়ী করছেন, তেমনি অনেকে কোনো কোনো মাদ্‌রাসা শিক্ষিতকে সন্ত্রাসে লিপ্ত দেখে সন্ত্রাসীর শিক্ষাকে দায়ী করছেন। এ সকল পণ্ডিতের অনেকেই মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও মাদ্‌রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত নন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে তাঁরা জানতে পারেন যে, মাদ্‌রাসাগুলি জঙ্গিদের আখড়া এবং মাদ্‌রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ জঙ্গি কার্যক্রমে লিপ্ত। এ থেকে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্‌রাসা শিক্ষাই মূলত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিস্তারের জন্য দায়ী। যদি ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্‌রাসা শিক্ষাই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী হতো তবে মাদ্‌রাসার সকল ছাত্র- শিক্ষকদের মধ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা অনুভব করা যেত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কখনোই তা নয়। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা আলিম-উলামা, ইমাম ও পীর-মাশাইখগণ সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ হত্যা ও ধ্বংসের প্রতি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ও বিরোধিতা করেন।

বিগত প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উপমহাদেশের চালু রয়েছে এবং মূলত একই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে চলছে। এছাড়া অনুরূপ পদ্ধতির অগণিত মাদ্‌রাসা মালয়েশিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশে রয়েছে। এগুলি থেকে বের হয়ে আসা অগণিত মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ

---

[৫৬১]. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সম্পাদিত, ওরামা সম্মেলনে ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণা, ***ইসলামে চরমপন্থা ও সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই*** (ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০০৭) পৃ. ১৬

[৫৬২]. প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান , ***যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে*** (ঢাকা: কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ: ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১১

করেছেন। ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই তাঁরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্ম দেননি। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কিছু মাদ্‌রাসা ছাত্র-শিক্ষক এ অপরাধের সাথে জড়িত। তবে তারা কখনোই বিশ্বাস করেন না যে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের এ অপরাধের জন্য দায়ী। বরং তা তাদের ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি।[৫৬৩] ইসলাম সম্পর্কীয় স্বল্পজ্ঞানী লোক যাদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে ইসলামী বিধানকে এড়িয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। তাইতো রাসূল (সা.) বলেন, 'যখন কোন প্রকৃত আলেম বাকি থাকবেনা তখন মানুষ মূর্খদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে; তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তারা কুরআন-হাদীস ইলম বিহীন উত্তর প্রদান করবে, তারা নিজেরাও গোমরাহী হবে এবং অন্যদেরকেও গ্রহণ করবে।'[৫৬৪] সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের জন্য মাদরাসা শিক্ষাকে দায়ী করে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বা মাদ্‌রাসা শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিলে স্বভাবতই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হবেন এবং ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিপন্নতাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করবেন। এতে একমাত্র সন্ত্রাস ও জঙ্গিরাই লাভবান হবে এবং জাতি ভয়ংকর সংঘাতের মধ্যে নিপতিত হবে।

বিভক্তির পরিণতি

পতন ও অবক্ষয়ের যুগগুলিতে বিভক্তি ও দলাদলির এ অবস্থা থেকেছে। ক্রুসেড ও তাতার যুদ্ধের সময় শিয়া-সুন্নী, হানাফী-শাফিয়ী, শাফিয়ী-হাম্বলী এরূপ হানাহানি চলেছে। বিবাদমান বিভিন্ন দল ক্রুসেডার বা তাতারদের বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, আমরা আপনাদের পক্ষের শক্তি, আমাদের প্রতিপক্ষরাই আপনাদের শত্রু, কাজেই তাদের ঘায়েল করুন। কিন্তু ক্রুসেডার বা তাতারগণ যখন হত্যাকা- চালিয়েছেন তখন পক্ষ-বিপক্ষ বিচার করেন নি, সকল পক্ষের সকল মুসলিম নারী-পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন। বর্তমানে বোসনিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও অন্যান্য দেশে আমরা একই অবস্থা দেখতে পাই। আলিমগণ একে অপরকে খারাপ বলেছেন। আর দখলদার বাহিনী তাদের বোমাবর্ষণ ও গণহত্যাযজ্ঞে সকলকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন, কে কোন মতের তা যাচাই করছেন না।

ইসলাম শূন্যতা ও আল্লাহ বিমুখতা

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের করাল গ্রাসে বিশ্ব আজ উৎকণ্ঠিত। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সোচ্চার। এতো সব পদক্ষেপের পরও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বরং তা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। কোনো কিছুতেই সন্ত্রাস নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। কারণ পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসীরা সাদরে লালিত হচ্ছে? কেন বিশ্বের বুকে সন্ত্রাস টিকে যাচ্ছে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর হলো, ইসলাম শূন্যতা ও আল্লাহ বিমুখতা।[৫৬৫] ইসলাম সব সময় এ ধরনের অপতৎপরতামূলক কাজ থেকে দূরে থাকতে মানুষকে উপদেশ দেয়। আজ যারা এ ধরণের সন্ত্রাস ও জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা করছে তারা অবশ্যই ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছে।[৫৬৬]

ইসলামের ধর্মীয় বিধান, সংস্কৃতি অমান্য

ইসলাম ধর্মীয় বিধান, দেশীয় আইন ও সংস্কৃতি মানব জীবনের প্রধান চালিকা শক্তি। এ সব তাদেরকে সুন্দর জীবনের সন্ধান দিয়ে থাকে। যখন কোন মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন ও দেশীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করে না, তখন তার পক্ষে যে কোন অন্যায়-অপরাধ করা সম্ভব। ধর্মীয় ও নীতিগত শিক্ষার অভাব এবং বিভিন্ন সমাজও দেশের কৃষ্টি-কালচার, পরিবেশ ভিন্ন হওয়ায় মানুষ সহজে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এসব কাজ তখনই করা সম্ভব যখন নিয়ম নীতির বালাই থাকে না। এ ক্ষেত্রে অসৎ সঙ্গে বসবাস ও স্বার্থন্বেষী মহলের প্ররোচনা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এ জন্য সকলকে ধর্মীয় ও দেশীর কৃষ্টি-কালচারের

---

[৫৬৩]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ*, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ২৫-২৬

[৫৬৪]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ৩১

[৫৬৫]. ড. মুহাম্মদ আবদুর রশিদ ও মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ২২১

[৫৬৬]. মো: নুরুল ইসলাম, ***"উগ্র জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলাম :একটি পর্যালোচনা"*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৯ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০০৯), পৃ. ২১১

প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এ থেকে পরিত্রাণের একটাই পথ 'জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো' এই কথার মর্ম বুঝে জীবনের বাকি দিনগুলো কোনো না কোনো ভালো কাজে ব্যয় করা উচিত।[৫৬৭]

ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের আলোচ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপন

ইসলাম এবং মুসলিমরাই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হওয়ায় এর বাইরে যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে লিপ্ত তারা আড়ালে রয়ে যাচ্ছে। প্যালেস্টাইন ইস্যু মূলত তাদের নিজ ভূমির অধিকার আদায়ের ইস্যু। অথচ প্যালেস্টাইনী আত্ম নিবেদিত যোদ্ধাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে ধর্মীয় উগ্রপন্থী হিসেবে। তারা ইসরাইলী নৃশংসতা এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে শেষ পথ হিসেবে যে আত্মোৎসর্গের পথ বেছে নিয়েছে সে বিষয়টির প্রতি কারো উপলব্ধি হচ্ছে না। অবস্থাটি এমন হয়েছে যে, কে আসল নির্যাতনকারী আর কে নির্যাতিত তার নির্ণয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।[৫৬৮] তাই বলা যায়, ইসলাম ও মুসলমানরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের আলোচ্য বিষয় হওয়ার কারণে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী, জঙ্গি আখ্যা দেওয়া হয়। আজকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে বিশেষত পশ্চিমা মিডিয়ায় একটা বিবৃতি বার বার দেয়া হচ্ছে। সেটা হল সব মুসলামানই সন্ত্রাসী নয়, তবে সব সন্ত্রাসীই মুসলামান। যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সন্ত্রাস কেবল মুসলমানদের সম্পত্তি নয় এবং এ সন্ত্রাসের ব্যাপারে মুসলমানদের তেমন বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। ইসলামে এটার অনুমোদন দেয়া হয়নি। বরং ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[৫৬৯]

ইসলাম ও জঙ্গিবাদের মধ্যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত সম্পর্ক টানা

১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ারের ঘটনা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে নতুন বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে। এ ঘটনায় জনগণের মধ্যে বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সম্পর্ক টেনে আনার কারণেই এরূপ অবস্থা হয়েছে। এ ঘটনার পর বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে। এর ফলে কোন কোন মুসলিম দেশ দখল করে নেয়া হয়েছে আর এসব দেশগুলোতে নতুন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। যার পরিণাম অনুমান করা কঠিন। ইসলামী বিশ্বের উপর যে নতুন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তা বিদেশীদের অধীনে মুসলমানদের অবস্থাকে খারাপ করে দিচ্ছে। তাদের অবস্থা কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনের জনগণের ন্যায় রূপ নিয়েছে।[৫৭০]

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মূল কারণ না জানা

সন্ত্রাস ও জঙ্গি সমস্যার মূল কারণটা খুঁজে দেখা হয় না। যদি কোনো দেশে সন্ত্রাসী সংগঠন থাকে, তাহলে সেখানে গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে কি কারণে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। শুধু এভাবেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তাদেরকে হত্যা করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কেউ একজনকে হত্যা করলে দশজন আসবে। তাই এর পেছন ফিরে দেখতে হবে আসল কারণটা কি? কোন কারণে তারা এ পথ বেছে নিয়েছে এর মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে । উদাহরণ হিসেবে প্যালেস্টাইনের কথা বলা যায়। হিটলার যখন ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করল এবং অনেককে জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দিল, তখন প্যালেস্টাইনিরা বলেছিল, 'আহলান ওয়া সাহলান।' তোমরা আমাদের জ্ঞাতি ভাই আমাদের কাছে চলে আসো। ব্যাপারটা এরকম যে, আমি এক অচেনা লোককে বললাম কোনো অসুবিধা হলে আমার ঘরে এসে থাকো। কয়েক বছর পর সে আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। আর যখন আমি ঘরের বাইরে এসে শোরগোল শুরু করলাম এ কারণে যে, তারা আমার ঘর দখল করেছে, তখন আপনি আমাকে বলবেন, সন্ত্রাসী'। আসলেই আমি কি সন্ত্রাসী? শুধু মানবতার কারণে আমি আমার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আর

---

৫৬৭. মো: আব্দুর রহিম, *সামাজিক অবক্ষয় ও সন্ত্রাসের অন্তরালে বিচিত্র প্রতিযোগিতা*, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১৪

৫৬৮. আসমা বারলাস, *জিহাদ,ধর্মযুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ অপব্যখ্যার রাজনীতি*, মুহাম্মদ আবদুল আজিজ সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪৬-৪৭

৫৬৯. ডা. জাকির নায়েক, *সন্ত্রাস কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?*, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ২৩

৫৭০. এম রুহুল আমিন, *সন্ত্রাস,সন্ত্রাসবাদ এর মোকাবেলায়আন্তর্জাতিক প্রয়াস*, মুহাম্মদ আবদুল আজিজ সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৬৯

এখন আমিই কি-না সন্ত্রাসী। কাকে দোষ দেব? দোষ আসলে আমাদেরই। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আসলে সমস্যাটা কোথায়? সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সবাইকে একত্রিত করার শক্তিও দিয়েছেন। যদি মূল কারণটা খুঁজে দেখা হয় তাহলে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেন একজন মানুষ মরতে চায়? কে মরে যেতে পছন্দ করে? যে মানুষটা বলে, আমি নিজেকে মারতে পারি, তাহলে কেন সে আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মরবে না? যদি কোনো মনোবিজ্ঞানীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলবেন, মূল কারণ জানতে হলে প্রথমে ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, কেন তারা এগুলো করছে? সে ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায় যে, এর পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ আছে। আর কারণটা হচ্ছে, হতে পারে তাদের কিছু অংশ হয়রানির শিকার হয়েছে, আর কিছু অংশ আসলেই সন্ত্রাসী। কেউ মানুষকে অত্যাচার করে টাকার জন্য, কেউ হয়তো খ্যাতির জন্য, আবার কেউ হয়তো রাজনীতির জন্য। তবে এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল । হতে পারে তারা মুসলমান বা হিন্দু বা খ্রিস্টান। যখন মানুষ তাদের ওপর চালানো অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, তখন তার একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তখন সে বেছে নেয় সহিংসতার পথ। মনোবিজ্ঞানীরাও একথাই বলেন। মানুষের স্বভাব হলো অত্যাচারিত হলে তার প্রতিশোধ নেয়া। একজন মানুষ যে একটা আঙ্গুলও উঁচু করতে চায় না, কেন সে বন্দুক হাতে নিতে চাইবে? কেন এমনটা করতে হবে? সবার ভালোর জন্যই মূল কারণটা খুঁজে বের করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তবেই এ নিরীহ মানুষের ওপর সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বন্ধ হবে এবং সব মানুষ এক জাতি হিসেবে একসাথে বসবাস করতে পারবে।[৫৭১]

অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ

বর্তমান অন্যায়-অবিচার একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, অন্যায়, অত্যাচার-নির্যাতন সংঘাত জঙ্গিবাদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ।'[৫৭২] সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পেছনে মূল কারণ হল অন্যায় অবিচার। প্রতিশোধ পরায়ণতাই সন্ত্রাসের একমাত্র কারণ। যে কোনো দুর্ঘটনা হোক সেটা নাইন ইলেভেনের ঘটনা, ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ, ১৯৯৩
সালে মুম্বাই এর সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি। দ্বন্দ্ব সংঘাতের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষ দেয় যে, সংঘাতের প্রধান কারণ পৃথিবীর নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, দম্ভ ও ক্ষমতার অপব্যবহার, পার্থিব মোহ-মায়া এবং লোভ লালসা। এই ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ক্ষণিকের ক্ষমতা, নেতৃত্ব কর্তৃত্বের জন্য তারা মানবতার নির্মম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।[৫৭৩] ক্ষমতার লোভে একটি গোষ্ঠী মানুষকে অপতৎপরতামূলক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে । যার ফলে সহিংসতার সৃষ্টি হয়। ক্ষমতার দ্বন্ধে ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটে। ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতায় যাবার লোভে যে কোনো ধরণের কাজ করতে প্রস্তুত হয়।[৫৭৪] মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সমাজে তাদের ইখলাস এবং মধুর বাক্য, সত্য ও ন্যায়ের সাহায্যে এবং মর্যাদার দ্বারা। এর দ্বারা তারা লোকদেরকে ধোঁকা দেয়, আর তার সত্যবাদিতার ওপর আল্লাহর শপথ দ্বারা প্রমাণ সৃষ্টি করে। অথচ প্রকৃত পক্ষে সে অত্যন্ত ঝগড়াটে ও মানুষের শত্রু। কেননা সে এসব করে শুধু লোকদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। এমন করে অতি নিকৃষ্ট লোকেরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে প্রকারই হউক ক্ষমতা দখল করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যারা পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথাবার্তায় তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্ কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃত পক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না।"[৫৭৫]

---

৫৭১. ডা. জাকির নায়েক, *সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ*, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৭২

৫৭২. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান আশরাফী, ***অগ্রপথিক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ইসলাম*** (ঢাকা: ইফাবা: অক্টোবর ২০১৬ খ্রি.), সংখ্যা ১০, পৃ. ১০৯

৫৭৩. মাওলানা কাজী আবূ হুরায়রা, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ১৫৫

৫৭৪. মো: নুরুল ইসলাম, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ২১০

৫৭৫. আল-কুরআন, ২: ২০৪-২০৫

সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার

সমকালীন বিশ্বের সকল অশান্তি, যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অন্যতম কারণ ফিলিস্তিনে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, মুসলিম দেশগুলির সম্পদ ও ভৌগলিক অবস্থান ও ইউরোপ আমেরিকার উগ্র ধর্মভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদী নব্য রক্ষণশীলদের আবির্ভাব ও আধিপত্য। পবিত্র বাইবেল থেকে জানা যায় যে, ফিলিস্তিনে ইহুদীদের অবস্থান বিশ্বে অশান্তির অন্যতম কারণ। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ ইসরাঈল সন্তানগণকে আল্লাহর বিধান পালন ও মানবজাতির কল্যানের বিনিময়ে ফিলিস্তিনে তাদের বাসস্থান প্রদানের ওয়াদা করেন। কিন্তু পুরোহিতদের বিকৃতির কারণে তারা এ ওয়াদাকে তাদের জাতিগত সম্পদ বলে গণ্য করে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার বৎসর ইহূদীগণ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করছে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ খ্রি. ইউরোপ ও আমেরিকার সহায়তায় হাজার হাজার বৎসর ধরে ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আরবদের হত্যা ও বিতাড়ন করে ফিলিস্তিনে আবার ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাইবেলের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ফিলিস্তিনে ইহূদীদের প্রথম অবস্থানের প্রায় হাজার বছরে কখনোই তারা পার্শ্ববর্তী কোন দেশের মানুষদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, ফিলিস্তিনে ইসরাঈলীদের অবস্থান এতদাঞ্চলের অশান্তির মূল কারণ। যতদিন তারা তথায় থাকবে ততদিন কোন ভাবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। ফিলিস্তিনে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত হয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরো কঠিন করেছে। এর সাথে মিলিত হয়েছে নব্য রক্ষণশীলদের ধর্মচিন্তা। ইউরোপে বিশেষ করে আমেরিকায় খ্রিস্টধর্মীয় মৌলবাদিতা ও রক্ষণশীলতা ব্যাপক ভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। যারা খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস জানেন তারা নিশ্চিত জানেন যে, খ্রিস্ট ধর্মীয় রক্ষণশীলতার অর্থই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা।[৫৭৬] সাম্রাজ্যবাদীদের ধর্ম ও সাম্রাজ্যবাদ হাত ধরাধরি করে চলে। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ করেছে সেখানেই তারা নানা কৌশলে ধর্মান্তর করতে চেষ্টা করেছে। এখনো এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ইরাক ও আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি মিশনারি আগ্রাসনের প্রস্তুতির সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। তথায় মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যরা এবং তাদের ছত্রছায়ায় অন্যান্য প্রচারক সরাসরি অথবা সেবার নামে ধর্মান্তরের বহুমুখি চেষ্টা চালাচ্ছেন। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উপজাতি ও সংখ্যালঘুদেরকে বিভিন্ন প্রলোভনে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট তৈরি করা হচ্ছে। খ্রিস্টীয় ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বের ইহূদীদেরকে ফিলিস্তিন-জেরুজালেমে একত্রিত করে যীশুখ্রিস্টের পুনরাগমনের প্রেক্ষাপট তৈরি এবং মুসলিম দেশগুলিকে অস্থিতিশীল করে তাদের সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে একদিকে ফিলিস্তিন, ইরাক ও অন্যান্য দেশে নির্বিচারে নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে গণহারে হত্যা করা হচ্ছে, এ সকল মানবতাবিরোধী অপরাধের সরব সমর্থনের পাশাপাশি এগুলির বিরুদ্ধে সকল কণ্ঠকে নীরব করে দেওয়া হচ্ছে। বিক্ষুদ্ধ কেউ সন্ত্রাসের পথ বেছে নিলে তাকে ইসলামী জঙ্গি বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বিনা প্রমাণে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনাকে ইসলামী জঙ্গিদের কর্মকাণ্ড বলে দাবি করা হচ্ছে। প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রাণ যুবকদের ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করে তাদেরকে ডেকে এনে অস্ত্র, ট্রেনিং ও সমর্থন দিয়ে জঙ্গি তৈরি করা হচ্ছে। এরপর আর জঙ্গিবাদের অভিযোগে তাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের অন্য একটি দিক লক্ষণীয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ এখন প্রধানত যাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তাদের একটা ধর্মীয় পরিচয়ও আছে, তারা মুসলমান। অথচ এই ধর্মীয় পরিচয়ই আলোচ্য সন্ত্রাসবাদের মূল পরিচয় নয়। মূল পরিচয় হলো তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বিভিন্ন জাতির ওপর নিপীড়নের বিরোধী। বিরোধিতার এ পরিচয় ও চরিত্র আড়াল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের ওপর নির্ভরশীল মহল, তাদের দোসর রাষ্ট্রগুলোর শাসক শ্রেণি ও সরকারের পক্ষ থেকে ইসলাম ধর্মীয় পরিচয়কেই সামনে আনা হচ্ছে।

---

[৫৭৬]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪

এ ক্ষেত্রে তথ্য ও তত্ত্বেরও অভাব নেই। সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নকে সামনে তুলে এসব প্রতিরোধকে উপস্থিত করা হচ্ছে দুই সভ্যতার সংঘর্ষ হিসেবে। এভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী মৌলবাদীদের এক প্রকার নতুন উত্থান হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, নিপীড়ন ও লুণ্ঠনই ইসলামী মৌলবাদের উত্থানের বাস্তব ভিত্তি। আগে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রাম পরিচালিত হতো কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট প্রভাবিত ও ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন জাতীয়তাবাদী শক্তির দ্বারা। বিশ শতকের আশির দশকের শেষ দিকে পূর্ব ইউরোপ ও তার ঠিক পরেই সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও চীনে পুঁজিবাদের পুরোদস্তুর পুনপ্রতিষ্ঠার পর যে সামরিক হতাশা সারা বিশ্বের জনগণ ও প্রগতিশীল মহলে সৃষ্টি হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার ফলে জনগণের প্রগতিশীল অংশের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়াই ইসলামী মৌলবাদী শক্তির উত্থানের সব থেকে বড় কারণ। একদিকে একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজোড়া আগ্রাসী তৎপরতা এবং অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে চিরাচরিত প্রতিরোধের শক্তি নিদারুণভাবে হ্রাস ও খর্ব হওয়াই মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়াসহ অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম মৌলবাদী শক্তির উত্থানের শর্ত সৃষ্টি করেছে। ইসলামী মৌলবাদ এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। কিন্তু ঐতিহাসিক গতিপথের এমনই লীলাখেলা যে, এই প্রতিক্রিয়াশীলরাই এখন সাম্রাজ্যবাদের জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছে এক প্রবল প্রতিরোধের শক্তি হিসেবে। এই প্রতিরোধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসর রাষ্ট্রগুলোকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করলেও এর এমন কোনো পরিণাম নেই যা বিশ্বের জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধান, জাতিগত নিপীড়নের অবসান ও বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত করতে পারে।[৫৭৭]

মুসলিম দেশগুলোর তেল সম্পদ লুণ্ঠন ও আধিপত্য বিস্তার

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চল হলো মধ্যপ্রাচ্য। এই অঞ্চলে ইরান ও তুরস্ক ছাড়া প্রত্যেক দেশেই আরবদের বার্স এবং এই আরবদের অধিকাংশই মুসলমান । ইরানী ও তুর্কীরাও মুসলমান। মধপ্রাচ্য আবার মধ্য এশিয়ার মতো একটি তেলসমৃদ্ধ অঞ্চল। এই তেলের ওপর দখলদারী ও তেল সম্পদ অবাধে লুণ্ঠনই[৫৭৮] হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আসল লক্ষ। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় তেলের দেশ সৌদি আরব। এর ওপর মার্কিনীদের নিয়ন্ত্রণ বহুদিন থেকেই আছে। এখানে তাদের সামরিক উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য। এসব কারণে সৌদি রাজপরিবার ও শাসকশ্রেণি যতই মার্কিনের সেবাদাস হোক, তাদের একটা অংশ মার্কিন বিরোধী। ওসামা বিন লাদেনও এই মার্কিন বিরোধী আন্দোলনেরই লোক। মার্কিন উপস্থিতির বিরোধিতার কারণেই তার সৌদি নাগরিকত্ব খারিজ করে তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ইরানের শাহ ও লিবিয়ার রাজা ইদরিস এ দুই দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ায় সেখানকার বিশাল তেল সম্পদে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ব্যাঘাত হয়। এর ফলে এ দুই দেশ তাদের পরম মিত্র থেকে চরম শত্রুতে পরিণত হয়। ইরানকে পর্যুদস্ত ও পুনর্দখলের জন্য আশির দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দামকে কাজে লাগিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ যুদ্ধ বাঁধিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা ইরানকে আগের মতো আয়ত্ব করতে পারেনি এবং মার্কিন বিরোধিতা উক্ত দেশেই তীব্র। সুদান ও সোমালিয়ার অবস্থাও তাই। এ দুই দেশের বিপুল পরিমাণ তেল আছে যার ওপর দখল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাজেই এদের সঙ্গেও মার্কিনিদের সম্পর্ক সুখকর নয়।

সিরিয়ায় তেলের স্বার্থ এত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ইসরাইলীদের সঙ্গে সিরিয়ার শত্রুতার সম্পর্কের জন্য যুক্তরাষ্ট্র তাদেরও শত্রু। একই কারণে মুসলমান ও খ্রিষ্টান অধ্যুষিত লেবাননের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খুব খারাপ। মধ্যপ্রাচ্যের দক্ষিণাংশে উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোতেও তেলের মজুদ বিরাট। সৌদি আরবের মতো এই দেশগুলোর ওপরও মার্কিনিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোতে বিশেষ করে কুয়েত, কাতার ও বাহরাইনে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। তেলের প্রশ্ন বাদ দিয়ে মধ্য ও দূরপ্রাচ্যের এই দেশগুলোতে মার্কিন নীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে যাওয়া একেবারেই অবাস্তব। তেল স্বার্থ থেকে সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি অবিচ্ছেদ্য।

---

[৫৭৭]. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩-১০৫

[৫৭৮]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ যতই সন্ত্রাসবাদ এবং গণবিধবংসী অস্ত্রের কথাই বলুন, তার প্রকৃত স্বার্থ হলো তেল। ইরাকের তেলের ওপর নিরঙ্কুশ দখল প্রতিষ্ঠা ও সেখান থেকে অবাধে তেল লুণ্ঠনের জন্যই বুশ ইরাক ও সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে এমন যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছিল। এইসব দেশের জনসংখ্যার সামান্য অংশ বাদে বাকি সকলেই মুসলমান। এখানে তাদের জাতীয় পরিচয় আরব, ইরানী, তুর্কী হলেও তাদেরকে মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত করা সহজ। এভাবে আখ্যায়িত করে তাদের জাতিগত পরিচয়, তাদের ওপর জাতিগত শোষণ নিপীড়ন, মধপ্রাচ্যে মার্কিনিদের তেল-স্বার্থ ইত্যাদি সবকিছু আড়াল করে তাদেরকে ইসলামী মৌলবাদী হিসেবে উপস্থিত করে মার্কিনসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও তাদের অন্য দেশীয় দোসরা নিজেদের দানবীয় প্রচার মাধ্যমে বিশাল আকারে ও নিয়মিতভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ইত্যাদির সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শত্রুতা সৃষ্টি হলেও এদেশগুলোর জনগণ ও শাসক দল ইসলামী মৌলবাদী নয়। তাদের সংগ্রাম মূলত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন

ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও চরমপন্থার উত্থানের প্রধান কারণ বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের ওপর নির্বিচার অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ। এ নিধনযজ্ঞের বড় একটি দিক ইসরায়েল রাষ্ট্রের মাধ্যমে ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্যে হত্যাযজ্ঞ। এছাড়াও চেচনিয়া, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, চীনের উইঘুর, সিরিয়া, ইরাক আফগানিস্তান, মায়ানমার ভারত ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্বিচার জুলুম, অত্যাচার ও জাতিগত নিধনযজ্ঞ (ethnic cleansing) চলছে। আর আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ জাতিসংঘ, পাশ্চাত্য দেশগুলি ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম এ নিধনযজ্ঞের বিষয়ে নীরব বা সরব সমর্থক। এর বিরুদ্ধে কেউই সরব নয়। এ পরিস্থিতিতে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের অদম্য আবেগই চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিচ্ছে। মানুষ যখন নির্বিচার অত্যাচারের প্রতিবাদে আইনগতভাবে কিছুই করতে না পারে তখন বে-আইনীভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। এ জন্য সারা বিশ্বের মুসলিম মানস এ নিধনযজ্ঞের অবসান ও মুসলিম সভ্যতার বিজয় কামনা করছে। এরূপ আবেগ ও হতাশা থেকেই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাঈল বা অন্য কোনো দেশের অন্যায় বা জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ বা জুলুমের প্রতিকার করতে আবেগী যুবক সাধারণ মার্কিন নাগরিককে বা মার্কিনীদের সাথে সহযোগী বলে অন্য কোনো দেশ ও ধর্মের কোনো মানুষকে হত্যা করেন। এ জাতীয় আবেগতাড়িত হওয়ায় তার এ কর্মটি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কঠিন অন্যায় ও পাপ। কারণ-
(১) ইসলাম অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় পদ্ধতিতে করতে অনুমতি দেয় না,
(২) ইসলাম একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি প্রদানের অনুমতি দেয় না এবং
(৩) ইসলাম কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীকে বিচার বা শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণের অনুমতি দেয় না। এজন্য কখনোই কোনো দেশের প্রাজ্ঞ আলিম ও মুফতীগণ এরূপ প্রতিশোধ বা প্রতিবাদ বৈধ বলেন না। তাঁরা এ সকল ক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে, শান্তিপূর্ণভাবে সহিংসতা বর্জন করে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপনের উৎসাহ দেন। তবে আবেগী যুবক তো তাদের ফাতাওয়া নিয়ে কাজে নামেননি। বরং আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করেছেন এবং আলিমগণের ফাতওয়াকে দুর্বলতা বা দালালি বলে গণ্য করেছেন। তার আবেগের পক্ষে অন্য আরেক আবেগী আধুনিক অর্ধ-আলিম ধর্মগুরু বা মুফতীর ফাতাওয়া তার কাছে যুগোপযোগী, সঠিক ও দ্রুত ফল লাভের সহায়ক বলে মনে হয়েছে।[৫৭৯]

ইসলামের বিপন্নতায় হতাশা

হতাশা মানুষকে মরিয়া (desperate) করে তোলে। এতে মানুষ উগ্রতায় নিপতিত হয়। মুমিন সমকালীন পরিস্থিতি দেখে ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে এরূপ মরিয়া হয়ে উঠতে পারেন।

ইসলাম বিপন্ন বলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পোপের নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ, ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও বিনা-হিসাবে জান্নাত গমনের উন্মাদনা নিয়ে

---

[৫৭৯] . ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র ইউরোপ একত্রিত হয়ে ১০৯৫ খৃ/৪৮৮ হি থেকে প্রায় ২ শত বৎসর বর্বর ক্রুসেড যুদ্ধ করেছে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির বিরুদ্ধে। পঙ্গপালের মত মিলিয়ন মিলিয়ন ধর্মযোদ্ধা ক্রুশ উচিয়ে মুসলিম দেশগুলিতে ঝাপিয়ে পড়েছে, নারী, পুরুষ ও শিশু-সহ লক্ষলক্ষ মানুষ হত্যা করেছে এবং একের পর এক মুসলিম দেশ দখল করে নিয়েছে। ক্রুসেডারগণ দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, কয়েক বছরের মধ্যেই তারা মক্কা ও মদীনা দখল করে ইসলামকে চিরতরে নির্মুল করবেন। সমাজ সচেতন মুসলিম ও 'দায়ী'গণ অনেকেই ভেবেছেন, ইসলাম বুঝি বিপন্ন। কিন্তু ইসলাম বিপন্ন হয় নি। পাপ, অনাচার, জুলুম, দলাদলি ও হানাহানিতে লিপ্ত মুসলিমগণ শাস্তি পেলেও ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। মুসলিমদের ঐক্য ও প্রস্তুতি ছিল না। তার পরও মুসলিমগণ আগ্রাসী ক্রুসেডারদের সকল মুসলিম ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। উপরন্তু ক্রুসেড যুদ্ধের পরে এরই ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ে মুসলিমগণ পূর্ব ইউরোপের প্রায় অর্ধাংশ অধিকার করতে সক্ষম হন। ক্রুসেডারগণ চেয়েছিলেন ইসলামকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুছে দিতে। কিন্তু এ যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ইউরোপে স্থায়ীভাবে তার আসন গেড়েছে।

ক্রুসেড যুদ্ধের পরেই পূর্ব থেকে তাতার আক্রমন শুরু হয়েছে। অকল্পনীয় বর্বর সে আক্রমনের সামনে একের পর এক মুসলিম দেশের পতন হয়েছে। লক্ষলক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ধ্বংস হয়েছে সম্পদ ও মানব ঐতিহ্য। মুসলিমগণ ভেবেছেন, ইসলাম বুঝি শেষ। কিন্তু পাপ, অনাচার ও বিচ্ছিন্নতায় আকণ্ঠ লিপ্ত মুসলিম সমাজের মানুষেরা শাস্তি পেলেও ইসলাম শেষ হয় নি। যে সময়ে তাতারদের হাতে ইরান, ইরাক, সিরিয়া অন্যান্য দেশের মুসলিমগণ নিহত হচ্ছেন, সে সময়ে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ব্রুনাই, থাইল্যা- ইত্যাদি দেশের অগণিত মানুষ ক্রমান্বয়ে ইসলামের ছায়াতলে আগমন করছেন। সর্বোপরি যে বর্বর তাতার জাতি অমানবিক আক্রোশে মুসলিম দেশগুলি ধ্বংস করেছে, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং সারা বিশ্বে ইসলামী বিজয়ের ঝা-াকে এগিয়ে নিতে থাকে। মানব ইতিহাসের এ এক অলৌকিক বিষয়। একটি বিজয়ী জাতি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটি বিজিত জাতির ধর্ম গ্রহণ করে সে ধর্মের বিজয় তরান্বিত করতে লাগল! অনুরূপভাবে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে মুসলিম দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ককে পরাজিত করে ক্রুসেডারগণ ভেবেছিলেন যে, ইসলামের রাজনৈতিক পরিচিতি মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছে এবং অচিরেই মিশনারি কর্ম ও ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মও বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের সে চিন্তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীন মুসলিম দেশগুলিতে পুনরায় ইসলামী জাগরণ ও ইসলমী জীবনব্যবস্থার দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জোরদার হতে থাকে। এ দাবী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের হৃদয় স্পর্শ করে। তখনই এ দাওয়াতকে "উগ্রতা"-র পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও অন্যান্য ইসলামী দাওয়াতী কর্মকা-কে জামাল আব্দুন নাসির ক্ষমতায় আরোহণের জন্য ব্যবহার করেন। এরপর অতর্কিত নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে এ সকল দাওয়াতী কর্মকাণ্ড কে উগ্রতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এতে জনপ্রিয় দাওয়াত জনবিচ্ছিন্ন উগ্রতায় পর্যবসিত হতে থাকে। যখন দাওয়াতের নেতৃবৃন্দ একে মধ্যপন্থায় আনতে চেষ্টা করেন, তখন আবার "জামাআতুল মুসলিমীন" ধরনের উগ্র দল সৃষ্টি করে আলিম, আল্লাহর পথে দাওয়াতদানকারী ও ধার্মিক মানুষদেরকে এবং ইসলামী জাগরণকে জনগণের কাছে ঘৃণ্য ও জনবিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চলে।

১৯৮৮-১৯৯২ সালে আলজেরিয়ায় ইসলামী দাওয়াত জনপ্রিয়তা লাভ করে। জাতীয় নির্বাচনে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে ইসলামপন্থীদেরকে উগ্রতার পথে ঠেলে দেওয়া হয়। আবেগতাড়িত হয়ে তারা অস্ত্র ও সহিংসতার পথে পা বাড়ায়। আর এর ফলে জনপ্রিয় একটি আন্দোলন জনবিচ্ছিন্ন ও জনধিকৃত সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হয়।

এভাবে সর্বদা জনপ্রিয় দীনী দাওয়াতকে উগ্রতার মাধ্যমে জনবিচ্ছিন্নন ও জনধিকৃত বানিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রয়োজেন উগ্রতার প্রচারকদের রোপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের সতর্ক হতে হবে। জামাআতুল মুসলিমীনের কর্মকাণ্ড থেকে মিসর ও ইস্রায়েল সরকার সকল সুবিধা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু দীনী দাওয়াত নির্বিচার নিপীড়ন ও নির্যাতন ছাড়া কিছুই পায়নি। ৯/১১ বা ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলা থেকে আমেরিকার নব্য-রক্ষণশীলগণ ও যায়নবাদী ইহুদীগণ সকল প্রকার

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধা লাভ করেছেন, কিন্তু মুসলিম উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনুরূপ "জামাআতুল মুসলিমীন" বা "৯/১১" তৈরির চেষ্টা বারংবারই করা হবে। এর ক্ষপ্পরে যেন আবেগী যুবকগণ না পড়েন তা নিশ্চিতকরতে দীন প্রতিষ্ঠা বা দীনী দাওয়াতের সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি এবং বিভ্রান্তির উৎসগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

কোনো অবস্থাতেই হতাশ হওয়া বা দ্রুত ফল লাভের চেষ্টা করা মুমিনের কর্ম নয়। মুমিনের দায়িত্ব কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে নিজের দায়িত্ব পালন করা। কোনো মুসলিম রাষ্ট্র জিহাদের শর্ত পূরণ করে জিহাদের আহ্বান করলে সম্ভব হলে সে জিহাদে শরীক হওয়া। আর সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাতের নির্দেশানুসারে সাহাবীগণ ও পরবর্তীগণের কর্মধারার আলোকে ধৈর্য, প্রজ্ঞা, ও বিনম্রতার সাথে দীনের দাওয়াত এগিয়ে নেওয়া।

ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা দেখি যে, সুন্নাতের আলোকে সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। অন্যায় পরিবর্তনের আবেগ, দ্রুত ফল লাভের উদ্দীপনা বা অন্যায়ের প্রতি অপ্রতিরোধ্য ঘৃণা ইত্যাদির কারণে আবেগী হয়ে যারা সন্ত্রাস, সহিংসতা বা যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছেন তারা ইসলামের কোনো কল্যাণ করতে পারেন নি। খারিজীগণ, বাতিনীগণ ও অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তাদের অনুসারীদের অনেক গরম ও আবেগী কথা বলেছেন এবং অনেক 'পরিবর্তনের' স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু তারা স্বল্প সময়ের কিছু ফিতনা ছাড়া কিছুই করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থা অনুসারী আলিমগণ বিদ্রোহ, উগ্রতা, শক্তিপ্রয়োগ, জোরপূর্বক সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিহার করে শান্তি-পূর্ণভাবে জনগণ ও সরকারকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে যুগে যুগে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় রোধ করেছেন।

দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

প্যালেস্টাইনীরা দখলদার ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এ পথে তারা তাদের নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করছে। প্রাণ উৎসর্গ করার এ ধারাকে অনেকে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের রূপ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং যেসব তরুণ-তরুণী নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে তাদেরকে নৃশংস মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানী পাইলটদের কথা ভুলার নয়। অথচ আত্মঘাতী হামলার প্রথম দিক নির্দেশক এই জাপানী পাইলটরা। জাপানি এবং ইহুদী আত্মঘাতীদের শত শত মানুষ হত্যার পিছনে তাদের প্রেরণা ছিল তাদের রাজা, দেশ এবং ধর্ম। তাহলে মুসলিম আত্মঘাতীদের ওপরেই কেবল নৃশংসতার এ দোষ চাপানো কেনো? তাই বলা যায়, দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গ করার কারণে মুসলমানদের সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদী আখ্যা দেওয়া হয়।

ইসলাম প্রচার প্রসারের গতিরোধ

পাশ্চাত্য বিশ্ব একটি গুরতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তা হলো তাদের দেশগুলির নীরব ইসলামায়ন। ইসলাম মানুষের জীবন-ধর্ম। ইসলামের সহজ-সরল বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয় সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। মানুষের প্রকৃতির সাথে এ ধর্ম মিশে একাকার হয়ে যায়। মানব প্রকৃতি অতি সহজেই একে গ্রহণ করে। আধুনিক সভ্যতার নৈতিক অবক্ষয়, অশ্লীলতা, বিলাসিতা ও অমানবিকতার মধ্যে নিপতিত পাশ্চাত্য দেশগুলির অনেক মানুষই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য জানলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। অশ্লীলতা, বিলাসিতা ও মাদকতার প্রসারে ইউরোপ আমেরিকার পরিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে গিয়েছে এবং তথাকার প্রকৃত সাদা অধিবাসীদের জনসংখ্যা দ্রুত কমছে। এ সকল দেশ তাদের শিল্প, কারখানা ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে বাইরের অভিবাসী গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে প্রতিনিয়ত অনেক মুসলিম এ সকল দেশে প্রবেশ ও বসবাস করছেন। এদের সংস্পর্শে এসে এ সকল দেশের মূল অধিবাসীদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছেন। এভাবে এ সকল দেশে নীরবে ইসলামের বিস্তৃতি চলছে। এ বিস্তৃতি ঠেকাতে, মুসলিম অভিবাসীদেরকে নাগরিকত্ব না দিতে, বহিস্কার করতে এবং সর্বোপরি মূল অধিবাসীদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার ও ইসলামের বাস্তবায়ন অতীব জরুরী। ছদ্মাবরণে ঔপনিবেশিক চক্রান্তের নীল নকশার আদলে একদিকে যেমন আরব বিশ্বকে টুকরো

টুকরো করা হয় তেমনি মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী সম্ভাবনাময় একটি দেশকে ধর্মনিরপেক্ষতার লীলাভূমিতে পরিণত করে ইসলামী বিধান ও সংস্কৃতির ধারক, বাহক পৃষ্ঠপোষক এ দেশ থেকে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চালানো হয়।'[৫৮০] আর এজন্য তারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ইস্যু অতীব কার্যকর বলে মনে করেছেন।[৫৮১] পৃথিবীতে এখন ইসলামের অনুসারী বাড়ছে সর্বোচ্চ গতিতে। ঐ লোকগুলো হয়তো ভয় পাচ্ছে যে, ইসলামের যেভাবে বিস্তৃতি ঘটছে, তাতে করে তারা এখন যা করছে সে কাজগুলো তাদেরকে বন্ধ করতে হবে। প্লেইনট্রুথ ম্যাগাজিনের একটি পরিসংখ্যানমূলক খবর যেটা রিডার্স ডাইজেস্টের অ্যালম্যানাক ইয়ারবুক ১৯৮৬-এর রিপ্রোডাকশন ছিল। যেখানে বলা হয়েছে, ১৯৩৪ থেকে ৮৪ সালের মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা সংখ্যা কত বেড়েছে? সে পরিসংখ্যানে এক নম্বরে ছিল ইসলাম, সেটা ছিল ২৩৫%। খ্রিস্টান ধর্ম মাত্র ৪৭%। আমি একটা প্রশ্ন করছি ১৯৩৪ থেকে ৮৪ সাল পর্যন্ত কোন যুদ্ধটা হয়েছে? যে কারণে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছে? আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা আছে। ইউরোপেও কথা বলারস্বাধীনতা আছে। ইসলাম যদি মহিলাদের অত্যাচার করে, তাহলে অমুসলিম মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করে কেন? কীভাবে

তারা মুসলমান হচ্ছে, তাদের তিন ভাগের দুই ভাগই মহিলা? কারণ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামে সকল সমস্যার সমাধান আছে। আমেরিকার একটা রির্সাচ কোম্পানি যার অফিস ওয়াশিংটনে- তারা বলছে যে, ১১ সেপ্টেম্বরের ২ মাস পর ২০ হাজার লোক মুসলমান হয়েছে।[৫৮২] তাই বলা যায়, ইসলাম প্রচার প্রসারে গতিরোধ করার জন্য মুসলমানদের সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী আখ্যা দেওয়া হয়।

শান্তি স্থাপনের নামে অশান্তি সৃষ্টি

বর্তমানে যে সব জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদের দাবি তারা দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন করতে চায়। প্রশ্ন হলো এ ধরনের বোমা হামলা ও আত্মঘাতি হামলার মাধ্যমে কিভাবে শান্তি স্থাপন করা যায়? আল-কুরআনে এ ধরণের কার্যক্রমে যারা লিপ্ত থাকে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, “তাদেরকে যখন বলা হয় পৃথিবীতে অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাইতো শান্তি স্থাপনকারী।”[৫৮৩] শান্তি স্থাপনের নামে যারা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য তৈরিতে লিপ্ত তারা গোমরাহীতে লিপ্ত, ইসলাম তাদের সাথে নেই। তারা মিথ্যা বুলি দিয়ে ইসলামের নামে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তাদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে শুধু এতটুকুই নিবে যতখানি তোমাদের উপর অত্যাচার করা
হয়েছে, কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।”[৫৮৪]

নিজ ধর্মকে অন্য ধর্মের ওপর প্রধান্য

নিজ ধর্ম বিশ্বাস যখন অন্য ধর্মকে প্রতিহত করে, অন্য ধর্মকে বৈরী বিবেচনা করে যখন কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা ছাড়াই নিজ ধর্ম বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখতে চায় তখনই এর ভেতর থেকে মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদ।[৫৮৫] ইহুদী ও খ্রিষ্টান, বৈদ্য, স্বনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজস্ব ধর্মকে সুপতিষ্ঠিত করতে বদ্ধ পরিকর। বিশেষ করে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা খ্রিষ্টানিটি বিস্তৃতির জন্য বিভিন্ন এনজি ও মিশোনারী পারিচলনা করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হলো সকল ধর্মের ওপর নিজেদের ধর্মকে সমুন্নত করা এবং অন্যান্য ধর্ম তথা ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলামকে এমনভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়, যাতে মানুষ ইসলাম থেকে বিমুখ হয়।

---

[৫৮০]. মতিউর রহমান, ***ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ*** (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ: মার্চ ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৬
[৫৮১]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ*, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৫০
[৫৮২]. ডা. জাকির নায়েক, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪১
[৫৮৩]. আল-কুরআন, ২: ১১
[৫৮৪]. আল-কুরআন, ১৬: ১২৬
[৫৮৫]. এ কে এম শাহনেওয়াজ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১৭৭

শাসকের সাথে বিরোধীদের দ্বন্ধ

যে কোন রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি সরকার বা শাসক থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ উন্নয়ন কার্যক্রম যদি দেশের মানুষের স্বার্থ, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ও জনগুরুত্বপূর্ণ অধিকারের পরিপন্থী হয় সর্বোপরি যদি তা মানুষের ঈমান-আকিদা ও বিশ্বাসের পরিপন্থি হয় তাহলে তারা সরকারের বিরুদ্ধে দ্বন্ধে জড়িয়ে পড়ে। আর এ দ্বন্ধ রূপ নেয় দূর্বার আন্দোলনে। এ আন্দোলন ঠেকানোর জন্য সরকার তার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রয়োগে দমন-পীড়ন চালিয়ে ধাবিয়ে রাখতে চায়। এ ধাবিয়ে রাখা থেকে জন্ম নেয় সস্বস্ত্র সংগ্রাম। আর এ সস্বস্ত্র সংগ্রাম এক সময় গিয়ে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদে রূপ নেয়।

বেকারত্ব ও হতাশা

বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন ও মুসলিম দেশে ইসলাম-দমন কেন্দ্রিক ক্ষোভ সকল মুসলিম দেশে বিদ্যমান থাকলেও ইসলামী চরমপন্থা সকল দেশে সমানভাবে বিস্তার লাভ করেনি। ইন্দোনেশিয়ায় যেরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রম লক্ষ করা যায়, মালয়েশিয়াতে তা পাওয়া যায় না, অথচ ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, মাদরাসার সংখ্যাধিক্য এবং আমেরিকা ও পাশ্চত্য বিরোধী মনোভাব মালয়েশিয়াতে বেশি। এর বড় কারণ সম্ভবত মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পাশ্চাত্য আগ্রাসন ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের সুস্পষ্ট মতামত। কর্মব্যস্ত ও পরিতৃপ্ত মানুষের মনে ক্ষোভ বা আবেগ বেশী দিন স্থান পায় না। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্য তাদের মনের আবেগ প্রতিধ্বণিত হয়। ফলে তা প্রকাশের জন্য বিকৃত পথের সন্ধান করে না। পক্ষান্তরে বেকার, সামাজিক বৈষম্য বা প্রশাসনিক অনাচারের শিকার মানুষের মনের ক্ষোভ ও হতাশাকে এ সকল আবেগ আরো উস্কে দেয়। এছাড়া এরূপ মানুষকে সহজেই বুঝানো যায় যে, এভাবে দুই-চারিটি বোমা মারলে বা মানুষকে খুন করলেই তোমার মত অগণিত মানুষের বেকারত্ব বা অত্যাচার শেষ হয়ে শান্তির দিন আসবে। বাংলাদেশে যারা সর্বহারার রাজত্ব বা ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সহিংসতা ও সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাদের বিষয়ে যে কেনো মাঠ জরিপে বিষয়টি প্রমাণ করে। এমনকি আঞ্চলিক বিভাজনও তা প্রমাণ করে। বাংলাদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে যেভাবে সমাজতন্ত্রী জঙ্গি বা ইসলামী জঙ্গির রিক্রুটমেন্ট সম্ভব, রাজধানী ও তার পূর্ব দিকে তা সম্ভব নয়। এসব এলাকার অর্থনৈতিক দৈন্যতা, বেকারত্ব ইত্যাদি এর অন্যতম কারণ।[৫৮৬] সুতরাং এ সকল কারণ সমূহের প্রেক্ষিতে ইসলামের নামে বিভিন্ন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রম সংঘটিত হয় এবং মুসলমানদের সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী বলে আখ্যা দেওয়া হয়। অথচ ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অনুমতি দেয়নি। আর ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই।

মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত

মানুষ স্বাধীন ভাবে এ পৃথিবীতে এসেছে। পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হতে চায় না। তারা চায় মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশের উড়ে বেড়াতে। আর এ মৌলিক অধিকারগুলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা। এ চাহিদা পূরণে মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। যখন কোন চাহিদা মেটাতে মানুষ ব্যর্থ হয় বা কেউ তার এ অধিকার খর্ব করে তখন তারা তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বৈধ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সম্ভব না হলে তখন তারা সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মত পথ অবলম্বন করে থাকে। তাতে ব্যক্তি নিজেও ক্ষতিগ্রস্থ হয় আবার অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে। এতে করে সমাজ ও রাষ্ট্র একটি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়।

---

[৫৮৬]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৫৯-৬০

মুসলিম দেশে ইসলাম-দমন

মুসলিম দেশগুলিতে উগ্রতা ও সন্ত্রাস প্রসারের অন্যতম কারণ এ সকল দেশে ইসলাম-দমন। বিশ্বের যে কোনো মুসলিম দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তাদের প্রায় ১০% বা ১৫% মানুষ ধার্মিক মুসলিম, যারা ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের চেষ্টা করেন এবং সকলেই এরূপ করুক বলে আশা করেন। এর বিপরীতে জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশ- ২% বা ১%-এরও কম মানুষ ধর্মকে আফিম, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন বা দাবি করেন এবং টুপি, দাড়ি, বোরকা, মসজিদ, মাদ্‌রাসা ইত্যাদি ধর্মপালন বা ধর্মশিক্ষার প্রসারে আতঙ্কিত হন। বাকী প্রায় ৮০-৮৫% ভাগ মানুষ সাধারণ মুসলিম। যারা ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না, ধর্মের কিছু বিধান পালন করেন, কিছু পরিত্যাগ করেন এবং সাধারণভাবে ধর্ম ও ধার্মিকদের শ্রদ্ধা করেন। বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায় যে, অনেক মুসলিম দেশে বাকস্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে দ্বিতীয় প্রকারের মানুষদেরকে তাদের মতপ্রকাশ ও কর্মকা-ের যেরূপ সুযোগ দেওয়া হয়, প্রথম প্রকারের মানুষদেরকে সেরূপ সুযোগ দেওয়া হয় না, বরং বিভিন্ন অযুহাতে তাদের মতপ্রকাশের অধিকার হরণ করে কণ্ঠরোধ করা হয়। ইসলামপন্থী বলে আখ্যায়িত ধার্মিক মানুষের দাবি মূলত দু' ধরণের-

(১) রাষ্ট্র, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী নীতিমালার বাস্তবায়ন ও

(২) সমাজের অশ্লীলতা, নগ্নতা, মাদকতা, অনাচার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ।

ধার্মিকদের মধ্য থেকে সামান্য মানুষই প্রথম বিষয়ে সরব, তবে সকলেই দ্বিতীয় বিষয়ে আবেগী হন। যে কোনো ধার্মিক মানুষ সমাজের অবক্ষয়, অনাচার, অশ্লীলতা, নগ্নতা, মাদকদ্রব্যের প্রসার, জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন। এর বিরুদ্ধে কথা বলতে বা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক সময়ই তার কথা বলার অধিকার হরণ করা হয়। সকল দেশেরই ঘোষিত নীতি, সহিংসতা, ধর্ষণ, এসিড, নৈতিক অবক্ষয়, এইডস, মাদকাসক্তি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। সকল বিবেকবান মানুষই এগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তবে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ভিন্ন। পাশ্চাত্য রীতিতে অবাধ যৌনাচার, যৌনতা-উদ্দীপক কর্মকাণ্ড , পণ্য ও মদের অবাধ সরবরাহ, বিজ্ঞাপন ও বিপণন অব্যাহত রাখতে হবে এবং পাশাপাশি আইন বা উপদেশের মাধ্যমে এ সকল অবক্ষয় রোধ করতে হবে। বাহ্যত তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে এ ব্যবস্থা সম্পৃক্ত। জুয়া, মদ, মাদকদ্রব্য, তামাক-পণ্য, যৌনতা-প্রসারক পণ্যের বিজ্ঞাপন ও বিপণনের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করার পর তারা মাদকাসক্তি, ধর্ষণ, ক্যান্সার, এইডস ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছু টাকা অনুদান প্রদান করেন। ইসলামের নির্দেশনা হলো সকল অবক্ষয়ের মূল উৎস রোধ করা। অবাধ নগ্নতা, অশ্লীল নাচ-গান, সিনেমা-ছবি, জুয়া, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদির সুযোগ অব্যাহত রেখে মহিলা-উত্যক্ত, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, এসিড, মাদকাসক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। বিশ্বের সকল দেশের বাস্তবতা এর বড় প্রমাণ।[৫৮৭]

মুসলিম দেশের সরকার, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষেরা পাশ্চাত্যের প্রভাবে বা বেনিয়া-চক্রের চাপে অবক্ষয় ও অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বললেও, উৎসগুলির বিরুদ্ধে কথা বলেন না। তারা অনৈতিক কর্মকাণ্ড , এইডস, নারী উত্ত্যক্ত ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে কথা বলেন, কিন্তু অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেশ্যাবৃত্তি বা যৌনতা-উদ্দীপক পণ্যের বিরুদ্ধে কথা বলেন না। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রেই যেখানে ইসলামের আইন বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, তুরস্ক, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া, সুদান, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিন ইত্যাদি।'[৫৮৮] আর ধার্মিক মুসলিমগণ অবক্ষয় ও অপরাধের উৎস বন্ধ করার দাবি করেন। যে কোনো বিবেকবান মানুষ স্বীকার করবেন যে, ধার্মিকগণের এ দাবি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘোষিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। জাগতিক স্বার্থ বা বেনিয়া-চক্রের চাপে কথা বলতে না পারলেও সরকার ও প্রশাসনের ন্যূনতম দায়িত্ব ধার্মিকদের মত প্রকাশ ও প্রচারে সহযোগিতা করা, যেন দেশ ও জাতি উপকৃত হয়। ধর্মীয় অনুভূতি ও দেশপ্রেম উভয়েরই দাবি এটি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অনেক সময় এর উল্টা করা

[৫৮৭]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৮-৫৯

[৫৮৮]. মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮২-৮৫

হয়। বিভিন্ন অযুহাতে তাদের কণ্ঠরোধ করা হয়। কখনো বেনিয়া-চক্র তাদের অপমান ও নির্যাতন করেন এবং প্রশাসন এদেরকে সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে। কখনো প্রশাসনই তাদের কণ্ঠরোধ ও নির্যাতন করে। যখন একজন আবেগী ধার্মিক যুবক- বিশেষত যার আবেগ আছে কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানে পূর্ণতা নেই- এরূপ নগ্নতা, অশ্লীলতা, মাদকতা ইত্যাদি দেখে প্রতিবাদ বা প্রতিকারের কোনো পথই পান না, কথা বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন এবং তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হলেও কেউ কোনো সহযোগিতা না করে, তখন হতাশা ও আবেগ তাকে উগ্রতার পথে প্ররোচিত করে। এরূপ ব্যক্তি তখন আইন নিজের হাতে তুলে নিতে চেষ্টা করেন বা অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে সহিংসতায় লিপ্ত হন।

উগ্রতার প্রসারে দায়ীগণের বিচ্ছিন্নতার ভূমিকা

আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও "দায়ী"-গণের পারস্পরিক শত্রুতা, বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি ও গালাগালিতে দীনের শত্রুদের ছাড়া আর কারো কল্যাণ হচ্ছে বলে আমরা দেখছি না। এরূপ বিভক্তির কারণে একদিকে যেমন ইসলামের দাওয়াত ব্যাহত হচ্ছে এবং দীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার হচ্ছে, অপরদিকে সমাজের অনেক আবেগী যুবক মূলধারার আলিম-উলামা ও পীর-মাশাইখদের বিষয়ে হতাশা ও কুধারণা পোষণ করে উগ্রতার আহ্বানকারীদের ক্ষপ্পরে পড়ে যাচ্ছে।

ওহাবী মতবাদের উদ্ভব ও প্রসার কে অজুহাত হিসেবে উপস্থাপন

ওহাবী মতবাদ কে জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে অনেক গবেষক উল্লেখ করছেন। সৌদি আরবের ধর্মীয় নেতা মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২খ্রি.) প্রচারিত মতবাদকে ওহাবী মতবাদ বলা হয়। তিনি তৎকালীন আরবে প্রচলিত কবর পুজা, কবরে সেজদা করা, কবরে বা গাছে সুতা বেঁধে রাখা, মানত করা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার, শিরক, বিদআত ইত্যাদির প্রতিবাদ করেন। তাঁর বক্তব্য শুধু প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উপরন্তু তাঁর বিরোধীদের তিনি মুশরিক বলে অভিহিত করতেন। ১৭৪৫ খ্রি. বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের অনতিদূরে অবস্থিত দিরইয়া নামক ছোট্ট গ্রাম-রাজ্যের শাসক আমীর মুহাম্মদ ইবনু সাউদ (মৃ. ১৭৬৫) তাঁর সাথে যোগ দেন। তাদের অনুসারীরা তাদের বিরোধীদেরকে মুশরিক বলে গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালন শুরু করেন। ১৮০৪ সালের মধ্যে মক্কা-হিজায সহ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ সাউদী ওহাবীদের অধীনে চলে আসে। তৎকালীন তুর্কী খিলাফত এ নতুন রাজত্বকে তার আধিপত্য ও নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে করেন। কারণ একদিকে মক্কা-মদীনা সহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্যদিকে মূল আরবে স্বাধীন রাজ্যের উত্থান মুসলিম বিশ্বে তুর্কীদের একচ্ছত্র নেতৃত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তুর্কী খলীফা দরবারের আলিমগণের মাধ্যমে ওহাবীদেরকে ধর্মদ্রোহী, কাফির ও ইসলামের অন্যতম শত্রু হিসেবে ফাতওয়া প্রচার করেন। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারাভিযান চালানো হয়, যেন কেউ এ নব্য রাজত্বকে ইসলামী খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত মনে না করে। পাশাপাশি তিনি তুর্কী নিয়ন্ত্রণাধীন মিসরের শাসক মুহাম্মদ আলীকে ওহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। মিশরীয় বাহিনীর অভিযানের মুখে ১৮১৮ সালে সউদী রাজত্বের পতন ঘটে। এরপর সাউদী রাজবংশের উত্তর পুরুষেরা বারংবার নিজেদের রাজত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সর্বশেষ এ বংশের 'আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রাহমান আল-সাউদ (১৮৭৯-১৯৫৩) ১৯০১ থেকে ১৯২৪ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বর্তমান সৌদি আরব প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৮৯]

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বিশ্বের যেখানেই সংস্কারমূলক কোনো দাওয়াত বা আহ্বান প্রচারিত হয়েছে, তাকেই সৌদি ওহাবীগণ মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বলে দাবি করেছেন। অপরদিকে তুর্কী প্রচারণায় ওহাবী শব্দটি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হয়। তাদেরকে অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের চেয়েও অধিকতর ঘৃণা করা হয়। ফলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ব্রিটিশ বিরোধী আলিমদেরকে ওহাবী বলে প্রচার করতেন; যেন সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকে।

---

[৫৮৯]. ড. ইব্রাহীম জুমআ, *আল-আতলাস আত-তারীখী লিদ-দাওলা আস-সাউদিয়্যাহ*, ড. ইসমাঈল আহমদ ইয়াগী, ***তারীখুল আলাম আল-ইসলামী***, পৃ. ৬৩-৭৮

এছাড়া মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরকে নিন্দা করার জন্য ওহাবী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করেন। মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের সমসাময়িক ভারতীয় মুসলিম সংস্কারক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.)। তাঁর মত-প্রচারের প্রথম দিকে ১৭৩১ খ্রি. তিনি মক্কায় গমন করেন এবং তিন বৎসর তথায় অবস্থান করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি ভারতে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনিও কবর পূজা, পীর পূজা, কবরে মানত করা, কবরবাসী বা জীবিত পীর বা ওলীগণের কাছে বিপদমুক্তির সাহায্য চাওয়া ও অন্যান্য শিরক, বিদআত, কুসংস্কার, মাযহাবী বাড়াবাড়ি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে ওহাবী বলে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তবে ভারতের সর্বপ্রথম সংবিধিবদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ ওহাবী নেতা ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের (১৩৪৬-১৮২৩ খ্রি.) অন্যতম ছাত্র সাইয়েদ আহমদ বেরলবী (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রি.)। তিনি সমগ্র ভারতে মাযার, দরগা, ব্যক্তি পূজা, মৃত মানুষদের নামে মানত, শিন্নি ইত্যাদি বিভিন্ন শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। এছাড়া তিনি ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি হজ্জে গমন করেন। প্রায় তিন বৎসর তথায় অবস্থানের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে. তিনি ব্রিটিশ ভারত থেকে হিজরত করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমন করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং নিজে সেই রাষ্ট্রের প্রধান হন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সেখানে একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পরে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তী প্রায় ৩০ বৎসর সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অনুসারীগণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছিন্ন জিহাদ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যান। ১৮০৩-৪ খ্রিস্টাব্দে ওহাবীগণ মক্কা-মদীনা দখল করে এবং তথাকার প্রাচীন মাজার-কেন্দ্রিক সৌধগুলি ভেঙ্গে ফেলে। এতে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর অনুসারীগণ ওহাবীদের মতই একইভাবে শিরক, কুফর, বিদআত, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রতিবাদ করতেন। এভাবে তাদের মতামতের সাথে ওহাবীদের মতামতের বাহ্যিক সাদৃশ্য ছিল। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সাইয়েদ আহমদ বেরলবী হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় গমন করেন। ইংরেজ শাসকগণ সুকৌশলে প্রচার করে যে, স্বাধীনতার নামে যারা আপনাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে আসলে তারা ইসলামের শত্রু এবং নবী ও সাহাবাদের অপমানকারী দল, তাদের নাম ওহাবী, তারাই আপনাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বংশধরদের কবরগুলি ধ্বংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে ... আর সৈয়দ আহমদ তাদেরই এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং তারা সবাই ওহাবী তাই তারাও আপনাদের শ্রদ্ধেয় পীরবুজুর্গ ও পুর্বপুরুষদের কবর ভাঙ্গতে চায়...।[৫৯০] এভাবে ব্রিটিশ সরকার বুঝান যে, প্রকৃত ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কোনো ক্ষোভ নেই। প্রকৃত ইসলাম ও মুসলিমদেরকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন। শুধু বিভ্রান্ত ওহাবী সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেই তারা দমন করছেন ও শাস্তি দিচ্ছেন। কাজেই এতে সাধারণ ভাল মুসলিমদের বিরক্ত হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই।সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর শিষ্যদের থেকে ভারতে বিভিন্ন সংস্কারমুখী ধারার জন্ম নেয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে অনেকে নির্ধারিত মাযহাব অনুসরণ অস্বীকার করে নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবি করেন। তাঁর শিষ্য জৌনপুরের পীর মাওলানা কারামত আলী একটি সংস্কারমুখী ধারার জন্ম দেন। ফুরফুরার পীর মাওলানা আবূ বাক্র সিদ্দীকীও সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর মতানুসারী ও তাঁর প্র-শিষ্য ছিলেন। দেওবন্দী আলিমগণও তাঁরই শিষ্যদের থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাদের সকলকেই প্রতিপক্ষগণ ও ঔপনিবেশিক সরকার ওহাবী, রঙিন ওহাবী বা বর্ণচোরা ওহাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর অন্যতম শিষ্য ও সমসাময়িক সংস্কারক মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১ খ্রি.) এবং সমকালীন অন্য সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রি.)। তাদেরকেও ওহাবী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাদের আন্দোলন ও প্রতিরোধকে ওহাবী আন্দোলন বলা হয়েছে।[৫৯১]

---

[৫৯০]. গোলাম আহমদ মোর্তাজা, *ইতিহাসের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১-১৯২

[৫৯১]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪২

Dhaka University Institutional Repository

ওহাবী শব্দের ব্যবহার বুঝতে একটি উদাহরণ পেশ করা হলো। মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর ১৭৮২ খ্রি. বাংলার ২৪ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৩ সালে হজ্জের সময় মক্কায় সাইয়েদ আহমদ বেরেলবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর মুরীদ হন। দেশে ফিরে তিনি তাঁর এলাকার মানুষদের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রচার করেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বললেও কখনোই হিন্দু ধর্ম ধর্মাবলম্বী বা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি। কিন্তু তাঁর শিক্ষায় সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ধর্মপালন বৃদ্ধি পাওয়াতে এলাকার হিন্দু জমিদারগণ ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা সাধারণ মুসলিম প্রজাদেরকে জানান যে, প্রকৃত ইসলামকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন। তবে ওহাবী মতবাদকে তারা দমন করতে চান। যুগযুগ ধরে মুসলিমগণ হিন্দুদের মতই নাম রেখেছেন, দাড়ি কেটেছেন, গোঁফ রেখেছেন, মসজিদ বানানোর জন্য ব্যস্ত হননি এবং গোহত্যা করেননি। তিতুমীর ওহাবী মতানুসারে দাড়ি রাখতে, গোঁফ কাটতে, মুসলমানী নাম রাখতে, মুসলমানদের গ্রামে মসজিদ বানাতে ও কুরবানীর নামে গোহত্যা করতে উৎসাহ দিচ্ছে। এতে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। এ জন্য ওহাবী মতবাদ দমন করা অতীব জরুরী। তাদের দমনের কারণে ভাল মুসলমানদের বিক্ষুদ্ধ হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কোনোই কারণ নেই। এজন্য তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ন বাবু, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, নগরপুরের জমিদার গৌড়প্রসাদ চৌধুরী ও অন্যান্য প্রখ্যাত জমিদার সমবেতভাবে ৫টি বিষয়ে নোটিশ জারি করেন-

(১) যাহারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ওহাবী হইবে, দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাটিবে, তাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা এবং ফি গোঁফের উপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হইবে।

(২) মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে।

(৩) পিতা-পিতামহ বা আত্মীয়-স্বজন সন্তানের যে নাম রাখিবে সে নাম পরিবর্তন করিয়া ওহাবী মতে আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে।

(৪) গোহত্যা করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া নেওয়া হইবে, যেন সে ব্যক্তি আর গোহত্যা করিতে না পারে।

(৫) যে ব্যক্তি ওহাবী তিতুমীরকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিবে তাহাকে তাহার ভিটা হইতে উচ্ছেদ করা হইবে।"[৫৯২] বস্তুত, তুর্কী খিলাফাত ও ব্রিটিশ সরকারের ব্যাপক প্রচারের কারণে প্রকৃত ইসলাম ও ওহাবী ইসলামের এ বিভাজন পাশ্চাত্য গবেষকদের কাছে সার্বজনীনতার রূপ পেয়েছে। বিশ্বের যে কোনো স্থানে সংস্কার আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, উপনিবেশ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা পাশ্চাত্য বিরোধী আন্দোলনে ধার্মিক মুসলিম, আলিম, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা পীর-মাশাইখের সম্পৃক্ততা থাকলেই তাকে ওহাবী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। ওহাবী ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামের এ বিভাজনের ক্ষেত্রে অনেক পাশ্চাত্য গবেষক প্রকৃত ইসলামকে সূফী ইসলাম বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে, সূফী ইসলাম অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক ও উদার। প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার মুসলিম ও অমুসলিম সমাজের অগণিত সূফী দরবারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ একত্রিত হচ্ছেন, যিক্র, ওযীফা, সামা-কাওয়ালী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন এবং তবারুক ও দুআ গ্রহণ করছেন। এ সকল দরবারে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্যিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি আলোচনা করা হয় না।

বাংলাদেশে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সূফী ইসলামের দুটি পর্যায় দেখা যায় । অনেক মুসলিম তাসাউফ ও সূফীবাদের নামে পীর-মাশাইখকে আল্লাহর অবতার বা বিশেষ ঐশ্বরিক সম্পর্ক বা ক্ষমতার অধিকারী বলে গণ্য করেন, তাদেরকে সেজদা করেন, তাদের কবর-মাযার বা সমাধিতে সেজদা করেন, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি শরীয়তের আহকাম পালনকে গুরুত্বহীন মনে করেন এবং গান-বাজনা ও নৃত্যগীতিকে সূফী ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে গণ্য করেন। তারা নিজেদেরকে প্রকৃত সূফী ও প্রকৃত সুন্নী বলে দাবি করেন। যারা পীর সেজদা, করব সেজদা, গানবাজনা, ধুমপান ইত্যাদির প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেন

[৫৯২]. A.R Mollik; British Policy and the Muslims in Bengal,pp.78-79; গোলাম আহমদ মোর্তাজা, ইতিহাসের ইতিহাস, *১৯৫-১৯৭; চেপে রাখা ইতিহাস,* পৃ. ২১১-২১২

বা শরীয়ত পালনের বাধ্যবাধকতার কথা বলেন তাদেরকে এ পর্যায়ের সূফীগণ ওহাবী এবং ওলীগণের দুশমন বলে কঠোরভাবে নিন্দা করেন। অনেকে তামাক, গাজা ইত্যাদি সেবন বা ধুমপানকে সুন্নী ইসলাম ও সূফী ইসলামের মৌলিক পরিচয় বলে গণ্য করেন এবং ধুমপান বিরোধীদেরকে ওহাবী ও ওলীগণের দুশমন বলে নিন্দা করেন। অন্য অনেক মুসলিম পীর-সেজদা, করব-সেজদা, গান-বাজনা ইত্যাদি কর্মকে কঠিনভাবে নিন্দা করেন, শরীয়ত প্রতিপালনকে সূফী ইসলামের মূল বিষয় বলে গণ্য করেন এবং শরীয়ত প্রতিপালনের পাশাপাশি পীর-মাশাইখের নিকট তরীকত শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম পর্যায়ের সুফী ও মারফতীগণের মতানুসারে তারা ওহাবী ও সূফী ইসলামের দুশমন। তবে তারা নিজেদেরকে প্রকৃত সূফী ও

সুন্নী বলে দাবি করেন এবং প্রথম পর্যায়ের মানুষদেরকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন। এ পর্যায়ের তাসাউফ পন্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ওরস, ঈসালে সাওয়াব, মীলাদুন্নবী, সীরাতুন্নবী, যিকরের পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ও পর্যায়ের সূফীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সকল মতভেদের ভিত্তিতে এ পর্যায়ের সূফীগণের একদল আরেকদলকে ওহাবী, নবীর দুশমন বা ওলীগণের দুশমন বলে নিন্দা করেন এবং নিজেদেরকে প্রকৃত সুন্নী ও প্রকৃত সূফী বলে দাবি করেন, যদিও সকলেই পীর-মুরিদী ও তাসাউফে বিশ্বাস করেন ও বিভিন্ন তরীকা অনুসরণ করেন। পা-াত্যের খ্রিস্টানগণ প্রকৃতিগতভাবেই প্রথম পর্যায়ের সূফী ইসলাম ও এর অনুসারীদের ভালবাসেন। কারণ তাদের মানসিকতার সাথে তাদের মানসিকতার খুবই মিল। ইউরোপ-আমেরিকা ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে এরূপ সূফীদের মজলিস-দরবার ও খানকা-মাজারে তারা আগমন করেন, গান-বাজনা ও আধ্যাত্মিক চর্চায় অংশ নেন। এ সকল সূফীও তদেরকে অত্যন্ত ভালবেসে গ্রহণ করেন। স্বভাবতই পা-াত্যের মানুষেরা বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে এরূপ সূফী ইসলামের প্রসার কামনা করেন। এরূপ সূফী ইসলামের প্রসারই সকল ধর্মের ও ধর্মহীন মানুষদের মধ্যে অনাবিল শান্তি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করেন।[৫৯৩]

সভ্যতার সংঘাতের নামে ইসলামী দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রথমে ঢালাওভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। কিন্তু তারা দেখেন যে, এতে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়ছে। তখন তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে কাউকে পক্ষে ও কাউকে বিপক্ষে নিতে চান। এজন্য প্রথমে তারা লিবারেল বা উদার ও মৌলবাদী বা কট্টরপন্থী বলে ভাগাভাগি করেন। এরূপ ভাগাভাগি মুসলিম দেশগুলিতে তেমন কোনো বাজার লাভ করে না। এজন্য বিগত কয়েক বছর যাবত তারা নতুন একটি ভাগাভাগি বাজারজাত করতে চেষ্টা করছেন, তা হলো সূফী ইসলাম ও ওহাবী ইসলাম। মুসলিম দেশগুলিতে সূফীগণের প্রভাব ও ওহাবী শব্দটির প্রতি মুসলিমদের ঘৃণার বিষয়টি তারা জানেন। ব্রিটিশ সরকার ও হিন্দু জমিদারগণ যেভাবে সাইয়েদ আহমদ, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ ও অন্যান্য সকল ধর্মীয় সংস্কার ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে ওহাবী বলে চিত্রিত করে সাধারণ মুসলিমদের কাছে ঘৃণিত করার চেষ্টায় অনেকটা সফলতা লাভ করেছিলেন, তেমনি তারা তাদের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক সকল ইসলামী কর্মকান্ড ও ব্যক্তিত্বকে ওহাবী রূপে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। অন্তত সুন্নী-ওহাবী বা সূফী-ওহাবী বিতর্ক ও সজ্ঞাত উস্কে দিতে পারলে ইসলামী দাওয়াত, শিক্ষা বিস্তার, অশ্লীলতা-মাদকতার প্রতিবাদ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আলিম বা ইসলামপন্থীদের উত্থান নিশ্চিতরূপেই ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হবে।

তারা মূলত সূফী ইসলাম বলতে প্রথম পর্যায়ের সূফীদের বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ, দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীদের মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, সাইয়েদ আহমদ বেরলবী, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রমুখের মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটতে পারে, যাদের ক্ষমতায়ন তাদের স্বার্থ রক্ষা করে না। তারা বিশ্বাস করেন যে, প্রথম পর্যায়ের সূফীদের উত্থানই মুসলিম মানসিকতা থেকে জঙ্গিবাদের মূল উৎপাটন করতে সক্ষম এবং এ পর্যায়ের সূফী ইসলামই বিশ্বের মানুষদেরকে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও ধর্মীয় সংঘাত থেকে রক্ষা করে সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে। শুধু তাই নয়, এদের প্রতিষ্ঠা বিশ্বের প্রধান দুটি ধর্ম: খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামকে একেবারেই কাছাকাছি করে দিতে পারে।

---

[৫৯৩] . ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫

বস্তুত প্রথম পর্যায়ের সূফীগণ এবং পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীগণকে প্রকৃত ওহাবী বা বর্ণচোরা ওহাবী বলে বিশ্বাস করেন। এদের হাতে তাদের স্বার্থ নিরাপদ নয় বলেও তারা জানেন। তবে মুসলিম দেশগুলিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীগণের প্রভাব সম্পর্কেও তারা সচেতন। এজন্য তার সূফী ইসলামের নামে প্রথম পর্যায়ের সূফীদের নেতৃত্বাধীনে ও তাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে থেকে উভয় পর্যায়ের সূফীগণকে একত্রিত করে তাদেরকে ওহাবী-দের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করছেন। তারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, যারা ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র, বিচার, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার দাবি করছেন তারা মূলত ওলীগণের মাজারভাঙ্গা সৌদী ওহাবীগণের দালাল ও তাদের মতের অনুসারী। এরা ক্ষমতা লাভ করলে এরাও পীর-মাশাইখ ও কবর-মাজার ধ্বংস করবে। কাজেই এদেরকে প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ হোন। একথা নিশ্চিত যে, সাধারণ মুসলিম, আলিম ও পীর-মাশাইখ তাদের এরূপ প্রচারণায় প্রভাবিত হবেন। এছাড়া এ অযুহাতে ওহাবী-সুন্নী বিতর্ক ও হানাহানির প্রসার ঘটিয়ে মুসলিমদেরকে সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে বলে তারা মনে করছেন। বস্তুত ইসলাম নামের যেমন ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছে এবং ইসলামের নামে ইসলাম বিরোধী কর্ম করা হয়েছে ও হচ্ছে, তেমনি সূফী শব্দেরও ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছে। তাসাউফ, সূফী, পীর, দরবেশ ও ওলীগণের নামে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ও ঘটছে অনেক। তবে সর্বজন স্বীকৃত সূফী-দরবেশগণের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যে, তাঁরা সকলেই সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং সমাজ পরিবর্তনে তাঁদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

প্রায় সকল সূফী তরীকার মূল সূত্র হিসেবে আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.) ও আলী (রা.)-কে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত অমান্যকারী, ধর্মত্যাগী, ধর্মীয় অনাচারে লিপ্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁরা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর পথিকৃতি। হাসান বসরী, ইবরাহীম আদহাম, জুনাইদ বাগদাদী, আব্দুল কাদির জীলানী, আবূ হামিদ গাযালী, মুজাদ্দিদ-ই আলফিসানী, শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী, এমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী, কারামত আলী জৌনপুরী, আবূ বকর সিদ্দীকী ফুরফুরাবী (রহ.) ও অন্যান্য সকল সুপ্রসিদ্ধ সূফী-সাধক আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন, শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, কারাবরণ করেছেন বা শাহাদাত লাভ করেছেন।[৫৯৪] আধুনিক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে তাদের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য হলো ক্ষমতায় না যেয়ে ক্ষমতাসীনদের সংশোধনের চেষ্টা করা। তারা নিজেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেননি বরং ক্ষমতাসীনদেরকে নসীহত করেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, ন্যায়ের পক্ষে উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, জনগণকে সচেতন করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক শাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধে শরীক হয়েছেন এবং এ সকল কর্মকান্ডে যে সকল ব্যক্তি বা দলকে অপেক্ষাকৃত ভাল বলে মনে করেছেন তাদেরকে সমর্থন করেছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন। তথাকথিত জঙ্গি কর্মকান্ড বা উগ্রতার সাথে তাদের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য হলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কিন্তু শাস্তি বা বলপ্রয়োগের চেষ্টা না করা।

তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, নসীহত করেছেন, ক্ষমতাসীন ও অন্যান্য সকলকে অন্যায় দমন করতে, প্রতিবাদ করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, কিন্তু নিজে অন্যায় দমনের নামে শক্তি প্রয়োগ করেননি, আইন অমান্য করেননি, আইন নিজের হাতে তুলে নেননি এবং আইন অমান্য করার ঘোর বিরোধিতা করেছেন। এভাবে দেখা যায় যে, প্রকৃত সূফীগণ কখনোই সমাজ-বিমুখ বা রাজনীতি-বিমুখ ছিলেন না। সূফী ইসলাম-কে সমাজ, রাষ্ট্র ও জগৎ-বিমুখ বলে চিহ্নিত করা ও সকল সংস্কার আন্দোলনকে ওহাবী বলে চিত্রিত করার কোনো ভিত্তি নেই। আজ সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা প্রদান করে যে জঙ্গিগোষ্ঠীর জন্ম দেওয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়তে পারে ইসলাম ধর্মের সুফি দর্শন। এই দর্শনের মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের নৈতিকতা, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতার প্রায়োগিক প্রয়োগ ঘটতে পারে।'[৫৯৫] তথাকথিত ইসলামী সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের নেতৃত্বে উসামা বিন লাদিনের মত সৌদি বংশোদ্ভুত ব্যক্তিত্ব

---

৫৯৪. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৫৯৫. Bdnews24.com, ইসলামে সুফি দর্শন ও এর প্রাসঙ্গিকতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ (https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/50645.)

রয়েছেন বলে শোনা যায়। সৌদি আরবের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা তাদের অর্থায়ন করেন বলে দাবি করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত উপমহাদেশে আহলে হাদীস ও দেওবন্দী-পদ্ধতির কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত দু-চার ব্যক্তির এর সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা শোনা যায়। এছাড়া তাদের মধ্যে কবর-মাযার ইত্যাদির বিরোধিতা দেখা যায়। সর্বোপরি তারা নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য মৌখিক প্রচার ছাড়াও অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন। এ জন্য অনেক গবেষক মনে করেন যে, ওহাবী মতবাদের প্রসারই বর্তমান জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ। তবে লক্ষণীয় যে, উসামা বিন লাদিন-এর আন্দোলনের গোড়া পত্তন হয় সৌদি-ওহাবী রাষ্ট্রের বিরোধিতার মাধ্যমে। তার অনুসারীরা তথাকার রাজতন্ত্র, মার্কিন সৈন্য, অনাচার ইত্যাদির বিরোধিতা করেন এবং সৌদি রাষ্ট্র ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের বংশধরসহ সকল সৌদি আলিম বিন লাদিনের আন্দোলন ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন।[৫৯৬]

সর্বোপরি, বিভিন্ন দেশের সংস্কার বা প্রতিরোধ আন্দোলনকে ওহাবী বলে আখ্যায়িত করার কোনো ভিত্তি নেই। বস্তুত মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর আদর্শ প্রাপ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে তুর্কি খিলাফতের প্রচার ও ব্রিটিশ সরকারের সুযোগ সন্ধানের কারণে। ওহাবী মতবাদ ও আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে একান্তই একটি আঞ্চলিক বিষয় ছিল। অন্যান্য মুসলিম দেশের সংস্কার-প্রতিরোধ ও ধর্মকেন্দ্রিক সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের মতই ভালমন্দ মেশানো একটি বিষয়। অন্যান্য দেশে মুসলিমগণ তাদের পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুসারে অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। যেহেতু ওহাবীগণ ও অন্যান্য দেশের মুসলিমগণ সকলেই একই সূত্র, অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইসলামী ফিক্হ ও ইসলামের ইতিহাস থেকে নিজেদের মতামত সংগ্রহ করেছেন, সেহেতু তাদের মতামত ও কর্মের মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক। এ জন্য সকল কৃতিত্ব মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে দেওয়ার কোনো কারণ নেই। আফগানিস্তান ও ইরাকে উসামা বিন লাদিনের মতবাদ প্রসার লাভ করেছে। আর এ দুটি দেশই ঘোর ওহাবী বিরোধী। আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী হানাফী মাযহাবের কঠোর অনুসারী, পীর মাশাইখদের ভক্ত এবং ওহাবীদের বিরোধী। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের দীর্ঘ শাসনামলে ওহাবী বা অন্য যে কোনো সংস্কারমুখী আলিম ও মতবাদকে কঠোরভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। শুধুমাত্র সূফীদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোরতা অবলম্বন করা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুই দেশে জঙ্গিবাদের প্রসার থেকে বুঝা যায় যে, জঙ্গিবাদের কারণ অন্য কোথাও নিহিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সন্ত্রাসীদের জাতি, ধর্ম ও গোত্র ইত্যাদিকে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসের কারণ বা চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা সঠিক নয়। এতে সন্ত্রাস দমনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, কোনো, জাতি, ধর্ম বা গোত্রের সকল মানুষকে তো আর ঢালাওভাবে বিচার করা যায় না। জঙ্গিবাদের দায়িত্ব ওহাবী মতবাদের ওপর চাপানোর বড় বিপত্তি হলো, এতে সমস্যা সমাধানের পথ হারিয়ে যাবে। কেননা, সৌদি ওহাবীদের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন, কারণ জঙ্গিবাদ তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। আর অন্য কোনো দেশের কেউ নিজেকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু প্রায় সকল ধর্মীয় দলই বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা ওহাবী বলে আখ্যায়িত। প্রত্যেকেই দাবি করেন যে, তাঁরা সরাসরি কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও পূর্ববর্তী ইমামগণের মতের ভিত্তিতে তাদের মত ও দল গঠন করেছেন; মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের নিজস্ব কোনো মত তারা মানেন না। এমনকি সৌদি আরবের আলিমগণ কখনোই নিজেদেরকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে একজন সংস্কারক হিসেবে মনে করেন এবং তাঁর সকল মতামতই কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী ইমামগণের থেকে গৃহীত বলে দাবি ও প্রমাণ করেন।[৫৯৭]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে ইসলামী চরমপন্থা ও সন্ত্রাসের কারণসমূহ পর্যালোচনা

'ইসলামী চরমপন্থার' ক্ষেত্রেও এই আদর্শিক বিষয় বড় ভূমিকা রাখে, যার জন্য আন্তর্জাতিক চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো তৎপরতা চালিয়ে আসছে।'[৫৯৮] পাশ্চাত্য গবেষক ও পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্মই মূলত

[৫৯৬]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪৬-৪৮

[৫৯৭]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪৮-৪৯

[৫৯৮]. https://www.sbs.com.au/language/bangla/audio/dr-mostafa-shafi-has-explored-the-complex-causes-of-islamic-militancy

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বব্যাপী চরমপন্থা ও সন্ত্রাসের একমাত্র কারণ। ইসলামী আদর্শ, ইসলামী শিক্ষা উগ্রতা ও সন্ত্রাস শিক্ষা দেয়। তাদের এসব অভিযোগসমূহ নিম্নে পর্যালোচনা করা হল-

অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিত জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে দায়ী করেন। তাদের মধ্যে কেউ মনে করেন, ইসলামে অনেক ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহ-অবস্থান সম্ভব। তবে ইসলামের মধ্যে ভাল বিষয়ের সাথে জিহাদ, ধর্মত্যাগ, বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ক কিছু উগ্র ও অসহিষ্ণু বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেগুলি মানবাধিকার বা সভ্যতার সহঅবস্থান বা বিকাশের বিপক্ষে। এ সকল শিক্ষা থেকেই চরমপন্থার জন্ম। এজন্য চরমপন্থা ও সন্ত্রাস দমনের জন্য ইসলামের ভাল শিক্ষাগুলির প্রশংসা করতে হবে ও সেগুলির বিকাশ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি উগ্র বা খারাপ শিক্ষার বিস্তার রোধ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। এ থেকে উগ্রতার উৎসাহ দিতে পারে এরূপ শিক্ষা বাদ দিতে হবে। এভাবে মুসলিম সমাজগুলিতে মডারেট মুসলিমদের উত্থান ঘটাতে পারলেই এজাতীয় চরমপন্থা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। অন্য অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিত মনে করেন বা দাবি করেন যে, ইসলামের মূল শিক্ষাই সন্ত্রাস। তাদের মতে, ইসলাম তার অনুসারীদের অসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। ইসলামে জিহাদের নামে অমুসলিমদেরকে হত্যা করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এর ফলেই মুসলিমদের মধ্যে চরমপন্থার উত্থান। তাদের মতে ইসলামী সন্ত্রাস ও চরমপন্থা বন্ধ করার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মকে নির্মুল অথবা নিয়ন্ত্রণ করা। তারা দাবি করেন যে, ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত আবশ্যম্ভাবী। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিশ্বব্যাপী চরমপন্থার উত্থান সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বের সঠিকত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ইহূদী-খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মীয় উগ্রবাদীরাই শুধু নয়, পাশ্চাত্যের অনেক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতা বা রাজনৈতিক নেতাও বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম ও সন্ত্রাস সমার্থক এবং ইসলামকে প্রতিরোধ করাই সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করা। যেমন, ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে ডেনমার্কের রানী এক বিবৃতিতে বলেন- We are being challenged by Islam these years- globally as well as locally. It is a challenge we have to take seriously... We have to show our opposition to Islam and we have to, at times, run the risk of having unflattering labels placed on us because there are some things for which we should display no tolerance. "বর্তমান বছরগুলিতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে এবং স্থানীয়ভাবে ইসলামের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছি। এ চ্যালেঞ্জকে আমাদের কঠিনভাবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের প্রতি আমাদের বিরোধিতা আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে এজন্য আমাদেরকে অপ্রশংসনীয় বদনাম গ্রহণের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হবে। কারণ কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়ে আমাদের কোনো নমনীয়তা বা সহনশীলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।"[৫৯৯] তারা মনে করেন, মানব সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য চরমপন্থা ও সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়, শক্তির মাধ্যমে বিশ্বের সকল মুসলমানকে হত্যা করা, বন্দী করা, জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো ও মুসলিম দেশগুলিকে সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষত, ইসলামী শিক্ষার বিস্তার রোধ করা। বর্তমানে আমরা পত্রপত্রিকায় প্রতিনিয়তই দেখতে পাই যে, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতিবিদ তাদের দেশগুলিতে মসজিদ তৈরি নিষিদ্ধ করতে, মুসলিমদের নাগরিকত্ব প্রদান বন্ধ করতে বা বহিষ্কার করতে সরকারের নিকট প্রকাশ্যে দাবি দাওয়া তুলছেন। উপরন্তু এ সকল দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে তারা জনপ্রিয়তাও লাভ করছেন। এছাড়া এরূপ অনেক পাশ্চাত্য 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনৈতিক নেতা দাবি করছেন যে, ইউরোপে বা আমেরিকায় যদি কোনো সন্ত্রাসী হামলা হয় তবে নিশ্চিতধরে নিতে হবে যে, মুসলিম সন্ত্রাসীরাই তা করেছে এবং এর জবাবে ক্ষেপনাস্ত্রের মাধ্যমে মক্কা-মদীনা ধ্বংস করে দিতে হবে।[৬০০]

আমেরিকার প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ও লেখিকা অ্যান কালটার (Ann Coulter) সন্ত্রাস ও চরমপন্থা দমনের জন্য সকল মুসলিম দেশ দখল করে মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার দাবি জানিয়ে লিখেন: "we should invade their countries, kill their leaders and convert them to

---

৫৯৯. The daily Independent, Dhaka, subeditorial, 18/02/2006

৬০০. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

Christianity." "আমাদের উচিত তাদের দেশগুলি আক্রমন করা, তাদের নেতাদেরকে হত্যা করা এবং ধর্মান্তরিত করে তাদেরকে খ্রিস্টান বানানো।"[৬০১] এ সকল গবেষক-পন্ডিতকে হয়ত মুসলিমগণ ইসলাম-বিদ্বেষী বলে মনে করতে পারেন, তবে এদের অনেকের ক্ষেত্রেই এরূপ মতপ্রকাশের জন্য বিদ্বেষের চেয়ে অজ্ঞতাই বড় কারণ। তারা দেখছেন যে, কোনো কোনো মুসলিম নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করছে এবং এজন্য তারা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করছে। কাজেই তাঁরা ধারণা করেন যে, কুরআন এরূপই শিক্ষা দিয়ে থাকে। এদের অনেকেই ইসলামের জিহাদ বিষয়ক কিছু নির্দেশ হয়ত পাঠ করেছেন, কিন্তু জিহাদের প্রকৃত অর্থ, শর্ত বা বিধানাবলি জানেননি। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম ধর্ম-প্রচারক বা ধর্মগুরুদের প্রচারণামূলক বইপুস্তকই পাঠ করেছেন, ইসলামী জ্ঞানের সূত্রগুলি থেকে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেননি। বিশেষত ইসলাম বিদ্বেষী অপপ্রচারের জোয়ারের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ বা যাচাই না করে প্রচলিত প্রচারের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, জঙ্গিবাদের জন্য ইসলামই দায়ী এবং ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করাই এ সমস্যা দূরীকরণের একমাত্র উপায়। মুসলমানের সন্ত্রাসের জন্য তার ধর্ম ইসলামকে অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বিশ্বের সর্বত্র ও সকল জাতির মধ্যেই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে। অন্য কোনো ধর্মের সন্ত্রাসীর সন্ত্রাসের জন্য তার ধর্মকে কখনোই দায়ী করা হয় না। কিন্তু মুসলিমের সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে ঢালাওভাবে দায়ী করা হয়। আসাম, মনিপুর, মিজোরাম, বিহার, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স, মিয়ানমার বা অন্য কোনো স্থানের হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ, ক্যাথলিক, প্রটেসট্যান্ট বা অন্য ধর্মের সন্ত্রাসীদের বিষয়ে তাদের ধর্ম উল্লেখ করা হয় না বা ধর্মকে দায়ী করা হয় না। তাদের দেশ বা জাতির পরিচয় দিয়ে বলা হয় আইরিশ, তামিল, মনিপুরী, আসামীয়, বাস্ক, ইটালীয়, স্পেনীয় বা জার্মান সন্ত্রাসী। কিন্তু কোথাও কোনো মুসলিম এরূপ করলে তার ধর্মকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, ফিলিপাইন, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা কাশ্মীরের ইসলামী বা মুসলিম সন্ত্রাসী...। অথচ সকল ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসের কারণ ও দাবী একই। সকলেই তাদের ধারণা অনুসারে অধিকার রক্ষার সাধারণ পথে ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাসের পথ ধরে এবং সকলেই সন্ত্রাসের বৈধতা ও অনুপ্রেরণার জন্য নিজেদের ধর্মের বাণী ও শিক্ষা ব্যবহার করে। শুধু ধর্মাবলম্বীদের সন্ত্রাসই নয়, একান্তই ধর্মের নামে ও ধর্মের জন্য হত্যা, গণহত্যা ও সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা রয়েছে, যেগুলিতে কখনোই ধর্মকে দায়ী করা হয় না, বরং সন্ত্রাসে লিপ্ত মানুষদেরকে দায়ী করা হয়। নিম্নে এ বিষয়ে একটি তালিকা উল্লেখ করা হলো-

(১) ধর্মের নামে ও একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায় ইউরোপের খৃস্টানগণ বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে চার্চের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে এবং কখনো কখনো খৃস্টান শাসকদের নির্দেশে বিভিন্নভাবে নিরস্ত্র সাধারণ ইহূদীদেরকে নির্যাতন ও হত্যা করেছেন। এর মধ্যে অনেক গণহত্যার ঘটনা রয়েছে যেগুলিতে একসাথে হাজার হাজার ইহূদীকে হত্যা করা হয়। অ্যাডলফ হিটলার ১১ থেকে ১৪ মিলিয়ন মানুষ হত্যার জন্য দায়ী। এর মধ্যে ৬ মিলিয়নই ছিল ইহুদি।[৬০২] সর্বশেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫) হলোকস্ট (holocaust)-এ প্রায় ৬ মিলিয়ন ইহূদী নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[৬০৩] (২) একান্ত ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের খৃস্টানগণ স্পেনে ও ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার অযোদ্ধা নিরস্ত্র মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে চরম বর্বরতার সাথে হত্যা করেছে। এর মধ্যে অনেক গণহত্যার ঘটনা রয়েছে। সর্বশেষ ঘটনা বসনিয়ায় (Bosnia and Herzegovina) সার্ব খৃস্টানগণ কর্তৃক মুসলিম হত্যাযজ্ঞ। এ হত্যাযজ্ঞের অনেক ঘটনার মধ্যে অন্যতম স্রেব্রেনিসায় (Srebrenica) গণহত্যা। একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ ও জাতিগত প্রতিহিংসার ভিত্তিতে জাতিসজ্ঞ ঘোষিত নিরাপদ আশ্রয়ে জাতিসজ্ঞের শান্তিরক্ষী বাহিনীর নাকের ডগায় ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে সার্ব খ্রিস্টানগণ স্রেব্রেনিসায় ৮,০০০ নিরস্ত্র অযোদ্ধা মুসলিম যুবক, কিশোর ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সর্বোপরি এ গণহত্যার বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাথমিক ঠান্ডা প্রতিক্রিয়ার কারণ বোধহয় একমাত্র এই যে, ঘাতকগণ ছিল খ্রিস্টান আর নিহতরা ছিল মুসলমান। এ বিষয়ে এনকার্টার

[৬০১]. The Wisdom of Ann Culturer, a Newsnetwork feature, The Independent (Dhaka, 8/9/2006, p.12

[৬০২]. দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৬ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. (https://www.bd-ratidin.com/various/2019/10/06/463364.)

[৬০৩]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

(The Bosnian War Crimes Investigations) রিপোর্টে বলা হয়েছে- Although the ICTY's inquiry focuses on war crimes committed by the warring parties within Bosnia, it has also raised serious questions among human rights observers about the role of the United States and other Western powers. Specifically, did U.S. intelligence agencies have advance knowledge of the Bosnian Serb attack on Srebrenica and fail to warn the United Nations (UN) forces guarding the city? Why were the U.S. and other Western intelligence agencies slow in releasing evidence of Bosnian Serb war crimes during the nearly four-year-long conflict? And why have Western officials in charge of enforcing the peace accord failed to arrest the two men indicted by the ICTY for masterminding the Bosnian Serb campaign of ethnic cleansingthe organized program of mass murder, rape, and destruction of homes and places of worship? "যদিও আই.সি.টি.ওয়াই (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)-এর তদন্ত মূলত বসনিয়ার যুদ্ধরত পক্ষলির যুদ্ধপরাধ উদ্ঘাটনের জন্য, তা সত্ত্বেও এ ট্রাইবুনাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মধ্যে গুরুতর কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। বিশেষত, স্রেব্রেনিসায় সার্বদের আক্রমন সম্পর্কে অগ্রিম কোনো তথ্য কি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে ছিল? তা সত্ত্বেও কি তারা এ শহর রক্ষায় নিয়োজিত জাতিসঙ্ঘ বাহিনীকে সে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল? প্রায় চার বছর দীর্ঘ সংঘাতের সময়ে বসনিয়ায় সার্বদের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক তথ্যপ্রমাণাদি প্রকাশ করতে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এমন ধীরতা অবলম্বন করল কেন? যে সকল প-িমা কর্মকর্তা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন তারা এ গণহত্যা, গণধর্ষণ ও বাড়িঘর ও উপাসনালয়সমূহের ধ্বংসযজ্ঞের মূল পরিকল্পনাকারী নায়ক হিসেবে আইসিটিওয়াই যে দু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছিল তাদেরকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলেন কেন?"

(৩) ২০০২ সালে গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তা জঙ্গি হিন্দুরা প্রায় দুই হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে, হাজার হাজার মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করা হয় ও হাজার হাজার মুসলিম নাগরিকদের বাড়িঘর ও সম্পদ লুট করা হয়।

(৪) ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের অন্যতম ঘটনা আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (IRA) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড । ব্রিটিশদের সাথে আইরিশদের শত্রুতা ও বিরোধিতার মূল উৎস ধর্ম। ব্রিটিশগণ প্রটেস্ট্যান্ট ও আইরিশগণ ক্যাথলিক। ইউরোপের ইতিহাসে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যকার ভয়ঙ্কর যুদ্ধগুলি ছাড়াও অনেক গণহত্যার ঘটনা সুপরিচিত। তারই অংশ হিসেবে এ দু'দেশের মানুষের মধ্যে শতশত বছরের পুঞ্জিভুত বিদ্বেষের একটি প্রকাশ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেলিপ্ত হওয়া। লক্ষণীয় যে, উত্তর আয়ারল্যন্ডের প্রটেস্ট্যান্টগণ সর্বদা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে থেকেছে আর আই. আর. এর সন্ত্রাস পরিচালিত হয়েছে অনেক সময় এ সকল আইরিশ প্রটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে। বিশেষত ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আইআরএর গুপ্তহত্যা, বোমা হামলা, গাড়ি বোমা, বাণিজ্যিক কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে শতশত বেসামরিক নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশু নিহত হয়েছেন এবং অগণিত মানুষ আহত হয়েছেন।[৬০৪]

(৫) ধর্মভিত্তিক ও ধর্মীয় সন্ত্রাসের অন্যতম উদাহরণ যায়নবাদী (Zionist) ইহূদীদের সন্ত্রাস। ফিলিস্তিনে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অগণিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। ধর্মের নামে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাস করে তারা অগণিত নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করেছে এবং গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছে। এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে কিং ডেভিড হোটেল উড়িয়ে দেওয়া ও দির ইয়াসিন নামক গ্রামের নিরস্র নিরীহ মানুষদের গণহত্যা। নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী যুবকগণ যখন সশস্ত্র ইসরায়েলী সৈন্যদের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেন অথবা ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধাগণ যখন সশস্ত্র ইসরায়েলীয় সৈন্যদেরকে আক্রমন করেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য বিশ্ব তাকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করে। অথচ 'অযোদ্ধা' নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী শিশু ও নারীপুরুষদের প্রতি ইসরায়েলী সৈন্যদের গুলি ছোড়া, বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি

[৬০৪]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ২১-২২

কর্মকে তারা সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন না। বরং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক অধিকার বলে দাবি করেন।'[৬০৫] মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে ২২ জুলাই ১৯৪৬ সালে জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে বোমা হামলা চালিয়ে ইরগুন যাভি লিয়াম (the Irgun Zvai Le'umi: National Military Organization) নামক ইহূদী সন্ত্রাসী জঙ্গি সংগঠন নিরস্ত্র শিশু ও মহিলা সহ আরব, ব্রিটিশ ও ইহূদী শতাধিক নিরস্ত্র অযোদ্ধা মানুষকে হত্যা করে এবং আরো অনেক মানুষ আহত হয়। এনকার্টা এনসাইক্লোপীডিয়ার এ ঘটনাকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ-জমকালো সন্ত্রাসী ঘটনা (The most spectacular terrorist incident) এবং বিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম সন্ত্রাসী ঘটনা (the most deadly terrorist incidents of the 20th century) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সন্ত্রাসী মেনাহেম বেগিন পরবর্তীকালে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে এবং তাকে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে।

(৬) সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মযাজকদের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করার পাশাপাশি প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। প্রায় ৪১০০০ সক্ষম পুরুষকে গুম বা হত্যা করা হয়েছে।[৬০৬] এরূপ ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের অগণিত উদাহরণ সমকালীন ইতিহাসে দেখা যায়। এ সকল ঘটনাকে সন্ত্রাসী ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা বলে অনেকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু কখনোই এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য সন্ত্রাসীদের ধর্মকে দায়ী করা হয়নি। যদিও এ সকল সন্ত্রাসী কর্ম একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায়, ধর্মীয় বিদ্বেষে বা ধর্মগ্রন্থের বাণীকে ভিত্তি করে করা হয়েছে, তবুও কখনোই তাদের বিষয়ে খ্রিস্টান সন্ত্রাসী, ক্যাথলিক সন্ত্রাসী, প্রটেস্ট্যান্ট সন্ত্রাসী, অর্থোডক্স সন্ত্রাসী, হিন্দু সন্ত্রাসী, ইহূদী সন্ত্রাসী বা অনুরূপ কিছু বলা হয় না। বরং তাদের জাতি, গোষ্ঠী বা অন্যান্য পরিচয়কে তুলে ধরা হয়। সর্বোপরি কখনোই তাদের সন্ত্রাসী বা মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের ধর্মকে দায়ী করা হয় না। আর এক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান নিতান্তই সীমিত। পক্ষান্তরে ইহূদী, আইরিশ, জার্মান, সার্ব, তামিল, আসামীয়, মনিপুরি, বর্মি নেপালী, তিব্বতী, চীনা, আমেরিকান ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসের জন্য যেমন ইহূদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম দায়ী নয়, তেমনি মুসলিমদের সন্ত্রাসের জন্য কখনোই তার ধর্ম দায়ী নয়। অথচ সন্ত্রাস উদযাপনও করা হয়েছে। ১৯৪৬ সালে কিং ডেভিড হোটেলের এ সন্ত্রাসী ঘটনার ৬০ বর্ষপূর্তি ইসরাইলে ঘটা করে উদযাপন করা হয়। ২০০৬ এর জুলাই মাসে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রশাসন ও জনগণ এ সন্ত্রাসী ঘটনার ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব পালন করে। এ বিষয়ে ভারতের জাতীয় দৈনিক 'দি হিন্দু'র ২৪/৭/২০০৬ তারিখের অনলাইন সংস্করণে সন্ত্রাস উদযাপন: ইসরাইলী স্টাইল (Celebrating Terror, Israeli-style) প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৬০৭] অনেকেই এরূপ গণহত্যা ও সন্ত্রাস উদযাপনের নিন্দা করেছেন, কিন্তু কেউই এজন্য ইহূদী ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা বা ধর্মগ্রন্থকে দায়ী করেননি। কিন্তু ইহূদী রাষ্ট্রের বর্বর সন্ত্রাস ও গণহত্যার প্রতিবাদে অন্য কোনো উপায় না পেয়ে যখন কোনো ফিলিস্তিনী সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয় তখন তার সন্ত্রাসকে ইসলামী সন্ত্রাস ও তাকে মুসলিম সন্ত্রাসী বলে উল্লেখ করা হয়। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাস সকল ধর্মের, দেশের ও মতাদর্শের মানুষদের মধ্যে বিরাজমান। এ বিষয়ে মুসলিমদের অংশগ্রহণ নিতান্তই সীমিত। আর ইহূদী, আইরিশ, জার্মান, সার্ব, তামিল, আসামীয়, মনিপুরি, বর্মি, নেপালী, তিব্বতী, চীনা, আমেরিকান ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসের জন্য যেমন ইহূদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম দায়ী নয়, তেমনি মুসলিমদের সন্ত্রাসের জন্য কখনোই তার ধর্ম দায়ী নয়। কারো অপরাধের জন্য তার ধর্মকে দায়ী করা শুধু অপরাধই নয়, বরং তা অপরাধীর পক্ষে জনমত তৈরি করে এবং অপরাধ দমন বাধাগ্রস্ত করে।[৬০৮]

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রতিকার

---

[৬০৫]. https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=50&section=556

[৬০৬]. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ০৯.০৩.২০১৮ইং

[৬০৭]. আজহারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৯২-৯৩

[৬০৮]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩-২৪

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ যে কারণেই সৃষ্টি হোক না কেন, তা নির্মূল করতে না পারলে সমগ্রবিশ্ব বসবাসের যোগ্যতা হারাবে। কেননা মানুষ নিরাপদে পথ চলতে চায়। তারা সুখে শান্তিতে দিনাতিপাত করতে চায়। তাই মানুষের জান, মাল, ইজ্জত, সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নামক দানবকে নির্মূল করা একান্ত আবশ্যক। নিম্মে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রতিকারের বিষয় আলোচনা করা হল-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে আদর্শিত হওয়া

দা'য়ী বা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধকারীকে অবশ্যই তাঁর নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত মহোত্তম আচরণের অধিকারী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উত্তম চরিত্রের আদর্শ। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

"আর নিশ্চয় আপনি মহান আচরণ ও ব্যবহারের উপরে অধিষ্ঠিত।"[৬০৯]

এ মহান আচরণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। উপরে আলোচিত বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা ইত্যাদিও এই 'খুলুকে আযীম' বা 'মহান আচরণ'-এর অংশ। তবে এর আরো বিভিন্ন দিক রয়েছে যা 'দা'য়ী ইলালাহ'-কে অর্জন করতে হবে। শুধু দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ ব্যবহার বা আচরণ আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর জীবনকে আলোকিত করবে এবং তার চারিধারে ফুলের সৌরভ ছড়াবে।

দা'য়ীর জন্য অপরিহার্য কয়েকটি গুণাবলী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. সর্বাবস্থায় অশ্লীল কথা, অশালীন কথা, গালিগালাজ ও কটুক্তি বর্জন করা। বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيّ فاحِشًا ولا مُتَفحِّشًا، ولاَ لَعَّاناً ولاَسَبَّاباً

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশালীন, অশ্লীল, অশোভনীয় কথা বলতেন না, গালি দিতেন না, কটুক্তি করতেন না।"[৬১০]

২. বেশি কথা বলা, দম্ভভরে বা চিবিয়ে কথা বলা, অহঙ্কার করা, বিতর্ক করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি পরিহার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنّ مِنْ أحبِّكُمْ إلَيّ وأقْرَبِكُمْ مِنّي مَجْلِسًا يَومَ الْقِيَامَةِ أحاسِنَكُمْ أخْلاقًا وإنّ أبْغَضَكُمْ إلَيّ وأبْعَدَكُمْ مِنّي مَجْلِسًا يَومَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ والْمُتَشَدِّقُونَ والْمُتَفَيْهِقُونَ.

"তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থানের অধিকারী হবে তারা যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আচরণের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং কেয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে, যারা কথা বলে জিতে যেতে চায়, বাজে কথা বলে এবং যারা অহঙ্কার করে।"[৬১১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وإنْ كَانَ مُحِقًا وبِبَيْتٍ فِي وسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وإنْ كَانَ مَازِحا وبِبَيْتٍ فِي أعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حسّنَ خُلُقَهُ.

"নিজের মতটি হক্ব হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করল আমি তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে একটি বাড়ির যিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। আর যে ব্যক্তি হাসি-মশকরার জন্যও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাড়ির যিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। আর যার আচরণ-ব্যবহার সুন্দর আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি বাড়ির যিম্মাদারি গ্রহণ করলাম।"[৬১২]

---

[৬০৯]. আল কুরআন, ৬৮: ৪

[৬১০]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ১৬, ১৮

[৬১১]. সুনান আত-তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৭০

[৬১২]. আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪০০।

৩. সকলের সাথে আনন্দিত চিত্তে হাসিমুখে কথা বলা এবং কথার সময় পরিপূর্ণ মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে তার কথা শোনা। যেন তার প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতা পূর্ণভাবে ফুটে উঠে। আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ يُقْبِلُ بوجْهِهِ وحدِيْثِهِ عَلَى شَرِّ الْقومِ يَتَأَلَّفُهُ بِذٰلِكَ. وكَانَ يُقْبِلُ بوجْهِهِ وحدِيْثِهِ عَلَيَّ حتى ظَنَنْتُ أَنِّيْ خَيْرُ الْقومِ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সাথেও পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার দিকে পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে কথা বলতেন। এভাবে তিনি তার হৃদয় জয় করে নিতেন। তিনি আমার সাথেও কথা বলতেন পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এবং আমার দিকে পুর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে। এমনকি আমার মনে হতো আমিই সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ।"[৬১৩] এখানে উল্লেখ্য যে, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ এবং অহঙ্কারহীন হৃদয় না হলে এই গুণ পুরোপুরি অর্জন করা যায় না।

উত্তম আচরণ শুধু দা'ওয়াতের সফলতার চাবিকাঠিই নয়, উপরন্তু আখেরাতের সফলতার সর্বোত্তম উপায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حسْنِ الْخُلُقِ وإنّ صَاحبَ حسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ والصَّلَاةِ.

"কিয়ামতের দাড়িপালায় উত্তম আচরণের চেয়ে বেশি ভারি কোনো আমল আর রাখা হবে না। আর উত্তম আচরণের অধিকারী ব্যক্তি এ আচরণের দ্বারাই তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা পালনকারী মর্যাদা অর্জন করবে।"[৬১৪]

আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ

পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাব এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন শুধু আরববাসীরা নয়, গোটা পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে মতানৈক্য ছিল। গোত্রপ্রীতি, অঞ্চলপ্রীতি, সম্প্রদায়প্রীতি এতই প্রবল ছিল যে, তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং একটি নতুন ঐক্যবদ্ধ জাতি পৃথিবীকে উপহার দিলেন। পৃথিবীর সকল জ্ঞানী লোকেরা তা অকোপটে স্বীকার করেছেন। এই ব্যাপারে ব্রিটিশ দার্শনিক জর্জ বার্নাডশ'র বক্তব্য হচ্ছে "যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র, আদর্শ ও মতবাদ সম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক নেতার অধীনে আনা হতো, তবে একমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।"[৬১৫] জগতের সকল মহাপুরুষই মানুষের জন্য সত্য ও কল্যাণের বাণী বহন করে এনেছেন; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই কেবল তাঁর জীবনে পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক শিক্ষা ও আদর্শ রেখে গেছেন। একদিকে তিনি যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য নিজের জীবনে পরিপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী আদর্শ রেখে গেছেন, ঠিক তেমনি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক শিক্ষা ও নীতির প্রবর্তন করেছেন।[৬১৬] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সা.) মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।"[৬১৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাকে চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে ভূষিত করা হয়েছে।"[৬১৮] রাসূলুল্লাহ (সা.) বাস্তবিকই সমগ্র মানব জাতির সর্বকালের ও সর্বযুগের এক জীবনাদর্শ। তাঁকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী দিয়ে বিভূষিত করা হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "বল হে-মানব...আমি তোমাদের সকলের জন্যই প্রেরিত রাসূল।"[৬১৯] হযরত ঈসার (আ.) Sermon on the Mount (শৈলোপদেশ) ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণিকের তরে মানুষের মনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মত একটা

---

৬১৩. হাইসামী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৮, পৃ. ৩০০।
৬১৪. তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৪, পৃ. ৩৬৪।
৬১৫. এম আবদুর রব, *মহানবী (সা.) এর আদর্শের বিশ্বজনীনতা*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৯১-৯২
৬১৬. সৈয়দ বনরুদ্দোজা, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ১০৭
৬১৭. আল-কুরআন, ৩৩: ২১
৬১৮. আল-কুরআন, ৬৮: ৪
৬১৯. আল-কুরআন, ৭: ১৫৮

জীবন্ত আদর্শই কেবল মানব জীবনকে গড়তে পারে, মানুষকে উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে পারে, মরুভূমির অসভ্য বর্বরকেও জগতের শিক্ষাগুরুর আসনে বসাতে পারে। সেই জন্য ইসলাম মধুর নীতিবাক্য অথবা মনোরম উপদেশাবলীর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেনি; বরং একটি জীবন্ত আদর্শকে মানুষের জীবনে রূপায়িত করেছে। যদি আদর্শের পিছনে কোন মহান চরিত্র, কোন শিক্ষাগুরুর জীবনাদর্শ, কোন সাধনা না থাকত, তবে মানুষের ইতিহাস, কবির কবিতা, বাগ্মীর বাগ্মিতা ও দার্শনিকের দর্শন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনচরিত্রকে একটি বিশেষ বাক্যে বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কুরআনই তাঁর জীবনচরিত।" কুরআনের সমস্ত আদর্শ তাঁর জীবনে রূপায়িত হয়েছে। সমস্ত শিক্ষাই তাঁকে কেন্দ্র করে জগতে এক বিরাট ইতিহাস রচনা করেছে, যার সুদূর প্রসারী প্রভাব মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে রয়েছে।[৬২০] আল্লাহ যেমন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং সংরক্ষক তেমনি ইসলামের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র মানবতার জন্য দয়া ও আর্শীবাদ স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তোমাকে সমগ্র মানবতার জন্য আর্শীবাদ স্বরূপ পাঠিয়েছি।"[৬২১] তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ মানুষের বাস্তব জীবনে অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

সাম্য, মৈত্রী, শান্তি-শৃংখলা এবং নিরাপত্তার শিক্ষা প্রদান

বিশ্ব-সভ্যতায় সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব রাসূলুল্লাহ (সা.) শ্রেষ্ঠ অবদানের অন্যতম। তিনি আল্লাহকে সমগ্র বিশ্বের প্রভু বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুছে দিয়ে বাদশাহ ও ফকির, আমীর ও গরীব, ধনী ও নির্ধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, শাসক ও শাসিত, মালিক ও শ্রমিক, প্রভূ ও দাসকে এক সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এই সাম্যের বন্ধন মানুষের অন্তর জাতিভেদ, ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ইতর-ভদ্র ও শ্বেত-কৃষ্ণের নিকৃষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সব স্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সাম্যের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। সালাত, সাওম ও যাকাত প্রভৃতি অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই সাম্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বাৎসরিক হজ্জের মধ্যে দিয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ বিশ্বসম্মেলনের আয়োজন করেছে। যাকাত ধনীর ধনে নির্ধনের অধিকার দিয়ে এবং ধনীর ধনকে সমাজে বিতরণের ব্যবস্থা করে এক অর্থনৈতিক সাম্যের সৃষ্টি করেছে; ধনীর সঞ্চয়ের তৃষ্ণা ও দরিদ্রের দুঃখ-দৈন্যের হাহাকার এবং ধন ও শ্রমের চিরন্তন কলহ মিটিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করেছে। মুসলমানদের সালাতও সাম্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। মুসলমানগণ দল বেঁধে এক হয়ে একই আল্লাহর আরাধনা করে। জুমআর দিনে গ্রামে গ্রামে মসজিদে এসে সকল মুসলমান ছোট-বড়, উঁচু-নীচু এক হয়ে সেই এক অদ্বিতীয়, অনন্ত প্রভূর নিকট লুটিয়ে পড়ে।

প্রতি বৎসরই দুইবার ঈদের সময় মুসলমান ঈদগাহে সমবেত হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। হজ্জের সময় যখন সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা মক্কার মহাপ্রান্তরে এসে একত্রে মিলিত হয়ে সেই একই আল্লাহর আরাধনা করে, তখন যে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের অনবদ্য ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে, সেই মনোমুগ্ধকর অপার্থিব দৃশ্য জগতে আর কোথাও দেখা যায় না। এর পূর্বে সমস্ত জাতি, দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি সভ্য দেশের মধ্যেও Helots, Plebians ও শূদ্রেরা সকল প্রকার মানবীয় অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে; এমনকি তাদের স্পর্শ পর্যন্ত অনেকস্থলে অপবিত্র বলে বিবেচিত হয়েছে। আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ইতর-ভদ্র, উচু-নীচু এই ভেদাভেদ মানব জাতির এক চিরন্তন অভিশাপ। উচ্চ শ্রেণীর ও বর্ণের মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্ম ও সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার নামে কোটি কোটি নর-নারীকে ক্রীতদাস করে রেখেছে। মানুষের অধিকার হতে তারা সহস্র বৎসর ধরে বঞ্চিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্য মুছে ফেলে সমগ্র মানব জাতিকে এক সমাজভুক্ত করার কেবল জীবন্ত প্রেরণাই দেননি, বাস্তব জগতে কোটি কোটি মানুষকে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানব! তোমাদেরকে একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক

---

[৬২০] . সৈয়দ বদরুদ্দোজা, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৮৯-৯০

[৬২১] . আল-কুরআন , ২১: ১০৭

হতে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও দলে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে পার (পরস্পর পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি দেখাতে পার)। তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু ও চরিত্রবান সেই আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ট, নি-য়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।"[৬২২]
কুরআনের এই মহৎ উদ্দেশ্যের সমর্থন করে রাসূলুল্লাহ (সা,) বলেন, "আরবজাতি অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, অন্য জাতিও আরবজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়; তোমরা সকলেই আদমের সন্তান এবং মৃত্তিকা হতে সৃষ্ট। নি-য়ই মুসলিম পরস্পর পরস্পরের ভাই; তোমরা সকলে এই ভ্রাতৃসংঘের অন্তর্ভুক্ত। যদি এক কদাকার হাবশী ক্রীতদাসও তোমাদের উপর প্রভুত্ব করার জন্য ন্যস্ত হয় এবং কুরআনের নির্দেশানুযায়ী শাসন করে, তাহলে তাকে মান্য করবে এবং তার আদেশ পালন করবে।" এভাবে তিনি জাতি, ধর্ম ও বর্ণের আভিজাত্য, ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কার, পদমর্যাদা ও জ্ঞান-গৌরবের আস্ফালনকে চুরমার করে সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি মনুষ্যত্ব ও চরিত্রের অমূল্য সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণি, জাতি ও বর্ণের সমস্ত বৈষম্য চিরতরে মুছে দিয়ে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাস্তব রূপ দিয়েছেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিমুক্ত বিশ্ব উপহার দিয়ে সাম্য, মৈত্রী, শান্তি-শৃঙ্খলা নিরাপত্তার বাণী শুনিয়ে ছিলেন।[৬২৩]

বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

ইবন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাহাবী আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। তখন তিনি বলেন, আমার কাছে যে বর্ণনা পৌঁছেছে সে অনুসারে আর তিনি যা বলেননি, তা বলেছেন বলে বলা থেকে আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করুন, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও আল্লাহর পথে। তারপর তিনি আলী ইবন আবু তালিবের হাত ধরে বললেন। এ হচ্ছে আমার ভাই অথচ রাসূলুল্লাহ্
(সা.) হলেন রাসূলগণের সরদার ও মুত্তাকীগণের ইমাম এবং রাব্বুল আলামীনের রাসূল- যার কোন তুলনা নেই, বান্দাদের মধ্যে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই।[৬২৪] মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার অধিবাসী আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-বিশৃংখলার অবসান ঘটিয়ে তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই মু'মিনগণ (পরস্পর পরস্পরের) ভাই- ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।"[৬২৫] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর; তোমরা (পরস্পর পরস্পরের) শত্রু ছিলে, (আল্লাহ) তোমদের হৃদয়ে ভালবাসা দিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে (পরস্পর পরস্পরের) ভাই হয়ে গেলে।"[৬২৬]

ইসলামের সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.), আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), ওসমান (রা.), আলী (রা.) প্রমুখ জগৎ বরেণ্য মহাপুরুষগণ সকলেই সামান্য দীন-হীন কুলি ও মজদুরের সঙ্গে উঠা, বসা, পানাহার করতেন, সামান্য দীন মজুরের কাজ করেছেন, রাজার আসনে বসেও অভাবী জীবন যাপন করেছেন। ক্রীতদাস বেলালের অধীনে আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), আলী (রা.) প্রমুখ বরেণ্য জননেতাগণ মানুষের সেবা করতে কোন দ্বিধা করেননি। এখানে কোন রাজপ্রাসাদ, রাজার বিত্তবৈভব ও ধনঐশ্বর্য্য অথবা বিলাসের কোন সামগ্রী ছিল না। বিপুল ধন-সম্পদের মাঝে রাষ্ট্রনায়ক রাসূলুল্লাহ (সা.) দিনের পর দিন অনাহারে, অর্ধাহারে কাটিয়েছেন। তাঁর ঘরে মাসের পর মাস স্ত্রী-কন্যার খাদ্যের কোন সংস্থান ছিল না। বিশাল ভূ-খ-ের অধীশ্বর ওমর (রা.) এর পরিধানে শত-গ্রন্থি বিশিষ্ট কাপড়, সামান্য খেজুর ও পানি ছিল তার খাদ্য। এই প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট জেরুজালেমে প্রবেশ করেছেন উষ্ট্রের দড়ি ধরে, আর উষ্ট্রচালক উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসে রয়েছেন; উষ্ট্রচালক ও ওমর (রা.) এর মধ্যে কোন বৈষম্য নেই

[৬২২]. আল-কুরআন, ৪৯: ১৩
[৬২৩]. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০-২০১
[৬২৪]. ইবন হিশাম (র.), **সীরাতুন নবী (সা.)**, (ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ২০০৭) পৃ. ১৮১
[৬২৫]. আল-কুরআন, ৪৯: ১০
[৬২৬]. আল-কুরআন, ৩: ১০৩

ভ্রাতৃত্বের এই মনোরম দৃশ্য, সাম্যের এই অনবদ্য ছবি ইতিহাস আর কোনদিন দেখেনি। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে পারে।

লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা, হীনমন্যতা এবং অবিশ্বাস পরিহার

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঘৃণা ষড়রিপু, এগুলো মানুষের স্বাভাবগত বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের এসব প্রবণতা বদলে দিয়েছেন। ব্যক্তি ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। ক্রোধ ষড়রিপুর অন্যতম। মানুষের মাঝ থেকে এর উচ্ছেদ সম্ভব নয়। তবে ক্রোধের লক্ষ ও দিক বদলে কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে এ ক্রোধই তাকে সফল ও উন্নত মানুষের পরিণত করবে। সমাজের তাতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "কুফরীতে তোমাদের যে লোক শ্রেষ্ঠ, ইসলামে এলে সে-ই শ্রেষ্ঠ মুসলমান। উমর (রা.) প্রথম জীবনে অত্যন্ত তেজস্বী এবং ক্রোধপরায়ণ ছিলেন। এ ক্রোধের কারণেই অন্য কেউ সাহস না করলেও তিনি তালোয়ার নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হত্যা করতে রওয়ানা হন। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেল! সেই উমর (রা.)-ই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পদতলে তলোয়ার রেখে দিয়ে সত্যের অনুসারী হয়ে যান। অতঃপর শ্রেষ্ঠ মুসলমানে পরিণত হন। ক্রোধ কি তাঁর থেকে উচ্ছেদ হয়নি। বরং তার যে ক্রোধ কুফুরী ও মিথ্যার পক্ষে নিয়োজিত ছিল তা-ই সত্যের লক্ষে চালিত হল। মুসলমান হওয়ার পরই তিনি সাথীদের নিয়ে প্রকাশ্যভাবে শত শত কাফিরদের সামনে কা'বায় গিয়ে সালাত আদায় করলেন। এর আগে এ সাহস আর কেউ করেননি। সকলেই গোপনে হিজরত করেছিলেন। উমর (রা.) হিজরত করলেন প্রকাশ্যে, কাবাঘর তাওয়াফ করেন দীপ্ত ঘোষণা দিয়ে। উমর (রা.) তখন সত্যের সহায়, মিথ্যা ও পাপের বিরুদ্ধে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর । দুবৃত্ত ও সন্ত্রাসীর জন্য আতংক। তাঁর যে ক্রোধ, মিথ্যার অনুগামী ছিল, তা-ই আজ সত্য ও সুন্দরের পথে উত্তাল। ফলে ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে সেই উমর (রা.) সত্য ও সুন্দরের এমন কালজয়ী ইতিহাস রচনা করেছেন যা আজও ইতিহাসে বিরল।[৬২৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) সমগ্র মুসলিম জাতির লোভ নামক রিপুটিকে নির্মূল করে ফেলেন। তিনি অন্যায়, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হত্যা, রাহাজানি ইত্যাদি যাবতীয় পাপাচারকে নির্মূল করেছিলেন। লোভের গতিকে তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন কল্যাণ ও সাফল্যের দিকে।[৬২৮] এই আদর্শ স্ট্র্যাটেজী এর অংশ হিসেবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের মন থেকে লোভ, ক্রোধ ও ঘৃণা, হীনমন্যতা সহ নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা দূর করতে হবে। মহানবী (সা.) এর আদর্শে তাই প্রতীয়মান হয়। বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণ তথা লোভ যে পাপ, পাপে মৃত্যু, তা রাসূলুল্লাহ (সা.) দেখিয়েছেন। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উৎসমূলরূপ এই লোভ দূর করার জন্য নানা সাধনার মাধ্যমে ব্যক্তির প্রবৃত্তি থেকে দুনিয়ার আকর্ষণ দূর করাটা এই আদর্শ স্ট্র্যাটেজী এর অন্যতম দিক।[৬২৯]

আত্মসংযম ও ধৈর্য্য অবলম্বন

ইসলাম ধর্মের মূল দর্শনই ছিল শান্তির মাধ্যমে বিবদমান ও প-াৎপদ আরবদের মাঝে সভ্যতার ছোঁয়া লাগানো। গোত্রে গোত্রে বিভাজিত আরব সমাজে কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। কিন্তু ইসলামের রাসূল (সা.) চরম ধৈর্য সহকারে যুক্তি দিয়ে এই দুরূহ কাজটি করেছিলেন। তিনি ছিলেন সহিষ্ণুতার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।[৬৩০] মক্কায় মুসলমানদের ওপর কোরাইশেদের অত্যাচারের প্রতিশোধ পাল্টা সহিংস পন্থায় নেওয়ার অনুমতি হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব ও ওমর ইবনুল খাত্তাবের মত দুঃসাহসী বীর পুরুষদের ইসলাম গ্রহণ সত্ত্বেও পরিবর্তিত হয়নি। এই দুঃসাহসী বীরদ্বয় কোরাইশ নেতাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা তাদের অত্যাচার প্রতিহত, সহিংসতা দিয়ে সহিংসতার জবাব, এবং শক্তি দিয়ে শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.)

[৬২৭]. মাওলানা আবদুল গফুর, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৯৯-১০০

[৬২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪

[৬২৯]. প্রফেসর আনিসুর রহমান, *সন্ত্রাস নিমূলে মহানবী (সা.) এর আদর্শ*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৫৬

[৬৩০]. আবদুল মান্নান, ***ধর্মকে ধর্মের জায়গায় থাকতে দিন,*** দৈনিক সমকাল, ১২এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৪

ঐ অবস্থায় সবাইকে ধৈর্য্য ধারণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। এভাবে আত্মসংযম ও ধৈর্য্য অবলম্বনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[৬৩১]

অভিশাপ না করে কল্যাণ কামনা

মক্কায় যখন অত্যাচারের মাত্রা ভীষণভাবে বেড়ে যেতে লাগল, ইসলাম প্রচারের পরিবেশ ও পরিস্থিতি উত্তর পূর্বে প্রায় ৬০/৭০ মাইল দূরে তায়েফ নামক নগরীতে পৌঁছেছিলেন। হয়ত তায়েফবাসী তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু তায়েফবাসী তাঁর প্রতি যে অত্যাচার করেছিল তার বিবরণ শুনলে আজও মানুষের শরীর ও মন শিহরিয়ে উঠে। সেখানকার সর্দার আব্দুল লায়েল বংশের লোকেরা তাঁর ওপর দিনের পর দিন নির্মম অত্যাচার করেছে। তারা পথের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর শরীরে অবিরাম প্রস্তর বর্ষণ করেছে; শ্রান্ত-ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে তিনি বসে পড়লে ঐ পিশাচের দল তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আবার প্রস্তর বর্ষণ করেছে। অবিরত প্রস্তরাঘাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে তার পাদুকাদ্বয় রক্তে ভরে উঠেছিল। দীর্ঘ দশ দিন ধরে নগর, পল্লী ও প্রান্তরে তার ওপর দিয়ে এক নৃশংস অত্যাচার চলেছিল। শেষে তাঁর জীবন সংশয়ের আশঙ্কা চিন্তা করে তিনি জায়েদকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় ফিরে যাবার সংকল্প করেন, তখন পাষণ্ডেরা তাঁকে প্রস্তারাঘাতে আরও জর্জরিত করেছে। এমন আঘাতের পর আঘাতে তাঁর সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। হযরতকে একেবারে অবসন্ন ও অচৈতন্য অবস্থায় দেখে জায়েদও প্রমাদ গুনেছেন এবং দ্রুত পদবিক্ষেপে নগরের বাইরে গিয়ে পথিপার্শ্বে ওতবা ও শায়বা নামক মক্কার দুই ভ্রাতৃদ্বয়ের এক আঙ্গুর বাগানে হযরতকে নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। জায়েদের সেবা ও শুশ্রুষায় হযরত একটু সুস্থ হয়ে ওযু করেন।

তারপর সেই করুণাময় রাব্বুল আলামীনের কাছে যে ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন তা চিরকালের জন্য তাঁর অনুপম আল্লাহ নির্ভরতা, সত্যনিষ্ঠা ও মহানুভবতার জ্বলন্ত নিদর্শন হয়ে আছে। উইলিয়াম মুরও এই অনুপম মর্মস্পর্শী প্রার্থনায় মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা না করে পারেননি। তাঁর ভাষায়- ÒIt sheds strong light on the intensity of his belief in the divine origin of his calling.”অর্থাৎ “জীবন্ত যে আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হতে উৎসারিত এর ওপর মুহাম্মদের (সা.) প্রগাঢ় বিশ্বাস সম্বন্ধে তার এই ব্যাকুল প্রার্থনা যথেষ্ঠ আলোকপাত করেছে। সে সময় হযরত বিনম্রচিত্তে এই ব্যাকুল প্রার্থনা সেই অন্তর্যামীর নিকট জানিয়েছিলেন, “হে আল্লাহ! হে আমার আল্লাহ! নিজের দুর্বলতা ও নিরুপায় অবস্থা, মানুষের চক্ষে আমার নগণ্যতার জন্য তোমার নিকট নিবেদন করছি। হে আল্লাহ্! হে পরম দয়াময়! তুমি সহায় সম্বলহীনের সহায় ও প্রভু। তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া আমার তো কেহ নেই। তুমি আমাকে কার হস্তে সমর্পণ করবে? তুমি কি এমন পরের হাতে (আমাকে সমর্পণ করবে) যে রূঢ় ভাষায় আমাকে জর্জরিত করবে অথবা এমন শত্রুর হাতে তুলে দিবে যে আমার সমস্ত কর্মই পণ্ড করে দিবে। তুমি যদি অসন্তুষ্ট না হও, তাহলে আমি (নিজেকে) নিরাপদ মনে করব; তোমার শুভাশিসই আমার শ্রেষ্ঠতম সম্বল। তোমার যে বিমল জ্যোতির প্রভাবে সকল আঁধার দূরীভূত হয়, যার কল্যাণে ইহ-পরকালের সকল বিষয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জ্যোতির স্মরণ নিয়ে প্রার্থনা জানাই যেন তোমার অসন্তোষ হতে দূরে থাকতে পারি, তোমার রোষ যেন আমার উপরে পতিত না হয়। তোমার নিকট আর্তনাদ করছি যেন সর্বদা তোমারই সন্তোষ লাভ করতে পারি। তুমি ছাড়া কোন শক্তি ও সহায় নেই।” কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভের পর তিনি একটু সুস্থ হয়ে জায়েদকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। পথে অত্যাচারীদের ধ্বংস কামনা করার অনুরোধ করায় রাসূলুল্লাহ (সা.) তার স্বভাবসুলভ মহানুভবতার সাথে উত্তর দিয়েছিলেন “আমি মানব জাতির জন্য আল্লাহর রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি, অভিসম্পাত করতে আসিনি।” এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “তোমাকে বিশ্বের জন্য রহমত প্রেরণ করা হয়েছে।”[৬৩২] রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সত্যই তায়েফবাসী অন্যায়

[৬৩১]. ড. আব্দুল হামীদ আহমাদ আবু সুলায়মান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭

[৬৩২]. আল-কুরআন, ২১: ১০৭

করেছে, কিন্তু তাদের বংশধরগণের মধ্যে ধর্মপ্রাণমানুষ জন্মাতে পারে।[৬৩৩] এভাবে অভিশাপ না করে কল্যাণ কামনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে রেখে গেছেন অনুকরণীয় আদর্শ।

সন্ত্রাসী, জঙ্গিকে কঠোর শাস্তি প্রদান

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) বাস্তব ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একবার বাহরাইন থেকে উক্‌ল ও উরায়না গোত্রের আটজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাদের পেট ফুলে গেল এবং শরীর হলুদ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাদের এ অবস্থা জানানো হলে তিনি তাদেরকে সাদকার উটের চারণভূমিতে নিয়ে উটের প্রশ্রাব ও দুধ পান করতে বললেন। সেখানে গিয়ে তারা সাদকার উটের প্রশ্রাব ও দুধ পান করে সুস্থ হয়ে উঠল। অতঃপর তারা উটের রাখাল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আযাদকৃত দাস ইয়াসার-কে হত্যা করল। এক বর্ণনা মতে, প্রথমেই তারা কাঁটা দিয়ে তাঁর চোখ নষ্ট করে দিয়েছিল। অতঃপর উট গুলো নিয়ে তারা পলায়ন করে। সকালের দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের সন্ধানে লোক পাঠালেন। ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনা মতে এ সংবাদ যখন পৌছল তখন তার কাছে আনসারদের বিশজন যুবক অশ্বারোহী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন সাথে পদচিহ্ন বিশারদ এক লোককেও পাঠালেন। দুপুরের দিকে তারা তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হল। চোখ উপড়ে ফেলা হল এবং এমতাবস্থায় মরুভূমির উত্তপ্তরোদে ফেলে রাখা হল। এ অবস্থায়ই তারা মৃত্যুবরণ করল। এ শাস্তির প্রচ-তা এমন ছিল যে, তারা পানি চাচ্ছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি।[৬৩৪]

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের স্ট্রাটেজী গ্রহণ

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ স্ট্র্যাটেজী এর প্রথম বিষয়টি লক্ষণীয় হলো, তা মূলত ও প্রধানতই সন্ত্রাস নির্মূলের স্ট্র্যাটেজীতে সন্ত্রাস দমন নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সন্ত্রাস মোকাবেলা সংক্রান্ত আদর্শ ট্র্যাটেজী'তে আসল কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে ধরা হয় সন্ত্রাস নির্মূলের কাজ। সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস দমনকে সীমিত পর্যায়ে বৃহত্তর স্ট্র্যাটেজী এর অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর সন্ত্রাস নির্মূলের কাজটিকে খুব দ্রুত, গভীর, সুচারু এবং স্থায়ীভাবেই ফলপ্রসূ করে সম্পন্ন করার ওপর জোর দেয়া হয়। যাতে একই সঙ্গে সীমিত পর্যায়ে অন্তবর্তীকালীন একই সীমিত ব্যবস্থা হিসেবে যে সন্ত্রাস দমনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়-তাকে যেন দীর্ঘায়িত ও বিস্তৃত না হয়।[৬৩৫] আল্লাহর রাসূল (সা.) এ সব জুলুম নির্যাতন, অন্যায়, অবিচার, শোষণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কেবল উপদেশই দেননি, আল্লাহর শাস্তির ঘোষণাই কেবল প্রচার করেননি; মানুষের মাঝ থেকে সন্ত্রাসের মূল উৎসটাকেই উপড়ে ফেলে নির্মূল করে দিয়েছিলেন।এটাই ছিল এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্যের বৈশিষ্ট্য।[৬৩৬]

সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ

আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবন হিশাম-যিয়াদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-বুখারী মুহাম্মদ ইবন ইসহাক মুত্তালিবী সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আকাবার বায়'আতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়নি এবং তাঁর জন্যে রক্তপাত বৈধ করা হয়নি। তখন তিনি আল্লাহর দীনের দাওয়াত প্রদান, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ

---

৬৩৩. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৫৭-৫৯

৬৩৪. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৬০২

৬৩৫. প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান, *সন্ত্রাস নির্মূলেমহাবী (সা.) এর আদর্শ*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৫৪-৫৫

৬৩৬. মাওলানা আবদুল গফুর, *সন্ত্রাস নির্মূল ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) এর আদর্শ*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৯৯

এবং অজ্ঞদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যেই আদিষ্ট ছিলেন। কুরায়শরা তাঁর অনুসারী মুহাজিরদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তারা তাঁদেরকে তাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংকটের সম্মুখীন করে তোলে এবং তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। মোটকথা, তাঁদের কেউ কেউ দীনের জন্যে চরম কষ্ট ভোগ করছিলেন। কেউ কেউ তাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে হাতে শাস্তি ভোগ করেছিলেন। আর কেউ কেউ তাদের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নানা দেশে পালিয়ে বেড়ায়েছিলেন। তাঁদের কেউ আবিসিনিয়ায়, কেউ মদীনায়, আবার কেউ অন্য কোথাও। কুরায়শরা যখন আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হল, তাদের জন্যে আল্লাহ সম্মান প্রাপ্তির যে সুযোগ দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করল এবং আল্লাহর নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর দ্বীনকে অবলম্বনকারীদেরকে নিগ্রহ, নির্যাতন ও দেশছাড়া করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে যুদ্ধ ও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন। আমার কাছে উরওয়া ইবন যুবায়র (রা.) প্রমুখ আলিম সূত্রে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি যুদ্ধের অনুমতি ও রক্তপাতের বৈধতার ব্যাপারে প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে তা হল, "যুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হল তাদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নি-য়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ'। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ নিষেধ করবে; সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।"[৬৩৭]

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবী (রা.) সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, আমি তাদের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এ জন্যেই বৈধ করেছি যে, তারা নির্যাতিত অথচ আচার-আচরণে তারা কোনই অপরাধ করেনি, তাদের অপরাধ শুধু এতটুকুই যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করে আর যখন তারা পৃথবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকার্যের আদেশ করে এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়।"[৬৩৮] মুসলমানরা মদিনায় হিজরত করা ও সেখানে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলমানদের নীতি পাল্টে গেল কোরাইশ নেতৃত্বাধীন আগ্রাসী হানাদারদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রয়োগের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, এবং কিভাবে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষে পরিণত হলো। এ সময়ে কুরআন মুসলমানদেরক তাদের জানমাল ও আন্দোলন রক্ষার্থে সশস্ত্র লড়াইয়ের শুধু অনুমতি দেয়নি বরং আদেশ দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) কোরাইশ ও কোরাইশ ছাড়া অন্যান্য সেই সব গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন, যারা তাঁর সংস্কারবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। এই প্রতিরোধের উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা করা, সমাজের দুর্বল লোকদের ওপর থেকে যুলুম প্রতিহত করা এবং মানুষকে তার আকীদা বিশ্বাস ও জীবন বিধান নির্বাচনের স্বাধীনতা প্রদান করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐ সব আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সর্বপ্রকারের শক্তি ও সহিংসতার উপকরণ ব্যবহার করেন।[৬৩৯]

দুশমনকে ক্ষমা, দয়া, মহানুভবতা প্রদর্শন

চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে সারাটি জীবন শান্তির বাণী মুখে নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অনেক অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। নিজে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে প্রতিঘাতের চিন্তা করেননি। চরম

---

[৬৩৭]. আল-কুরআন, ২২: ৪১

[৬৩৮]. আল-কুরআন, ৮: ৩৯

[৬৩৯]. ড. আবদুল হামীদ আবু সুলাইমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুকে ক্ষমা ও ভালবাসা প্রদান করে জগতে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।[৬৪০] মক্কা বিজয় মানব ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বিনা রক্তপাতে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে মহানুভবতা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। যারা প্রিয় জন্মভুমি হতে বিনাদোষে তাদেরকে বিতাড়িত করেছে, যারা বৎসরের পর বৎসর ধরে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে, যারা তায়েফে প্রস্তরাঘাতে রক্তে রঞ্জিত করেছে, যারা তাঁর শিষ্যবৃন্দের ওপর অত্যাচার এমনকি প্রিয়তমা কন্যাকে বর্শাঘাত করে মৃত্যু ঘটিয়েছে, যারা তাঁর পিতৃব্যের হৃৎপিন্ডকে চর্বণ-করেছে, যারা তাঁকে বিষ প্রদানে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে, নগ্ন-তরবরি দিয়ে অতর্কিতে তাঁকে ছিন্ন-ভিন্ন করার চেষ্টা করেছে, যারা দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে নির্বাসনে রেখে তাঁকে অর্ধাহারে, অনাহারে সগোত্রে মারার চেষ্টা করেছে, যারা তাঁর প্রিয় শিষ্যগণের তপ্ত কলিজার তাজা রক্তে মক্কা নগরীকে রঞ্জিত করেছে, যারা মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকায় তাঁর অনুরক্ত ভক্ত শিষ্যদেরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ করেছে, তাদের সকলকেই তিনি ক্ষমা করেছেন। বিনয় ও ক্ষমার জীবন্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় প্রবেশ করে এই রক্তপিপাসু দানবের দলকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা আমার কাছে আজ কিরূপ ব্যবহার আশা কর? তারা সভয়ে নিবেদন করেছে, আমরা তোমার মত মহাপ্রাণ ভ্রাতার কাছে ইউসুফ (আ.) তাঁর অত্যাচারী ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছিলেন, সেরূপ ব্যবহারই আশা করি।[৬৪১] বিনম্র জবানে রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআনের ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "তিনি বলেছেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়।"[৬৪২] পৃথিবীর ইতিহাসে সমগ্র জাতিকে এভাবে ক্ষমা করার দৃষ্টান্ত বিরল। ক্ষমার প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হয়, যখন যে উৎপীড়িত সে ক্ষমতা লাভ করে এবং যে অত্যাচারী সে সহায় সম্বলহীন হয়ে সেই উৎপীড়িতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনে এ দু'টি শর্তই পূর্ণ হয়েছিল। শত্রুকে ভালবাসার উপদেশ অনেকেই করেছেন। কিন্তু বাস্তব জগতে তার দৃষ্টান্ত বিরল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনে পরিপূর্ণ আদর্শ রেখে গেছেন। মক্কায় তাঁর সহায় সম্বলহীন অবস্থার কথা বলছি না, যখন নিরুপায় অবস্থায় পড়ে মানুষ প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় হয়ত শত্রুকে ক্ষমা করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) অবশ্য মক্কায় অবস্থানকালে শত অত্যাচার ও অনাচারের মাঝেও শত্রুকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করেছেন, কিন্তু ক্ষমতা লাভ করে মক্কায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ করার পর তিনি যে ক্ষমার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ .

"ভাল-মন্দ এক নহে, মন্দের পরিবর্তে ভাল ব্যবহার কর; দেখবে তোমার পরম শত্রু যার ও তোমার মধ্যে এক ঘোর বিদ্বেষ রয়েছে তোমার পরম বন্ধুতে পরিণত হবে।"[৬৪৩] সারকা-বিন-জাশাম হিজরতের সময় দ্রুতগতিতে অশ্বধাবন করে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আক্রমণ করার অভিপ্রায়ে তার নিকট উপস্থিত হয়, তিন তিনবার তার পা বাড়ায়ে বসে যায় এবং তিন তিনবার সে ভাগ্য গণনা করে ব্যর্থতার লক্ষণ পেয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে; তখন সে নিরুপায় হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট নিরাপত্তার জন্য আকুল প্রার্থনা জানায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্বিধাহীনচিত্তে তাকে লিখিত আশ্বাস দেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বিনা দ্বিধায় তাকে ক্ষমা করেন এবং হিজরতের সময়ের সেই ঘটনার কোন উল্লেখও করেননি। আবু সুফিয়ান বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিরুদ্ধে কোরাইশদের নেতৃত্বে বিরাট অভিযান চালিয়েছেন তাঁর হীন চক্রান্তে শত শহীদের রক্তে মক্কা নগরী রঞ্জিত হয়েছে, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্ষমা করে শুধু তাকে নিরাপত্তা দেননি, তার গৃহে যারা আশ্রয় নিয়েছেন তাদেরকেও নিরাপদ বলে ঘোষণা করেছেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামযার হৃৎপিন্ড চর্বন করেছিল, সেই পিশাচীকেও রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্ষমা করেন। তাঁর এ মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে সে উচ্ছসিতকণ্ঠে বলে উঠেছিল, "মুহাম্মদ পৃথিবীতে

---

[৬৪০]. মাওলানা আবদুল গফুর, *সন্ত্রাস নির্মূল ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) এর আদর্শ*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৯৭

[৬৪১]. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৬৩-৬৪

[৬৪২]. আল-কুরআন, ১১: ৯২

[৬৪৩]. আল-কুরআন, ৪১: ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

তোমার তাঁবু অপেক্ষা অন্য কোন তাঁবুকে আমি অধিক ঘৃণা করিনি; কিন্তু আজ তোমার তাঁবুই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়।" হামযা (রা.) এর হত্যাকারী ওয়াহশী তায়েফ বিজয়ের পর ভয়ে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আশ্রয়স্থল ব্যতীত তাঁর জন্য আর কোন নিরাপদ স্থান নেই, সকলের নিকট এ আশ্বাস পেয়ে সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শরণাপন্ন হয় এবং মহাপুরুষ তাঁকে দ্বিধাহীনচিত্তে ক্ষমা করেন।

আবু জেহেলের পুত্র আকরামা তার পিতার সাথে মিলিত হয়ে বৎসরের পর বৎসর ধরে মুসলমানদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর সেও ভয়ে পালিয়ে যায়; কিন্তু তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর স্বামীকে ফিরিয়ে এনে তাঁর দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তাকে কেবল ক্ষমায় করেননি, তাকে স্বাগত ও সাদর-সম্ভাষণ জানান। নিজ কন্যার এক প্রকারের হত্যাকারী হাববারকেও মহাপুরুষ অকুণ্ঠচিত্তে ক্ষমা করেন। মক্কা বিজয়ের পর সে জঘন্য দোষে দোষী সাব্যস্ত হলে তার জন্য কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হয়। হাববারের ইরান পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে ইরান না গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দ্বারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, "মহাত্মন! আমার সম্বন্ধে যা শুনেছেন তা সবই সত্য। আমি ইরানে পালিয়ে যাব মনস্থ করেছিলাম কিন্তু আপনার দয়া ও মহানুভবতার কথা শুনে আপনার দ্বারে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য এসেছি।" মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর করুণার দ্বার খুলে যায় এবং তিনি এই পরম শত্রুকেও ক্ষমা করেন। কুরাইশ সরদার সাফওয়ান বিন উন্মিয়া আমীর বিন ওহাবকে প্ররোচিত করে তার বিষাক্ত তরবারি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হত্যা করার জন্য মদিনায় পাঠায়; কিন্তু আমীর ঘটনাচক্রে গ্রেপ্তার হয়ে পড়ে। মহাপুরুষ এ নরপিশাচকেও ক্ষমা করেন। সাফওয়ান বিন উন্মিয়া ভয়ে হজ্জে যাবার উদ্দেশ্যে জেদ্দায় পালিয়ে যায়। আমীর এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট সাফওয়ানের জন্য নিরাপত্তার প্রার্থনা জানায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার নিরাপত্তার আশ্বাস দেন, কিন্তু তাঁর আশ্বাসের কোন নিদর্শন না পেলে সে তার দরবারে আসতে সাহস করবে না। পুনরায় তাঁর নিকটে এই নিবেদন করায় তিনি তৎক্ষণাৎ নিদর্শন স্বরূপ তাকে নিজের আমাম (পাগড়ী) দান করেন। এভাবে চরম শত্রুকে দয়া, ক্ষমা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করে রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে এক অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন।[৬৪৪]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

সমাজে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অত্যাচারীকে কোনক্রমে সমর্থন করা যায় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান ন্যায় নীতি অনুসারে হলে জগতে শান্তি অক্ষুন্ন থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায়বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই অল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত আছেন।'[৬৪৫] এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানে এতই পরিস্কার যে প্রত্যক অত্যাচার ও অনাচারের প্রতিকারের ব্যবস্থা এতে রয়েছে এবং অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত জনগনকে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতির ওপরেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। যদি প্রতিশোধ নেওয়ার অথবা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অনুমতি না দেওয়া হতো বা রাষ্ট্র নিযুক্ত বিচারকগণ ন্যায়দণ্ড পরিচালনা করে অত্যাচারীর শাস্তির ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে এ প্রথিবী বসবাসের অযোগ্য হতো। সে জন্য ইসলাম চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, নরহত্যা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অন্যান্য সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে।[৬৪৬]

---

৬৪৪ . সৈয়দ বদরুদ্দোজা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২২-১২৪

৬৪৫ . আল-কুরআন, ৫: ৮

৬৪৬ . সৈয়দ বদরুদ্দোজা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩২

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবন ছিল ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক। আর তাঁর সাহাবা ও শিষ্যগণও তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনে এই ন্যায়পরায়ণতার শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে। একদা মজুম সম্প্রদায়ের একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করে ধরা পড়লে সাহাবাগণ এ মহিলাটিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাদের সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে ঐ মহিলাটির যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেন। যায়েদের পুত্র ওসামাও হযরতকে এ মহিলাটি ক্ষমা করার একান্ত অনুরোধ জানালে তিনি বলেন, "ওসামা, তুমি এর দোষ খণ্ডন করার জন্য ওকালতি করছো। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে; কারণ যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্মানীয় ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাকে মুক্তি দিত, কিন্তু যদি কোন অসহায় ব্যক্তি চুরি করত, তাকে দণ্ড দিত।"[৬৪৭] তাইমা ইবন উবাইরাক নামেমাত্র একজন মুসলমান (প্রকৃতপক্ষে সে ছিল কপট) বর্ম চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হলে, সে বর্মটি একজন ইয়াহূদীর বাড়িতে পুতে রাখে ইয়াহূদীর বাড়ী থেকে তা উদ্ধার করা হলে ইয়াহূদী অভিযোগ অস্বীকার করে এবং তাইমার ওপর দোষ চাপায়। একজন মুসলমান হিসেবে সকল মুসলমানের সহানুভূতি ছিল তাইমার পক্ষে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মামলাটি নিজ হাতে নিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক বিচার করে ইয়াহূদীকে মুক্তি দান করলেন।"[৬৪৮] তাই সকলের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সাম্য ও ইনসাফ কায়েম করলে সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মূলোৎপাটন হতে পারে।

জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান

মানুষের জীবন ও সম্পদ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রধান অবলম্বন। এ গুলো না থাকলে মানুষ সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। ইসলাম জীবন, মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রু ও সম্পদের নিশ্চিত নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। এ সব ক্ষতিগ্রস্থ করার অধিকার কারো নেই। এ ক্ষেত্রে ইসলাম কাউকে বিন্দুমাত্রও ছাড়ের সুযোগ দেয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন, "হে মানবগণ! তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে। সে পর্যন্ত তোমাদের জীবন ও সম্পদ থাকবে অক্ষত। তোমাদের জীবনের ও সম্পদের নিরাপত্তা থাকবে অক্ষত আজকের পবিত্র দিন ও পবিত্র মাসের মতই। স্মরণ রেখো, তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রভূর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তিনি সত্যিই তোমাদের কাজের হিসাব নেবেন।"[৬৪৯] তাই সমাজে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করলে কখনো সন্ত্রাসও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না।

ভারসম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা চালু

বৈষম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার কারণে জন্ম নেয় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। কেউ অনাহারে, অর্ধাহারে দিনাতিপাত করবে আবার কেউ অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হয়ে বিলাসবহুল জীবন-যাপন করবে। ইসলাম তা কখনো সমর্থন করে না। এ ধনীর ধনে গরীবের অধিকার রয়েছে। ধনীদেরকে কৃপনতা, অপব্যয় পরিহার করে যাকাত ও সদকাহ প্রদানের মাধ্যমে গরীবদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের সুষম এবং ভারসম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে ধনী-গরীবের মাঝে বৈষম্য দূর করেন এবং তাদের মাঝে সদ্ভাবের সৃষ্টি করেন যা সমাজকে শান্তিময় করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যাবতীয় ধন-সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মাঝেই আবর্তিত বা কুক্ষিগত না হয়।"[৬৫০] সুতরাং ইসলামী অর্থব্যবস্থার বাস্তবায়ন সমাজ থেকে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ উত্থানের পথকে রুদ্ধ করে দেয়।

দারিদ্র বিমোচন

---

[৬৪৭]. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১৩৫

[৬৪৮]. এডভোকেট মুজিবুর রহমান, **ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌম, শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ৯১**, ঢাকা: সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ১৯৯১, পৃ. ১২২

[৬৪৯]. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *ইসলামে মানবাধিকার*, নূরুন্নবী খানঅনুদিত, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৩৭-৩৮

[৬৫০]. আল-কুরআন, ৫৯: ৭

সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ ঐ স্ট্র্যাটেজীতে সন্ত্রাসমূলক যে লোভ তার মূলউৎপাটনের জন্য একদিকে দুনিয়ার মহব্বত দূরীকরণের জন্য তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি যে সব প্রয়োজন মেটানো দুনিয়াবী জীবনের জন্য অপরিহার্য, তার অভাব দূরীকরণের সমন্বয় করা হয়েছে। দারিদ্র্য ব্যক্তিকে উত্তম দানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন,

يَا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاذ مَا كَسَبْذمْ ومِمّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ولَا ذيَمّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ ذنْفِقُونَ ولَسْذمْ بِآخِذيهِ إِلّا أَنْ ذغْمِضُوا فِيهِ واعْلَمُوا أَنّ الله غَنِيّ حمِيدٌ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাব মুক্ত, প্রশংসিত।"[৬৫১]

এই অভাব দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিজের দোয়ায় কুফর (অবিশ্বাস) এবং ফকর (অভাব) কে একই বাক্যে উচ্চারণ করে, উভয় থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চান। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সন্ত্রাস নির্মূলের আদর্শ স্ট্র্যাটেজীর আরেকটি অংশ হবে সমাজ থেকে অভাব দূরীকরণ তথা দারিদ্র বিমোচন। দারিদ্র বিমোচন যে সন্ত্রাস বিরোধী স্ট্র্যাটেজীর অংশ হওয়া দরকার, তা এ বিষয়ে আজকের পৃথিবীর প্রায় সকল বিশেষজ্ঞই একমত। কিন্তু দারিদ্র বিমোচন সন্ত্রাস নির্মূলের সফল ট্র্যাটেজীর একটি দিক মাত্র। তা করতে গিয়ে স্ট্র্যাটেজী'র পূর্বে আলোচিত অন্য দিকটি প্রবৃত্তি থেকে পার্থিব বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণ দূরীকরণ-তাতে যদি বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তা হলে তা হবে হিতে বিপরীত। তাই মহানবী (সা.)-এর সন্ত্রাস নির্মূলের আদর্শ স্ট্র্যাটেজীতে দারিদ্র্য মোচন তার এক অপরিহার্য অংশ হলেও তাকে রাখা হয়েছে আত্মশুদ্ধির অপরিহার্যতার অধীন। আর সে জন্যই দারিদ্র্য বিমোচনের এমন সব পদ্ধতি তাতে সন্নিবেশিত, যা দারিদ্র বিমোচন করলেও অবাধ ভোগবাদ পথ খুলে দেয় না। নিসাব নামে দারিদ্র্যসীমাকে বস্তুগত সম্পত্তির অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের ধরে রেখে যাকাত, সাদাকা, ফিতরা ইত্যাদি এমনভাবে চালু করা হয়েছে, যাতে এ সবের গ্রহীতা হিসেবে এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের সুবিধা যারা নেবেন, তারা দারিদ্র্যসীমা থেকে উঠতে না উঠতেই, আবার এসবের দাতা হিসেবে নিজেরাও আবার দিতে শুরু করতে বাধ্য হন। ফলে শুধু চাওয়া আর পাওয়ার মাধ্যমে সর্বগ্রাসী সদাগ্রাসী ভোগবাদী প্রবণতার অভ্যাস আর তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে না। তাই সন্ত্রাস নির্মূল ট্র্যাটেজীর অংশ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অপরিহার্য দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টাটিকে দারিদ্র বিমোচনে অনুসরণ করা দরকার। মুসলিম সমাজ সকল অনুদানমূলক দারিদ্র-বিমোচন প্রচেষ্টাকে যাকাত-সাদকা-ফিতরার ছাঁচে ঢেলে সাজিয়ে প্রচলিত করা হবে সহজ ও অধিকতর ফলপ্রসূ। যেসব সমাজ মুসলিম প্রধান নয়, সেখানেও যাকাত ফিতরার ন্যায় অনুদানমূলক দারিদ্র-বিমোচন প্রক্রিয়া চালু করা দরকার। পাশ্চাত্য প্রচলিত দারিদ্র বিমোচনমূলক প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক পার্থক্য হলো- এই প্রক্রিয়ায় অনুদানটি নিঃশর্তে, বা অনুদানদাতাকে কিছু ফেরত দেয়ার শর্তে হয় না। বরং তা হয়ে থাকে, নিজে অনুদান ব্যবহার করে দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করা, ঐ সীমার উদ্বৃত্ত থেকে সীমার নিচে থেকে যাওয়াদের নির্দিষ্ট কিছু অনুদান বাধ্যতামূলকভাবে দেওয়ার শর্তে।[৬৫২]

ধনী দরিদ্রের যৌথ ব্যবসার প্রচলন

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ সন্ত্রাসনিমূল স্ট্র্যাটেজী'র একটি অংশ হলো, অতি প্রয়োজন পূরণে দেয়া অনুদানের উপরও দরিদ্রজনকে উৎপাদনমুখী করে তুলার জন্য সমাজের ধনাঢ্যদের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়ের

---

৬৫১. আল-কুরআন, ২: ২৬৭

৬৫২. প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান, *সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা.) এর আদর্শ*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৫৭-৫৯

সম্পর্ক গড়ে তুলা, ধনী-দরিদ্রের যৌথ মালিকানাভিত্তিক নানা ব্যবসায়ের প্রচলন করতে হবে। এইরূপ ধনী-দরিদ্রের সরাসরি সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভেতর দিয়ে চালিত যৌথ ব্যবসায়ের এমন বহু মনস্তত্ত্বগত উপকার আছে, যা সমাজ থেকে শ্রেণিবিদ্বেষসহ সন্ত্রাস ও জঙ্গি প্রবণতা দূরীভূত করবে । নানা ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের দেয়া টাকা দিয়ে চালিত মুদারাবায় সেটা সাধারণত হবে না। সন্ত্রাস নির্মূলের আদর্শ স্ট্র্যাটেজীর অংশ হিসেবে পাড়ায় পাড়ায় ধনী-দরিদ্রের এমন যৌথ ব্যবসায়ের প্রচলন করা দরকার। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাই করেছিলেন বলে প্রতীয়মান।

তাযকিয়াতুন নাফ্স এর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের জন্য এর উৎসরূপ মনোবিকারমূলক চরিত্রগত দুর্বলতা সেগুলো দূরীকরণেই সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবীদার। এজন্য তাযকিয়াতুন নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি আজকের প্রচলিত পরিভাষায় যাকে অনেকে তাসাউফ বলে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অন্তরকে সর্ব প্রকার চারিত্রিক ও আত্মিক রোগ-ব্যধি ও সহিংসতা-সন্ত্রাসী ভাব থেকে পবিত্র রাখার জন্য এই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন হয়। যার মূল কথা হলো, ভিতর-বাহিরকে নেক আমল দ্বারা সজ্জিত করা এবং বদ আমল ও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আখলাক-চরিত্রকে সংশোধন করা এবং অন্তরকে এ পরিমাণ পাক-পবিত্র করা যে, তার ভিতর-বাহিরের সর্ব প্রকার নিকৃষ্ট গুণাবলীর প্রতি ঘৃণা ও সর্ব প্রকার উৎকৃষ্ট গুণাবলীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।'[৬৫৩] এ শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম পালনে সফলতার মূল চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬৫৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে নিজেকে বিশুদ্ধ করবে সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে কলুষিত করবে সে ব্যর্থ হবে।"[৬৫৫] সমাজে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের যে কোন ট্র্যাটেজীর কেন্দ্রীয় বিষয় (Lynchpin) হবে আত্মশুদ্ধিমূলক নানা পদ্ধতিগত কর্মকাণ্ড । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাহাবী (রা.) এর শিক্ষা-দীক্ষা আর আচরণ পদ্ধতি থেকে নেয়া নানা উপাদানে সমন্বিত-উপস্থাপিত তাযকিয়াতুন নাফ্স বা তাসাউফের যে সব বিভিন্ন বিশুদ্ধ পদ্ধতি (তরীকা) রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপক প্রচার প্রসার ও প্রয়োগ হবে সমাজে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের আদর্শ স্ট্র্যাটেজী প্রয়োগের প্রধান কাজ।[৬৫৬]

অবক্ষয় রোধে নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষা প্রদান

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন তৎকালীন আরব দেশে নৈতিক অবক্ষয় চরমে পৌঁছেছিল। নৈতিকতার সেই চরম অবক্ষয়ের যুগে তিনি আবির্ভূত হলেন আলোর দূত হয়ে। যাঁকে আল্লাহ তা'আলা নিজে অভিহিত করলেন, "আল্লাহর পথে তারই নির্দেশ আহ্বানকারী এবং প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা বলে।"[৬৫৭] সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী রাসূলুল্লাহ (সা.) হিংসা বিদ্বেষ হানাহানিতে লিপ্ত মানবজাতিকে নৈতিকতার আলোকোজ্জ্বল পথে আহ্বান জানালেন। "হে মানবজাতি, তোমাদের সেই মহান প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"[৬৫৮] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নৈতিক শিক্ষা আরবজাতিকে দান করেছিল নৈতিকতার বিশাল ভাণ্ডার। তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত এবং নৈতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে তৎকালীন আরববাসী সেরা শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। নৈতিক অবক্ষয়রোধে ইসলাম এবং বিশ্বব্যাপী চলছে এর মহান অবদানের জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম জাতির প্রতি তার পরম অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মু'মিনদের প্রতি এটা আল্লাহর পরম অনুগ্রহ যে তিনি তাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন নবী তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করল,

---

৬৫৩ . দৈনিক ইনকিলাব, মুমিনের জীবনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ১৬ জানুয়ারী ২০২০ খ্রি. (https://www.dailyinqilab.com/article/261146)

৬৫৪ . প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

৬৫৫ . আল-কুরআন, ৯১: ৯-১০

৬৫৬ . প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান, **সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা.) এর আদর্শ**, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত, পৃ.*** ৫৬

৬৫৭ . আল-কুরআন, ৩৩ : ৪৬

৬৫৮ . আল-কুরআন, ২ : ২১

তাদেরকে পরিশুদ্ধ ও পরিশিলীত করল এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করল।"[৬৫৯] আজ যখন চারদিকে সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদ, হানাহানি, খুনোখুনি ও অন্যায় অত্যাচারের তান্ডব লীলা বিশ্বব্যাপী চলছে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহান শিক্ষাবলী নৈতিক অবক্ষয়রোধে সকলের পথিকৃতরূপে কাজ করতে পারে।[৬৬০]

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়ে

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রবণতার একটি উৎস হলো স্নায়ুর নানারূপ অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, শব্দদূষণ, পরিবেশ দূষণ, যা স্নায়ুর উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। নগরায়িত যান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধানির্ভর জীবনাভ্যাসে অভ্যস্ত অনেকেই এই উত্তেজনা থেকে মুক্তি পাবার জন্য জীবনে যন্ত্রনির্ভরতা ও যান্ত্রিকতা বৃদ্ধিমূলক নানা উপায়ের আশ্রয় নেয়। এ যেন ঘৃতে-অগ্নি! টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠানাদির অধিকাংশ উচ্চশব্দে উচ্চারিত যান্ত্রিক শব্দপ্রধান গানবাজনা, ঐরূপ শব্দ কানে নিয়ে ক্যাসেট ইত্যাদি শোনা, অনেক ক্ষেত্রে মাদক ব্যবহার, এ ধরণের ঘৃতে-অগ্নিতুল্য তথাকথিত বিনোদনমূলক উপায়। সমাজের রক্ষণশীলগণ এ সবে বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে সব বিনোদনকেই হারাম করে দেয়। তবে বিনোদনকারী এইসব উত্তেজিত স্নায়ুজনদের ঘৃতাগ্নিতুল্য বিনোদনের দিকেই ঠেলে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ স্ট্র্যাটেজীতে স্নায়ুর উত্তেজনা নিবারণকারী নানা সাংস্কৃতিক ও বিশুদ্ধ বিনোদনমূলক উপায় ছিল। সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ, ছন্দিত সুরে যিকির-আযকার, হামদ, নাতে রাসূল এমনকি অযুতে ভেজা হাতে ঘাড়ের পিছন মোছা, বা খরতাপে পাগড়ির কাপড়টা ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা, এ সবই স্নায়ুর উত্তেজনা নিবারণ করে। এ ছাড়াও কবিতা আবৃত্তি, খেলাধুলা, এমনকি ঈদে-উৎসব অনুষ্ঠানে নির্দোষ বিনোদন অনুষ্ঠান-সবই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শে করা হতো। এসব যান্ত্রিকতাবিমুক্ত উপায়াদির মাধ্যমে সমাজে নির্দোষ বিনোদনের উপায় ও প্রথা প্রচলন প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রচলিত বা অনুমোদিত ঐ সব বিনোদন প্রক্রিয়ার সূত্র ধরেই দেড় হাজার বছর ধরে বিভিন্ন দেশে মুসলমান সমাজে নানারূপে প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি ও রক্ষণশীলদের ভিত্তিহীন বিরোধীতার মুখে এসব প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের আদর্শ স্ট্র্যাটেজির অংশ হিসেবেই, একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবরূপেই, এসব ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মকে গ্রাম-গঞ্জে, শহর-বন্দরে, পাড়া-মহল্লায়, অফিস-আদালতে, অনেকটা গণসঙ্গীতের মতই ছড়িয়ে দিতে হবে। কাওয়ালী, মারেফতি, মরমীয়া, কাসীদা, মীলাদ, যিকিরের মাহফিল এইসব উপায়াদির নানারূপ যান্ত্রিক অপসংস্কৃতির অপরিহার্য বিকল্প হিসেবে । এসবের ব্যাপক বিস্তারের আয়োজন করে সন্ত্রাস ও জঙ্গি প্রবণতার অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক উৎস। যে সায়ুগত উত্তেজনার উপশমের বন্দোবস্ত করতে হবে।[৬৬১] সর্বোপরি শান্তির দূত রাসূলুল্লাহ (সা.) যে নীতিমালা রেখে গেছেন তা অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ মুক্ত বিশ্ব গড়া সম্ভব। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্, তোমরা যদি এই দুটোকে আঁকড়ে ধরো তাহলে পথভ্রষ্ট হবে না।"[৬৬২]

ইমাম ও খতিবদের বিশেষ বয়ান

দৈনিক পাঁচবার জামা'আতে সালাত আদায় করার জন্য ইমামকে কোন খুতবা দিতে হয় না। খুতবা অর্থ ভাষণ বা বক্তৃতা। সাপ্তাহিক জুমুয়ার জামা'আতে এবং বার্ষিক দুই ঈদের জামা'আতে ইমামকে খুতবা দিতে হয়।[৬৬৩] কেউ যাতে সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পরে, সে জন্য মুসলমানদের মধ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবায় মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ওপর বিশেষ বয়ান প্রদান করে করতে হবে। যাতে মুসল্লিরা এখান থেকে নসিহত গ্রহণ করে সুন্দর জীবনের সন্ধান পায়। পাশাপাশি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কুপ্রভাব থেকে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে।[৬৬৪]

---

৬৫৯. আল-কুরআন, ৩: ১৬৪

৬৬০. আবদুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী, *নৈতিক অবক্ষয়রোধে ইসলাম*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৭৪

৬৬১. প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান, *সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা.) এর আদর্শ*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৫৬

৬৬২. তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৬, পৃ. ১৩১

৬৬৩. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৭৬

পারস্পরিক মতবিনিময়

সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও শ্রেণি পেশার মানুষ বসবাস করে থাকে। তাদের অনেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে অবহিত নয়। তাই তাদেরকে সচেতন করে তোলার জন্য পারস্পরিক মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক ঐক্য বা ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করলে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা নিয়ে সকলে মিলে জঙ্গিবাদের মত বিষয়ে মতবিনিময় করলে দীনের নামে বিভ্রান্তি ও উগ্রতা সহজেই দূরীভূত করা সম্ভব হবে।[৬৬৫]

গণসচেতনতা তৈরী

বাংলাদেশসহ বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে দেখা যায় যে, হাট-বাজারে, গ্রাম-গঞ্জে, মাদ্রাসা-মসজিদে বিভিন্ন সময় ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সেখানে ওয়াজ-নসিহত করার জন্য উলামায়ে কেরামদেরকে দাওয়াত করা হয়। সে ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম সামান্য সচেতন হলে এ সুযোগে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করে গণসচেতনা সৃষ্টি করতে পারেন। পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[666]

নৈতিক এবং চারিত্রিক উন্নয়ন সাধনের শিক্ষা প্রদান

নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মূল কারণ। যে জাতি চরিত্র-নৈতিকতায় যত উন্নত, সে জাতি ততই চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। তাই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন করতে হলে চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নতি অপরিহার্য।[৬৬৭] এ জন্য সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের জন্য নৈতিক এবং চারিত্রিক উন্নয়ন সাধনের শিক্ষা প্রদান করতে হবে। যাতে সৎ, চরিত্রবান এবং আদর্শ সুনাগরিক গড়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটে।

আত্মশুদ্ধিমূলক 'তরীকা' সমূহের চর্চা ও প্রচার-প্রসার

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের জন্য সন্ত্রাসের মনোবিকারমূলক চরিত্রগত দুর্বলতা সেগুলো দূরীকরণেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এজন্য প্রবৃত্তির শুদ্ধি বা তাযকিয়াতুন নাফস আজকের প্রচলিত পরিভাষায় যাকে 'তাসাউউফ' বলে তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। কুরআনে নাফসের তাযকিয়া কে ধর্মকর্ম মাধ্যমে অর্জিতব্য যে সাফল্য তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

'যে তার নাফসকে পরিশুদ্ধ করলো, নি-য়ই সে সফলকাম হয়েছে। আর যে তার নাফসকে কলুষিত করলো সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'[৬৬৮] সমাজে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাস নির্মূলমূলক সাফল্য সম্ভব যে কোন ষ্ট্রাটেজীর কেন্দ্রীয় বিষয় তা হলে হতে হবে প্রবৃত্তির শুদ্ধিমূলক নানা পদ্ধতিগত কর্মকাণ্ড । সমাজটি যদি মুসলিম সমাজ হয়- তাহলে তো কথাই নেই। খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের শিক্ষা-দীক্ষা আর আচরণ পদ্ধতি থেকে নেয়া নানা উপাদানে সমন্বিত-উপস্থাপিত তাযকিয়া বা তাসাউউফের যেসব বিভিন্ন বিশুদ্ধ ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপক প্রচার প্রসার ও প্রয়োগ হবে সমাজে সন্ত্রাস নির্মূলমূলক আদর্শ ষ্ট্রাটেজী প্রয়োগের প্রধান কাজ। সমাজটি মুসলমান প্রধান না হলে, সেখানেও এই সব পদ্ধতির বিষয়বস্তু এবং প্রক্রিয়াগত পদ্ধতিকে ধর্মীয় বিষয় হিসেবে যদি নাও হয়- সমাজ মনস্তাত্ত্বিক,ম সংশোধন-সংস্কারমূলক সাংস্কৃতিক এক প্রচেষ্টা হিসেবেই তার প্রচলন করা যেতে পারে।

---

৬৬৪. মুহাম্মদ আবদুল মুমিন খান, *ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সমর্থন করে না*, দৈনিক প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর,২০১১, পৃ. ১২

৬৬৫. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে সন্ত্রাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬

৬৬৬. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, সেমিনার বক্তৃতা, পৃ.*বিত্র সিরাতুন্নবী (সা.) জাতীয় সেমিনার*, ২০০৭, পৃ. ৭

৬৬৭. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ১৪

৬৬৮. আল কুরআন, ৯১: ৯-১০

এই আদর্শ ষ্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের মন থেকে লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা ও হীনমন্যতা এবং অন্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাবের মত নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা দূর করতে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শে তা-ই প্রতীয়মান হয়। 'দুনিয়া' তথা বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার মহব্বত তথা আকর্ষণ তথা লোভ যে পাপ, তথা অপরাধের উৎস তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন। সন্ত্রাসের উৎসমূলরূপ এই লোভ দূর করার জন্য, নানা সাধনার মাধ্যমে ব্যক্তির প্রবৃত্তি থেকে 'দুনিয়ার মহব্বত' দূর করাটা এই আদর্শ ষ্ট্রাটেজীর গুরুত্বপূর্ণ দিক।[৬৬৯]

৩. মুসলমানদের আক্বীদাহ- বিশ্বাস ও উপলব্ধির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর দ্বীন ও তাঁর কিতাবের প্রতি প্রকাশ্যে অবজ্ঞা প্রকাশ কিংবা গালি দিতে পারবে না।

৪. নিজেদের ধর্মবিশ্বাস যেমন ঃ ত্রিত্ববাদ, ক্রুশ এর ন্যায় অন্যান্য মতাদর্শ ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ প্রচলন করা ও নিজেদের ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্যদের মাঝে নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে পারবে না।

যিম্মীদের উপর আরোপিত এ দায়িত্বসমূহ মূলত মুসলমানদের উপরে আরোপিত কতিপয় দ্বীনি দায়িত্বের মতই। যেমন-

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বে যত নবী ও রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন, তাদের শরী'আতের অবমাননা না করা।

খ. আহলে কিতাবদের সাথে সদ্ভাবে বিতর্ক করা।

গ. আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের যিম্মায় অবস্থানরত অমুসলিমদের অধিকার আদায়ের মাধ্যমে তাদের প্রতি মমতা প্রকাশ করা।

বর্তমান আধুনিক যুগে কোনও কোনও ইসলামী রাষ্ট্রে এসব অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য আকীদার গণ্ডি থেকে বের হয়ে সাংবিধানিক গণ্ডিতে স্থানান্তরিত হলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। তা দ্বীনি দায়িত্ব বা অধিকার হোক কিংবা দুনিয়াবী দায়িত্ব বা অধিকার হোক। কারণ এসকল অধিকার বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হলো একটি দ্বীনি পরিবেশের ভিত্তি সুদৃঢ় করা। আর এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কল্যাণ বাস্তবায়নে অধিক্যতা তৈরি করা এবং তাদের অধিকার নিশ্চয়তা দানে প্রবৃদ্ধি আনয়ন। আর ইসলাম যা অত্যাবশ্যক করেছে, তা থেকে অন্যমনষ্ক হবার বা তার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করার কিংবা তা অস্বীকার করার সাধ্য কোনও শাসকের নেই।

সহনশীলতার শিক্ষা প্রদান

সহনশীলতার মাধ্যমেও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করা যায়। যে কোন মানুষের জন্য জান্নাতে যেতে হলে অনেক শর্তের মধ্যে একটি হল সহনশীলতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, শুধু তারা ব্যতীত যাদের ঈমান আছে, সৎকর্ম করে এবং যারা মানুষকে সত্য ও সহনশীলতার উপদেশ দেয়।"[৬৭০] মানুষকে সহনশীলতা আর অধ্যবসায়ের উপদেশ প্রদান করতে হবে। সহনশীলতা হল জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম শর্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি তোমার চোখের সামনে অন্যায় কিছু ঘটে আর যদি তোমার সামর্থ্য থাকে তাহলে সেটা হাত দিয়ে বন্ধ কর। যদি হাত দিয়ে বন্ধ করতে না পার তাহলে তোমার জিহ্বা দিয়ে বন্ধ কর। তোমার জিহ্বা দিয়ে বন্ধ করতে না পারলে মনে মনে ঘৃণা কর। আর যদি তুমি এটা কর তাহলে তুমি একেবারে নিচের স্তরের বিশ্বাসী।"[৬৭১] তাই সবাইকে সহনশীল হতে হবে। সহনশীলতার শিক্ষা দিতে হবে।[৬৭২] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৬৭৩]

গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান

[৬৬৯]. নূরুল ইসলাম মানিক, ***সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম*** (ঢাকা: ইফাবা, ৪র্থ সংস্করণ, জুন ২০১৩) পৃ. ৫৬-৫৭

[৬৭০]. আল-কুরআন, ১০৩ : ১-৩

[৬৭১]. সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১, পৃ. ৬৯

[৬৭২]. ডা. জাকির নায়েক, *সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ*, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৬৫-৬৭

[৬৭৩]. আল-কুরআন, ২ : ১৫৩

যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে, এবং যারা এর মদদদাতা, তারা এ জগতের শত্রু। তাদের সাথে মেলামেশা, লেনদেন, সুসম্পর্ক বজায় রাখা যাবে না। তারা কোন আদেশ-উপদেশ করলে তাৎক্ষনাত তা পরিহার করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না।"[৬৭৪] এখন প্রয়োজন এমন কিছু মহৎ লোকের যারা একদিকে সরকার, প্রশাসন ও দায়িত্বশীলদেরকে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে গঠনমূলক পরামর্শ দিবেন। অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধার্মিক মানুষদেরকে হটকারিতা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, উগ্রতা ও হতাশা পরিত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে ধৈর্য, প্রজ্ঞা, সহিংসতার পরিবর্তে শান্তি ও খারাপের মুকাবিলায় ভাল আচরণ অব্যাহত রাখার অনুপ্রেরণা দিবেন।[৬৭৫]

দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকা

সামাজিক জীবনে প্রত্যকটা মানুষই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এই দায়িত্ববোধ সম্পর্কে মানুষদেরকে সজাগ ও সতর্ক করে তোলাই দ্বীনি দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য।[৬৭৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরাই সর্বোকৃষ্ট জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষদেরকে ফিরিয়ে রাখবে।"[৬৭৭] এই ঘোষণা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ হল, তারা গোটা মানব জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করবে। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর যিম্মাদারী। তাই তো কল্যাণের পথে আহবানকারীর মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ঐ ব্যক্তির কথা থেকে সর্বোত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে (মানুষদের) ডাকে এবং সৎ কাজ করে এবং বলে নি-য়ই আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন।"[৬৭৮] আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট যে, নিজেকে একজন মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়ার পূর্বে ভাল কাজ করতে হবে এবং মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে হবে। তবেই আল্লাহর যমীনে সুখ-শান্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের মাঝে পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ, লুণ্ঠন, স্বার্থ চরিতার্থের ঘৃণ্য আগ্রসন নীতি ও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের হিংস্র মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না।[৬৭৯] সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। সবাই যদি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকে, তাহলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিস্তার লাভ করতে পারবে না।[৬৮০]

সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা

কোন দেশের সমাজ গঠনের জন্য তার অধিবাসীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা অন্যতম পূর্বশর্ত। বসবাসরত মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতার অভাব হলে সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন করা অসম্ভব। ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলমানগণ পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও সহকারী হওয়ার কথা।[৬৮১] মানুষ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য হলো, দুনিয়ার সকল মানুষই এক আদম সন্তান। অতএব সকলেই সমানভাবে পরস্পরের ভাই। জাতি, অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার কারণে মানুষকে মৌলিকভাবে বিভক্ত করার নীতি ইসলাম সমর্থন করে না।[৬৮২] বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইসলাম ব্যক্তির সাথে পরিবারের, ব্যক্তির সাথে জাতির এবং এক জাতির সাথে অপর জাতির সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ দায়িত্ব পালনে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সচেষ্ট

---

৬৭৪. আল-কুরআন, ২৬ : ১৫১

৬৭৫. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ*, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ২৫৬

৬৭৬. মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, *সন্ত্রাস ও ইসলামী মূল্যবোধ*, নুরুল ইসলাম মানিকসম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ১৮৪

৬৭৭. আল-কুরআন, ৩ : ১১০

৬৭৮. আল-কুরআন, ৪১ : ৩৩

৬৭৯. মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, *সন্ত্রাস ও ইসলামী মূল্যবোধ*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ১৮৪

৬৮০. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৪৯

৬৮১. ড. এ. এইচ.এম ইয়াহইয়ারহমান, ***মুসলিম বিশ্বের পতনের কারণ ও প্রতিকার,*** The Islamic University Studies (Part-A), Vol. 6,No. 1, December-1997, p. 4

৬৮২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম, ***ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা,*** ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ.

থাকতে হবে।[৬৮৩] এমতাবস্থায় সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বিবেকবান মানুষ হিসেবে দায়িত্বহীন থাকতে পারে না। কেননা সমাজের বর্তমান অবস্থা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত নাজুক। তাই প্রত্যেকে তাঁর নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বিষয়ে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[৬৮৪]

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ

সভ্যতার বিকাশের জন্য অবিরাম পরিশ্রম করেছে অনেক জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞজন। আল কুরআনে এ ধরণের জ্ঞানী ও গুণী বিজ্ঞ লোকের পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন এবং মানুষের মধ্যে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটি আখিরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীনের জন্য।"[৬৮৫] অতএব, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করে সামাজিক শান্তি স্থাপনের জন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে সুদৃঢ় করা এবং সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের নিষ্পত্তি, আপোষ মীমাংসা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পারস্পরিক ভালবাসা ও সৌহার্দ্যমূলক আচরণের মাধ্যমে জনগণকে শান্তি শৃঙ্খলার প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। অবশ্য এসব ব্যাপারে ভূমিকা পালনের জন্য তাদের যেমন প্রশিক্ষণ দিতে হবে, তেমনি প্রশিক্ষণোত্তর জ্ঞান কাজে লাগানোর সুযোগও থাকতে হবে। তাঁরা দূর্নীতিমুক্ত, শোষণহীন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য মানুষের মনের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে সামাজিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সবাইকে আর্থিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতা দেওয়া প্রয়োজন। তবেই তাঁরা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।[৬৮৬]

সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা

ইসলাম মানব জীবনকে সম্মানের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং একজন মানুষের জীবন অন্যায়ভাবে হরণকে সমস্ত মানব গোষ্ঠীকে হত্যার সমতূল্য বলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নরহত্যা কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করা ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করলো এবং কেউ কারোর প্রাণ রক্ষা করলে সে সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো।"[৬৮৭] এখানে সুস্পষ্টভাবে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সর্বপ্রকারের নিরাপত্তার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামের এ শাশ্বত নির্দেশকে সামনে রেখে বর্তমান সমাজে সবাইকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সচেষ্ট হতে হবে।[৬৮৮]

উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান

যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে সুপথে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরায়ে এনে সমাজ গঠন ও সংস্কারমূলক কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। পাশাপাশি তাদেরকে ব্যক্তিগত স্বনির্ভরতার সকল পথ উম্মুক্ত করে দিতে হবে। মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। তাই সে ভূলকে আঁকড়ে ধরে রেখে তাদেরকে অবহেলা করলে আরো কঠিন পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এ জন্য দয়ার হাত প্রসারিত করে সে ভুল সংশোধনের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে সঠিক পথে আনার সুযোগ কর দিতে হবে।[৬৮৯] সবাইকে একথা স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, অবজ্ঞা আর অবহেলা ও অনাদরে অনেক ভালো মানুষও বিপদগামী তথা সন্ত্রাস ও জঙ্গি হয়ে যেতে পারে।

ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিরোধ

---

[৬৮৩]. আব্দুর রহমান আযযাম, ***মহানবী (স.) এর শাশ্বত পয়গাম,*** ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ৬৬-৬৭

[৬৮৪]. ড. মীর মন্‌জুর মাহমুদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৯০

[৬৮৫]. আল-কুরআন, ২৮: ৮৩

[৬৮৬]. মোহাম্মদ আতাউর রহমান, ড. আব্দুল্লাহ আল মারূফ ও কাজী আবু হুরায়রা, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৬৪-৬৫

[৬৮৭]. আল-কুরআন, ৫: ৩২

[৬৮৮]. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, ***মসজিদ ও ইসলামী সমাজ গঠন,*** ইফাবা পত্রিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, *পৃ.* ১৬-১৭

[৬৮৯]. মুহাম্মদ আতাউর রহমান, ড. আব্দুল্লাহ আল মারূফ ও কাজী আবু হুরায়রা, ***প্রাগুক্ত, পৃ.*** ৬৩

বর্তমান সমাজে ইসলাম, ঈমান, কুফর, নিফাক, শিরক, জিহাদ ও কিতাল ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু লোকের মুখে বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা শোনা যায়। এ সব ব্যাখ্যার ফলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের আবির্ভাব ঘটছে। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে অগভীর জ্ঞান, আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভাব, বিভ্রান্তি এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য বহুলাংশে দায়ী। অতএব গভীর জ্ঞানী লোকদের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে যারা নিজেদের জ্ঞানের দৈন্যতা সত্ত্বেও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা পেশ করে ইসলাম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দেশের সাধারণ নাগরিকদের প্রতি সম্মেলনে[৬৯০] উদাত্ত আহ্বান জানাতে হবে। বাড়াবাড়ি ও অগভীর জ্ঞানের ফলে আজকাল এক শ্রেণির লোক নিয়মতান্ত্রিক পন্থার পরিবর্তে সশস্ত্র পন্থায় ইসলামি আইন বা শাসন কায়েমের নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ের তাৎপর্য অনুধাবন না করা, নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি এবং প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ইসলামের শিক্ষা লাভ না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে এরূপ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার লাভ করে এ সব স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান লাভের জন্য নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি এবং প্রাজ্ঞ আলিমগণের শরণাপন্ন হতে হবে।[৬৯১] কারণ রাসূল (সা.) বলেন,

مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ.

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি ধারালো কিছু দিয়ে ইশারা করে ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দেয়।'[৬৯২] ভয় দেখানো যেখানে নিষেধ; সেখানে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের তো কোন প্রশ্নই আসেনা। তাই ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।

বাংলাদেশে কিছু উগ্রপন্থী লোক ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ইসলামের নামে গুপ্ত হত্যা, আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে দেশের মধ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্য বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। তারা ইসলাম ও মানবতার দুশমন। কেননা তারা কিছু নিরীহ লোককে ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে উভয়েই বিপথগামী হয়েছে।

ইসলামি জিহাদ এসব অপসংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই সকলের জানা উচিত জেহাদ আর সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ এক কথা নয়। ইসলামে যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকারকে সংরক্ষিত করেছে। প্রত্যেক কাজে একটি সীমা নির্ধারণ করেছে যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, জিহাদের নামে সন্ত্রাস, জঙ্গিরা জিহাদের অপব্যাখ্যা করে, দেশের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে এবং মসজিদ-মাদ্রাসা ও উলামা-মাশায়েখদেরকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা করছে তাদেরকে প্রতিহত করা প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। আর সরকার এসব সন্ত্রাস ও জঙ্গিদেরকে কঠোর হস্তে দমনের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে নিরপরাধ লোক যাতে কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার না হয় সে দিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে।জেহাদের নামে যে কোনো গোষ্ঠী, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং নাশকতার চর্চা করে, তারা ইসলামকে ধ্বংস করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকারী ও প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হবে। কেউ কেউ ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে এ কথা বলে যে, ইসলাম জন্মলগ্ন থেকে সন্ত্রাসকে লালন করে আসছে। এমনকি সারা সৃষ্টি জগতে সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সন্ত্রাসী বলার দুঃসাহস পর্যন্ত দেখায়। আর এ অপবাদও ছড়ানো হয় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে মাদরাসাগুলোতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ শিক্ষা দিয়ে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি তৈরি করা হয়।[৬৯৩] তাদের এমন ধারণা মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমন ধারণা পোষণকারীদেরও কঠোর হস্তে দমন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আওতায় আনতে হবে। তাহলে কেউ আর এ ধরণের দুঃসাহস করবে না।

ইসলামের সঠিক অবস্থান তুলে ধরা

[৬৯০]. সম্মেলন-২০০৭ খ্রি., মজলিস উল উলামা বাংলাদেশ আয়োজিত ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ওলামা সম্মেলনে বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমদের বক্তৃতা সংকলন 'ওলামা সম্মেলনে ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণা ইসলামে চরমপন্থা ও সন্ত্রাসের কোন স্থাসন নেই'।

[৬৯১]. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

[৬৯২]. সুনানুত্ তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৩৩

[৬৯৩]. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

ইসলামে সন্ত্রাসের কোনোই স্থান নেই। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বিশৃঙ্খলা এবং নাশকতার বিরুদ্ধে ইসলামী শরীয়তে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। মানবজাতির পার্থিব ও পরকালীন জীবনকে শান্তিময় করাই যেহেতু ইসলামের মূল লক্ষ সেহেতু ইসলাম তার বাস্তব আদর্শ এবং পারিভাষিক দিক থেকে সর্বাবস্থায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে প্রতিহত করার বিধান দিয়েছে। ইসলাম এসেছে সামাজিক সন্ত্রাস, তথ্য সন্ত্রাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসসহ সকল প্রকার অপকর্মকে নির্মূল করে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে এবং উন্নত, শিষ্ট ও সুশীল জাতি গঠন করতে। যারা ইসলামে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের কোনো সুযোগ আছে বলে মনে করে তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে মধ্যপন্থী একটি উম্মত হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের মধ্যে কোনো সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থাকতে পারে না। অপ্রয়োজনীয় কোনো প্রাণহানি বা রক্তক্ষয় ইসলাম সমর্থন করে না। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলো আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে এক বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে জন্য অবশ্যই অনেক যুদ্ধ জিহাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হল ১৩ লক্ষ বর্গমাইলের একটি শান্তিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিপক্ষবাদীদের আক্রমণের মোকাবেলায় আক্রমণকারীদের ও আক্রান্তদের কেবলমাত্র অতি স্বল্প সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল । তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। ইসলামের নামে জাহেলিয়াতের মাধ্যমে যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ চলমান, তা নির্মূল করতে হয় হলে ইসলামের সঠিক শিক্ষার চর্চা বৃদ্ধি ও মাদরাসা শিক্ষাকে আরো আধুনিক এবং ব্যাপকভাবে করতে হবে। এভাবে ইসলামের সঠিক শিক্ষা কুরআন, সুন্নাহর অনুশীলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ তথা গোটা বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব।[৬৯৪] সুতরাং আল্লাহর দ্বীনের অপব্যাখ্যা করে কেউ যাতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মত কার্যকলাপে লিপ্ত হতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

কুরআন সুন্নাহের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে বক্তব্য প্রদান

উলামা-মাশায়েখগণ যদি সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয় ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছু না বলে শুধুই ফযীলত ও গল্পের ওয়াজ করলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে কোন লাভ হবে না। ইমামগণ যদি সমাজ বা সরকারের অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ না করে শুধু উগ্রতার নিন্দা করেন তাহলেও তা মানুষের মনে রেখাপাত করবে না। কেউ এক পেশে কথা পছন্দ করেন না এবং তাতে প্রভাবিত হন না। তাঁরা যদি সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয়, অশ্লীলতা ও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সুন্নাত সম্মত পদ্ধতিতে কথা বলেন, এগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতিবাদের সুন্নাত সম্মত পদ্ধতি জানিয়ে দেন, উগ্রতা, বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও বিদ্রোহের কারণে মুমিনগণ দুনিয়া ও আখিরাতে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং দ্বীনি দাওয়াতে কিভাবে লাভবান হয় বিভিন্ন আঙ্গিকে তার তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেন তাহলে তা খুবই ভাল ফলদায়ক হবে।[৬৯৫] লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করে না, রোগের কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, তারপর জীবানুটা মেরে ফেলে। এটাই চিকিৎসার নিয়ম। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সন্ত্রাসের পেছনের কারণটা হল অন্যায়-অবিচার, মৌলিক অধিকারহরণ। যখন একদল মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়, আর এই প্রতিশোধের আগুনই হলো সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের একমাত্র কারণ।[৬৯৬] একটা বিশেষ গোত্রের ওপর অন্যায়-অবিচার বন্ধ করলে, সন্ত্রাসও বন্ধ হয়ে যাবে।সন্ত্রাসও জঙ্গি কর্মকান্ডের জন্য কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া না গেলেও এর অন্যবিধ কারণ থাকতে পারে। যেমন- বিদেশী দখলদারিত্ব, জনগণের বৈধ অধিকার হরণ, উন্নয়নের অভাব, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। এগুলোর কারণে একে অপরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থেই যুদ্ধ চালাতে চায় আর মানব সমাজকে সন্ত্রাসবাদের দুষ্টচক্র থেকে বাঁচাতে চায় তাহলে ধর্ম, ভৌগলিক অঞ্চল বা নীতি আদর্শ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টিকারী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।[৬৯৭] ব্যক্তির মান-সম্মান, পদমর্যাদা, চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রভৃতি হ্রাস বা হানি করার মাধ্যমে সমাজে সন্ত্রাস বিস্তৃতি লাব করে। তাই সন্ত্রাস সৃষ্টি হতে পারে

[৬৯৪]. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪৪-৪৫

[৬৯৫]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ*, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ২৫৬

[৬৯৬]. ডা. জাকির নায়েক, *সন্ত্রাবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?* ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪০

[৬৯৭]. এম রুহুল আমিন, সন্ত্রাস, *সন্ত্রাসবাদ এর মোকাবেলায় আর্ন্তজাতিক প্রয়াস*, মুহাম্মদ আব্দুর আজিজ সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৭০

এমন যত পন্থা আছে যেমন- অপপ্রচার, গুজব, নিন্দা, উপহাস, তিরস্কার, ভৎর্সনা, বিকৃত নামকরণ, মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতি ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।[৬৯৮] এ সকল বিষয় জনসাধারণকে জানিয়ে এবং নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ভূমিকা রাখতে পারে।

বোমাবাজী ও জঙ্গী তৎপরতা প্রতিরোধের আহ্বান

বাংলাদেশে বিগত দুই দশক জুড়ে বোমাবাজীর উত্থান ঘটে। বিগত কয়েক বছর থেকে সুপরিকল্পিতভাবে জঙ্গিবাদের নামে বোমাবাজী শুরু হয়। জাতি চরমভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এমনি এক সংকট-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। সরকার সারাদেশের মসজিদের ইমাম, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ, র‌্যাব ও জনসাধারণকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান। তাঁরা দেশব্যাপী অব্যাহতভাবে সন্ত্রাস প্রতিরোধমূলক বক্তব্য, আলোচনা, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে এ ধারা অব্যাহত রাখে। সরকার এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। ফলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পতন হয়। দেশ ও জাতি এক মহাসংকট থেকে মুক্ত হয়।[৬৯৯]

অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি

সন্ত্রাসের অঙ্কুর যেন গজাতে না পারে, সে জন্য মাতাপিতাকে সদা তাদের সন্তানদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। উঠতি বয়সে সমাজের নানা ধরনের চরিত্রের মানুষের সাথে পরিচয় ঘটে। তখন অভিভাবকদের উচিত তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া, সমাজে গঠনমূলক কাজে উৎসাহিত করা। কারণ যৌবনের স্বাভাবিক আবেদন অনুযায়ী যুবকরা কিছু করতে চায়। ভাল কাজে নিয়োজিত না হতে পারলে খারাপের দিকে চলে যায়।[৭০০] এমনকি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথেও সম্পৃক্ত হয়ে যেতে পারে। এভাবে অভিভাবকদের সচেতনতা সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে ভূমিকা রাখতে পারে।

সহিংসতা বর্জন করে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন

কোন দেশের প্রাজ্ঞ আলিম-উলামা ও মুফতীগণ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে সমর্থন করেন না। কোন কারণে কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণকেও বৈধ বলেন না। তারা সকল ক্ষেত্রে ধৈর্যের ধারণ, শান্তিপূর্ণভাবে সহিংসতা বর্জন করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপনে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।[৭০১] অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

সংঘাতের পরিবর্তে সংলাপের পরিবেশ তৈরী

ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী ও সুমহান আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত ও সংঘাত পরিহার করে পৃথিবীর প্রয়োজনে পারস্পরিক সংলাপ ও সমঝোতার পরিবেশ তৈরী করতে হবে। কেননা ইসলামে চরম পন্থা, জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই।[৭০২] সংঘাতের পরিবর্তে সংলাপের পথ বেছে নিতে হবে শান্তির সহায়ক হিসেবে। মুসলমানদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ-তা সবাইকে বোঝাতে হবে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। এটা শুধু মুখের কথা দিয়ে নয় বরং আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। ইসলাম সম্পর্কে আজ সারাবিশ্বে যে বিভ্রান্তির বেড়াজাল তাও দূর করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[৭০৩] সংঘাতের পরিবর্তে সংলাপের পথ ও পরিবেশ তৈরি করে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ দমনে ভূমিকা রাখতে পারে।

---

[৬৯৮]. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ ও মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ***সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা,*** নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত, পৃ.*** ১২৩-১২৪

[৬৯৯]. মুহাম্মদ আতাউর রহমান, ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ ও কাজী আবু হুরায়রা, **প্রাগুক্ত, পৃ.** ৯০

[৭০০]. আবদুশ শাকুর, *মহানবী (সা.) এর আদর্শের আলোকে সন্ত্রাস দমন,* নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত, পৃ.*** ৪৯

[৭০১]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ*, ***প্রাগুক্ত, পৃ.*** ৫৭

[৭০২]. মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান, ***চরমপন্থা নয় মধ্যমপন্থা অবলম্বন,*** দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ মে, ২০১৩, পৃ. ১২

[৭০৩]. ড. এম শমসের আলী, *সমাবর্তন বক্তৃতা*, তৃতীয় সমাবর্তন,কুষ্টিয়া, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের আলেম সমাজ, ধর্মীয় নেতা, মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও খতিবদের উদ্ভূত সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তাঁদের সোচ্চার প্রতিবাদ ও শান্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ অবস্থান রেখে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ সমঝোতায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা সমাধানের একটি সহজ পথ। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ধর্মপ্রাণ মানুষকে চরমপন্থা প্রতিরোধে সজাগ-সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে শান্তির স্বপক্ষে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের ব্যাপক প্রচারণামূলক জাতীয় ঐক্য ও সংলাপের কর্মসূচী হাতে নিয়ে অসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারে।[৭০৪]

সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ

বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও আত্মঘাতী হামলা একটি জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্তরিক প্রয়াস। পারস্পরিক দোষারোপ না করে দল-মত-পেশা নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিক আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালালে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব । অতএব, সকল রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ সহ সর্বস্তরের জনগণকে এ সংকট নিরসনে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।[৭০৫] খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ডাকাতি, ত্রাস সঞ্চার করা ইত্যাকার যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আমাদের সমাজে চলছে, তা কেবল পুলিশী ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সকলের সার্বিক সহযোগিতা। পরিবারে অভিভাবক, স্কুলের শিক্ষক, সমাজপতিরা যদি স্ব স্ব দায়িত্ববোধ নিয়ে এগিয়ে আসেন তাহলে সন্ত্রাস এভাবে ডালপালা বিস্তার করতে পারবে না।[৭০৬] দেশের উলামা-মাশায়েখ ও ইমামগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাঁদের ঐক্য বর্তমান সময়ের বড় দাবী। নিজেদের মধ্যে দলাদলি না করে অন্যের প্রশংসা, মঙ্গল কামনা, সুপরামর্শ প্রদান করতে হবে। বিচ্ছিন্ন থেকে কোন সমস্যারই সমাধান করা যায় না। সম্মিলিত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হলে যে কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ঐক্যবদ্ধ জাতির ওপর আল্লাহর রহমত থাকে"।[৭০৭]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

অনেক চিন্তাবিদের মতে সন্ত্রাসবাদকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে হলে এর উদ্দেশ্য জানতে হবে, আর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে হবে।শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ থেকে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করতে পারে। যে কোন সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা থাকলে অন্যায়, অনাচার, পাপাচার ও অপরাধ আপনা থেকেই দূরীভূত হয়ে যায়।[৭০৮] তাই সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ দমনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেন।

সন্ত্রাসীদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট

সন্ত্রাসীরা কোনো না কোনো সমাজে বসবাস করে থাকে। তারা কারো না কারো স্বজন বা প্রতিবেশী। তাই তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করাও একটি অস্ত্র হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শের অনুসরণে যদি সত্যিকারভাবে এ সব লোকদের ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। যে সব কারণে তারা সন্ত্রাসী বা জঙ্গি হয়েছে যদি সে সব কারণ দূরীভূত করা যায়, যা প্রত্যক্ষ বা

---

[৭০৪]. মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান, ***চরমপন্থা নয় মধ্যমপন্থা অবলম্বন,*** দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ মে, ২০১৩, পৃ. ১২

[৭০৫]. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৫৫

[৭০৬]. মুহাম্মদ আতাউর রহমান, ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ ও কাজী আবু হুরায়রা, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৯০

[৭০৭]. এম. রুহুল আমিন, *সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ ও এর মোকাবেলায় আর্ন্তজাতিক প্রয়াস*, মুহাম্মদ আবদুল আজিজ সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৭০

[৭০৮]. ড. মো: ময়নুল হক, *সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ ও এর প্রতিকার*, ইসলামী দৃষ্টিকোণ, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১৫১

পরোক্ষভাবে সন্ত্রাস জন্ম দেয়, তাহলে এ সব কারণ দূরীভূত করে সন্ত্রাস বা জঙ্গি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।[৭০৯]

আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

দেশের সাধারণ নাগরিকদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরার লক্ষে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বর্তমানে যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে আইনের হাতে সোপর্দ করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের অবস্থান এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা থাকলে তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করতে হবে।[৭১০] সন্ত্রাস ও জঙ্গিদের মদদদাতা গডফাদাররাও সন্ত্রাসী, তাই যারা সন্ত্রাসীদের অর্থ, অস্ত্র, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।[৭১১] যারা শান্তিপূর্ণ সুন্দর পরিবেশ বিনষ্ট করে দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তারা ইসলামের দুশমন। আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠোরতম শাস্তি। তাই মানবজাতির শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষে সন্ত্রাস ও জঙ্গিদের জন্য ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান আরোপ করেছে এবং ন্যায় সংগতভাবে সন্ত্রাস উৎখাতের জন্য মুসলিম জাতিকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) এর সহিত লড়াই করে এবং জমিনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শুলে চড়ানো অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিক হতে কেটে ফেলা কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা। এ লাঞ্ছনা ও অপমান হবে দুনিয়ার কিন্তু পরকালে এ অপেক্ষা কঠিনতম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।"[৭১২] তাই অপরাধ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জন্য শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

অন্তর পরিশুদ্ধির শিক্ষা প্রদান

সন্ত্রাস দমনে ইসলাম যা বলে তা হচ্ছে প্রথমে নিজেকে এবং নিজের অন্তরকে কলুষমুক্ত করতে হবে। যাকে আরবী ভাষায় তাযকিয়াতুন নাফ্স বা আত্মার পরিশুদ্ধি বলা হয়। আত্মার প্রশান্তি দিতে হলে অন্তরকে কলুষমুক্ত রেখে আল্লাহর জিকিরে মত্ত থাকতে হবে। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। আল্লাহর স্মরণই হচ্ছে পাপমুক্ত থাকার একমাত্র পন্থা।[৭১৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "জেনে রাখ, আল্লাহর জিকিরেই রয়েছে অন্তরের একমাত্র প্রশান্তি।"[৭১৪] আর আল্লাহকে স্মরণ করার, আল্লাহর জিকির করার উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমেই সকল অপকর্ম থেকে মুক্ত থাকা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সালাত কায়েম কর, নি-য়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখে।"[৭১৫] একজন নামাজী লোক মিথ্যাবাদী, সন্ত্রাসী বা জঙ্গি হতে পারে না। তার দ্বারা অশ্লীল কাজ, অন্যায় কাজে সহযোগিতা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ তথা যে কোন অপকর্ম দমনের সর্বোত্তম চিকিৎসা হচ্ছে সালাত। তাই বলা যায় যে, তাযকিয়াতুন নাফ্স বা আত্মার পরিশুদ্ধির শিক্ষা অনুসরণ করলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করা যায়।

আখিরাতে বিশ্বাস ও জবাবদিহিতার ভয়

আখিরাতে বিশ্বাস ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় যার মনে কাজ করবে সে কখনও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মত ঘৃণ্য কাজে ব্যাপৃত হবে না।[৭১৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা

---

[৭০৯]. আবদুশ শাকুর, *মহানবী (সা.) এর আদর্শের আলোকে সন্ত্রাস দমন*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৫০

[৭১০]. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৫৩

[৭১১]. এস.এ.এম মহিউদ্দীন খান, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪৬৪

[৭১২]. আল-কুরআন, ৫: ৩৩

[৭১৩]. মাওলানা আব্দুল হান্নান তুরুকখলী, ***সন্ত্রাস দমনে ইসলাম,*** দৈনিক ইনকিলাব, ২৩অক্টোবর, ২০১২, পৃ. ৮

[৭১৪]. আল-কুরআন, ১৬: ৪৩

[৭১৫]. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৩

[৭১৬]. ড. ময়নুর হক, সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ ও এর প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১৪৮

সোজাপথ হতে বিচ্যুত হয়েছে।"[৭১৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন "পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস আল্লাহকে ভয়কারীদের জন্য শ্রেষ্ঠতর স্থান।"[৭১৮] আখিরাতে প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট জবাব দিতে হবে। কাউকে এক বিন্দু পরিমান ছাড় দেয়া হবে না। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "কেউ অনু পরিমান সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।"[৭১৯] এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা এর জন্যেও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।[৭২০] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যে দিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।"[৭২১] সুতরাং জাতিতে জাতিতে বিশ্বব্যাপী যে হানাহানি, মারামারি, হীন ও ছোট ভাবার, তাদেরকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার যে প্রবণতা, ইসলাম তার মূলোৎপাটন করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেকটি মানুষকে পরকালমুখী এবং পরকারের হিসাব নিকাশের ব্যাপারে সচেতন করে তুলেছেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরব জাতিকে পরকালমুখী জীবন বিধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।[৭২২] অতএব দুনিয়াবি শাস্তির অপমান, আত্মসম্মান, আখিরাতে বিশ্বাস ও জবাবদিহিতার ভয় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ভূমিকা রাখতে পারে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা মুহাম্মদ (সা.) কে সব ধর্মের সব তথ্য প্রকাশ করবেন বা জানিয়ে দিবেন। যদিও ইহুদি-খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের এসব বিষয় প্রকাশ পাওয়া অপছন্দ করত। আবু হুরায়রা (রা.) ও অন্য মুফাসসিরদের মতে, শেষ যুগে ঈসা (আ.) এর পুণরাগমনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালার এ দ্বীনকে চূড়ান্ত বিজয় ও প্রকাশ দান করবেন। সে সময়ে বিশ্বের সব মানুষ এ দ্বীন গ্রহণ করবে এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহরই হবে।

জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের উপায়সমূহ

বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপ্রিয়। এদেশে কখনো ধর্মীয় সংঘাত ও জঙ্গিবাদ দেখা দেয়নি। ইদানিং আমাদের দেশেও ধর্মীয় উগ্রতার উন্মেষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আমাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ক. আসমানী কারণ নির্ণয় করা

পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিছু কিছু অপরাধ সমাজে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তা'য়ালা সে সমাজে সামাজি অবক্ষয় ও অশান্তি ছড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "যারা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা জানেন, তোমরা জান না।"[৭২৩] অন্যান্য আয়াত ও হাদিসে অশ্লীলতা, ভেজাল, মাপ বা পরিমাপে কম প্রদান, প্রতারণা, জুলুম, হত্যাকাণ্ড, ন্যায়বিচারের দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি কারণে সমাজে আল্লাহ্র শাস্তি ও গজব আসবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

খ. ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা দূরীকরণ

জ্ঞানহীন আবেগ চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদের জন্ম নেয়। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত বেকার যুবককে যদি বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, সহিংসতার মাধ্যমে তোমার বেকারত্ব ও সব সমস্যা দূরীভূত হবে। এ যুবক সহজে তাদের প্রলোভনে পড়ে যেতে পারে।

---

[৭১৭]. আল-কুরআন, ২৩ : ৭৪
[৭১৮]. আল-কুরআন, ৬ : ৩২
[৭১৯]. আল-কুরআন, ৯৯: ৮
[৭২০]. ইবনে মাজা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৪১৭
[৭২১]. আল-কুরআন, ৭৮: ৪০
[৭২২]. আবদুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী, *নৈতিক অবক্ষয়রোধে ইসলাম*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[৭২৩]. আল-কুরআন, ২৪: ১৯

গ. জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্ত করা

যেহেতু জঙ্গিবাদের সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত। ফলে এর প্রতিরোধে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। ইসলামের যে বিষয়গুলোর ভুল ব্যাখ্যার কারণে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হয় সেগুলোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য বিজ্ঞ আলেমদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মসজিদের ইমাম ও খতিবগণ জুমার বয়ানে সুন্দর বয়ানে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারলে জঙ্গিবাদ সমাজে স্থান করতে পারবে না। সুন্নাতের আলোকে সাহাবিদের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। সন্ত্রাস, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ, উগ্রতা এগুলো নবী (সা.) ও সাহাবিদের (রা.) কর্মপদ্ধতি নয়। তাই আমাদের জঙ্গিবাদের সঠিক কারণ নির্ণয় করে তার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কখনো ইসলামের কল্যাণ করেনি, যুগে যুগে দেশ ও জাতির ক্ষতিই করেছে। বাংলাদেশ সহ গোটা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ এখন আতঙ্কের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাস, গোষ্ঠিগত সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, এক কথায় প্রতিটি সেক্টরকেই সন্ত্রাসবাদ গ্রাস করে নিচ্ছে। বর্তমানে ইসলামের নামে যারা উগ্র সন্ত্রাসী কাজ করছে, তারা দ্বীন-ইসলামের কোনো উপকার তো করছেনই না, বরং প্রচণ্ড ক্ষতি করছেন। তাদের এহেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে দ্বীন-ইসলামের সহীহ দাওয়াত ও তাবলীগই আজ হুমকীর সম্মুখীন। প্রকৃতপক্ষে এরা মুসলিম জাতির জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "শুনে রাখো, সেসব জালিমদের উপর আল্লাহ্ লা'নত (অভিশাপ), যারা আল্লাহর পথ (সরল সঠিক জীবন ব্যবস্থা) হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং এ পথকে জটিল ও বক্র করে তুলতে চেষ্টা করে, আর এসব লোকই হয় আখিরাতকে অস্বীকারকারী।"[৭২৪]

ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। ফিতনা-সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও বিশৃঙ্খলা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়লা বলেন, "ফিতনা-সন্ত্রাস হত্যার চেয়েও ভয়াবহ"[৭২৫]

নির্বিচারে মানুষ হত্যা কোন মুসলিম তো বটেই কোন সুস্থ্য মানুষের কর্ম হতে পারে না এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যার অপরাধ অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির কারণ ব্যতীত হত্যা করলো সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো। আর যে, ব্যক্তি কাউকে রক্ষা করলো সে যেন গোটা মানজাতিকে রক্ষা করলো।"[৭২৬]

রাসূল (সা.) বিদায় হজ্বের ভাষণে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "শুনে রাখো! মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই। সাবধান! আমার পরে তোমরা একজন আরেকজনকে হত্যা করার মতো কুফরি কাজে লিপ্ত হয়ো না।"[৭২৭] সুতরাং কুরআন ও সন্নাহর এই নির্দেশনা অনুসরণ করে চললে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কখনোই মুসলিম সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারতো না।

রাসূল (সা.) এর হাদিস অনুযায়ী এই জামানার সন্ত্রাসীরা হবে অপরিপক্ক ও নির্বোধ। ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারদের সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেন,

يَأْذي فِي آخِرِ الزّمَان قومٌ، حدَثَاءُ الأسْنَان، سُفَهَاءُ الأحلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قولِ البَرِيّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السّهْمُ مِنَ الرّمِيّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حنَاجرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيذمُوهُمْ فَاقْذلُوهُمْ، فَإِنّ قذلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قذلَهُمْ يومَ القِيَامَةِ.

"শেষ যমানায় একদল তরুণের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে যারা হবে স্থুলবুদ্ধির। তারা নীতিবাক্যগুলো আওড়াতে থাকবে। তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে ছুটে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ অতিক্রম করে (অন্তরে প্রবেশ) করবে না। যেখানেই এদের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হবে, এদেরকে তোমরা হত্যা করো। এদের হত্যাকারীদের জন্য এই হত্যার প্রতিদান রয়েছে কিয়ামতের দিন।"[৭২৮]

---

৭২৪. আল-কুরআন, ১১: ১৮-১৯

৭২৫. আল-কুরআন, ২: ১৯১

৭২৬. আল-কুরআন, ৫: ৩২

৭২৭. আবু আব্দুল্লাহ্ হাকেম নাইসাপুরী, ***আল-মুসতাদরাক আ'লাস্ সাহীহাইনে*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ: ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭১

৭২৮. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ২০০

রাসূল (সা.) এর উল্লিখিত হাদিসের আলোকে জঙ্গিবাদীদের প্রকৃত চিত্র বুঝা যায়। তাদের সাথে কোন দ্বীনদার হক্কানী আলেম-উলামা নেই, নেই কোন ইসলাম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। গভীর মেধা ও ঠান্ডা মস্তিস্কের অধিকারী মানুষের নিকট এটা স্পষ্ট যে, চরম শ্রেণি বৈষম্য, বিত্তশালী ঘরের সন্তানদের এডভেঞ্চার প্রিয়তা এসবকে পুঁজি করে প-িমা বিশ্ব কোমলমতি ধর্মভীরু তরুণ-যুবকদের ব্রেইন ওয়াশ করে, ধর্মের নামে জিহাদের কথা বলে অনুপ্রাণিত করে প্রতিহিংসাপরায়ণ নীতি গ্রহণে উৎসাহিত করে জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ও কল্যাণকর শিক্ষা যাদের অন্তরকে স্পর্শ করেনি, তারাই বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর পদত্ত শান্তিপূর্ণ দাওয়াত ও তাবলীগের নীতি পরিবর্তন করে কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থি মনগড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতাকে তাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার অবলম্বন বানিয়ে নিয়েছে। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ্ হতে এবং ইসলামী জ্ঞানের স্বীকৃত সূত্রগুলি থেকে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ না করে তাদের গুরুদের প্রচারণামূলক বইপুস্তক পাঠ করেছেন এবং যথারীতি বিভ্রান্ত হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (বিপর্যয়) চূড়ান্তভাবে অবসান হয় এবং দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়।"[৭২৯]
এ জন্য রাষ্ট্রের সরকারেরর প্রশাসনের উপর ফরয দায়িত্ব হয়ে গেছে, সন্ত্রাসের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের উৎস সহ খুঁজে বের করে তাদের প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা এবং দ্বীন-ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য ও কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর সরকার ও তাঁর পুলিশ, র‌্যাব, আর্মি ও বিজিবি প্রশাসন যদি প্রকৃত সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসবাদরে সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের নির্মূলে যথাযথ দায়ীত্ব পালনে অবহেলা করে এবং নীরিহ মুসলিমদের হয়রানি করে, তবে আল্লাহ্ তা'য়ালার ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ঘোষণা করেছেন, "যদি তেমিরা এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসো, তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দিবে।"[৭৩০] ইসলামের নামে সন্ত্রাস করে জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসীরা দ্বীনকে সমুন্নত করছে না, বরং ক্ষতি করছে। তাদের জঙ্গিবাদী কর্মকা-ের দ্বারা গোটা বিশ্বে এখন ইসলামের শান্তিপ্রিয় দিকটি চরম বিপর্যয়ে পড়েছে। সর্বোপরি যা সমাজে ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে তা কখনো একজন প্রকৃত মুসলিমের বা ইসলামের কাজ হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "আল্লাহ তা'য়ালা বিপর্যয় ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড কে আদৌ পছন্দ করেন না।"[৭৩১]
একজন ভাল মুসলিম অবশ্যই ইসলামের জন্য কাজ করবে, মানুষের কাছে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য ও কল্যাণকর দিক তুলে ধরে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণেরর জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। তবে সে কর্মপদ্ধতি হতে হবে ক্ষমা ও চূড়ান্ত ধৈর্য্যের নীতিতে অটল থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিতাব আল-কুরআন ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর সুন্নাহ্ অবলম্বনে।

পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আখিরাতে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের লক্ষ্যে নিজেদের অর্থ ও সময় ব্যয়ের মাধ্যমে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব ও দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাওয়াত ও তাবলীগ করাই ঈমানদারগণের ঈমানের সর্বোচ্চ দাবী এবং মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব ও ইসলামের আইন-বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হলে ঈমানদারগণের রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা লাভ একান্ত প্রয়োজন। তবে তা হতে হবে আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্দেশিত সূরা আন-নূরের পঁঞ্চান্ন নম্বর আয়াত অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে। মূলতঃ সকল ধর্মের লোকদের জন্য যার যার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ রেখে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর অনুসরণে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মাঝেই সফলতা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিন্তু ভুল নেতৃত্ব কিংবা কুরআন ও সুন্নাহর যথাযথ দলিল হাতে না আসার কারণে অনেক দল বা গোষ্ঠী কিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রাম করে, বোমাবাজি বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, সেনা ক্যু করিয়ে কিংবা গণতন্ত্র সহ মানুষের রচিত মনগড়া ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন করে রাষ্ট্রীয়

[৭২৯]. আল-কুরআন, ২: ১৯৩
[৭৩০]. আল-কুরআন, ৮: ৭৩
[৭৩১]. আল-কুরআন, ২: ২০৫

শাসন ক্ষমতা তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভের বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। দলকানা কিংবা অতিরিক্ত আবেগী হওয়ার কারণে তারা হয়তো জানেনই না যে, এসবের কোনটিই ঈমানদারগণের রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা লাভের পদ্ধতি নয়।

পৃথিবীতে কোথাও পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকা অবস্থায় তা প্রতিষ্ঠাপ করার জন্য সশস্ত্র বা কিতাল করার কোনরূপ নির্দেশনা পবিত্র কুরআন এবং রাসূল (সা.) এর সহীহ হাদিসে নেই। সুতরাং যারা কিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা বোমাবাজির মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠ করতে চাচ্ছেন, তারা স্পষ্টতঃই বিভ্রান্তিতে আছেন।

এক্ষেত্রে মানব সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য এই জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় হলো, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার ব্যাপকভাবে করা। কারণ ইসলাম কোন সহিংসতা বা সন্ত্রাস শিক্ষা দেয় না। মুসলিম নামধারী কিছু মানুষ তার মানবীয় লোভ, দূর্বলতা, অসহায়ত্ব. প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদির কারণে সহিংসতা বা হিংস্রতায় লিপ্ত হয়। এরূপ সহিংসতায় লিপ্ত ব্যক্তি নিজের কর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য, নিজের বিবেককে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করার জন্য, অন্যকে নিজের পক্ষে টানার জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে। সুতরাং একজন ভাল মুসলিম হিসেবে বলতে চাই, ইসলামের কাজ অবশ্যই করতে হবে। আল্লাহর ফরয হুকুম পালনে জালিমের জুলুম ও রক্তচক্ষুকে অবশ্যই উপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সংঘাত-সংঘর্ষের নীতি গ্রহণ করে নয়, মানুষের জান-মালের ক্ষতি করে নয়; কাফির মুশরিকদের ফাঁদে পা দিয়ে নয়, দ্বীন-ইসলামের অপব্যাখ্যা করে নয়, নব্য খারিজিদের মতাদর্শে সন্ত্রাস, বোমাবাজি বা আত্মঘাতি বোমা হামলার পথ বেছে নিয়ে নয়। বরং সকল ধর্মের লোদের জন্য যার যার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ রেখে আল্লাহর রাসূল (সা.) প্রদর্শিন শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলেই দুর্নীতি, সন্ত্রাস, উগ্রতা, জঙ্গিতৎপরতা ও নৈরাজ্যসহ সকল অপতৎপরতা নির্মূল হয়ে মানুষের জীবনে শান্তি ও কল্যাণ ফিরে আসবে, শান্তি ও কল্যাণ ফিরে আসবে, সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সকল মানুষের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণ হবে। উত্তম ধৈর্য্য ও ক্ষমার নীতিতে অটল থাকতে হবে। উপরোক্ত বিরোধীতাকারীদের আচরণে রাগ না করে, পাল্টা গালি না দিয়ে, পাল্টা আঘাত না করে তাদের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে বেশি বেশি দোয়া করতে হবে।

সর্বোপরি ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য্যকে জানতে হকপন্থী আমিরের আনুগত্যে থাকুন, বেশি বেশি কুরআন ও সহীহ হাদিস পড়ুন, রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনচরিত পড়তে হবে এবং ইসলামের পথে মানুষকে আহ্বানের জন্য তাঁদের কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম কোন গোপন দ্বীন নয়; এটা আগে উপলদ্ধি করতে হবে। অতঃপর ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ নিয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে হবে। ইসলামের সঠিক দাওয়াত দিয়ে নিজে বাঁচতে হবে এবং মানুষকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে সহযোগিতা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ نَارًا وقُودُهَا النَّاسُ والْحِجَارَةُ.

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"[৭৩২] তাই প্রত্যেকেই তাঁর কর্ম সম্পর্কে বিচারের মাঠে জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূল (সা.) বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ ومَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوجِهَا ومَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، والخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"তোমদের প্রত্যেকেই দায়ীত্বশীল, প্রত্যেকেই তার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম দায়ীত্বশীল সে তা দায়ীত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, ব্যক্তি তার পরিবারের (রাখাল/পাহারাদার) দায়ীত্বশীল সে তার পরিবারের দায়ীত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, নারী তার স্বামীর ঘরের দায়ীত্বশীলা সে তার দায়ীত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত

---

[৭৩২]. আল-কুরআন, ৬৬: ৬

Dhaka University Institutional Repository

হবে, দাস বা সেবক তার মনিবের মালের দায়ীত্বশীল তাকে তার দায়ীত্ব সম্পর্কে বিচারের মাঠে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৭৩৩]

কারো অন্তরে পরকালে জাহান্নামের ভয় বিদ্যমান থাকলে সে অবশ্যই সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের মত সামাজিক ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখবে এবং অপরকেও তা থেকে দূরে থাকার সহযোগিতা করবে।

ধর্ম-মুক্ত শিক্ষা ও ধর্ম-যুক্ত শিক্ষা

"মাদরাসা-শিক্ষিত" ও ধার্মিক মানুষেরা জঙ্গি না হলেও তারা সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী এবং অশ্লীলতা, মাদকতা ও অনাচার বিরোধী। জঙ্গিবাদের অযুহাতে এদেশের মানুষদের মধ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী মানসিকতা অথবা অশ্লীলতা, মাদকতা ও অনাচার বিরোধী মানসিকতা নির্মূল করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা। আর যদি আমরা জাতির কল্যাণে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল দেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িতদের অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। জঙ্গি বলে কথিত ও প্রচারিত অধিকাংশ দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও তাত্ত্বিক গুরুগণও আধুনিক শিক্ষিত। কিভাবে এদের দলে নতুন অন্তর্ভুক্তি নিয়ন্ত্রণ করবেন? আমরা কি শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিব যে, ধর্ম ভাল নয়, ধর্ম আফিম, ধর্ম পালন করো না, পরকাল বিশ্বাস করো না, ধার্মিকদের কাছে যেও না? এরূপ শিক্ষা তো কোনোভাবেই দিতে পারব না। আর দিলেও তাতে কোনো লাভ হবে না। জঙ্গিবাদ কমবে না, বরং জঙ্গিদের প্রচারণার সুযোগ অনেক বাড়বে, ধর্ম বিপন্ন বলে তারা আরো অনেক মানুষকে দলে ভেড়াবে। উপরন্তু এরূপ শিক্ষা দুর্নীতি, সন্ত্রাস, এইডস, এসিড, যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের মহাদ্বার উন্মোচন করবে। তাহলে কী আমরা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই শিক্ষা দিব না? ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার নামে কি আমরা "ধর্ম-মুক্ত" শিক্ষা দান করব? এতে তো আমাদের সমস্যা বাড়বে। কারণ এরূপ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় অনুভূতি নষ্ট করতে পারবে না, কিন্তু ধর্মীয় অজ্ঞতা তাদের ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহারের সুযোগ বাড়িয়ে দেবে।

বস্তুত ধর্মীয় অনুভূতি নির্মুল করা যায় না। সঠিক জ্ঞানের অভাবে তা বিপথগামী হয়। কখনো কুসংস্কার ও অনাচার এবং কখনো উগ্রতার পথ ধরে। কেউ "পাগল বাবা"-র দরবারে ধর্না দিয়ে, মাজারে-দরগায় পাগল বা মস্তানের পিছনে ছুটে, গাঁজা খেয়ে, জিনের বাদশা বা অনুরূপ প্রতারক- পুরোহিতের কাছে যেয়ে মূল্যবান কর্মঘন্টা ও সম্পদ নষ্ট করে। আর কেউ উগ্রতা ও সহিংসতার পিছে ছুটে নিজের ও অন্যের মহামূল্যবান জীবন ও সম্পদ নষ্ট করে। আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত ও রাজনৈতিক নেতা আমাদেরকে নীতি কথা শুনান এবং "দুর্নীতিমুক্ত" দেশ গড়তে নসীহত করেন। কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, বড় বড় দুর্নীতি মামলায় তারা জড়িত। এর কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস, আখিরাত মুখিতা ও আল্লাহর ভয় ছাড়া শুধুমাত্র নীতিকথা, নীতিশিক্ষা, প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার দিয়ে কখনোই দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয়, সহিংসতা, মাদকতা বা অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও ইসলামী ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞানী প্রাজ্ঞ গবেষক আলিম তৈরির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেন তারা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মতামত প্রদানের মাধ্যমে যুবসমাজকে উগ্রতা থেকে রক্ষা করতে পারেন।

জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্তি

যেহেতু এ বিষয়টির সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত সেহেতু এর প্রতিরোধ, প্রতিকার ও একজন রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতা যদি বলেন "ইসলাম শান্তির ধর্ম... ইত্যাদি" তাতে সন্ত্রাসে লিপ্ত যুবক পরিতৃপ্ত বা 'কনভিন্সড' হবে না; তবে যদি একজন প্রাজ্ঞ নেককার আলিম এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন তাহলে

[৭৩৩]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫

তা হয়ত তাকে পরিতৃপ্ত বা ‘কনভিন্সসড’ করতে পারবে। এতে যেমন সংশ্লিষ্ট অনেকে সংশোধিত হবে তেমনি নতুন অর্ন্তভুক্তি কমে যাবে। ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রেখেছেন। এর অন্যতম হলো মসজিদ ও সালাতুল জুমুআ। জুমুআর খুতবা ও আলোচনা সাধারণভাবে মুমিনের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। সকল ব্যক্তিগত ও সামাজিক অপরাধ ও অবক্ষয়ের ন্যায় জঙ্গিবাদ বা উগ্রতা রোধেও ইমামগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এ জন্য মসজিদগুলিতে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেওয়া এবং বিদ্যমান ইমামদের ধর্মীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি নিয়ন্ত্রণের নামে ইমামদের কথা বলা বন্ধ করেন তাহলে তা কোনো ভাল ফল দিবে না; বরং উল্টো ফল দিবে। ইমামগণ যদি সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয় ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছু না বলে শুধুই ফযীলত ও গল্পের ওয়ায করেন তাহলে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে কোনো লাভ হবে না। ইমামগণ যদি সমাজ বা সরকারের অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ না করে শুধু উগ্রতার নিন্দা করেন তাহলেও তা মানুষের মনে রেখাপাত করবে না। কেউ একপেশে কথা পছন্দ করেন না এবং তাতে প্রভাবিত হন না। ইমামগণ যদি সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয়, অশ্লীলতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতিতে কথা বলেন, এগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতিবাদের সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি জানিয়ে দেন, উগ্রতা, বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও বিদ্রোহের কারণে মুমিন দুনিয়া ও আখিরাতে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং দীনী দাওয়াত কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিভিন্ন আঙ্গিকে তার তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেন তাহলে তা খুবই ভাল ফল দিবে।

আসমানী কারণ নিয়ন্ত্রণ করুন

অনেক সময় আমরা ভাবি যে, অমুক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা অমুক অন্যায় নির্মূল করব বা উন্নয়ন নিশ্চিত করব। আমরা ভুলে যাই যে, এক প্রকারের অশান্তি দূর করলে অন্য প্রকারের অশান্তি আমাদের গ্রাস করবে। আমরা মহান আল্লাহর গযব ও শাস্তি থেকে পালাতে পারব না। বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অশ্লীলতা, দুর্নীতি, ওজন, মাপ বা পরিমাপে কম দেওয়া, ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি ইত্যাদি এ জাতীয় পাপের অন্যতম। মহান আল্লাহ বলেন:

وضَرَبَ اللهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ والْخَوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

“আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, যেথায় আসত সবদিক থেকে প্রচুর জীবনোপকরণ, অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, ফলে তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাদেরক আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।”[৭৩৪]

কাজেই আমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই থাকি আর পাশাপাশি ক্ষুধা ও ভয়-সন্ত্রাসের বেড়াজাল থেকে বের হতে চেষ্টা করি তবে চেষ্টা অনেক হলেও ফল আশানুরূপ হবে না। ক্ষুধা ও ভয়ের একটি জাল ছিন্ন করলে অন্য জাল আমাদের জড়াবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنّ الّذِينَ يُحِبّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدّنْيَا والآَخِرَةِ واللهُ يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

“যারা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।”[৭৩৫] কাজেই আমরা অশ্লীলতার প্রচার, প্রসার ও বিপনন অব্যাহত রেখে মহা-পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজ থেকে ‘যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি’ দূর বা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব বলে চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই। এ অর্থের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, অশ্লীলতা, ভেজাল, মাপ বা পরিমাপে কম প্রদান, প্রতারণা, জুলুম, হত্যাকাণ্ড, ন্যায়বিচারের দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ না করলে বিভিন্নভাবে সমাজে আল্লাহর শাস্তি ও গযব আসবেই। এগুলি রোধ করতে এবং সকল নাগরিকের জন্য বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ নিশ্চিত করতে সমাজের সকল নাগরিক ও সরকারকে সচেতন প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর পাশাপাশি সন্ত্রাস,

---

৭৩৪. আল কুরআন, ১৬: ১১২

৭৩৫. আল কুরআন, ২৪: ১৯

জঙ্গিবাদ ও অন্যান্য সকল 'দুনিয়াবী যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি' সমাজ থেকে নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালাতে হবে। তাহলেই আমরা আশানুরূপ ফল পাব, ইনশা আল্লাহ।

দ্বীনি দা'ওয়াত -এর সুযোগ প্রদান ও এ জাতীয় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি দা'ওয়াতের পরিচিতি

নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিজের আশেপাশে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আলাহর দ্বীনকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য মুমিনের জীবনের একটি বড় দায়িত্ব হলো 'আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহ্ইউ আনিল মুনকার', অর্থাৎ 'ন্যায় কাজের নির্দেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা'। আদেশ ও নিষেধ-কে একত্রে 'আদ-দা'ওয়াতু ইলালাহ' বা 'আলাহর দিকে আহ্বান' বলা হয়। এ ইবাদাত পালনকারীকে "দা'য়ী ইলালাহ" বা "আলাহর দিকে আহ্বানকারী" ও সংক্ষেপে "দা'য়ী", অর্থাৎ "দা'ওয়াতকারী" বা "দাওয়াত-কর্মী" বলা হয়।

দা'ওয়াত (**الدعوة**) শব্দের অর্থ আহ্বান করা বা ডাকা। এছাড়াও শব্দটি আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ, আবেদন, দাবি, প্রচার, অনুরোধ, দু'আ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৭৩৬] আরবীতে আম্র (**الأمر**) বলতে আদেশ করা, নির্দেশ করা, উপদেশ দেয়া, অনুরোধ, অনুনয় করা, হুকুম করা, হুকুম দেওয়া সবই বুঝায়। অনুরূপভাবে 'নাহই' (**النهي**) বলতে নিষেধ করা, বারণ করা, বর্জনের অনুরোধ করা, কোন বস্তু নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ইত্যাদি বুঝানো হয়।[৭৩৭]

কুরআন-হাদীসে এই দায়িত্ব বুঝানোর জন্য আরো অনেক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে: তন্মধ্যে রয়েছে আত-তাবলীগ (**التبليغ**), আন-নাসীহাহ (**النصيحة**), আল-ও'য়ায (**الوعظ**) ইত্যাদি। আত-তাবলীগ অর্থ পৌঁছানো, প্রচার করা, খবর দেওয়া, ঘোষণা দেওয়া বা জানিয়ে দেওয়া, দ্বীনি দা'ওয়াত। শব্দ আন-নসীহাহ শব্দের অর্থ আন্তরিক ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা, উপদেশ, সদুপদেশ, পরামর্শ, সুৎ পরামর্শ ইত্যাদি। এ ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা প্রসূত ওয়ায, উপদেশ বা পরামর্শকেও নসীহত বলা হয়। 'ওয়ায' বাংলায় প্রচলিত অতি পরিচিত আরবী শব্দ। এর অর্থ উপদেশ, আবেদন, প্রচার, সতর্কীকরণ, হিতোপদেশ, বক্তৃতা ইত্যাদি।[৭৩৮] দা'ওয়াতের এই দায়িত্ব পালনকে কুরআন কারীমে 'ইকামতে দ্বীন' বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এগুলি সবই একই ইবাদতের বিভিন্ন নাম এবং একই ইবাদতের বিভিন্ন দিক।

দা'ওয়াত-এর গুরুত্ব

নবী-রাসূলগণের মুল দায়িত্ব

সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ, প্রচার, নসীহত, ওয়ায বা এককথায় আলাহর দ্বীন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সকল নবী ও রাসূলের (আলাইহমুস সালাম) দায়িত্ব। সকল নবীই তাঁর উম্মাতকে তাওহীত ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শিরক, কুফর ও পাপ থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَ الَّذِيْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِيْ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অর্থাৎ "যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেন এবং অসৎকার্য থেকে নিষেধ করেন...।"[৭৩৯]

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মকে আদেশ ও নিষেধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যত্র এ কর্মকে দা'ওয়াত বা আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ.

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা আলাহর প্রতি ঈমান আন না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।"[৭৪০]

---

৭৩৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী* (রিয়াদ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ৪৭০

৭৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮৮

৭৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩৩

৭৩৯. আল কুরআন, ৭: ১৫৭

আল কুরআনের অপর এক আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ দায়িত্বকে দা'ওয়াত বা 'আহ্বান' বলে অভিহিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ الْحسَنَةِ وجَادِلْهُمْ بِالَّذِيْ هِيَ أَحسَنُ.

"আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন হিকমাত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর ওয়ায-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।"[৭৪১]

অন্যত্র এই দায়িত্বকেই তাবলীগ বা প্রচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

"হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আলাহর বার্তা প্রচার করলেন না।"[৭৪২]

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, প্রচার বা পৌঁছানোই রাসূলগণের একমাত্র দায়িত্ব। বলা হয়েছে,

فَهَلْ عَلَى الرّسُلِ إلا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"রাসূলগণের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।"[৭৪৩]

এই দায়িত্বকেই অন্যত্র নসীহত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নূহ আলাইহিস সালাম এর যবানীতে বলা হয়েছে,

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ

"আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পেঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসীহত করছি।"[৭৪৪] এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وصّى بِهِ نُوحا والّذِي أَوحيْنَا إِلَيْكَ ومَا وصّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ.

অর্থাৎ "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছেন তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়।"[৭৪৫] তাবারী, ইবন কাসীর ও অন্যান্য মুফাস্সির সাহাবী-তাবিয়ী মুফাস্সিরগণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে,

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ: أن اعملوا به على ما شرع لكم وفرض.

দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো দ্বীন পালন করা তথা তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ ও ফরজ করা হয়েছে।[৭৪৬] আর দ্বীন পরিপূর্ণ পালনের মধ্যেই রয়েছে আদেশ, নিষেধ ও দা'ওয়াত। এ অর্থে কোনো কোনো গবেষক দ্বীন পালন বা নিজের জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যদের জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াতকেও "ইকামতে দ্বীন" বলে গণ্য করেছেন।

উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য

দা'ওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা নসীহতের এই দায়িত্বই উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে-

ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحونَ.

---

৭৪০. আল কুরআন, ৫৭: ৮

৭৪১. আল কুরআন, ১৬: ১২৫

৭৪২. আল কুরআন, ৫: ৬৭

৭৪৩. আল কুরআন, ১৬: ৩৫

৭৪৪. আল কুরআন৭: ৬২; ৭: ৬৮, ৭৯, ৯৩; ১১: ৩৪

৭৪৫. আল কুরআন, ৪২: ১৩

৭৪৬. মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত তাবারী , *জামি'উল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন* (মাকতাবুত তাহকীক, দারুল হিজর, ১ম সংস্করণ,) খ. ২১, পৃ. ৫১৩

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের মধ্যে এমন জাতি হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ন্যায়কার্যে নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ করবে এবং এরাই সফলকাম।"[৭৪৭] অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

অর্থাৎ "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ কর এবং আলাহে বিশ্বাস কর।"[৭৪৮]

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ.

"তারা আলাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্যে নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত।"[৭৪৯]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"মুমিন নরনারী একে অপরের বন্ধু, এরা ন্যায়কার্যে নির্দেশ দেয়, অন্যায় কার্যে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আলাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আলাহ কৃপা করবেন। এবং আলাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৭৫০]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ ব্যতীতও আল কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলাহর প্রকৃত মুমিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।[৭৫১] এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান, নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মত সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অন্যতম কর্ম। শুধু তাই নয়, মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের দাবি হলো যে, তারা একে অপরের অন্যায় সমর্থন করেন না, বরং একে অপরকে ন্যায়কর্মে নির্দেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, এ সকল আয়াতে ঈমান, নামায, যাকাত ইত্যাদির আগে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এথেকে আমার মুমিনের জীবনে এর সবিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। এই দায়িত্বপালনকারী মুমিনকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরূপ দায়িত্বশীল মুমিনদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আলাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[৭৫২]

আমরা দেখেছি যে, আদেশ-নিষেধ বা দা'ওয়াত-এর আরেক নাম 'নসীহত'। 'নসীহত' বর্তমানে সাধারণভাবে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হলেও মূল আরবীতে নসীহত অর্থ আন্তরিকতা ও কল্যাণ-কামনা। কারো প্রতি আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনার বহিঃপ্রকাশ হলো তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দেওয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ কাজটি মুমিনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্যতম দায়িত্ব। বরং এই কাজটির নামই দ্বীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

"দ্বীন হলো নসীহত।" সাহাবীগণ বলেন, কার জন্য? তিনি বলেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্য, মুসলিমগণের নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ সকল মুসলিমের জন্য।"[৭৫৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 'নসীহতের' জন্য সাহাবীগণের বাই'য়াত

---

৭৪৭. আল কুরআন, ৩: ১০৪

৭৪৮. আল কুরআন, ৩: ১১০

৭৪৯. আল কুরআন, ৩: ১১৪।

৭৫০. আল কুরআন, ৯: ৭১

৭৫১. আল কুরআন, ৯: ১১২; ২২: ৪১; ৩১: ১৭

৭৫২. আল কুরআন, ৪১: ৩৩

৭৫৩. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫৩

বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে জারীর ইবন আব্দুলাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মুগীরা ইবন শু'বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবী বলেন,

بايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقامِ الصّلاةِ وإِيتاءِ الزَّكَاةِ والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাই'য়াত বা প্রতিজ্ঞা করলাম, সালাত কায়েমের, যাকাত প্রদানের, এবং প্রত্যেক মুসলিমের নসীহত করার।"[৭৫৪] এ অর্থে তিনি সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধের বাই'য়াত গ্রহণ করতেন। 'উবাদাহ ইবন সামিত ও অন্যান্য সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বলেন,

إِنّا بَايَعْنَا ... ى السَّمْعِ والطَّاعَةِ .... وعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ولا نَخَافَ لَومَةَ لَائِمٍ فِيهِ.

"আমরা রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাই'য়াত করি আনুগত্যের.... এবং সৎকর্মে আদেশের এবং অসৎকর্মে নিষেধের এবং এই বলে যে, আমরা মহিমাময় আলাহর জন্য কথা বলব এবং সে বিষয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দা বা গালি গালাজের তোয়াক্কা করব না।"[৭৫৫]

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের করণীয়

আদেশ নিষেধের জন্য স্বভাবতই ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রয়োজন। এজন্য যারা সমাজে ও রাষ্ট্রে দায়িত্ব ও ক্ষমতায় রয়েছেন তাদের জন্য এ দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফরয আইন বা ব্যক্তিগতভাবে ফরয। দায়িত্ব ও ক্ষমতা যত বেশি আদেশ ও নিষেধের দায়িত্বও তত বেশি। আলাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ও তাদের তত বেশি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে বলেছেন-

الّذينَ إِنْ مَكّنّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقامُوا الصّلاةَ وآتَوا الزّكَاةَ وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ ولِلّهِ عَاقِبَةُ الأُمورِ.

"যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে বা ক্ষমতাবান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকার্যে নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আলাহর এখতিয়ারে।"[৭৫৬]

এজন্য এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক প্রশাসকগণ, বিচারকগণ, আলিমগণ, বুদ্ধিজীবিগণ ও সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে বেশী, তাদের জন্য আশংকাও বেশি। তাদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত্ব পালন না করে নিশ্চুপ থাকেন তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়াবহ।

অনুরূপভাবে নিজের পরিবার, নিজের অধীনস্থ মানুষগণ ও নিজের প্রভাবাধীন মানুষদের আদেশ ও নিষেধ করা গৃহকর্তা বা কর্মকর্তার জন্য ফরয আইন। কারণ আলাহ তাকে এদের মধ্যে ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল করেছেন এবং তিনি তাকে এদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلا كُلّكُمْ رَاعٍ وكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ فَالإِمَامُ (الأَمِيرُ) الّذِي عَلَى النّاسِ رَاعٍ وهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ والرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ والْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوجِهَا ووَلَدِهِ وهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ.

"সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মানুষদের উপর দায়িত্ব-প্রাপ্ত শাসক বা প্রশাসক অভিভাবক এবং তাকে তার অধিনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বাড়ির কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ি ও তার সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব প্রাপ্তা এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৭৫৭] কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্যায় ও অসৎকর্মের প্রতিবাদ করা শুধুমাত্র এদেরই দায়িত্ব। বরং তা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। যিনি অন্যায় বা গর্হিত কর্ম

---

৭৫৪. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২২

৭৫৫. আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩২৫

৭৫৬. আল কুরআন, ২২: ৪১

৭৫৭. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৭৭; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৭।

দেখবেন তার উপরেই দায়িত্ব হয়ে যাবে সাধ্য ও সুযোগমত তার সংশোধন বা প্রতিকার করা। রাসূল (সা.) বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

''তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পবিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে তার অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করবে, আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।''[৭৫৮]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব হলো, অন্যায় দেখতে পেলে সাধ্য ও সুযোগ মত তার পরিবর্তন বা সংশোধন করা। এক্ষেত্রে অন্যায়কে অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং এর অবসান ও প্রতিকার কামনা করা প্রত্যেক মুমিনের উপরেই ফরয। অন্যায়ের প্রতি হৃদয়ের বিরক্তি ও ঘৃণা না থাকা ঈমান হারানোর লক্ষণ। আমরা অগণিত পাপ, কুফুরী, হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মের সায়লাবের মধ্যে বাস করি। বারংবার দেখতে দেখতে আমাদের মনের বিরক্তি ও আপত্তি কমে যায়। তখন মনে হতে থাকে, এ তো স্বাভাবিক বা এ তো হতেই পারে। পাপকে অন্তর থেকে মেনে নেওয়ার এ অবস্থাই হলো ঈমান হারানোর অবস্থা। আলাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষেধ করেছেন বা যা পাপ ও অন্যায় তাকে ঘৃণা করতে হবে, যদিও তা আমার নিজের দ্বারা সংঘটিত হয় বা বিশ্বের সকল মানুষ তা করেন। এ হলো ঈমানের ন্যূনতম দাবী।

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, ক্ষমতার ভিত্তিতে এই ইবাদতটির দায়িত্ব বর্তাবে। এজন্য ফকীহগণ উলেখ করেছেন যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধের এ ইবাদতটি সাধারণভাবে ফরয কিফায়া। যদি সমাজের একাধিক মানুষ কোনো অন্যায় বা শরীয়ত বিরোধী কর্মের কথা জানতে পারেন বা দেখতে পান তাহলে তার প্রতিবাদ বা প্রতিকার করা তাদের সকলের উপর 'সামষ্টিক ফরয' বা 'ফরযে কিফায়া'। তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি এ দায়িত্ব পালন করেন তবে তিনিই ইবাদতটি পালনের সাওয়াব পাবেন এবং বাকীদের জন্য তা মূলত 'নফল' ইবাদতে পরিণত হবে। বাকি মানুষেরা তা পালন করলে সাওয়াব পাবেন, তবে পালন না করলে গোনাহগার হবেন না। আর যদি কেউই তা পালন না করেন তাহলে সবাই পাপী হবেন। দুইটি কারণে তা ফরযে আইন বা ব্যক্তিগত ফরযে পরিণত হয়-

প্রথমত, ক্ষমতা। যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনিই এ অন্যায়টির প্রতিকার করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে তার জন্য তা ফরয আইন-এ পরিণত হয়। পরিবারের অভিভাবক, এলাকার বা দেশের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের জন্য এ দায়িত্বটি এ পর্যায়ে ফরয আইন। এছাড়া যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি কেউ বুঝতে পারেন যে, তিনি হস্তক্ষেপ করলে বা কথা বললে অন্যায়টি বন্ধ হবে বা ন্যায়টি প্রতিষ্ঠিত হবে তবে তা তার জন্য 'ফরয আইন' বা 'ব্যক্তিগতভাবে ফরয' হবে।

দ্বিতীয়ত, দেখা। যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অন্যায়টি দেখে নি বা জানে নি, তবে তার জন্য তা নিষেধ করা ও পরিত্যাগের জন্য দা'ওয়াত দেওয়া 'ফরয আইন' বা 'ব্যক্তিগত ফরয'-এ পরিণত হয়। সর্বাবস্থায় এ প্রতিবাদ, প্রতিকার ও দা'ওয়াত হবে সাধ্যানুযায়ী হাত দিয়ে, মুখ দিয়ে বা অন্তর দিয়ে।[৭৫৯]

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত-এর বিষয়বস্তু

দা'ওয়াত, আদেশ, নিষেধ, ওয়ায, নসীহত ইত্যাদির বিষয়বস্তু কী? আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ের দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধ করব? কোন্ বিষয়ের কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে? আমরা কি শুধুমাত্র নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদতের জন্য দা'ওয়াত প্রদান করব? নাকি চিকিৎসা, ব্যবসা, শিক্ষা, সমাজ, মানবাধিকার, সততা ইত্যাদি বিষয়েও দা'ওয়াত প্রদান করব? আমরা কি শুধু মানুষদের জন্যই দা'ওয়াত প্রদান করব? নাকি আমরা জীব-জানোয়ার, প্রকৃতি ও পরিবেশের কল্যাণেও দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধ করব?

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ঈমান, বিশ্বাস, ইবাদত, মু'আমালাত ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। সকল বিষয়ই দা'ওয়াতের বিষয়। কিছু বিষয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কিছু বিষয়ের মধ্যে দা'ওয়াতকে সীমাবদ্ধ করার অধিকার মুমিনকে দেওয়া হয় নি। তবে গুরুত্বগত পার্থক্য রয়েছে। 'দা'ওয়াতের

---

৭৫৮. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫০।

৭৫৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *আল্লাহর পথে দা'ওয়াত* (আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি.) পৃ. ১২

সংবিধান' কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে যে বিষয়গুলির দা'ওয়াতে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, মুমিনও সেগুলির প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করবেন। আমরা জানি যে, কুরআন ও হাদীসে প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে মুমিন জীবনের কর্মগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ফরয আইন, ফরয কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ ইত্যাদি পরিভাষাগুলি আমাদের নিকট পরিচিত। কিন্তু অনেক সময় আমরা "ফযীলতের" কথা বলতে যেয়ে আবেগ বা অজ্ঞতা বশত এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করে থাকি। নফল-মুসতাহাব কর্মের দা'ওয়াত দিতে যেয়ে ফরয-ওয়াজিব কর্মের কথা ভুলে যায় বা অবহেলা করি। এছাড়া অনেক সময় 'মুসতাহাব'-এর ফযীলত বলতে যেয়ে 'হারাম' এর ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বলা হয় না।

কুরআন-হাদীসের দা'ওয়াত পদ্ধতি থেকে আমরা দা'ওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আদেশ নিষেধের বিষয়াবলীর গুরুত্বের পর্যায় নিম্নরূপ দেখতে পাই।

প্রথমত, তাওহীদ ও রিসালাতের বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন ও সর্ব প্রকার শিরক, কুফ্‌র ও নিফাক থেকে আত্মরক্ষা। সকল নবীর দা'ওয়াতের বিষয় ছিল প্রথমত এটি। কুরআন-হাদীসে এ বিষয়ের দা'ওয়াতই সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন তাওহীদের বিধানাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াত দেওয়া হয়েছে, তেমনি বারংবার শিরক, কুফ্‌র ও নিফাকের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে দ্বীনের পথে দা'ওয়াতে ব্যস্ত অধিকাংশ "দা'য়ী" এই বিষয়টিতে ভয়ানকভাবে অবহেলা করেন। আমার চিন্তা করি যে, আমরা তো মুমিনদেরকেই দা'ওয়াত দিচ্ছি। কাজেই ঈমান-আকীদা বা তাওহীদের বিষয়ে দা'ওয়াত দেওয়ার বা শিরক-কুফ্‌র থেকে নিষেধ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ.

"অধিকাংশ মানুষ আলাহর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং সে অবস্থায় তারা শির্‌কে লিপ্ত থাকে।"[৭৬০]

হাদীস শরীফে বারংবার মুমিনদেরকে শিরক-কুফ্‌র থেকে সাবধান করা হয়েছে। শিরক, কুফ্‌র ও নিফাক-মুক্ত বিশুদ্ধ তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান ছাড়া নামায, রোযা, দা'ওয়াত, জিহাদ, যিকির, তাযকিয়া ইত্যাদি সকল ফরয বা নফল ইবাদতই অর্থহীন। এ জন্য শির্‌ক-কুফ্‌রীতে লিপ্ত ব্যক্তিকে নামায, রোযা, যিকির, দ্বীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দা'ওয়াত দেওয়াও অর্থহীন।[৭৬১]

দ্বিতীয়ত, বান্দার বা সৃষ্টির অধিকার সংশিষ্ট হারাম বর্জন

আমরা জানি, ফরয কর্ম দু প্রকার: করণীয় ফরয ও বর্জনীয় ফরয। যা বর্জন করা ফরয তাকে "হারাম" বলা হয়। হারাম দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হারাম মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলি বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, অধীনস্থ, সহকর্মী, প্রতিবেশী, দরিদ্র, এতিম ও অন্যান্য সকলের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করা; কোনোভাবে কারো অধিকার নষ্ট না করা; কাউকে জুলুম না করা; গীবত না করা; ওজন, পরিমাপ ইত্যাদিতে কম না করা; প্রতিজ্ঞা, চুক্তি, দায়িত্ব বা আমানত আদায়ে অবহেলা না করা; হারাম উপার্জন থেকে আত্মরক্ষা করা; নিজের বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধ হলেও ন্যয় কথা বলা ও ন্যায় বিচার করা; কাফির শত্রুদের পক্ষে হলেও ন্যায় বিচার করা ইত্যাদি বিষয় কুরআন ও হাদীসের দা'ওয়াত ও আদশে নিষেধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি রাস্তাঘাটে, মাজলিসে, সমাজে বা পরিবেশে কাউকে কষ্ট দেওয়া এবং কারো অসুবিধা সৃষ্টি করাকেও হাদীস শরীফে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সৃষ্টির অধিকার বলতে শুধু মানুষদের অধিকারই বুঝানো হয় নি। পশুপাখির অধিকার সংরক্ষণ, মানুষের প্রয়োজন ছাড়া কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে

---

[৭৬০] . আল কুরআন, ১২: ১০৬

[৭৬১] . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

এ বিষয়গুলি অনেক সময় অবহেলিত। এমনকি অনেক 'দা'য়ী' বা 'দা'ওয়াতকর্মী'ও এ সকল অপরাধে জড়িত হয়ে পড়েন।

যে কোনো কর্মস্থলে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য কর্মস্থলের দায়িত্ব পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সঠিকভাবে পালন করা ফর্য আইন। যদি কেউ নিজের কর্মস্থলে 'ফরয' সেবা গ্রহণের জন্য আগত ব্যক্তিকে 'ফরয' সেবা প্রদান না করে তাকে পরদিন আসতে বলেন বা তাকে একঘন্টা বসিয়ে রেখে 'চাশতের' নামায আদায় করেন বা দা'ওয়াতে অংশ গ্রহণ করেন তাহলে তিনি মুলত ঐ ব্যক্তির মত কর্ম করছেন, যে ব্যক্তি পাগড়ীর ফযীলতের কথায় মোহিত হয়ে লুঙ্গি খুলে উলঙ্গ হয়ে পাগড়ী পরেছে।

অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ক আদেশ নিষেধ কুর্আন-হাদীসে বেশি থাকলেও আমরা এ সকল বিষয়ে বেশি আগ্রহী নই। কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্যদেরকে কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন ও আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানের বিষয়ে দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধ করতে আমরা আগ্রহী নই। অবৈধ পার্কিং করে, রাস্তার উপর বাজার বসিয়ে, রাস্তা বন্ধ করে মিটিং করে বা অনুরূপ কোনোভাবে মানুষের কষ্ট দেওয়া, অপ্রয়োজনীয় ধোঁয়া, গ্যাস, শব্দ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের বা জীব-জানোয়ারের কষ্ট দেওয়া বা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধ করাকে আমরা অনেকেই 'আলাহর পথে দা'ওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলে মনে করি না। বরং এগুলিকে জাগতিক, দুনিয়াবী বা আধুনিক বলে মনে করি।[৭৬২] অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুর9ষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্যে পাপের বোঝা বহন করে"[৭৬৩]

তৃতীয়ত: পরিবার ও অধীনস্থদেরকে ইসলাম অনুসারে পরিচালিত করা

"বান্দার হক্ক" বা মানবাধিকার বিষয়ক দায়িত্বসমূহের অন্যতম হলো নিজের দায়িত্বাধীনদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়া ও পথে পরিচালিত করা। দাওয়াত-কর্মী বা দা'য়ী নিজে যেমন এ বিষয়ে সতর্ক হবেন, তেমনি বিষয়টি দাওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবেন।

চতুর্থত: অন্যান্য হারাম বর্জন করা

হত্যা, মদপান, রক্তপান, শুকরের মাংস ভক্ষণ, ব্যভিচার, মিথ্যা, জুয়া, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া ইত্যাদি এ জাতীয় হারাম। "দা'য়ী" বা দাওয়াত-কর্মী নিজে এসব থেকে নিজের কর্ম ও হৃদয়কে পবিত্র করবেন এবং এগুলি থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য দা'ওয়াত প্রদান করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হালাল ও হারাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তাই প্রত্যেক মুমিন নিঃসংকোচে তার অনুসরণ করে। কেননা সে বিশ্বাস করে, 'তিনি তাদের জন্য পবিত্র (ও উত্তম) বস্'ু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র (ও অনুত্তম) বস্'ু হারাম করেছেন।"[৭৬৪] আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বারংবার বিভিন্নভাবে এবিষয়ক দা'ওয়াত প্রদান করা হয়েছে।[৭৬৫]

পঞ্চমত: পালনীয় ফরয ওয়াজিবগুলি আদায় করা

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) বলতেন, 'রাতে তাহাজ্জুদ আর দিনে রোজা রাখা প্রকৃত আল্লাহভীতি নয়; বরং আল্লাহভীতি হলো আল্লাহ যা ফরজ করেছেন তা আদায় করা এবং তা নিষিদ্ধ করেছেন তা পরিহার করা। এগুলো আদায় করার পর যদি কোনো নেক আমল করা হয় তবে কল্যাণের ওপর কল্যাণ বলে বিবেচিত হবে।'[৭৬৬] নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল উপার্জন, ফরয-আইন পর্যায়ের ইলম শিক্ষা ইত্যাদি এ জাতীয় ফরয ইবাদত এবং দাওয়াতের অন্যতম বিষয়।[৭৬৭]

---

৭৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

৭৬৩. আল-কুরআন, ৩৩: ৫৮

৭৬৪. আল-কুরআন, ৭: ১৫৭

৭৬৫. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

৭৬৬. যয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন আহমাদ ইবন রজব হাম্বলী, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম (বৈরূত: মুআস্সাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করণ: ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ২৬৮

৭৬৭. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

ষষ্ঠত: সৃষ্টির উপকার ও কল্যাণমূলক ‘সুন্নাত-নাফল’ ইবাদত করা

সকল সৃষ্টিকে তার অধিকার বুঝে দেওয়া ফরয। অধিকারের অতিরিক্ত সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উপকার করা কুরআন-হাদীসের আলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ ‘নফল’ ইবাদত এবং আলাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও প্রিয়তম পথ। ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া, দরিদ্রকে দারিদ্যমুক্ত করা, বিপদগ্রস্থকে বিপদ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং যে কোনোভাবে যে কোনো মানুষের বা সৃষ্টির কল্যাণ, সেবা বা উপকারে সামান্যতম কর্ম আলাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কুরআন ও হাদীসে এ সকল বিষয়ে বারংবার দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধ করা হয়েছে।

সপ্তমত: আলাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার ‘সুন্নাত-নফল’ ইবাদত করা

নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, বান্দা যেসব আমলের দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে থাকে, তার মধ্যে ফরজ আমলগুলো আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর নফল ইবাদত দ্বারা বান্দা আমার এত বেশি কাছের হয়ে যায় যে তখন আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিই। সে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি তাকে আশ্রয় দিই।”[৭৬৮] নফল নামায, রোযা, যিকির, তিলাওয়াত, ফরয কিফায়া বা নফল পর্যায়ের দা'ওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ, নসীহত, যিক্র, তাযকিয়া ইত্যাদি এ পর্যায়ের।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে রত মুমিনগণ ষষ্ঠ পর্যায়ের নফল ইবাদতের চেয়ে সপ্তম পর্যায়ের নফল ইবাদতের দা'ওয়াত বেশি প্রদান করেন। বিশেষত, দারিদ্য বিমোচন, কর্মসংস্থান তৈরি, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের দা'ওয়াত প্রদানকে আমরা ‘আলাহর পথে দা'ওয়াত’ বলে মনেই করি না। অথচ রাসূল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়াবি সমস্যাগুলোর একটি সমাধান করে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার আখিরাতের সংকটগুলোর একটি মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্থের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাআলাও তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-গুণ গোপন করবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।”[৭৬৯]

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীব-জানোয়ারও যদি কোনো অন্যায় বা ক্ষতির কর্মে লিপ্ত থাকে সাধ্য ও সুযোগমত তার প্রতিকার করাও আদেশ নিষেধ ও কল্যাণ কামনার অংশ। যেমন কারো পশু বিপদে পড়তে যাচ্ছে বা কারো ফসল নষ্ট করছে দেখতে পেলে মুমিনের দায়িত্ব হলো সুযোগ ও সাধ্যমত তার প্রতিকার করা। তিনি এই কর্মের জন্য আদেশ, নিষেধ ও নসীহতের সাওয়াব লাভ করবেন। পূর্ববর্তী যুগের প্রাজ্ঞ আলিমগণ এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকেই এ সকল বিষয়কে ‘আলাহর পথে দা'ওয়াত’ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার অংশ বলে বুঝতে পারেন না। মহান আলাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।[৭৭০]

দা'ওয়াতের ফযীলত ও সাওয়াব

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ, দা'ওয়াত, দ্বীন প্রচার বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝতে পারছি। আমরা দেখছি যে, কাজটি মুমিনের জন্য একটি বড় ইবাদত। এ ইবাদত পালন করলে মুমিন নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত পালনের ন্যায় সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন। অবহেলা করলেও অনুরূপ ইবাদতে অবহেলার শাস্তি তার প্রাপ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, কুরআন-হাদীসে দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধের এ ইবাদতের জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার ও শাস্তির কথা জানানো হয়েছে। পুরস্কারের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: ক) সর্বোচ্চ পুরস্কার, খ) অন্যান্য অনেক মানুষের কর্মের সমপরিমাণ সাওয়াব ও

---

[৭৬৮]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ১০৫

[৭৬৯]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২০৭৪

[৭৭০]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

গ) জাগতিক গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া।

সফলতা ও সর্বোচ্চ পুরস্কার

আমরা দেখেছি যে, দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব পালনকারীরাই সফলকাম বলে আল কুরআনে বলা হয়েছে। অন্যত্র এই দায়িত্ব পালনকারীর জন্য রয়েছে মহোত্তম পুরস্কার ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إلاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعْرُوفٍ أَو إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاةِ اللهِ فَسَوفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে যে দান, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের আদেশ দেয় তার পরামর্শে কল্যাণ আছে। আলাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য কেউ তা করলে তাকে মহা-পুরস্কার দিব।"[৭৭১]

'দা'য়ী'র সর্বোচ্চ পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَاللهِ لأنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلا واحدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أنْ يَكُونَ لَكَ حمرُ النَّعَمِ.

"আলাহর কসম, তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষকেও আল্লাহ সুপথ দেখান তাহলে তা তোমার জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ লাল-উটের চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে।"[৭৭২] অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন,

أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ونَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ.

"ভাল কার্যে নির্দেশ করা সাদকা বলে গণ্য এবং খারাপ থেকে নিষেধ করা সাদকা বলে গণ্য।"[৭৭৩]

আমরা যারা সহজে মুখ খুলতে চাই না তাদের একটু চিন্তা করা দরকার। প্রতিদিন অগণিতবার আমার সুযোগ পাই মুখ দিয়ে মানুষকে একটি ভাল কথা বলার। লোকটি কথা শুনবে কিনা তা বিবেচ্য বিষয়ই নয়। আমি শুধু বলার সুযোগটা ব্যবহার করে সাওয়াব অর্জন করতে চাই। একটু ভালবেসে একটি ভাল উপদেশমূলক কথা আমার জন্য আলাহর দরবারে অগণিত পুরস্কার জমা করবে। সাথে সাথে লোকটিরও উপকার হতে পারে। যদি হয় তবে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ পুরস্কার লাভ করব।

অগণিত মানুষের আমলের সমপরিমাণ সাওয়াব

দা'য়ী, মুবালিগ বা দা'ওয়াত ও তাবলীগে রত ব্যক্তির বিশেষ পুরস্কারের দ্বিতীয় দিক হলো তার এই কর্মের ফলে যত মানুষ ভাল পথে আসবেন সকলের সাওয়াবের সমপরিমান সাওয়াব তিনি লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ومَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভালপথে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পুরস্কারের সমপরিমাণ পুরস্কার সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কারের কোনো ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পাপের কোনো ঘাটতি হবে না।"[৭৭৪]

মুমিন যদি কোনো একটি ভাল কর্ম করতে সক্ষম নাও হন, কিন্তু তাঁর নির্দেশনা-পরামর্শে কেউ তা করে, তবে তিনি কর্মকারীর সমপরিমান সাওয়াব পান। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَنْ دَلّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاعِلِهِ

"যদি কেউ কোনো ভাল কর্মের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন তবে তিনি কর্মটি পালনকারীর সমপরিমান সাওয়াব লাভ করবেন।"[৭৭৫]

---

[৭৭১]. আল কুরআন, ৪: ১১৪
[৭৭২]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৭৩; সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ১২১
[৭৭৩]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৫৮
[৭৭৪]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ৬২
[৭৭৫]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৪১

আযাব-গযব থেকে রক্ষা

দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব পালন করার অন্যতম পুরস্কার হলো জাগতিক গযব থেকে রক্ষা পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে তা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন,

نَائِمِ عَلَى حدُودِ اللهِ والْمُدْهِنِ (الواقع) فِيهَا كَمَثَلِ قومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحرِ

فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبّونَ عَلَى الّذِينَ فِي أَعْلاهَا فَقَالَ الّذِينَ فِي أَعْلاهَا لا نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤْذُونَنَا فَقَالَ الّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِنّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا (فِيْ نَصِيْبِنَا) فَنَسْتَقِي (ولَمْ نُؤْذ مَنْ فوقنَا) فَإِنْ أَخَذوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوا جَمِيعًا وإِنْ تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধিবিধান সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট এবং যে ব্যক্তি বিধিবিধান লঙ্ঘন করছে উভয়ের উদাহরণ হলো একদল মানুষের মত। তারা সমুদ্রে একটি জাহাজ বা বজরা ভাড়া করে। লটারীর মাধ্যমে কেউ উপরে এবং কেউ নিচের খোলে স্থান পায়। যারা নিচে অবস্থান গ্রহণ করল তারা পানি তোলার জন্য উপরে আসতে লাগল। এতে উপরের মানুষদের গায়ে পানি পড়তে লাগল। তখন উপরের মানুষেরা বলল, আমাদেরকে এভাবে কষ্ট দিয়ে তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। তখন নিচের মানুষেরা বলল, আমরা আমাদের অংশ বা জাহাজের নিচে একটি গর্ত করি, তাহলে আমরা সহজেই পানি নিতে পারব এবং উপরের মানুষদের কষ্ট দিতে হবে না। এই অবস্থায় যদি উপরের মানুষেরা তাদের এই কাজে বাধা দেয় এবং নিষেধ করে তাহলে তারা সকলেই বেঁচে যাবে। আর যদি তারা তাদেরকে এ কাজ করতে সুযোগ দেয় তাহলে তারা সকলেই ডুবে যাবে।"[৭৭৬]

নুবুয়তের নূর থেকে উৎসারিত এ উদাহরণটি ভাল করে চিন্তা করুন। সমাজের অনেক ক্ষমতাধর বা প্রভাবশালী মানুষ অনেক প্রকারের অন্যায় বা গর্হিত কাজ দেখেও প্রতিবাদ করেন না। তাঁরা জানেন যে, তাঁরা প্রতিবাদ করলে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নীরবতা বা তাৎক্ষণিক সুবিধা অগ্রাধিকার দেন। তারা ভাবেন, এতে আমার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কষ্ট করছে অন্য মানুষেরা। নষ্ট হচ্ছে অন্য মানুষের সন্তানেরা। তাদের বুঝা উচিত যে, সমাজের এ অবক্ষয় কোনো না কোনাভাবে তাদের ও তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে স্পর্শ করবেই। এজন্য আমাদের সকলকেই আদেশ-নিষেধের এ দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকতে হবে।

---

[৭৭৬]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের ইতিহাসে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ইতিবৃত্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস
বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ
বাংলাদেশীয় জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ
নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রবাদী জঙ্গি দলসমূহ
কালো তালিকাভুক্ত দল সমূহ
বিশেষ ২৩ জেলায় জঙ্গি তৎপরতা
নিষিদ্ধ চারটি আত্মস্বীকৃত জঙ্গি প্রতিষ্ঠান-
বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনসমূহ
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জঙ্গি সংগঠনগুলো-
মায়ানমার ভিত্তিক জঙ্গি গ্রুপ
জঙ্গি অর্থায়নে অভিযুক্ত বিভিন্ন এনজিও সংস্থা
প্রকাশ্যে বিভিন্ন জঙ্গিদলের উত্থান পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামের ইতিহাসে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ইতিবৃত্ত

মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে জ্বিন জাতি বসবাস করত। কিন্তু তারা পৃথিবীতে সীমাহীন বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, বিপর্যয় ও সংঘাত সৃষ্টি করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলাা তাদের কঠোর শাস্তি দিয়ে তদস্তলে মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলাা যখন ফেরেশতাদের নিকট মানব সৃষ্টির ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তখন ফেরেশতারা অশান্তি, বিপর্যয় ও সংঘাত সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করেছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, "হে আমাদের রব, আপনি পৃথিবীতে এমন একটি জাতি সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তরাক্তি করবে।"[৭৭৭] এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ তা'আলাা বলেছিলেন,"নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"[৭৭৮] মানব সৃষ্টির পরপরই সংঘাত শুরু হয় শয়তানের সাথে। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী ফরমান জারি করলেন, "এই শয়তানই হবে তোমাদের চিরশত্রু।"[৭৭৯] আর জেনে রেখো তোমাদের পথ দু'টি, একটি হল সিরাতাল মুস্তাকীম এবং আপরটি হলো সাবিলে তাগূত বা শয়তানের পথ। মূলত এ দু'টি পথ ধরেই পৃথিবীতে সংঘাতের সৃষ্টি। যুগে যুগে শয়তান প্রদর্শিত পথের অনুসারীরা পৃথিবীতে সংঘাত সৃষ্টি করেছে। মানব জাতির আদি পিতা হযরত

---

[৭৭৭]. আল-কুরআন, ২: ৩০
[৭৭৮]. আল-কুরআন, ২: ৩০
[৭৭৯]. আল-কুরআন, ২: ২০৮

আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.) যখন বেহেশতে অবস্থান করছিলেন তার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু প্রধানত শয়তানের প্রলোভনে তারা আল্লাহর বাণী ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলাা বললেন, "এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে।"[৭৮০] আলোচ্য আয়াতে 'ইহবিত' দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা আদম ও হাওয়া এবং শয়তান সকলকে পৃথিবীতে নেমে যাওয়ার আদেশ করেছেন।

পৃথিবীতে শুরু হল পরস্পরের দ্বন্দ্ব। তাগূত বা শয়তানের দলে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তি হল হযরত আদম (আ.) এর সন্তান কাবিল। এই কাবিল অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে সর্বপ্রথম তার সহোদর ভাই হাবিলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি তাদেরকে আদমের দুই ছেলের সত্য কাহিনী শুনিয়ে দাও। তারা দু'জন যখন কোরবানী দিল, তখন তাদের একজনের কাছ থেকে তা গৃহীত হলো। কিন্তু অন্য জনের কাছ থেকে গৃহীত হলো না। সে (কাবিল) বলল ? আমি তোমাকে হত্যা করবো। সে (হাবিল) বললো ঃ আল্লাহতো শুধু সংযতদের কাছ থেকে (উত্তম কর্ম) গ্রহণ করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াও। তবে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিতে হাত বাড়াবো না মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই, তুমি আমার পাপ ও তোমার পাপের দায় ঘাড়ে নাও, অতঃপর দোজখবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হও। ওটাই হত্যাকারীদের কর্মফল। অতপর তাঁর প্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করলো। তাই সে তাকে হত্যা করলো ও ক্ষতিগ্রস্থ হলো।"[৭৮১]

দ্বিতীয় আদম নামে খ্যাত হযরত নূহ (আ.) এর পুত্র কেনান পিতার আদেশ অমান্য করে আল্লাহদ্রোহী ও সন্ত্রাসী হয়েছিল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকে বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।"[৭৮২] হযরত নূহ (আ.) এর জামানায় তাগূতী শক্তির এতই প্রাধান্য পেয়েছিল যে, তিনি তাদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করেছিলেন। কুরআনে এসেছে, "নূহ বলল, হে আমার পারনকর্তা! আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে পাপাচারী, কাফির।"[৭৮৩] হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর নবুয়াতের সময় নমরুদ অত্যন্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল। সে নবির একত্ববাদের দাওয়াতকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। তাই সে নবিকে তার পথ থেকে সরানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এক পর্যায় নমরুদ ভয়ানক সন্ত্রাসী হয়ে উঠে। এমনকি সে আল্লাহর নবি হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে হত্যা করার জন্য অগ্নিকু-লি তৈরী করেছিল। মূসা (আ.) এর সময় ফিরাউনের ইতিহাস সাক্ষ দেয় যে, সে ছিল স্বৈরাচারী ও ভয়ানক সন্ত্রাসী। পৃথিবীর মানুষকে সে জিম্মি করে ফেলেছিল। সে হযরত মুসা (আ.) এর একত্ববাদের দাওয়াতকে সহ্য করতে পারছিল না। এক পর্যায় সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে হযতর মুসা (আ.) কে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা মানব সভ্যতার ইতিহাসের ন্যায় একই রকম দীর্ঘ। এ দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গ্রীক ঐতিহাসিক জেনোফোন খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১-৩৫০ এ শত্রুদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর কথা বলেছেন এবং তিনি তার নিজের ওপর মানসিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার কথাও করেছেন। প্রথম শতাব্দীতে রোমের রাজা তহবিল তছরূপ করলে তিনি তার বিরোধিতাকারীদেরকে দমন করার নিমিত্তে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন। যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে তিনি সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন করছিলেন। প্রাচীন যুগ থেকে ইহুদী উগ্রবাদী ধার্মিকগণ 'ধর্মীয় আদর্শ ও

[৭৮০]. আল-কুরআন, ২ : ৩৬
[৭৮১]. আল-কুরআন, ৫: ২৭-৩০
[৭৮২]. আল-কুরআন, ৭১ : ৫-৭
[৭৮৩]. আল-কুরআন, ৭১ : ২৬-২৭

ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মানব ইতিহাসে প্রাচীন যুগের প্রথম প্রসিদ্ধ সন্ত্রাসী কর্ম ছিল উগ্রপন্থী ইহুদী যীলটদের সন্ত্রাস।

খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসরত উগ্রবাদী এ সকল ইহুদীরা নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপোসহীন ছিল। যে সকল ইহূদী রোমান রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করত বা সহঅবস্থানের চিন্তা কর তারা তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করত। এজন্য তারা সিকারী বা ছুরি-মানব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তারা প্রয়োজনে আত্মহত্যা করত কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে ধরা দিত না। এদের হত্যাকান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণ ও প্রশাসনকে ভীতসন্ত্রস্ত করা। এজন্য তাদের টার্গেট ছিল প্রকাশ্য দিবালোকে বাজার, উপাসনালয়, উৎসবকেন্দ্র বা অনুরূপ জনসমাবেশের মধ্যে আক্রমণ করে হত্যা করা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ সকল হত্যাকান্ডের মাধ্যমে জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করা এবং রোমান প্রশাসন ও তাদের দালালদেরকে তাদের কর্মকান্ডের সংবাদ জানানোর ব্যবস্থা করা। তাগূতী শক্তির তাগূব আর তাদের বিপরীতে আল্লাহর মনোনীত নবী রাসূলদের জিহাদ হযরত আদম (আ.) থেকে সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত চলেছে। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে ইসলামের আর্বিভাব ও বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসার শুরু হয়। কাফির ও মুশরিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে (৬১০-৬৩২ খ্রি.) ষড়যন্ত্র লিপ্ত হলো। পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মদ (সা.) এর একত্ববাদের দাওয়াতকে সহ্য করতে পারছিল না। তখন তারা মহানবি (সা.) এর ওপর চরম অত্যাচার নির্যাতন চালাতে লাগল। যখন কোন উপায়ে মুহাম্মদ (সা.) এর দীনের দাওয়াত ঠেকানো যাচ্ছিল না তখন তারা দারুন নদওয়ার বৈঠকে সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাসূলুল্লাহ ((সা.) কে সন্ত্রাসী কর্মকা-ের মাধ্যমে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। এমন কি মহানবি (সা.) এর অনেক সাথীদের প্রতি চরম সন্ত্রাসী ও নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিল। যেমন হযরত খাব্বাব (রা.) কে শূলেবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। হযরত বেল্লাল (রা.) কে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে শুয়ায়ে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময়ে আরো অনেক সন্ত্রাসী কর্মকা-ের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।
খারিজী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে উগ্রতা ও সন্ত্রাসের প্রথম ঘটনা দেখা যায়। ৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খ্রি.) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তৃতীয় খলীফা উসমান ইবনু আফফান (রা.) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু উসমান (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া (রা.) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী (রা.) দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। সিফফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন। এ পর্যায়ে আলীর (রা.) অনুসারীদের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। তাদেরকে খারিজী অর্থাৎ দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। তারা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। তারা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সারাদিন যিক্র ও কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকার কারণে তারা কুর্রা বা 'কুরআন পাঠকারী দল বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর নির্দেশ, অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ বলেছেন: "মুমিনগণের দু দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালজ্ঞন করলে তোমরা জুলুমকারী বা সীমালজ্ঞনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[৭৮৪] এখানে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সীমালজ্ঞনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে। মু'আবিয়া (রা.) এর

---

[৭৮৪]. আল কুরআন, ৪৯: ৯

Dhaka University Institutional Repository

দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। আত্মসমর্পনের আগেই যুদ্ধ থামানো বা এ বিষয়ে মানুষকে সালিস বানানোর অর্থই আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ব্যতিক্রম বিধান দেওয়া। এছাড়া আল্লাহ বলেছেন: "হুকুম শুধু আল্লাহরই।"[৭৮৫] কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। আল্লাহ আরো বলেন: "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[৭৮৬] আলী ও তার অনুগামীরা যেহেতু আল্লাহর নাযিল করা বিধান মত মু'আবিয়ার সাথে যুদ্ধ না চালিয়ে, সালিসের বিধান দিয়েছেন, সেহেতু তাঁরা কাফির। তারা দাবি করেন, আলী (রা.), মু'আবিয়া (রা.) ও তাঁদের অনুসারীরা সকলেই কুরআনের আইন অমান্য করে কাফির হয়ে গিয়েছেন। কাজেই তাঁদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে।

খারিজীরা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে এ মর্মে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারদর্শী হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।[৭৮৭] সালিসি ব্যবস্থা আলী (রা.) ও মুআবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার বিবাদ নিস্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক্ব প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রা.) দল ত্যাগ করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।[৭৮৮] যেহেতু আলী (রা.) ও মুআবিয়া (রা.) মুসলিম উম্মাহকে খোদাদ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই জাতি এ পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এ জন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম নামে এক ব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। আলীর (রা.) শাহাদতের পরে উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করে না, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহ্বা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি চাই যে, আল্লাহর যিক্‌র করতে করতে আমি শহীদ হব![৭৮৯] এ গুপ্তঘাতককে প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিত্তান (৮৪ হি.) বলেন: "কত মহান ছিলেন সে নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সে মহান আঘাতটি করেছিলেন! সে আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চাননি। আমি প্রায়ই তাঁর স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।"[৭৯০] ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। আরবী সাহিত্যে তাদের কবিতা জিহাদী প্রেরণার অতুলনীয় ভাণ্ডার।[৭৯১] তাদের ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সেজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে কড়া পড়ে

---

[৭৮৫]. আল কুরআন, ৬: ৫৭; ১২: ৪০ ও ৬৭

[৭৮৬]. আল কুরআন, ৫: ৪৪

[৭৮৭]. সুনান নাসাঈ, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৫, পৃ. ১৬৫-১৬৬; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, *দিরাসাতুন আনিল ফিরাক*, পৃ. ৪৭-৪৮

[৭৮৮]. ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮০-৪৩০; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৫৯

[৭৮৯]. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ মুবাররিদ, ***আল-কামিল ফীল লুগাহ ওয়াল আদব*** (কায়রো, দারুল ফিকর আল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৭ হি.) খ. ৩, পৃ. ১১২০

[৭৯০]. ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১০৮৫

[৭৯১]. মুবার্‌রিদ, ***প্রাগুক্ত*** , পৃ. ৩৬

গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো।[৭৯২] কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত।[৭৯৩] পাশাপাশি তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। ৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাদের সন্ত্রাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দৌহিত্র হাসান (রা.) সন্ত্রাসের স্বীকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। ৬৪ হি. সনে কুফায় হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে এ ধারা অব্যাহত আছে এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত চলবে।

৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান (রা.) ও আলী (রা.)-কে কাফির বলতে অস্বীকার করলেন, উপরন্তু তাঁদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তার বিরোধিতা শুরু করে। ৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান (রা.) ও আলী (রা.)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছন। এছাড়া মু'আবিয়া (রা.) ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[৭৯৪] তারা মনে করে যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। তারা এরূপ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা রাজনৈতিক পর্যায়ে ইসলামী বিধিবিধান তাদের ধারণামত পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এ ছাড়া যারা আলীকে কাফির মনে করেন না এরূপ সাধারণ অযোদ্ধা পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করতে থাকে।[৭৯৫]

অধিকাংশ সাহাবী ও অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়ী নৈতিকভাবে আলীর (রা.) কর্ম সমর্থন করতেন। তাকে পাপী বা ইসলাম-লঙ্ঘনকারী বলতে কখনোই রাজি হতেন না। খারিজীগণ এদেরকেও কাফির বলে হত্যা করত। সাহাবী খাব্বার ইবনুল আরাত-এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর স্ত্রী পরিজনদের নিয়ে পথে চলছিলেন। খারিজীগণ তাঁকে উসমান (রা.) ও আলী (রা.) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি তাঁদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেন এবং সন্ত্রাস ও হত্যার ভয়ানক পরিণতির বিষয়ে হাদীস বলেন। তখন তারা তাঁকে নদীর ধারে নিয়ে জবাই করে এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী ও অন্যান্য নারী ও শিশুকে হত্যা করে। ভিন্নমতাবলম্বী মুসলিমকে বিভিন্ন অযুহাতে কাফির বলে ইসলামের নামে তাকে হত্যা করছে এবং নিরস্ত্র নারী ও শিশুদেরকেও হত্যা করছে। খারিজীগণের বিভ্রান্তিকর মতবাদের অন্যতম ছিল-

(১) ইসলামের নির্দেশনা বা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব অস্বীকার করা।
(২) হাদীস মানলেও সুন্নাত বা আলোচ্য ও বিতর্কিত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর প্রায়োগিক কর্ম ও কর্মপদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করা।
(৩) পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলা।
(৪) কাফির হত্যার ঢালাও বৈধতা দাবি করা।
(৫) রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শরয়ী গুরুত্ব অস্বীকার করা।

---

[৭৯২]. আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.), *তালবীসু ইবলিস* (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি.) পৃ. ৮৩-৮৪

[৭৯৩]. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুররী (৩৬০হি), *আশ-শারী'আহ* (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, তা.বি.) পৃ. ৩৭

[৭৯৪]. ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৬১

[৭৯৫]. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১হি), *আল-মুসনাদ* (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১৪১৯ হি.) খ. ৫, পৃ. ১১০, ইবনু কাসীর; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৭৮-৩৯১; ড. আহমদ, *দিরাসাতুন আনিল ফিরাক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৬১

Dhaka University Institutional Repository

(৬) রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পাপের কারণে রাষ্ট্রকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করা।
(৭) এরূপ রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যকারী নাগরিকদেরকে কাফির বলা।
(৮) এরূপ কাফির রাষ্ট্র ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ বলা।
(৯) জিহাদকে ফরয আইন, বড় ফরয ও দীনের রুকন বলে দাবি করা।
(১০) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের নামে শাস্তি প্রদান।
(১১) তাদের মতের বিরোধী সকল আলিমকে অবজ্ঞা করা।[৭৯৬] ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি সন্ত্রাসী দল ছিল বাতিনী শিয়া বা হাশাশীনগণ শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি বাতিনী সম্প্রদায়। শিয়াগণ ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা ইমামত বংশতান্ত্রিক বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয়বিধ নেতৃত্ব আলী (রা.)-এর প্রাপ্য ছিল। এরপর তা তাঁর বংশধরদের মধ্যেই থাকবে। এ নেতৃত্ব বা ইমামতকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে অনেক দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ শিয়া বিশ্বাস করেন যে, আলী বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জা'ফার সাদিকের (১৪৮ হি.) পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মূসা কাযিম (১৮৩ হি.) ইমামত লাভ করেন। একদল মনে করে যে, জা'ফার সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এ ইমামত তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে। তাদেরকে ইসমাঈলিয়া বাতিনীয়া সম্প্রদায় বলা হয়। বাতিনীয়া সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর বাতিনী বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে, ইসলামী ইলম দুপ্রকারেরঃ যাহিরী ও বাতিনী।[৭৯৭] তারা দাবি করেন, ইসলামের নির্দেশাবলীর দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ। এ অর্থ সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এ অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধিগণ জানেন। আর এ গোপন অর্থই 'হাকীকত' বা ইসলামের প্রকৃত নির্দেশনা।

এ হাকীকতের জ্ঞানই প্রকৃত মারিফত। শুধু সাধারণ জাহিলগণই যাহিরী বা প্রকাশ্য ইলম ও আমল নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ বা হাকীকত বুঝে মারিফাত অর্জন করেন এবং সে মতই তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন। এ মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীরা তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তি ভরে মেনে নিতেন। ৩য়-৪র্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ কারামিতা, ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তারা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মত মতো ব্যাখ্যা করত সেহেতু তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এ সকল সন্ত্রাসীদের অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিযারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। হাশিশ বা আফিম ও গাজা জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার ছিল তাদের মৌলিক পরিচয়। এ জন্য তারা 'হাশাশীন' নামে খ্যাত হয়। তারা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে। আরবী হাশাশীন শব্দ থেকেই তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি গুপ্ত হত্যা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাঈলীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির বিল্লাহ (৪৮৭ হি.)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র নিযার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের

---

[৭৯৬]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, **ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদঃ একটি পর্যালোচনা**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর২০০৬ পৃ. ২৬

[৭৯৭]. আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী, সুয়ূতী, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, ইলমুল বাতিন বা বাতিনী ইলমকে যাহেরী ইলম থেকে পৃথক বা গোপন কোন বিষয় হিসাবে বর্ণনা করে যে সকল হাদীস প্রচলিত সেগুলি সবই বানোয়াট ও মিথ্যা। এগুলি বাতিনী শিয়াদের বানানো জাল হাদীস। এ বিষয়ক জাল হাদীস এবং সহীহ হাদীসে এ বিষয়ক কি নির্দেশনা আছে; সুয়ূতী, ***যাইলুল মাউযূ'আত***, পৃ. ৪৪; মুল্লা কারী, ***আল-মাসনূ'য়***, পৃ. ৯৩; ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ***হাদীসের নামে জালিয়াতি***, পৃ. ৩৪৩-৩৪৯

নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুক্কায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায ফিদায়ী (আত্মঘাতী) তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত। তাদের মাধ্যমে তিনি উত্তর পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় আল-মাওত নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার প্রচারিত ধর্মীয়-রাজনৈতিক আর্দশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শত্রু মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন।

ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুপ্তহত্যা এভাবে আর কোনো দল করেনি। এ সকল দুর্ধর্ষ আত্মঘাতী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উযির নিযামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজুমুদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। পার্শবর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এ সকল ফিদাঈদের পরবর্তী টার্গেট কে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দূর্গ থেকে ফিদাঈদের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ তাদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খ্রি.) হালাকু খার বাহিনী তাদের নির্মূল করে।[৭৯৮] খারিজীগণের ন্যায় বাতিনী-গণের বিভ্রান্তির মূল ছিল ইসলামের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের কর্মধারার গুরুত্ব না দেওয়া। তবে খারিজীদের সাথে তাদের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় -

(১) খারিজীগণ জিহাদের নামে সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ, অযোদ্ধা জনপদের উপর হামলা, হত্যা ও লুটতরাজ করলেও সাধারণত গুপ্ত হত্যা করত না। আলী (রা.), মুআবিয়া (রা.) প্রমুখের গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা ও আলী (রা.)-কে গুপ্ত হত্যা করা ছাড়া অন্য কাউকে তারা গুপ্ত হত্যা করেছে বলে জানা যায় না। পক্ষান্তরে বাতিনীগণের মূল কর্মই ছিল গুপ্ত হত্যা।

(২) খারিজীগণের কর্মকাণ্ডে আত্মহত্যা বা আত্মঘাতী হামলার কোনো ঘটনা দেখতে পাই না। পক্ষান্তরে বাতিনীগণ নেতার নির্দেশে মৃত্যুবরণ করাকেই জান্নাতের পথ বলে বিশ্বাস করত, আত্মহনন বা অন্যের হাতে মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করত না।

(৩) খারিজীগণ ইসলামী শরীয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করত। এ বিষয়ে কোনোরূপ ছাড় দেওয়াকে কুফরী বলে মনে করত। পক্ষান্তরে বাতিনীগণ শরীয়ত পালন জরুরী বলে মনে করত না। বিশেষত নেতার নির্দেশে যে কোনো শরীয়ত বিরোধী কর্ম করাকে বৈধ মনে করত।

(৪) খারিজীগণ কখনোই নিজেদের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনীয়তা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত না। তারা নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মের কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রচার করত। পক্ষান্তরে বাতিনী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিই ছিল গোপনীয়তা ও মিথ্যা। তারা সর্বদা নিজেদের মতবাদ গোপন রেখে সমাজের মানুষদের সাথে মত, বিশ্বাস ও কর্মে একাত্মতা প্রকাশ করত। শুধু বাছাই করা মানুষদের কাছে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে দাওয়াত দিত।[৭৯৯] মধ্যযুগে খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা দেখা যায়। বিশেষত ধর্মীয় সংস্কার, পাল্টা-সংস্কার (the Reformation and the CounterReformation)-এর যুগে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে অগণিত যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধ বহির্ভুত সন্ত্রাসের অনেক ঘটনা দেখা যায়।তারপর সন্ত্রাস শব্দটা প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হয়েছিল ১৭৯০ এর দশকে ফরাসি বিপ্লবের সময়। আর ১৭৯০ এর দশকে এডমন্ড বার্ক নামে ব্রিটিশ কূটনীতিক এই শব্দটা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন সে সময়ে ফ্রান্সের জ্যাকোবিন সরকারকে। ১৭৯৩ এবং ১৭৯৪ সালকে বলা হয়ে থাকে সন্ত্রাসের সময়কাল। ম্যাক্সমিলিয়ান রোবসৃপিয়ার ছিলেন এ সরকারের প্রধান। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ৩ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলেন, গিলেটিনে চড়িয়েছিলেন। ইতিহাস বলে রোবসৃপিয়ার তখন ৫

[৭৯৮]. আহমদ মুহাম্মাদ জলী, *দিরাসাতুন আনিল ফিরাক*, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ২৬৫-৩০৬; মতিউর রহমান, ***ঐতিহাসিক অভিধান,*** পৃ. ৯৮

[৭৯৯]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, **ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদঃ একটি পর্যালোচনা**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর,ডিসেম্বর,২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষাধিক মানুষকে আটক করে ৪০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। ২ লক্ষাধিক মানুষের হয়েছিল নির্বাসন। আরো ২ লক্ষাধিক মানুষ জেলখানায় অনাহারে অত্যাচারে মারা গেছে। তাহলে বুঝা যায় সন্ত্রাস শব্দটা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদেরকে বোঝানোর জন্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের মূল অনুপ্রেরণা ছিল ধর্ম। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সন্ত্রাসবাদে অনেক বেশি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ দেখা দেয়। ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন এর্নাক্টিস্টদের (Anarchist) সন্ত্রাসবাদ কর্মকাণ্ড লিপ্ত হতে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে।উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনফুসীয় অনুসারীগণ তাদের সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্য সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদের অংশ হিসেবে তারা তাদের দেশের অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হত্যাও করেছিল। রাশিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সেখানে সন্ত্রাবসাদী কর্মকাণ্ড একটি বড় ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলো। ১৮৮০ সালে নিহিলিস্ট মতবাদ ও নিহিলিস্টদের কার্যকলাপের ফলে রুশ সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছিলো ও নিহিলিস্ট বিপ্লবীদের হাতে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছিলো ১৮৮১ জন। নিহিলিস্টরা ছিলেন উগ্র। তবে তাঁরা শিক্ষিত ছিলেন। একটি আদর্শকে সামনে রেখে তারা বিপ্লবী তৎপরতা শুরু করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এই আন্দোলন সন্ত্রাসবাদে রূপান্তরিত হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিকদের মিছিলের মধ্যে একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল যেখানে ১২ জন নিরীহ মানুষ, ৭জন পুলিশ এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তা (নাম ডি জেন) মারা গিয়েছিল। এ কাজটা মুসলমানরা করেনি যারা করেছিল তারা নৈরাজ্যবাদী ৮ জন অমুসলিম। আর বিংশ শতাব্দীর হামলাগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ১৯০১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলি তাকে লিওন নামে এক নৈরাজ্যবাদী দুবার গুলি করে হত্যা করেছিল এবং সে ছিল অমুসলিম। ১৯১০ সালের ১ অক্টোবর লস এঞ্জেলসে টাইম নিউজ পেপার (বিল্ডিং) ভবনে একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। এখানে ২১ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। এর জন্য যারা দায়ী তারা ছিল জেমস ও জোসেফ নামে দুই খ্রিস্টান।

১৯১৪ সালের ২৮ জুন সারায়েভোতে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের আর্কডিউক ফ্রানজ, ফার্ডিন্যান্ড এবং তার স্ত্রী নিহত হয়েছিলেন। এখান থেকেই শুরুহয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । এর জন্য যারা দায়ী ছিল তারা ইয়ং বসনিয়া নামে একটি দল যাদের অধিকাংশ ছিল সার্বিয়ান অমুসলিম। ১৯২৫ সালের ১৬ এপ্রিল বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার সেইন্ট ন্যাডেলিয়া চার্চে ১৫০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল, আহত হয়েছিল ৫০০ জনেরও বেশি। এটা ছিল বুলগেরিয়ার মাটিতে তখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী আক্রমণ। আর এ কাজটা করেছিল বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৩৪ সালের ৯ অক্টোবর যুগোস্লাভিয়ার রাজা প্রথম আলেকজান্ডারকে ভ্লাদা জার্জিফ নামে এক অমুসলিম বন্দুকধারী হত্যা করে। প্রথম যে বিমানটি হাইজ্যাক করা হয় সেটা কোনো মুসলমান করেনি। কাজটা করেছিল ওরটিজ নামে এক অমুসলিম ব্যক্তি। সে বিমানটি ছিনতাই করে কিউবাবায় নিয়ে যায় এবং সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) বিজয়ী শক্তির দ্বারা একটি বড় দুষ্ট চক্র সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর কাছে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয়। এরপরও পরাজিত শক্তি ইহুদীবাদকে সমর্থন করে এবং উপনিবেশবাদ থেকে কখনও ফিরে আসেনি। এর ফলে আলজেরিয়ার উপর ফ্যান্সের আগ্রাসন ও পালেস্টাইনের উপর ইসরাইলী আগ্রাসনে অনেক গেরিলার জন্ম হয়।

১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা কর। পুঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে হাজার হাজার জাপানীকে। আজো এর প্রভাব শেষ হয়নি। ১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই কিং ডেভিড হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। মেনাফেম বেগেন এর নেতৃত্বে ইরগুন কর্তৃক এ বিস্ফোরণটা ঘটে। যেখানে ৯১ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। তার মধ্যে ২৮ জন ব্রিটিশ, ৪১ জন আরব, ১৭ জন ইহুদি এবং অন্য আরো ৫ জন। এই ইরগুন গ্রুপ আরবদের ন্যায় পোশাক পরিধান করেছিল, যাতে লোকজন মনে করে আরবরাই এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আর এটা ছিল ব্রিটিশ ম্যানডেটের বিরুদ্ধে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আক্রমণ। সেই সময়টাতে মেনাফেম বেগানকে ব্রিটিশ সরকার এক নম্বর

সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করেছিল। কিন্তু দেখা গেল পরবর্তী কয়েক বছর পর তিনিই হলেন ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী এবং আরো কিছুদিন পর তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। যে মানুষটা খুনি, যে মানুষটা খুন করেছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে সে-ই প্রধানমন্ত্রী হয় ইসরাঈলের, কিছুদিন পর নোবেল পুরস্কার পায় শান্তিতে। আর তখন ইরগুন, হ্যাগানা, স্টার্নগ্যাং এসব সন্ত্রাসী দলও তাদের নেতারা যেমন আইজ্যাক রবিন, মেনাফেম বেগান, এরিয়েল শ্যারন এরা সবাই পরবর্তীতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী অথবা উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা হয়েছিলেন এবং তারা সবাই যুদ্ধ করে ছিল ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য। যদি পৃথিবীর মানচিত্র দেখা হয়, তাহলে ১৯৪৫ সালের আগে ইসরাঈল নামে কোনো দেশ ছিল না। এ ইহুদি দলগুলো, খোদ ব্রিটিশরা যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে ডাকত তারা একটা ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য লড়েছিল। পরে তারা শক্তি দিয়ে ইসরাঈল দখল করে প্যালেস্টাইনদের তাড়িয়ে দেয়। এখন এ লোকগুলোই প্যালেস্টাইনের লোকদেরকে বলছে সন্ত্রাসী।

১৯৪৮ সালে প্যালেস্টানীদের আবাসভূমি দখল করে ইংগ-মার্কিন গোষ্ঠী অভিশপ্ত যাযাবর ইহুদীদের জন্য ইসরাাঈল-রাষ্ট্র গঠন করে। তখন হতে ইসরাঈল আরবদের মধ্যে শত্রুতা-লড়াই চলে আসছে । ইহুদীদের সার্বিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এই বিশ্বমোড়ল আমেরিকা। বহুবার জাতিসংঘে আরব প্যালেস্টাইনীদের বিরুদ্ধে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়েছে। এখনও অন্যায়ভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলী দস্যু-দানবকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এই ৮ বছরের মধ্যে ২৫৯ টি সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে শুধু ইহুদি সন্ত্রাসীরা। তাদের অনেক দল ছিল যেমন ঃ ইরগুন, স্টার্নগ্যাং, হ্যাগানা ইত্যাদি। ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র তার গোয়েন্দাসংস্থা সি আই এ'র মাধ্যমে সিরিয়ার নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসনভার পাকিস্তানিদের বাহিনীর হাতে ন্যস্ত হয়। তারা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর স্বৈরাচার মনোভাব পোষণ করে। তারা সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাসাভাষী মানুষদের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলন ঠেকাতে পাক সরকার ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেশাহাদাত বরণ করেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার প্রমুখ। এভাবে পাকিস্তানি সেনা সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে দমনের চেষ্টা চালানো হয়। শুরু হয় পাক সেনাদের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন।
১৯৬৬ সালের ৭ জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান স্বাধীকার আন্দোলনের অংশ হিসেবে ৬দফা উত্থাপন করেন। পাকিস্তানি শাসকরা বঙ্গবন্ধুকে ঠেকানোর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেন। আন্দোলনের মুখে পাক সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে আলোচনার নামে টালবাহানা করতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতে পাক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ ঘুমন্ত বাঙ্গালীর ওপর অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ লোককে হত্যা (শহিদ) করে, দুই লক্ষ নারীকে অমানবিক ও পাশবিক নির্যাতন চালায়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসর্মপণে বাংলাদেশ শত্রু মুক্ত হয়। ১৯৫৩ সালে ইরানের মোসাদ্দেক সরকার উৎখাত করে স্বৈরাচারী একনায়ক রেজাশাহ্ পাহলভিকে ক্ষমতায় বসায় এই বিশ্ব-মোড়ল আমেরিকা। সিরিয়া অভিযোগ করে যে, ১৯৫৪ সালে ইসরাঈল একটি সিরীয় বিমান গুলি করে ভূপাতিত করার মাধ্যমে সন্ত্রাস শুরু করে। ১৯৬৩ সালে ইরাকের কমিউনিষ্টদের হত্যা করার জন্য বাথ-পার্টিকে দিক নির্দেশনা দিয়ে একটি হত্যা তালিকা প্রদান করে, যা আমেরিকার নির্দেশে বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে সেই বাথ পার্টিতেই সাদ্দাম হোসাইনকে পার্টি প্রধান করা হয়। আবার সেই সাদ্দাম হোসেনই আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম শত্রু। তাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাকে হত্যা করা হয়। সন্ত্রাসী আক্রমণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৬৮ সালের ২৮ আগষ্ট গুয়াতেমালার রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছিল একজন অমুসলিম। ১৯৬৯ সালে জাপানের রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছিল একজন জাপানি অমুসলিম। একই বছর ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতকে অপহরণ করেছিল তাও একজন অমুসলিম।

১৯৬৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জার্মানিতে অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তারপর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে অনেক ধার্মিক মুসলিম সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতিনীতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য দাবি করতে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রধান দেশ মিসরে এ জাতীয় দাবি উত্থিত হতে থাকে। সাধারণ মুসলিম যুবক ও শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এ চেতনা ক্রমান্বয়ে স্থান লাভ করতে থাকে। পঞ্চাশের দশক থেকে মিসরের শাসকগোষ্ঠী তাদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করার পরিবর্তে তাদেরকে দমন করার পথ বেছে নেন। তাঁদের দাবি পেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়। শুধু তাই নয় নির্বিচারে অগণিত আলিম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও সাধারণ নাগরিককে কারাগারে আটক করা হয়। তারা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে ভদ্র, শালীন ও সৎ যুবক। তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের অপরাধ বা আইন অমান্যের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। একটি মাত্র অভিযোগে তাদেরকে আটক করা হয়, তা হলো তারা ইখওয়ানুল মুসলিমীন সংগঠনের সদস্য। আর ইখওয়ানের সদস্য বলে কাউকে আটক করার পর উক্ত সংগঠনের সাথে তার সম্পর্ক প্রমাণ করার কোনো দায় দায়িত্ব মিসরের পুলিশ বাহিনীকে বহন করতে হতো না।
১৯৬৮ সালের দিকে আলী মাহমূদ নামে একজন সাংবাদিক ইসলাম-পন্থী হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হন। তিনি ইসলামপন্থী হওয়া তো দূরের কথা ধর্মকর্ম যথারীতি পালনের অভ্যাসও তার ছিল না। সর্বাবস্থায় জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে তিনি কারাগারের রোজনামচা প্রকাশ করেন। এর এক স্থানে তিনি লিখেছেন: মিসরীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল হাসান তাল'আত গ্রেফতারকৃত ইসলামপন্থীদের সাথে সরাসরি আলাপের মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধনের দায়িত্ব নেন। তিনি কারাগারে আসলে ১৮/১৯ বৎসরের এক যুবক প্রশ্ন করেন, তাকে কেন বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়েছে, সে তো কোনো দলমতের সাথে কোনোভাবে জড়িত নয়? তখন লেফটেন্যান্ট সালূমা জেনারেলের কানে কিছু বলেন। তখন জেনারেল গর্জে উঠে বলেন, কেন তোমাকে মসজিদ থেকে গ্রেফতার করা হয়নি? তুমি মসজিদে ছিলে না? তাহলে কিভাবে দাবি করছ যে, তুমি কোনো দলের সদস্য নও? তখন সেখানে উপস্থিত একজন ইমাম শেখ আরিফ বলেন, বাবা, তোমাকে যদি বেশ্যালয় বা মদের আড্ডা থেকে গ্রেফতার করা হতো, তবে তোমার বাঁচার পথ থাকত। কিন্তু তোমাকে যেহেতু মসজিদে পাওয়া গিয়েছে, কাজেই তোমার দুর্ভ্যাগ্যের শেষ নেই![৮০০] এভাবে নির্বিচারে নিরীহ, ধার্মিক যুবকদেরকে গণহারে গ্রেফতার করা হয়। কারাগারের অভ্যন্তরে তারা অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয় অমানবিক অত্যাচার ও বিচারবহির্ভুত হত্যার সম্মুখীন হন। এ অত্যাচার কতিপয় যুবকের মধ্যে উগ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এরা খারিজীদের অনুরূপ সন্ত্রাসী চিন্তাচেতনাকে ইসলামী আদর্শ বলে প্রচার করতে থাকে। এদের অন্যতম ছিল মিসরের শুকরী আহমদ মুস্তফা প্রতিষ্ঠিত জামা'আতুল মুসলিমীন।[৮০১] তিনি ও তাঁর অনুসারীরা দাবি করেন যে, একমাত্র তাঁদের জিহাদী কর্মকা-ের মাধ্যমেই দীনের বিজয় সম্ভব হবে।

তারা আরো দাবি করেন যে, অত্যন্ত দ্রুতই তারা এ বিজয় অর্জনে সক্ষম হবেন। তাঁদের এসকল দাবি দাওয়া ও দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অনেক যুবককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা জামা'আতুল মুসলিমীন নামে একটি দল গঠন করেন। সাধারণ মানুষ এ দলকে জামাআতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ নামে চিনতেন। তাকফীর অর্থ কাফির বলা এবং হিজরাহ অর্থ হিজরত বা পরিত্যাগ করা। এ দলের মূলনীতি ছিল তারা ছাড়া সমাজের সকল মানুষই কাফির এবং কাফিরদের সমাজ থেকে হিজরত করে তাদের সমাজে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি মুসলিম বলে গণ্য হবে না। শুকরী ও তাঁর অনুসারীরা খারিজী মতবাদ গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এবং খারিজী মতবাদই কুরআন-হাদীস সমর্থিত একমাত্র সঠিক মতবাদ বলে দাবি করেন। খারিজীদের মতই তাদের মধ্যে ইলমের চেয়ে আবেগ ছিল বেশি। তারা

---

৮০০. মুহাম্মাদ সুরূর বিন নাইফ, আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহু ও আহলুল গুলু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২

৮০১. শুকরী আহমদ মুসতাফা ১৯৪২ সালে আসইয়ূতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে ১৯৬৫ সালে মিসরের আসয়ূত শহরের কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাকে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীনের' সদস্য হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৭ বৎসর কারাভোগের পর ১৯৭১ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার থেকে তিনি নতুন এক 'বৈপ্লবিক' চিন্তা ও তত্ত্ব নিয়ে বের হন।

খারিজীদের মতই বিভিন্ন যুক্তি ও অযুহাতে তাদের দলভুক্ত হতে আপত্তিকারী সকল মুসলিমকে কাফির-মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। বিশেষত যে সকল আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিভ্রান্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের মতবাদের ভুলগুলি প্রকাশ করতেন তাদেরকে তারা গুপ্ত হত্যা করতে শুরু করে। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে তারা মিসরের সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও গবেষক পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবীকে অপহরণ করে এবং পরে তাকে হত্যা করে।[৮০২]

এ হত্যাকাণ্ডের পরে সরকার এদেরকে গ্রেফতার করে এবং ৩০/৩/১৯৭৮ তারিখে শুকরী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। বাকিদেরকে দীর্ঘ মেয়াদি কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ অপহরণ, হত্যাকাণ্ড, বিচার ও শাস্তিপ্রদানের টাইমিংটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড. যাহাবীর অপহরণের পরে মিসরের সাথে ইসরায়েলের শান্তি আলোচনা শুরু হয় ও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। মিসরবাসীগণ এবং বিশেষত ইসলামপন্থীরা ইসরায়েলের সাথে চুক্তির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ড. যাহাবীর অপহরণের পর ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার, ধরপাকড় ও নির্যাতনের মধ্যেই এ চুক্তির আলোচনা শুরু ও শেষ হয়। এদের মৃত্যুদণ্ড ইসলামপন্থী-দেরকে মেসেজ প্রদান করে যে, কেউ শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিলে তারও এরূপ অবস্থা হবে। ১৯৭৮ সালের পরে তাদের জোরালো উপস্থিতি না থাকলেও তাদের চিন্তাচেতনা ও মতবাদগুলি পরবর্তীকালে অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। উগ্রতায় লিপ্ত সমকালীন বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে তাদের এ সকল মতবাদ একইভাবে বিদ্যমান বলে দেখা যায়। এভাবে প্রাচীন খারিজীগণের ন্যায় শুকরী মুস্তফা ও তাঁর জামা'আতুল মুসলিমীন বা জামাআতুত তাকফীর ওয়াল হিজরা-র মূল বিভ্রান্তি ছিল অতি আবেগ, দীনের বিষয়ে অতি-বাড়াবাড়ি, ধর্ম পালন ও বুঝার অহঙ্কার ও কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত বা কর্মরীতির গুরুত্ব না দেওয়া। এ থেকে তারা বহুমুখি বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে-

(১) পাপের কারণে মুমিনকে কাফির বলা। ব্যাহিক পাপ না থাকলেও তাদের মতের বিরোধী সকলকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে কাফির বলা।

(২) কুরআন বিরোধী আইনের বিদ্যমানতার কারণে উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির শাসকদেরকে কাফির বলা। এ সকল রাষ্ট্রকে কাফির ও তাগুতী রাষ্ট্র বলে গণ্য করা। এ সকল রাষ্টের নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুগতের কারণে কাফির বলা। যারা এদের কাফির না বলে তাদেরকেও কাফির বলা। একজন মুসলিমকে প্রশ্নত্তোরের মাধ্যমে মুসলিম বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুসলিম বলে স্বীকার না করা।

(৩) এ সকল রাষ্ট্র ও সমাজকে জাহিলী ও কাফির সমাজ মনে করে এগুলি থেকে হিজরত করা, বা অন্তত মানসিক হিজরত'করা, অর্থাৎ, মানসিকভাবে নিজেকে এদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা, সমাজের মসজিদগুলিতে জুমআ ও জামাআত আদায় না করা।

(৪) নিজেদের দলকে আল-জামাআত বলে দাবি করা এবং তাদের আমিরের হাতে বাইয়াত করাকে ইসলামে প্রবেশের শর্ত বলে দাবি করা।

(৫) সমাজের সকল আলিমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা ও তাদের ঘৃণা করা। সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম, ইমাম, ফকীহ ও নেককারগণকে ঘৃণা করা ও তারা কেউই ইসলাম সঠিকভাবে বুঝেন নি বা পালন করেন নি বলে দাবি করা। আলিম, ইমাম ও সালফে সালেহীনের অনুসরণ বা তাকলীদকে শিরক বলে দাবি করা। সকলের জন্য ইজতিহাদ জরুরী বলে দাবি করা।

(৬) ইসলামের ফরয ইবাদগুলির মধ্যে বড়-ছোট নির্ণয় করা। দীন প্রতিষ্ঠা অর্থ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বলে দাবি করা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করা এবং বড় ফরযের জন্য ছোট ফরয-ওয়াজিব পরিত্যাগ করাকে জায়েয বলে দাবি করা। যেমন দীনের প্রয়োজনে ফরয সালাত ত্যাগ, সিয়াম ত্যাগ, দাড়ি মুণ্ডন, মদপান, কাফির নারী বিবাহ করা ইত্যাদি।

---

[৮০২]. মুহাম্মাদ সুরূর, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৯-১১; ২৮৭-৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

(৭) ইসলামের বিধিবিধানকে পর্যায়ক্রমিক পালনীয় বলে দাবি করা। তারা দাবি করতেন যে, মিসরের তৎকালীন সময়ে তারা মক্কী যুগে অবস্থান করছেন। কাজেই ইসলামের অনেক বিধানই তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(৮) শিক্ষাগ্রহণের বিরোধিতা করা, বিশেষত তাগূতী সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ বা সনদগ্রহণকে পাপ বা কুফরী বলে গণ্য করা এবং নিরক্ষর থাকাকে ইসলাম নির্দেশিত বলে দাবি করা।

(৯) কাফিরদের বা তাদের মতের বিরোধীদের হত্যা করা বৈধ, জিহাদ ও দীন প্রতিষ্ঠার কর্ম বলে দাবি করা।[৮০৩]

তারপর ইটালির রেগব্রিগেড তারাও অনের নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। এমনকি ১৯৭৮ সালে তারা ইটালির প্রধানমন্ত্রী অ্যালডো মোর কে অপহরণ করে ৫৫ দিন পর তাকে হত্যা করে। জাপানেও এ রকম সন্ত্রাসী চক্র দল আছে। যেমন: দ্যা জাপানিজ রেড আর্মি, ওম শিরিফি ও বৌদ্ধ কান্ট প্রভৃতি। তারা একবার নার্ভ গ্যাস দিয়ে টোকিও পাতাল রেলে হাজার হাজার মানুষকে মারতে চেয়েছিল; কিন্তু ভাগ্য ভাল, তারা খুব একটা সফল হতে পারেনি। সেখানে মারা গিয়েছিল মাত্র ১২ জন। তবে নার্ভ গ্যাসের কারণে ৫ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষ এ ঘটনায় আহত হয়েছিল। এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল তারা কেউ মুসলিম নয়। তারা সবাই ছিল বৌদ্ধ। ইংল্যান্ডে ১০০ বছরেরও বেশি সময় আই.আর. এস (আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি) বিভিন্ন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে খোদ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এরা সবাই ক্যাথলিক, তবে তাদেরকে ক্যাথলিক সন্ত্রাসী বলা হয় না, যদিও তারা অনেক সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। শুধু ১৯৭২ সালেই ৩টা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় যার প্রথমটাতে ৭ জন, দ্বিতীয়টাতে ১১ জন এবং তৃতীয়টাতে মারা যায় ৯ জন। ১৯৭৪ সালে গিলফোর্ড বারে তারা আরো দুটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। যেখানে ৫ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে আর আহত হয়েছে ৪৪ জন। বার্মিংহাম বারে একই ঘটনায় ২১ জন নিহত ও ১৮২ জন আহত হয়। ১৯৭৮-৮৯ সালে ইরানে একনায়ক স্বৈরচার রেজা-শাহ পাহলভিকে উৎখাত করে ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী সরকার গঠন করা হয়। তখন হতেই ইমাম খোমেনীকে দমনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য বহুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ১৯৮০-৮৮ তে ইরাক-ইরান যুদ্ধ আমেরিকা বাঁধিয়ে দেয়, উদ্দেশ্য ইরানের ইসলামী সরকার উৎখাত, দুই ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে অস্ত্রবিক্রি করা ও মুসলিম শক্তি দুর্বল করা। পারস্য সাগরে অবস্থানকারী মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ হতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরানী যাত্রীবাহী বিমানের ২৯০ জন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়। ১৯৮১-৮৬ সময়ে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীকে হত্যার জন্য সমুদ্রে সামরিক মহড়ারত বিমান হতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে গাদ্দাফীর পালিত কন্যাসহ অসংখ্য বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে মার্কিনিরা লিবিয়ায় আগ্রাসন চালিয়ে গাদ্দাফীর সরকার কে উৎখাত করে তাঁকে হত্যা করা হয়। ১৯৮০ সালে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে হাজার হাজার কুর্দিকে হত্যা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। আজ সেই যুক্তরাষ্ট্রই পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর অভিযোগ এনে সাদ্দামকে উৎখাত করে। ১৯৮১ সালে ইসরাঈলকে দিয়ে ইরাকের পারমাণবিক চুল্লি ধ্বংস করানো হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ফ্রান্স আর স্পেনে সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম ইটিএ । তারা এ পর্যন্ত ৩৬টি আক্রমণ চালিয়েছে। আফ্রিকায়ও অনেক সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। তার মধ্যে একটা প্রধান কুখ্যাত দল হলো লর্ডস সালভেশন আর্মি। এটা একটা খ্রিস্টান সন্ত্রাসী সংগঠন। তারা বাচ্চাদেরকেও সন্ত্রাসী আক্রমণের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আর শ্রীলংকার এলটিটিই, তামিল টাইগারস (বর্তমানে বিলুপ্ত) তারা পৃথিবীর সবচেয়ে কুখ্যাত, সবচেয়ে হিংস্র সন্ত্রাসী সংগঠন ছিল। তাদের সদস্যরা আত্মঘাতী বোমার ব্যাপারেও যথেষ্ট দক্ষ। এমনকি তারা বাচ্চাদের (রেড ডেভিল)- কে কাজে লাগায়, প্রশিক্ষণ দেয়; আত্মঘাতী হামলা চালায়। সাধারণভাবে ফিলিস্তিনি ও ইরাকি আত্মঘাতী হামলাকারীর কথা শুনা যায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ দেয়, যারা আত্মঘাতী হামলাকে জনপ্রিয় করেছে তারা হলো এলটিটিই বা তামিল টাইগারস। তারা হিন্দু কিন্তু ভারতের সাংবাদিকরা তাদেরকে হিন্দু সন্ত্রাসী বলে না; বলে এলটিটিই। ভারতে বেশির ভাগ সন্ত্রাসী আক্রমণের

---

[৮০৩]. ড. হাসান হুদাইবী, দুআতুন লা কুদাত; সালিম বাহনসাবী, ***আল-হুকমু ওয়া কাদিয়্যাতু তাকফীরিল মুসলিম ও মুহাম্মাদ সুরূর ইবন নাইফ, আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহু ওয়া আহলুল গুলু;*** ড. নাসির আল-আকল, ***আল-খাওয়ারিজ,*** পৃ. ১৩২-১৪১; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলী, ***দিরাসাতুন আনিল ফিরাক,*** পৃ. ১০৮-১৪৯

ক্ষেত্রে বলা হয় কাশ্মীরি বিদ্রোহের কথা। শিখ সন্ত্রাসীদের বিন্দ্রানওয়ালা গ্রুপের কথা সকলের জানা। ভারতের সরকার ১৯৮৪ সালের ৫ জুন পাঞ্জাবে শিখদের স্বর্ণ মন্দিরে আক্রমণ করে এবং দখল করে। সেখানে ১০০ জন মানুষ মারা যায়। প্রতিশোধ হিসেবে কয়েক মাস পর ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করে তার একজন নিরাপত্তা রক্ষী, যে ছিল শিখ। কেউ যদি অমুসলিম কর্তৃক উদ্ভাবিত দক্ষিণ এশিয়া সন্ত্রাসবাদের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে, তাহলে সেখানে সন্ত্রাসী আক্রমণের তালিকা দেখা যাবে। সন্ত্রাসী আক্রমনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বা অবদান খুবই কম। তবে মিডিয়া বা গণমাধ্যম এটা যথার্থরূপে প্রকাশ করে না। ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রদেশের ত্রিপুরায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। যেমন-এটিটিএফ (অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স), এনএলএফটি (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অভ ত্রিপুরা) প্রভৃতি তারা অনেক হিন্দু হত্যা করেছে। ২০০৪ সালের ২ অক্টোবর ৪৪ জন হিন্দু মারা যায় এবং অনেকে আহত হয় তাদের আক্রমনে। আসামে আছে উলফা তারা একাই ১৯৯০-২০০৬ পর্যন্ত গত ১৬ বছর সময়ের মধ্যে ইন্ডিয়ার মাটিতে ৭৪৯টি আক্রমন চালিয়েছে। ৭৪৯ টি নিশ্চিত সন্ত্রাসী আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও খবরের কাগজে শুধু কাশ্মীরিদের আক্রমনই প্রকাশিত হয়েছে। আসামে বহু সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। উলফাদের ট্রেনিং দেয়া হয় শুধু মুসলমানদেরকে হত্যা করার জন্য। এ দেশের অন্য একটি সন্ত্রাসী দল নকশালপন্থী ও মাওবাদী।

মাওবাদিরা কমিউনিস্ট। আর ভারতে কমিউনিস্টদের যতগুলো আক্রমণ হয়েছে বেশিরভাগই করেছে মাওয়িটরা। শুধু নেপালেই গত সাত বছরে তারা ৯৯টি সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। আর ভারতে ৬০০টি জেলার মধ্যে (ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী) প্রায় ১৫০টি জেলার মাওয়িটরা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সন্ত্রাসী ঘটনার এক-তৃতীয়াংশ সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ পর্যন্ত যত গুলো আক্রমণ করেছে, কাশ্মীরের সাথে তুলনা করলে কোনো তুলনাই করা যাবে না। তারা ভারত সরকারের জন্য অনেক বড় হুমকি। ১৯৯০-৯১ সময়ে ইরাককে দিয়ে কুয়েত আক্রমণ করায়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ৩৩টি দেশের জোট গঠন করে একযোগে ইরাকের ওপর আক্রমণ করে লক্ষ লক্ষ টন বোমা ফেলে শিশু-নারী-বৃদ্ধসহ হাজার হাজার নিরীহ লোককে হত্যা করে। ইরাকের ওপর অন্যায় অবরোধ করে প্রায় ৩ লক্ষ শিশুকে হত্যা করে। ১৯৯৮ সালে সুদানে কথিত রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর অভিযোগে সুদানী ঔষধ কারখানায় ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করে কারখানাটি ধ্বংস করা হয়। ১৯৯২-৯৩ সালে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় হাজার হাজার মুসলিম মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘর বাড়ী ছাড়া করে হত্যা করা হয়। কারণ, তারা মুসলমান। ইউরোপের মাটিতে যাতে কোন মুসলিম-রাষ্ট্র গঠন করতে না পারে, সে জন্য এ নির্যাতন। এ সবই পরাশক্তির কারসাজি। ৫০ বছর পূর্ব হতে কাশ্মীরের জনগণ স্বাধীনতা চাইছে, জাতিসংঘে এই বিষয়ে প্রস্তাব পাশ হলেও গণভোটের কোন ব্যবস্থা নেই। হাজার হাজার কাশ্মীরী প্রতিদিন নির্যাতিত, নিগৃহীত হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের দ্বারা। কারণ, কাশ্মীরীরা মুসলমান। কিন্তু পূর্বতিমুর খ্রিস্টান অধ্যুষিত বলে বিশ্ব-মোড়ল আমেরিকার প্রেমের টানে তিন দিনের মধ্যে জাতিসংঘ গণভোটের ব্যবস্থা করে পূর্বতিমুরকে স্বাধীন করে দেয়। কারণ, তারা মুসলমান নয়, খ্রিস্টান।

১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল হয়েছিল ওকলাহোমা বোম্বিং। সেখানে বোমা ভর্তি একটা ট্রাফ ওকলাহোমার ফেডারেল ভবনে আঘাত করে। মারা যায় ১৬৬ জন নিরীহ মানুষ, আহত হয় আরো কয়েকশো। প্রথম দিকে পত্রিকায় লেখা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র। কিন্তু কিছুদিন পর জানা গেল কাজটা করেছিল টিমোথি ও টেরি নামে ডানপন্থী দলের সমর্থক দুই খ্রিস্টান। এরা বোমার বিস্ফোরণের জন্য দায়ী কিন্তু মিডিয়া মধ্যপ্রাচ্য ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করে। ১৯৯৬ সালে তারা লন্ডনে বোমা বিস্পোরণ ঘটায় যেখানে ২জন নিহত ও ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়। এরপর তারা বোমা ফাটায় ম্যানচেস্টার শপিং সেন্টারে, যেখানে আহত হয় ২০৬ জন। ১৯৯৮ সালে ক্যামব্রিজে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানে একটা গাড়িতে ৫০০ পাউন্ড ওজনের একটা বোমা ছিল, এ ঘটনায় আহত হয় ৩৫ জন। সেই একই বছর ৫০০ পাউন্ড ওজনের আরেকটি বোমা একটি গাড়িতে বিস্ফোরিত হয়, যেখানে ২৯ জন নিহত ও ৩৩০ জন আহত হয়েছিল। আর এ রেকর্ড বিবিসি, সিএনএন, অ্যামনেস্টির মতো অমুসলিম মিডিয়া সূত্রে প্রাপ্ত। তবে অনেক সময় সংখ্যাটা কখনো বেশি কখনো কিছুটা কম হয়ে থাকে। বিভিন্ন মাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরণের তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। যেমন একটা প্রতিবেদনে জানা যায় যে, মারা গেছে ২৯৬ জন। আবার অন্য এক তথ্যে ২৯৩ জন। তাই বলা যায় ২৯০ জনের বেশি। ২০০1 সালে আইআর বিবিসি-তে বোমা ফাটাল কিন্তু আইআরকে কখনোই ক্যাথলিক সন্ত্রাসী' বলা হয় না। আজকে ইংল্যান্ড সরকার খুব বেশি ভয় পাচ্ছে মুসলমান সন্ত্রাসীদের। এমনকি ২০০5 সালের ৭ জুলাই লন্ডনের বোমা বিস্ফোরণের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই, তা সত্ত্বেও সন্দেহ করা হচ্ছে মুসলমানরা এটা ঘটিয়েছে। সেখানে ৫০ জনের বেশি মারা গেছেন। যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া হয় মুসলমানরাই এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তারপরেও এটা আইআরএ- এর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কথা বিস্ফোরণের ধারে কাছেও না। তারা হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছে। তারপরেও ইংল্যান্ড সরকারের ভয় পায় মুসলমানদের। আইআরএ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে আছে; কিন্তু ১০০ বছরের পুরাতন আইআরএ যেন কোন সমস্যাই নয়।"

২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ঘটে গেল এক প্রকার প্রলয়ংকরী দুর্ঘটনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এর জন্য দায়ী করেন আল-কায়দাকে। তারপর দেখা গেল মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে প্রচার চালানো হল- এ দুর্ঘটনায় নায়ক হচ্ছে মুসলিম সন্ত্রাসীরা। তাদের দাবি মতো যদি মেনে নেয়া হয় এই ঘটনার হোতা আল-কায়দা। আর এর জন্যই সারাবিশ্বে মুসলিম সন্ত্রাসী বলে প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। তাহলে ইহুদি, খ্রিস্টান, ক্যাথলিক, তামিলরা যখন এর চেয়ে অধিক ভয়ংকর সন্ত্রাসী হালমা চালিয়ে গোটা বিশ্বে অশান্তির সৃষ্টি করল তখন ইহুদি, খ্রিস্টান, ক্যাথলিক, মাও, তামিল সন্ত্রাসবাদী বলে কেন প্রচারাভিযান চালানো হয়নি। যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দুর্ঘটনা ঘটল তখন জর্জ বুশ আল-কায়দার ওপর সম্পূর্ণ দোষ চাপিয়ে শান্তির দোহাই দিয়ে আফগানিস্তানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলেন তার হিংস্র মানবতাসম্পন্ন সেনাবাহিনী দিয়ে। বিশ্ববাসী তার এমন গর্হিত কাজ দেখল এবং অনেক তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ ও নিন্দা জানালো। ২০০২ সালে ভারতের গুজরাটে কাপালিক হিন্দুরা পরিকল্পিতভাবে ট্রেনে নিজেরাই আগুন লাগিয়ে মুসলমানদের ওপর দোষ চাপিয়ে প্রায় ৮০০০ নর-নারী শিশুকে দিনের বেলা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। জাতিসংঘ বা বিশ্বমোড়লরা কোন টু-শব্দটি করেনি। কারণ, নিহত ব্যক্তিরা মানুষ নয়, মুসলমান। স্বাধীন দেশ পানামার প্রেসিডেন্ট নরিয়েগাকে জলদস্যুর মত ধরে নিয়ে কারাগারে গিনিপিগের মত আবদ্ধ করে রাখা শান্তি স্থাপন সন্ত্রাস। ২০০৮ সালের মুম্বাই জঙ্গি হামলা যা সাধারণত ২৬ নভেম্বর বা ২৬/১১ নামে পরিচিত। গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে জানা যায়, পাকিস্তান থেকে জলপথে অনুপ্রবেশকারী কয়েকজন ইসলাম জঙ্গি কর্তৃক ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক শহর মুম্বাইয়ে ১০টিরও বেশি ধারাবাহিক গুলি চালনা ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা এটি। এ হামলাটি ২৬ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত একযোগে চালানো হয়। মুহূর্তেই মুম্বাইয়ের ব্যস্ততা পরিণত হয় ত্রাসে। প্রাণ হারান ১৬৬ জন নিরীহ মানুষ। সন্ত্রাস কোনো ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। সন্ত্রাসীরা কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী কারণ সব ধর্মের সন্ত্রাসী আছে। খ্রিস্টান সন্ত্রাসী আছে, ক্যাথলিক সন্ত্রাসী আছে, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ এভাবে বিভিন্ন ধর্মের সন্ত্রাসী আছে। তবে বেশির ভাগ ধর্মই নিরীহ মানুষকে হত্যা করাকে সর্বদা নিন্দা করে। যদি জরিপ করে দেখা যায়, তাহলে কোন মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছে, তারা কোন ধর্মের অনুসারী? এক নম্বরে পৃথিবীর যে লোকটা সবচেয়ে বেশি নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে তিনি কে? তিনি হিটলার। গ্যাস চেম্বারে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছে, আর পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত মানুষ মারা গেছে প্রায় ৬ কোটি মানুষ। সে মুসলমান ছিল না সে একজন খ্রিস্টান।

জোসেফ স্ট্যালিন ২ কোটি মানুষকে হত্যা করেছিল এবং তার নির্দেশে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছিল। চায়নার মাও সে তুং দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ হত্যা করেছে। তাদের কেউই মুসলমান নয় সবাই অমুসলিম। ইতিহাস সাক্ষ দেয় মুসোলীনি শুধু ইটালিতেই প্রায় ৪ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। যার নামে ফরাসি বিপ্লবের নামকরণ করা হয়েছে সেই ম্যাক্সমিলিয়ান রোবসপিয়ার তার অত্যাচারে ও নির্যাতনে মারা গেছে ২ লক্ষের বেশি মানুষ। অশোক শুধু কলিঙ্গের একটা যুদ্ধেই হত্যা করেছিল এক লক্ষেরও বেশি মানুষ। এখন প্রশ্ন হলো সে মুসলমান ছিল না সে তো ছিল হিন্দু। ইসলাম ধর্মেও বেশ কিছু কুলাঙ্গার আছে। যেমন সাদ্দাম হোসেন, সে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল, কিন্তু শুধু

ইরাকের ওপর আমেরিকা জাতিসংঘ ও জর্জ বুশের একটা নিষেধাজ্ঞার কারণে শুধু ইরাকেই একটি আঘাতে মারা গেছে ৫০ হাজার শিশু। ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তো প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। তবে হিটলারের তুলনায় বা আঙ্কেল জো, জোসেফ স্টালিন, ও মাওসেতুং-এর তুলনায় এটা কিছু না এবং তাদের প্রত্যেকের কাছেই মুসলমানদের সব হত্যাকা- একেবারে নগণ্য। কেননা তারা সবাই তাদের ধর্ম মেনে চলতো। আসলে তারা কেউই ধার্মিক বা তাদের নিজ নিজ ধর্মের প্রকৃত অনুসারী ছিল না। যদি তাই হতো তাহলে তারা কখনোই এভাবে মানুষ হত্যা করতে পারতো না। তারপরও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় মুসলমানদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে। তাদেরকে মৌলবাদী, চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী ইত্যাদি বলা হচ্ছে।

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস

ইসলামের ইতিহাসে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা যায়, যেগুলি যুদ্ধের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত শর্তগুলি পুরোপুরি পূরণ করে না। এগুলি মানবীয় দুর্বলতার ফল। ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত এগুলি অবৈধ। তবে কোনো ক্ষেত্রেই যুদ্ধের ময়দানের বাইরে গুপ্ত হত্যা, নির্বিচার হত্যা, বোমা হামলা, আত্মঘাতী বোমা হামলা ইত্যাদিতে উপর্যুক্ত কয়েকটি বিভ্রান্ত দল ছাড়া কেউ জড়িত হননি। পরবর্তীকালের দুটি জিহাদ লোকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে-

(১) ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে (১৮১৮-১৮৩১খ্রি.) ভারতে ব্রিটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর জিহাদ ও

(২) আফগান জিহাদ।

প্রথমত : সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী জিহাদের শর্তগুলি পূরণ করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের শর্ত পূরণ করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশদেরকে আক্রমণকারী ও দখলদার বাহিনী হিসেবে গণ্য করে জিহাদের বৈধতা প্রমাণ করেন।

দ্বিতীয়ত : আফগান জিহাদও শুরু হয়েছিল প্রায় একইভাবে। সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ ও জবরদখলের মুখে আফগান জনগণ আলিমদের নেতৃত্বে জিহাদ শুরু করেছিলেন। সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বে এ জিহাদ বৈধ জিহাদ বলেই মনে করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম যুবক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। সোভিয়েট বাহিনীর পরাজয়ের পরে এ জিহাদ আন্তঃদলীয় ও আন্তঃগোত্রীয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন যুদ্ধে অভ্যস্ত আফগান জনগণ অস্ত্রের ভাষাতেই কথা বললেন স্বদেশীয় ও স্বধর্মীয় বিরোধীদের সাথে। প্রত্যেকেই নিজের কাজকে জিহাদ এবং প্রতিপক্ষকে ইসলামের শত্রু বলে দাবি করলেন। বাইরে থেকে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ স্বভাবতই কোনো না কোনো আফগান পক্ষে থেকে একই কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অনেকে আফগান ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এসব যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের অনেকের জন্য অস্ত্রের ভাষা পরিত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশই জিহাদের শর্তের চেয়ে জিহাদের ফযীলতের বিষয়েই বেশি জানতেন ও ভাবতেন। তারা নিজ দেশেও জিহাদী পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করেন।

আর বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের গোডপ্রিত্তন হয়েছিল আফগান ফেরত মুজাহিদদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র গোষ্ঠীর কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে জঙ্গিদের তৎপরতার সময়টাকে মোটা দাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে আশির দশকের মধ্যভাগে জন্ম নেওয়া মুসলিম মিল্লাত বাহিনী ও শেষ দিকে জন্ম নেওয়া হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশকে (হুজি-বি) এ দেশে প্রথম প্রজন্মের জঙ্গি সংগঠন বলা যায়। এর এক দশক পর জন্ম নেয় জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), যার লক্ষ ছিল দেশে শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করা। জেএমবির জন্মের ঠিক এক দশক পর উত্থান ঘটে বর্তমানে সক্রিয় দুই জঙ্গিগোষ্ঠীর। এর একটি ব্লগার হত্যার ঘটনায় জড়িত আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বা আনসার আল ইসলাম। তারা আল কায়েদার অনুসারী। অপর গোষ্ঠীকে পুলিশ বলছে নব্য জেএমবি। তবে তারা নিজেদের ইসলামিক স্টেট বা আইএস বলে দাবি করে। এই দুই গোষ্ঠীতেই মাদরাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত

পরিবারের সন্তানেরাও যুক্ত হয়েছেন, যার একটি রূপ দেখা গেছে গুলশানে।[৮০৪] আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশি মুজাহিদদের প্রত্যাবর্তনের আগে ১৯৮৬ সালে মুসলিম মিল্লাত বাহিনী গঠন করেন চাকরিচ্যুত সেনা কর্মকর্তা মতিউর রহমান। তিনি মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে এসে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার শিমুলিয়ায় নিজ গ্রামে আস্তানা গড়ে তোলেন। পাকুন্দিয়ার ওই আস্তানায় সদস্যদের থাকার জন্য ১৩১টি ঘর ও বেশ কিছু তাঁবু এবং ৬১টি পরিখা (বাংকার) তৈরি করা হয়েছিল। ছিল নিজস্ব জেনারেটরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। একটা মাদরাসাও করা হয়েছিল সেখানে। নাম শিমুলিয়া ফরজে আইন মাদরাসা। তার ফরজে কেফায়া বিভাগে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৯৮৯ সালের ১২ ডিসেম্বরে পুলিশ পীর মেজর (অব.) মতিউর রহমানের আস্তানায় অভিযান চালাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ হয়। আড়াই দিন ধরে চলে ওই বন্দুকযুদ্ধ। এতে পুলিশের দুই সদস্যসহ ২১ জন নিহত হন। আহত হন ২০ জন। ১৯৮৯ সালে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি-বি) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যশোরের মনিরামপুরের মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী।

এই সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গড়া সংগঠন হুজি-বিকে এ দেশে জঙ্গি তৎপরতার গোড়াপত্তনকারী বলে মনে করা হয়। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছিল হুজি-বির উত্থান ও বিস্তারপর্ব। হুজি-বির সমসাময়িক সময়ে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকায় সংগঠিত ও সক্রিয় হয় রোহিঙ্গাদের দুই সশস্ত্র সংগঠন আরএসও[৮০৫] ও এআরএনও।[৮০৬] হুজি-বি ও রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরা ছিল একে অন্যের সহযোগী। তারা ৬ বছরে ১৩টি জঙ্গি হামলা পরিচালনা করে। সংগঠনটি প্রথম নাশকতামূলক বোমা হামলা করে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে। তৎকালীন সরকারের আমলে ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ ওই হামলায় ১০ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। ৮ অক্টোবর খুলনায় আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলায় আটজন নিহত হন। তারপর ২০০০ সালের ২০ জুলাই গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভাস্থলের কাছে ও হেলিপ্যাডে বোমা পোতে রাখা হয়। এরপর ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে রমনার বটমূলে, ৩ জুন গোপালগঞ্জের বানিয়ারচরে গির্জায়, ১৬ জুন নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বোমা হামলা হয়। তৎকালীন জোট সরকার আমলে ২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি হবিগঞ্জে সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়াকে হত্যা করা পর্যন্ত হুজি-বি ৬ বছরে দেশে ১৩টি বোমা ও গ্রেনেড হামলা চালায়। এতে মোট ১০৯ জন নিহত হন। আহত হন ৭০০ জনের বেশি মানুষ। অনেকে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যান। এর মধ্যে হুজি-বির জঙ্গিরা সবচেয়ে বড় ভয়াবহ হামলা চালায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকায় তখনকার বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার জনসভায়। ওই গ্রেনেড হামলায় ২২ জন নিহত হন। আহত হন শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কয়েক শ নেতা-কর্মী। এ ২০০৪ সালের ২১ মে সিলেটে হজরত শাহজালালের (রহ.) মাজারে তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। হরকাতুল জিহাদের (হুজি-বি) জন্মের এক দশক পর ১৯৯৮ সালে জন্ম নেয় জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই জঙ্গি সংগঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সালাফি মতাদর্শী উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। জেএমবি সাড়ে চার বছরে (সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ডিসেম্বর ২০০৫) দেশে ২৬টি হামলা চালায়। এসব ঘটনায় ৭৩ জন নিহত এবং প্রায় ৮০০ জন আহত হন। একই সময়কালে হরকাতুল জিহাদও (হুজি-বি) বেশ কয়েকটি নাশকতামূলক হামলা চালায়। সব মিলিয়ে তখন দেশে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। জেএমবির লক্ষ ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। তারা ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে ৫০০ বোমা ফাটিয়ে প্রচারপত্রে বলেছিল, তারা এ দেশে আল্লাহর আইন বা শরিয়া আইন বাস্তবায়ন করতে চায়। ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে জেএমবি প্রতিষ্ঠা করেন আবদুর রহমান। জেএমবি প্রতিষ্ঠা করে নিজেই আমির হন শায়খ আব্দুর রহমান। ঢাকার খিলগাঁওয়ে একটি ভাড়া বাসায় বসে প্রথম শূরা কমিটি হয়। তবে বাস্তবে জেএমবির প্রথম নাশকতার শুরু ২০০১ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরার রক্সি সিনেমা হল ও সার্কাস মাঠে

---

[৮০৪]. দৈনিক প্রথম আলো, ***বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস***, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬

[৮০৫]. রাহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন

[৮০৬]. আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন

বোমা হামলা চালায় তারা। এতে ৩ জন নিহত ও প্রায় ১০০ জন আহত হন। এরপর ২০০২ সালের ১ মে নাটোরের গুরুদাসপুরে কিরণ সিনেমা হলে ও ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে চারটি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্টের আগ পর্যন্ত ১৮টি ঘটনা ঘটায় তারা। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এসে জেএমবি উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি শুরু করে। ২০০৫ সালে একযোগে ৬৩ জেলায় বোমা হামলা চালায়। তাদের সূরা সদস্য সালাহউদ্দিনকে ২০১৪ সালে ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রিজনভ্যানে হামলা করে ছিনিয়ে নেয় জঙ্গিরা।[৮০৭] তৎকালীন সরকার ২০০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জেএমবি ও জেএমজেবিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৮০৮] শুরুটা গত শতকের আশির দশকে। আফগানিস্তানের যুদ্ধে যায় প্রায় তিন হাজার বাংলাদেশি। তারা সেখানে প্রশিক্ষিত হয়। তাদের থেকে অন্তত আড়াই হাজার দেশে ফিরে আসে। এদের থেকেই করা হয় হরকাতুল জিহাদের মতো জঙ্গি সংগঠন। আরও নানা ব্যানারে নব্বই দশক থেকে শরু করে গত দশকজুড়ে তারা নানা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে দেশজুড়ে।[৮০৯]

তারপর ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সদস্য ফিদায়ি (আত্মঘাতী) হতে উদ্বুদ্ধ হয়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে জেএমবি ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, গাজীপুর ও নেত্রকোনায় পাঁচটি আত্মঘাতী হামলা চালায়। ওগুলোই ছিল দেশে জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রথম আত্মঘাতী হামলা। জেএমবি সাড়ে ৪ বছরে ২৬টি হামলায় ৭৩ জনকে হত্যা করে। এসব ঘটনায় আহত হন প্রায় ৮০০ মানুষ।[৮১০] শায়খ আবদুর রহমান এর সঙ্গে পাকিস্তানের লস্কর-ই-তাইয়েবার বাইরে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আল মুহাজেরুন নামের একটি জিহাদি সংগঠনের যোগাযোগ ছিল। এর প্রধান সিরীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক শায়খ ওমর বাক্রি। জেএমবির উৎখতের পরপরই সক্রিয় হয় আল-কায়েদার অনুসারী আরেক সংগঠন আনসার আল ইসলাম। ২০১৩ সালে ব্লগার রাজীব হায়দার হত্যার মধ্য দিয়ে এরা আলোচনায় আসে। আর ভঙ্গুর জেএমবির গর্ভ থেকে জন্ম নেয় আরেকটি জঙ্গিগোষ্ঠী। এরাই এখন নিজেদের আইএস দাবি করে দেশে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। সাত বছর বিরতির পর আবার হামলা ও হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে দেশে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে দু'টি জঙ্গিগোষ্ঠী। আগের দু'টি সংগঠনের ভেতর থেকে জন্ম নেওয়া এ দুই সংগঠন গত সাড়ে তিন বছরে ৬২টি হামলায় জড়িত ছিল। এ সব ঘটনায় নিহত হয়েছে ৯৪ জন। এর মধ্যে সর্বশেষ গুলশানে হামলার মধ্য দিয়ে চরম নৃশংসতা নিয়ে হাজির হয়েছে আইএস মতাদর্শ অনুসরণকারী গোষ্ঠীটি। এ হামলার পর বাংলাদেশের নাম সন্ত্রাসবাদী হামলার বৈশ্বিক মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে মাঠে নামা দুই জঙ্গি সংগঠনের একটি হলো আল-কায়েদার অনুসারী আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (বর্তমান নাম আনসার আল ইসলাম) এবং অপরটি সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী নব্য জেএমবি, যারা নিজেদের আইএস দাবি করে। লক্ষবস্তু বা টার্গেট এখন পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন হলেও দুটি সংগঠনই সালাফি বা আহলে হাদিস মতাদর্শী। দুই গোষ্ঠীরই সদস্যদের বড় অংশ তরুণ এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড় করা সচ্ছল পরিবারের সদস্য। এ দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র গোষ্ঠীর তৎপরতা শুরু হয়েছে অন্তত দেড় দশক আগে। আর এর শুরুটা করেছে ধর্মভিত্তিক আরেক সংগঠন বর্তমানে নিষিদ্ধ হিযবুত তাহ্রীর। এর পরপর যুক্ত হয় জামাআতুল মুসলেমিন নামে আরেক সালাফিবাদী সংগঠন, যার গর্ভ থেকে জন্ম নেয় আনসারুল্লাহ বাংলা টিম।[৮১১] খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ নিয়ে বিভিন্ন দেশে সক্রিয় আন্তর্জাতিক সংগঠন হিযবুত তাহ্রীর বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করে ২০০১ সালে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়া কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে যুক্তরাজ্য থেকে হিযবুত তাহ্রীর মতাদর্শ এ দেশে আসে। ২০০৩ সাল থেকে হিযবুত তাহরীরের কার্যক্রম দৃশ্যমান হতে শুরু করে। ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা ভঙ্গ করে ঢাকায় মিছিল-সমাবেশ করে সংগঠনটি প্রথম দেশের গণমাধ্যমের দৃষ্টি কাড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন

৮০৭. দৈনিক প্রথম আলো, *বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস*, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬

৮০৮. দৈনিক প্রথম আলো, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৫

৮০৯. https://www.dw.com/bn, জঙ্গিবাদের শেকড় কোথায়? ২৩ আগস্ট ২০১৯

৮১০. দৈনিক প্রথম আলো, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৯

৮১১. দৈনিক প্রথম আলো, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৬

ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) কয়েকজন শিক্ষকের নেতৃত্বে দেশে হিযবুত তাহ্‌রীরের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সংগঠনটি ঢাকার বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্তার লাভ করে। এর মধ্যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। হিযবুত তাহ্‌রীর মনে করে, গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ। তাই গণতন্ত্র অবশ্য পরিত্যাজ্য। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংগঠনটির পোস্টার, পুস্তিকা, প্রচারপত্রেও একই রকম কথা বলা হয়। সরকার ২০০৯ সালের ২২ অক্টোবর জননিরাপত্তার স্বার্থে হিযবুত তাহ্‌রীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর সংগঠনটির বেশ কিছু সদস্য গ্রেপ্তার হন। হিযবুত তাহ্‌রীরের অনেকটা কাছাকাছি সময়ে জামাআতুল মুসলেমিন নামে আরেক কট্টরপন্থী সংগঠন গোপন সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতো। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. আবদুর রশিদ চৌধুরী। সংগঠনটি আল-কায়েদার আরব উপদ্বীপের নেতা ইয়েমেনের আনওয়ার আওলাকির অনুসারী। এ সংগঠনটিও ইংরেজি মাধ্যমে পড়া এবং সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের লক্ষবস্তু করে সদস্য সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করে। তবে গ্রামের, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের সন্তান এবং মাদরাসায় লেখাপড়া করেছে এমন সদস্যও এই দলে ছিল। বর্তমানে সংগঠনটির কার্যক্রম একবারে নেই।

জামাআতুল মুসলেমিন থেকেই ২০০৭ সালের শেষ দিকে বা ২০০৮ সালের শুরুতে জন্ম নেয় আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বা আনসার আল ইসলাম। জন্মসূত্রে সংগঠনটি সালাফি মতাদর্শী এবং আল-কায়েদার নেতা আনওয়ার আওলাকির অনুসারী। আনসারুল্লাহর সদস্যদের বেশির ভাগই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, বিত্তবানের সন্তানও রয়েছে। তবে অল্প শিক্ষিত ও মাদরাসা পড়ুয়াও রয়েছে, যারা সংখ্যায় কম। শুরুতে তাদের ইন্টারনেটকেন্দ্রিক তৎপরতা ও প্রচারণা ছিল ব্যাপক। ইউটিউবে থাকা আনসারুল্লাহর প্রধান তাত্ত্বিক নেতা মুফতি জসিমউদ্দিন রাহমানীর বিভিন্ন বক্তৃতা ও খুতবা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এ সংগঠনটির সুদূরপ্রসারী লক্ষ সশস্ত্র লড়াই। তবে তার আগে সদস্য সংগ্রহ ও আর্থিক সামর্থ্য অর্জনকে জরুরি মনে করে তারা। জসিম উদ্দিন রাহমানী সর্বশেষ রাজধানীর বসিলায় একটি মসজিদের খতিব ছিলেন। ২০১৩ সালে ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দারকে হত্যার পর এই সংগঠনের কথা প্রথম জানাজানি হয়। ওই ঘটনায় সরাসরি জড়িত সবাই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই মামলার বিচার শেষে রায়ে দুজনের ফাঁসি এবং মুফতি জসিম উদ্দিন রাহমানীসহ বাকি পাঁচজনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। গণজাগরণ মঞ্চ সৃষ্টির পর থেকেই 'নাস্তিক, ধর্মের অবমাননাকারী ব্লগার'দের হত্যার বিষয়ে আনসারুল্লাহর প্রধান জসিমউদ্দীন রাহমানী ফতোয়া দিচ্ছিলেন এবং খুতবায় বয়ান করে আসছিলেন। এসব তাঁরা তাঁদের ওয়েব পেজে প্রচারও করেছেন। ২০১৩ সালে রাজীব হত্যার পর দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ২০১৫ সালে আবার হত্যাকা- শুরু করে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। তার আগে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে আল-কায়েদার নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরি এক ভিডিও বার্তার মধ্য দিয়ে আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখা (একিউআইএস) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এর পরপরই বাংলাদেশের আনসারুল্লাহ একিউআইএসের অধিভুক্ত হয় বলে তখন ঢাকায় জঙ্গিবাদ দমনে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ একাধিক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে বলেছিলেন। এরপর আনসারুল্লাহ নাম পাল্টিয়ে আনসার আল ইসলাম নাম ধারণ করে এবং নিজেদের একিউআইএসের বাংলাদেশ শাখা দাবি করে। আনসারুল্লাহ বা আনসার আল ইসলাম এ পর্যন্ত ১৩ জনকে হত্যার দায় স্বীকার করেছে। তাদের বেশির ভাগই ব্লগার। এর বাইরে রয়েছেন প্রকাশক, শিক্ষক ও সমকামীদের অধিকারকর্মী। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত ও পলাতক মেজর জিয়াউল হককে আনসারুল্লাহর সামরিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে গোয়েন্দা সংস্থার বরাতে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে খবর বের হয়। এই জিয়াকে ধরিয়ে দিতে ২০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল পুলিশ।

আনসারুল্লাহর কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মেজর জিয়া দায়িত্ব নেওয়ার পর সংগঠনটির হত্যাযজ্ঞের সংখ্যা বেশ বেড়ে যায়। তাঁরা মূলত চাপাতি ব্যবহার করলেও শেষ দিকে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও করেছেন । এখন পর্যন্ত নাশকতা বা বিস্ফোরক ব্যবহার না করলেও তিনটি আস্তানা থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধারের দাবি করেছে পুলিশ। তাদের আস্তানায় তখন

Dhaka University Institutional Repository

গাড়িবোমা তৈরির আলামত মিলেছিল বলেও পরে খবর বের হয়।[৮১২] নব্য জেএমবি দেশে ভিন্ন মাত্রার সন্ত্রাসবাদী হামলা ও সিরিয়া-ইরাকভিত্তিক আইএসের নামে দায় স্বীকার করে ব্যাপক আলোচনায় আসে এই জঙ্গিগোষ্ঠীটি। তবে সরকার ও পুলিশ বলছে, তারা নব্য জেএমবি। পুরোনো জেএমবির একটি অংশ বেরিয়ে এসে নতুন নেতৃত্বে সক্রিয় হয়েছে। নব্য জেএমবির সদস্যদের একটা বড় অংশ আধুনিক, বিত্তবান পরিবারের সন্তান, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারাই এ দেশে প্রথম শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করেছে। এ ছাড়া একের পর এক পুরোহিত, সেবায়েত, বৌদ্ধভিক্ষু, খ্রিষ্টানধর্মের মানুষ ও বিদেশি নাগরিককে হত্যা করেছে। এসব হত্যার পর নিহতদের ক্রুসেডার আখ্যা দিয়ে আইএসের নামে দায় স্বীকার করা হয়। প্রথম প্রকাশ সম্ভবত ২০১৩ সালের ৮ আগস্ট খুলনার খালিশপুরে উম্মুল মোমেনিন দাবিদার কথিত ধর্মীয় নেতা তৈয়বুর রহমান ও তাঁর কিশোর ছেলেকে জবাই করে হত্যার মধ্য দিয়ে। এর চার মাস পর ২১ ডিসেম্বর ঢাকার গোপীবাগে ইমাম মাহদীর প্রধান সেনাপতি দাবিদার লুৎফর রহমানসহ ছয়জনকে একই কায়দায় হত্যা করা হয়। এরপর ২১ এপ্রিল আশুলিয়ায় ব্যাংক ডাকাতির আগ পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর হত্যাযজ্ঞের খবর পাওয়া যায় না। ২০১৪ সালে একটি বহুজাতিক কোম্পানির আইটি শাখার প্রধান আমিনুল বেগ এবং একাধিক সামরিক-বেসামরিক পদস্থ কর্মকর্তার ছেলে ও লন্ডনপ্রবাসী গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গুলশানে হামলায় নিহত এবং পরে কল্যাণপুরে পুলিশের অভিযানে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা তিন বছর ধরে এ জঙ্গি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছে। সেপ্টেম্বরে ঢাকায় ইতালির নাগরিক সিজার তাবেলা এবং ৩ অক্টোবর রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোশিকে হত্যার পর আইএস দায় স্বীকার করে। এই গোষ্ঠী সারা দেশে ১০ মাসে ৪২টি হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। এর মধ্যে ২৮টি ঘটনায় আইএস দায় স্বীকার করেছে। সর্বশেষ দায় স্বীকার করে গত ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলার। কেবল তা-ই নয়, ১২ ঘণ্টার জিম্মি সংকট চলাকালে ভেতরের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কয়েক দফা আপডেট ও নিহত ব্যক্তিদের ছবি প্রকাশ করেছে এই গোষ্ঠী।

বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ

ইসলাম বিরোধী সকল প্রচারণার মূল দাবি যে, ইসলামই ধর্মের নামে যুদ্ধ বৈধ করেছে। বিশেষত খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ খ্রিস্টধর্মকে ভালবাসা ও মানবতার ধর্ম ও ইসলামকে যুদ্ধ, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের ধর্ম বলে চিত্রিত করেন। ইউরোপে মুহাম্মদ (সা.) কে সন্ত্রাসী রূপে চিত্রিত করে কার্টুন ছাপা হচ্ছে এবং কুরআন-কে সন্ত্রাসী গ্রন্থ বলে দাবি করে তা নিষিদ্ধ করতে দাবি জানানো হচ্ছে। ক্যাথলিক খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ ১৬শ বেনিডিক্ট (Benedict XVI) ২০০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জার্মানির রিগেনসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনায় বাইজানটাইন সম্রাট ম্যানুয়েল-২ এর ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষমূলক নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, "Show me just what Mhuammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached." "তুমি আমাকে দেখাও তো, মুহাম্মদ (সা.)) নতুন কি এনেছেন? তরবারীর মাধ্যমে তার ধর্ম প্রচার করার নির্দেশের মত অমানবিক ও অশুভ বিষয় ছাড়া আর কিছুই তুমি পাবে না।" এখানে জিহাদ পরিভাষার অপব্যবহার করা হয়েছে। জিহাদের বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশাবলি পর্যালোচনা করলে সত্যটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, ইহূদী-খ্রিস্টানগণের মধ্যে প্রচলিত বাইবেলের ভার্সনগুলির মধ্যে ব্যাপক বৈপরীত্য ও অমিল রয়েছে। ইহূদী বাইবেলের সাথে খ্রিস্টান বাইবেলের অমিল রয়েছে। তেমনি ক্যাথলিক খ্রিস্টানগণের বাইবেলের সাথে প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানগণের বাইবেলের অমিল রয়েছে। সর্বাবস্থায় মুসলিমগণ বিশ্বাস করে যে, প্রচলিত বাইবেল কখনোই আল্লাহর কিতাব নয়। এর মধ্যে তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ইত্যাদি আসমানী গ্রন্থের কিছু অংশ থাকলেও তা পুরোহিতদের সংযোজন, বিয়োজন ও বিকৃতির সাথে সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। যে সকল অমানবিক ও অশুভ বিষয় রয়েছে তা সবই এরূপ বিকৃত তথ্য।[৮১৩] তবে ইহূদী ও খ্রিস্টানগণ প্রচলিত এ বাইবেলকেই তাদের ধর্মগ্রন্থ ও আসমানী গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করেন।

---

৮১২ . দৈনিক প্রথম আলো, *বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস*, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬

৮১৩ . আল্লামা রাহমাতুল্লাহ, **ইযহারুল হক্ক,** ইফাবা, ঢাকা

ইহুদীগণ শুধু পুরাতন নিয়মকেই ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন। আর খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রচলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও কথাই আল্লাহর বাণী।[৮১৪] উপরন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের বাণী বা বিধান কখনো রহিত হতে পারে না। কাজেই বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রতিটি বাণী ও বিধান কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পালনীয় অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ।[৮১৫] বাইবেল থেকে জানা যায় যে, জিহাদ বা যুদ্ধের জন্যই যীশুখ্রিস্ট আগমন করেছিলেন। তিনি বলেন: Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword "মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।"[৮১৬] উপরন্তু যীশুখ্রিস্ট তার রাজত্বের বিরোধীদেরকে তাঁর সামনে জবাই করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me". "পরন্তু আমার এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব করি, তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষাতে বধ কর।"[৮১৭] বাইবেলে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, নেককার সাধু-সন্তদের মূল কাজ হলো আল্লাহর প্রশংসা করা এবং সর্বদা দু-ধারি তরবারী সাথে নিয়ে কাফির-বিধর্মীদের কতল করা ও শাস্তি দেওয়া। আর এভাবে কাফির-বিধর্মীদের হত্যা, বন্দী ও বিচার করাই সাধুদের মূল কর্ম ও মর্যাদা-

"Let the saints be joyful in glory... Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand; To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people; To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron; To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints."সাধুগণ গৌরবে উল্লাসিত হউক। ... তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা, তাহাদের হস্তে দ্বি-ধার খড়্গ থাকুক; যেন তারা বিধর্মী-কাফিরদের[৮১৮] প্রতিফল দেয়, লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়; যেন তাহাদের রাজাগণকে, তাহাদের মান্যগণ্য লোকদিগকে লৌহ-নিগড়ে বদ্ধ করে; যেন তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত বিচার নিষ্পন্ন করে; ইহাই সমস্ত সাধুর মর্যাদা।"[৮১৯] বাইবেলের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে নারী, শিশু ও নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যার ঢালাও অনুমোদন বুঝা যায়। যেমন বলা হয়েছে, "Kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves." "অতএব তোমরা বালক-বালিকাদের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং শয়নে পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ কর; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহাদিগকে আপনাদের জন্য জীবিত রাখ।"[৮২০] অন্যত্র বলা হয়েছে, "And when the LORD the God hath delivered it tnto thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the swore; but the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat the spoil of thine enemies, which the LORD thy God hath given thee. Thus shalt thou do unto all the cities which are very far from thee, which are not of the cities of these nations. But of the cities of these which the LORD thy God doth give thee for an inheritance, thou shalt save alive nothing that breatheth; but thou shalt utterly destroy them." "পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে খড়্গধারে আঘাত করিবে, কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও পশুগণ প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব সমস্ত লুটদ্রব্য

---

[৮১৪]. Ahmed Deedat, *The Choice* (Jeddah, Abul Qasim Publications, 1st print, 1994), Vol-2, p73-74.

[৮১৫]. Carl Gottaleb Pfander, *Balance of Truth* (The Mizanul Haqq), part-1 (The Good Way, Rikon, Switzerland), p 17.

[৮১৬]. বাইবেল, মথি ১০/৩৪

[৮১৭]. লুক ১৯/২৭

[৮১৮]. এখানে ইংরেজীতে (heathen) বলা হয়েছে, যার অর্থ বিধর্মী বা কাফির। এভাবে এখানে কাফির হত্যার ঢালাও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলা অনুবাদে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করার জন্য যবধঃযবহ অর্থ "জাতিগণকে" লেখা হয়েছে

[৮১৯]. গীতসংহিতা ১৪৯/৫-৯

[৮২০]. গণনা পুস্তক ৩১/১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

আপনার জন্য লুট-স্বরূপে গ্রহণ করিবে, আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত শত্রুদের লুট ভোগ করিবে। এই নিকটবর্তী জাতিদের নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমা হইতে অতি দূরে আছে, তাহাদেরই প্রতি এইরূপ করিবে। কিন্তু এই জাতিদের যে সকল নগর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিবেন, সেই সকলের মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও জীবিত রাখিবে না।"[৮২১] এরূপ অনেক নির্দেশ রয়েছে যা বাহ্যত অমানবিক ও গণহত্যার নির্দেশ বলে মনে হবে। যুদ্ধের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্র থাকলেই যুদ্ধের সম্ভাবনা স্বীকার করতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য নিয়ম, আইন ও বিধান রাখতে হবে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্র বা নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে অনেক সময় রাষ্ট্রকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। কিন্তু সকল শান্তিকামী মানুষই চেষ্টা করেন যুদ্ধকে যথাসম্ভব কম ধ্বংসাত্মক করতে এবং অযোদ্ধ মানুষদেরকে হত্যা না করতে। অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা বর্তমানে যুদ্ধ অপরাধ বলে গণ্য। অথচ বাইবেলে এরূপই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু অযোদ্ধা মানুষই নয়, উপরন্তু গরু, ছাগল, উট, ভেড়া ইত্যাদি অবলা প্রাণীও নির্বিচারে হত্যা করে নি-হ্ন করতে নির্দেশ দিয়েছে বাইবেল। বিধর্মী বা অন্য দেবতার উপাসকদের হত্যা করার ঢালাও নির্দেশ দিয়ে বাইবেলে বলা হয়েছেঃ "He that sacrificeth unto any god, save unto the LORD only, he shall be utterly destroyed" "যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন দেবতার কাছে বলিদান করে, সে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।"[৮২২] ঈশ্বরের নির্দেশের সামান্য বিরোধিতা করলেই মৃত্যুদ-- "Thou shalt not suffer a witch to live. Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death". "তুমি মায়াবিনীকে জীবিত রাখিও না। পশুর সহিত শৃঙ্গারকারী ব্যক্তির প্রাণদ- অবশ্য হইবে।"[৮২৩] বিধর্মীদের ধর্মালয় ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে- "Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works: but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images." "But ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves". "তুমি তাহাদের দেবগণের কাছে প্রাণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না ও তাহাদের ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিও না; কিন্তু তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিও, এবং তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিও।"[৮২৪] "কিন্তু তোমরা তাহাদের বেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করিবে, ও তথাকার আশেরা-মূর্তি সকল কাটিয়া ফেলিবে।"[৮২৫]

বাইবেল থেকে জানা যায় যে, নির্বিচার গণহত্যার উপর্যুক্ত নির্দেশাবলি সুন্দরভাবে পালন করেছেন বাইবেলীয় ভাববাদীগণ। মুসলিমগণ কখনোই বিশ্বাস করে না যে, কোনো ভাববাদী (নবী) এরূপ গণহত্যা করতে পারেন। তবে বাইবেল তাদের বিষয়ে এরূপই লিখেছে এবং ইহূদী-খ্রিস্টানগণ এরূপই বিশ্বাস করেন। বস্তুত, লক্ষ-লক্ষ মানব সন্তানকে নির্বিচারের হত্যার অগণিত কাহিনীর সমন্বয় বাইবেল। পবিত্র ভাববাদীগণ, মহাযাজকগণ বা বিচারকর্তৃগণ কিভাবে যুদ্ধ, ছলচাতুরি বা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছেন তার অগণিত বিবরণ বাইবেলে রয়েছে। অযোদ্ধা ও যুদ্ধবন্দী নারী, পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে ও গণহারে হত্যার বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এছাড়া নিরীহ যুদ্ধবন্দীদের কত বেশি কষ্ট দিয়ে হত্যা করা যায় সে বিষয়েও তাদের আগ্রহ লক্ষণীয়। লোহার মইয়ের নিচে রেখে, লোহার কুড়ালির নিচে রেখে এবং ইটের পাঁজার মধ্যে ঢুকিয়ে বা অনুরূপভাবে বর্ণনাতীত যন্ত্রণা দিয়ে নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যার কাহিনী বাইবেলে প্রচুর। এরূপ কর্মের জন্য ভাববাদিগণকে বাইবেলে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে।

যদি কেউ কষ্ট করে বাইবেলে যিহোশূয়ের পুস্তক (Joshua), বিচারকর্তৃগণের বিবরণ (Judges), শমুয়েলের পুস্তক (Samuel), রাজাবলি (The Kings), বংশাবলি (The Chronicles) ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করলে বর্বর গণহত্যা, কল্পনাতীত নিপীড়ন, উন্মাদ ধ্বংসযজ্ঞের লোমহর্ষক ঘটনাবলি দেখতে পাবে। এগুলি পাঠ করলে একজন সাধারণ পাঠক অনুভব করবেন যে, বাইবেলের নির্দেশ অনুসাসের যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য নয়,

[৮২১]. দ্বিতীয় বিবরণ ২০/১৩-১৬
[৮২২]. যাত্রাপুস্তক ২২/২০
[৮২৩]. যাত্রাপুস্তক ২২/১৮-১৯
[৮২৪]. যাত্রাপুস্তক ২৩/২৩-২৪
[৮২৫]. যাত্রাপুস্তক ৩৪/১২-১৩

এমনকি অন্যের দেশ দখলের জন্যও যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ মূলত হত্যা ও ধ্বংসের মাধ্যমে আনন্দলাভের জন্য। বাইবেলের নতুন নিয়মেও এ সকল কর্মের জন্য ভাববাদীগণকে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে।[৮২৬] মুসলিমরা বলছে যে, রাষ্ট্র থাকলেই যুদ্ধের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে যুদ্ধকে যথাসম্ভব কম ধ্বংসাত্মক করতে হবে এবং সকল অযোদ্ধা মানুষ, দ্রব্য ও বস্তুকে যুদ্ধের আওতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। ইসলামে এ কাজটিই সর্বোত্তমভাবে করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে যেমন, তেমনি প্রায়োগিকভাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং তার সারাজীবনের সকল যুদ্ধে মুসলিম ও কাফির মিলে সর্বমোট প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। যে দেশে প্রতি মাসেই শতশত মানুষ মারামারি করে খুন হতো, সে দেশে মাত্র সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে সকল আগ্রাসন রোধ করে তিনি বিশ্বব্যাপী চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

পক্ষান্তরে বাইবেলের একেক যুদ্ধেই হাজার হাজার কাফির হত্যার গৌরবময় বিবরণ লেখা হয়েছে। মহাভারত, গীতা বা রামায়ণের যুদ্ধেরও কাছাকাছি অবস্থা। সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় যে, বাইবেলে যুদ্ধ, হত্যা ও প্রতিশোধের ক্ষেত্রে কোনোরূপ নীতি নৈতিকার প্রতি লক্ষ রাখা হয় নি। ইসলামে যুদ্ধের জন্য গোপনীয়তা ও শত্রুপক্ষকে বোকা বানানোর জন্য কৌশল অবলম্বন বৈধ করেছে। কিন্তু চুক্তিভঙ্গ করা, প্রবঞ্চনা করা, নিরস্ত্রকে আক্রমণ করা, অযোদ্ধা লক্ষবস্তুতে আঘাত করা, আহতদের হত্যা করা, মৃতদেহ অপমান করা ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এরূপ সকল কর্মই বাইবেলীয় জিহাদের মধ্যে দেখা যায়। বিধর্মী ও বিজাতীয়দের সাথে ইহূদীদের যুদ্ধ, ইহূদীদের সাথে ইহূদীদের যুদ্ধ, ইস্রায়েল রাজ্যের ইহূদীদের সাথে জুডাই রাজ্যের ইহূদীদের যুদ্ধ, একই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই চুক্তিভঙ্গ, মিথ্যাচার, অযোদ্ধাদেরকে হত্যা, মৃতদেহের অবমাননা ইত্যাদি অগণিত বিষয় দেখা যায়। বাইবেলে এ সকল বিষয় অত্যন্ত গৌরবের সাথে প্রশংসনীয় কর্ম হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এজন্যই ইসরাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামির ১৯৪৮ সালে তার পরিচালিত সন্ত্রাসী বাহিনী দি স্টার্ন গ্যাং কর্তৃক জেরুজালেমে জাতিসংঘ মধ্যস্থতাকারী কাউন্ট বার্ণাডোটকে গোপনে হত্যার পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন: "ইহূদী নৈতিকতা ও ইহূদী ঐতিহ্য কোনটিই সন্ত্রাসকে রণনীতির পরিপন্থী মনে করে না। জাতীয় সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ততার মূহূতে আমরা নৈতিক দ্বিধাগ্রস্ততা বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে রাখি। সর্বাগ্রে, আমাদের জন্য সন্ত্রাস হল রাজনৈতিক যুদ্ধের অংশ যা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই যথার্থ।"[৮২৭] এখানে লক্ষণীয় যে, ইহূদী নৈতিকতার আর খ্রিস্টান নৈতিকতা একই হওয়ার কথা; কারণ তাদের নৈতিকার ভিত্তি ধর্মগ্রন্থ এক। খ্রিস্টান পাদরি-প্রচারকগণ অনেক সময় মুসলিমদেরকে বলেন যে, যুদ্ধ, গণহত্যা ও বিধর্মী হত্যার উপর্যুক্ত নির্দেশাবলি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের কথা বা তাওরাতের কথা, ইঞ্জিলের কথা নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রতিটি শব্দই আল্লাহর বাণী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পালনীয়। তাঁরা আরো বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর কোনো নির্দেশ বা বাণী কখনো রহিত হতে পারে না।

সর্বোপরি স্বয়ং যীশুখ্রিস্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে পুরাতন নিয়মের সকল নির্দেশ চিরন্তন, অপবির্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় ঐশ্বরিক নির্দেশ যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল খৃস্টানের জন্য পালনীয় এবং এগুলি পালন না করলে কেউ পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। তিনি বলেন- "For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven". "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সেই পর্যন্ত ব্যবস্থার (তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের বিধিবিধান) এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল

[৮২৬]. নতুন নিয়ম, ইব্রীয় ১১/৩২-৩৪

[৮২৭]. আজহারুল ইসলাম, *নিন্দিত বিশ্ব নন্দিত গন্তব্য, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৯, from an August 1943 article titled `Terror' written by Yitzhak Shamir for Hazit the journal of Lehi

ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সেই সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাইবে।"[৮২৮]

এছাড়া বাইবেলের নতুন নিয়মেও যীশু তাঁর রাজত্বের প্রতি অনীহা পোষণকারীদের তার সামনে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তরবারী বা যুদ্ধের জন্যই তাঁর আগমন।

বাইবেলে অন্য ধর্ম বা বর্ণের মানুষদেরকে শূকর, কুকুর ইত্যাদি বলে গালি দেওয়া হয়েছে।

অ-ইসরাঈলীয়দেরকে কুকুর ও শূকর আখ্যায়িত করে তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্মের দীক্ষা দিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে যীশু বলেন-"Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine..." "পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদের সম্মুখে ফেলিও না"[৮২৯]

ইসরাঈলীয়দেরকে কুকুর আখ্যায়িত করে তাদের জন্য দুআ করতে বা তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক দিতেও আপত্তি করেন যীশুখ্রিস্ট। মথি তাঁর সুসমাচারে লিখেছেন, "And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs." "আর দেখ, ঐ অঞ্চলের এক জন কনানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু, আমার উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।"[৮৩০]

প্রথম দৃষ্টিতেই যে কোনো ব্যক্তির কাছে কথাগুলি খুবই আপত্তিকর মনে হবে। জন্ম, বংশ বা ধর্মের কারণে মানুষকে কুকুর বলে অভিহিত করা! শুধুমাত্র বংশ বা ধর্মের কারণে তাকে মানবিক সাহায্য করতে অস্বীকার করা!! একজন খৃস্টধর্ম বিরোধী পাঠক দাবি করতে পারেন যে, এ বক্তব্য দ্বারা জাতিগত বৈষম্য ও জাতিগত বিদ্বেষ চিরস্থায়ী করা হয়েছে। তিনি দাবি করতে পারেন যে, বাইবেলের উপর্যুক্ত সকল গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মূল দর্শন যীশুর এ কথার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কেউ এ দাবীও করতে পারেন যে, বর্তমান যুগে ফিলিস্তিন, ইরাক ও অন্যান্য দেশে গণহতা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়ে পোপ কোনো প্রতিবাদ না করে ইসলামের নবীর সমালোচনা করছেন এর কারণও এ কুকুর দর্শন। যে দর্শনের মূল হলো, ইহূদী-খৃস্টানগণ ঈশ্বরের সন্তান। অন্য সকল মানুষ কুকুরের মতই মানবেতর প্রাণী। কুকুরকে যেমন পচা বা ছেড়া রুটির টুকরো ছুড়ে দেওয়া যায়, তেমনি তাদেরকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানদের স্বার্থের ক্ষতি করে তাদের কোনো উপকার করা যাবে না। যদি ঈশ্বরের সন্তানদের স্বার্থের ক্ষতি হয় তবে লক্ষকোটি সারমেয় সন্তানকে নির্বিচারে হত্যা করতে কোনো অসুবিধা নেই। এছাড়া ঈশ্বরের সন্তানগণ যদি কিছুটা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের জন্য দুচার হাজার বা দুচার লক্ষ সারমেয় সন্তানকে হত্যা করে ফেলেন তাতেও অসুবিধা কী? বাইবেলে অন্যধর্মের অনুসারীদের ঠা-ামাথায় হত্যার নির্দেশনা, এমনকি প্রতারণামূলকভাবে ডেকে এনে হত্যা করার নির্দেশনা রয়েছে। ইহূদীদের প্রাচীন রাষ্ট্র ইসরায়েলের কিছু নাগরিক বাল দেবতার উপাসনা করত। ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ইসরাঈলের সম্রাট যেহূ (Jehu, the son of Jehoshaphat) ঈশ্বরের সঠিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য বাল দেবতার উপাসকদের ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, সম্রাট যেহূ বাল দেবতার সেবা করবেন। এ জন্য তিনি বাল দেবতার

---

[৮২৮]. মথি ৫/১৮-২০

[৮২৯]. মথি ৭/৬

[৮৩০]. মথি ১৫/২১-২৬

Dhaka University Institutional Repository

উপাসকদের এক মহা- সমাবেশের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে ভেট ও উৎসর্গের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গোপনে উৎসবকেন্দ্র ও মন্দিরের চারিপাশে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে উৎসবরত সকল বিধর্মী-কে তরবারীর আঘাতে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি তাঁর সৈন্যদের বলেন, যদি একজন বিধর্মীও জীবন নিয়ে পালায় তবে তার বিনিময়ে একজন সৈন্য হত্যা করা হবে। এভাবে হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র নারী-পুরুষকে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে কোনোরূপ সুযোগ না দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেন।[৮৩১] অন্য ঘটনায় বাইবেলীয় নবী এলিজাহ (Prophet Elijah) বাল দেবতার ৪৫০ জন উপাসককে ধরে ঠাণ্ডা মাথায় জবাই করেন।[৮৩২] এ সকল ঘটনা থেকে খ্রিস্টান পোপ, পাদরী ও বিশপগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, খ্রিস্টান দেশে বসবাস রত সকল অখ্রিস্টান নাগরিক এবং ভিন্নমতাবলম্বী খ্রিস্টানদেরকে হত্যা ও নির্মূল করা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও অধিকার। প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট পাদরি আইজাক বাদারকান ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার লেখা পুস্তিকা ত্রয়োদশ গ্রন্থে লিখেছেন: রোম থেকে আরবী ভাষায় প্রকাশিত বাইবেল ইনডেক্সের হা অক্ষরের মধ্যে হারতাকা (heresy) বিষয়ে লেখা হয়েছে: ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বী বা বিদআতী ফিরকার (heretics) বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করা; কারণ সম্রাট যেহূ প্রতারণার মাধ্যমে বাল দেবতার অনুসারীদের জমায়েত করে হত্যা করেছেন এবং নবী এলিজাহ বাল দেবতার অনুসারীদের জবাই করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিধর্মীদের এভাবে হত্যা ও নির্মূল করা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।

খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার প্রেরণায় পোপ নিস্পাপ, নির্ভুল ও অভ্রান্ত (infallible)। তাঁর সিদ্ধান্তই ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত। আর এরূপ অভ্রান্ত পোপগণের নেতৃত্বে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় চার্চ বিধর্মী নির্মূলের এ মহান দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবেই পালন করেছেন। ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাট কন্সাটনাইন (Constantine) খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করেন। সেদিন থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত খৃস্টধর্মের ইতিহাস ধর্মীয় সহিংসতা, হত্যা, অত্যাচার ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরের ইতিহাস। শূন্য সহনশীলতা (Zero tolerance) প্রদর্শন করে কঠোর বর্বরতার সাথে খ্রিস্টান চার্চ সকল বিধর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীকে নির্মূল করেছে। আর এজন্যই নোবেল বিজয়ী প্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell: ১৮৭২-১৯৭০) বলেন,

"You find as you look around the world that every single bit of progress in human feeling, every improvement in the criminal law, every step towards the diminution of war, every step towards better treatment of coloured races, or every mitigation of slavery, every moral progress that there has been in the world, has been consistently opposed by the organized Churches of the world. I say quite deliberately that the Christian religion, as organized in the churches, has been and still is the principal enemy of moral progress in the world."

"বিশ্বের চারিদিকে তাকালে আপনি দেখবেন যে, বিশ্বের যেখানেই মানবীয় অনুভবের যে কোনো ক্ষুদ্রতম অগ্রগতি, অপরাধ-আইনের যে কোনো উন্নয়ন, যুদ্ধ হ্রাসে যে কোনো পদক্ষেপ, কাল বা সাদা বর্ণের মানুষদের সাথে উন্নততর আচরণের ক্ষেত্রে যে কোনো পদক্ষেপ, দাসপ্রথা বিলুপ্তির যে কোনো প্রচেষ্টা এবং নৈতিক উন্নয়ন যে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তারই বিরোধিতা করেছে খ্রিস্টীয় চার্চ নিরবিচ্ছিন্নভাবে। আমি পরিপূর্ণ সতর্কতা ও সুচিন্তিতভাবে বলছি যে, চার্চ পরিচালিত খ্রিস্টধর্মই বিশ্বের নৈতিক উন্নয়নের প্রধান শত্রু ছিল এবং এখনো আছে।"[৮৩৩] Vlasis Rassias নামক একজন গবেষক (Demolish Them) নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন গ্রীক ভাষায় ২০০০ খ্রিস্টাব্দে (ISBN 960-7748-20-4)। এ পুস্তকে খ্রিস্টধর্মের সহিংসতার অনেক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল সহিংসতার তালিকায় রয়েছে- Emperor Constantine began a centuries-long run of torture, destruction and extermination of all things not Christian like eradicating ancient Greek temples and stealing their treasures. Subsequent Roman Emperors in Constantinople executed everyone that did not accept the

---

৮৩১ . The Holy Bible, 2 Kings 10/18-28

৮৩২ . The Holy Bible, 1 Kings 18:40

৮৩৩ . Bertrand Russell, ***Why I am not a Christian***, pp 20-21, quoted from Dr. Abdul Hamid Qadri, ***Dimensions of Christianity***, pp 40-41.

new Christian faith. Then libraries were burned and all contrary teachings outlawed....For another thousand years, the primary occupation of state-sanctioned Christians was to exterminate those who would not accept the documents constructed into a Bible at the Council of Nicea. In 1493, Spanish monarchs Ferdinand and Isabella issued an edict demanding death for all those who would not accept 'the true faith'. Christopher Columbus and others began slaughtering natives of the Western Hemisphere by the millions, not because the would not accept the faith, but because they could not understand the question, because they could not speak Spanish!"

"খ্রিস্টান বিশ্বাসের পরিপন্থী সকল কিছুর বিরুদ্ধে সম্রাট কনস্টান্টাইন এক নিপীড়ন, ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্মূল অভিযানের শুরু করেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্থায়ী হয়। যেমন প্রাচীন গ্রীক মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হয় এবং সেগুলির ভাণ্ডার লুণ্ঠন করা হয়। নতুন খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করতে রাজি নয় এমন সকলকে নির্মূল করেন কন্সটান্টিনোপলের পরবর্তী রোমান শাসকগণ। এরপর লাইব্রেরীগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বিপরীত সকল কিছু নিষিদ্ধ করা হয়। ...নিকীয়া কাউন্সিলে যে বাইবেল তৈরি করা হয় সে বাইবেল যারা মানে না তাদেরকে নির্মূল করাই ছিল পরবর্তী হাজার বৎসর যাবৎ রাষ্ট্র পরিচালিত খ্রিস্টানগণের মূল কর্ম। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের সম্রাট ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা এক আদেশ জারি করেন যে, যারা সঠিক ধর্ম বিশ্বাস (খ্রিস্টধর্ম) গ্রহণ করবে না তাদেরকে হত্যা করতে হবে। (এ আজ্ঞার ভিত্তিতে) ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও অন্যান্যরা আমেরিকায় যেয়ে সেখানকার মিলিয়ন মিলিয়ন বাসিন্দাকে (রেড ইন্ডিয়ান) হত্যা করেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করার কারণে তারা তাদেরকে হত্যা করেন নি। বরং স্প্যানিশ ভাষা না জানায় তারা খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাস বুঝতে পারছিল না। এ অপরাধে তারা তাদেরকে হত্যা করেন।"[৮৩৪] শুধু মুসলিম, ইহূদী বা অখ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেই নয়, ভিন্নমতাবলম্বী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেও ক্রুসেড চালিয়েছেন খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপগণ এবং একেক যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করেছেন। আপনারা যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়াতে ক্রুসেড (Crusade), এ্যালবিজেনসিয়ান ক্রুসেড (the Albigensian Crusade), সেন্ট বার্থলমিউস দিবসের গণহত্যা (Massacre of Saint Bartholomew's Day), ইনকুইজিশন (Inquisition), ধর্মের যুদ্ধ (The Wars of Religion), ইহূদী বিরোধিতা (Anti-Semitism) ইত্যাদি আর্টির্কেল পড়লেই অনেক তথ্য জানতে পারবেন। যদিও আধুনিক গ্রন্থগুলিতে বিষয়গুলিকে খুবই হালকা করা হয়, নিহতদের সংখ্যা কম করা হয় এবং ধর্ম ও চার্চ-কে বাঁচিয়ে অন্যদের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয়। তারপরও যেটুক সত্য দেখবেন তাতেই গায়ের লোম শিউরে উঠবে! একেক যুদ্ধ বা হত্যাকা- ১০/২০ হাজার থেকে লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কখনো যুদ্ধ করে এবং কখনো যুদ্ধ ছাড়াই অতর্কিত হামলা চালিয়ে। এ হলো ইহূদী-খ্রিস্টানদের একেকটি ধর্মযুদ্ধের বা ধর্মীয় হত্যাকা-র অবস্থা। এ সকল বর্বরতা কখনো খ্রিস্টান সম্রাট-শাসকগণের নেতৃত্বে ঘটেছে এবং পোপগণ তা সমর্থন করেছেন। কখনো স্বয়ং পোপের নেতৃত্বে এরূপ বর্বর নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছে। আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার খ্রিস্টান বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতাদের কথবার্তার মধ্যেও ওপরের মানসিকতার ছায়া দেখা যায়। আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য আল-কায়েদাকে দায়ী করা হলেও এখন পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন নিজের দেশের আদালতেও তা প্রমাণ করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও আল-কায়েদার অপরাধের জন্য সকল মুসলিম দেশ দখল করে নেতাদের হত্যা ও মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর দাবিদাওয়া জানাচ্ছেন তাদের অনেকেই। দ্যা সেভেইজ ন্যাশনস নামক রেডিও শোতে (১২ মে ২০০৩) প্রচারিত মাইকেল সেভেইজের মতামত পশ্চিমা দেশে বিশেষ করে আমেরিকায় প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করা হয়। তিনি তার শোতে বলেন: "আমার মনে হয় এই লোকগুলোকে (আরব ও মুসলমানদেরকে) জোর করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা উচিত। শুধুমাত্র এভাবেই সম্ভবত তাদেরকে মানুষে পরিণত করা যাবে।"[৮৩৫] এভাবে আরো অনেক প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য উদার, পরমতসহিষ্ণু ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক ও গবেষক মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন। আরেক মার্কিন সিনেটর দাবি করলেন যে, আমেরিকায় যে কোনো সন্ত্রাসী হামলা হলে বুঝতে হবে যে, তা মুসলিমগণ

[৮৩৪]. Nasrine R Karim, ***War on Terror: What is it?*** The Independent, Dhaka, 20/02/2009.

[৮৩৫]. আজহারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

করেছে এবং কোনো প্রমাণ ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ হিসেবে মুসলিমদের পবিত্র স্থান মক্কা ও মদীনা ধ্বংস করে দিতে হবে। আর এধরণের বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদগণ ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব লাভ করছেন।

অথচ মুসলিম মানস এমনভাবেই তৈরি যে, সে কখনোই অন্য মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বা কাউকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। এখানে দেখা যায় যে, সবচেয়ে সহিংস মুসলিম সন্ত্রাসীও অন্যের ধর্মকে অবমাননা করার চেষ্টা করছে না বা অন্য ধর্মের মানুষকে জবরদস্তিকরে মুসলিম বানানোর আহ্বান করছে না। সুসভ্য, মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ খ্রিস্টানগণ মুসলিমদের পবিত্র কুরআনকে অপবিত্র করেছে। মানবতাবাদী ও ভালবাসার প্রচারক খ্রিস্টান পাদরিগণ কুরআনকে টয়লেটে নিক্ষেপ করার দাবি সম্বলিত ফলক চার্চের সামনে টানিয়ে রাখছেন। তারা মুসলিমদের পবিত্র নবীকে (সা.) নিয়ে ঘৃণ্য কার্টুন তৈরি করেছে। সারা বিশ্বের মুসলিমগণ এ ঘৃণ্য বর্বরতার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা মার্কিন বা ডেনিশ পতাকায় অথবা এ সব দেশের রাজনীতিবিদদের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেছেন। কিন্তু কখনোই কোনো মুসলিম খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থের অবমাননা করেন নি। বাজার থেকে একটি বাইবেল কিনে তাতে পেশাব করেন নি বা তাতে অগ্নি সংযোগ করেন নি বা যীশু খ্রিস্টের অবমাননাকর কার্টুন প্রচার করেন নি। পা-াত্যের সুসভ্য ধর্মনিরপেক্ষ মানুষদের দৃষ্টিতে একেবারে অশিক্ষিত, অসভ্য ও উগ্র কোনো মোল্লাও কখনো খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থকে অপবিত্র করতে বা যীশু নামে কার্টুন তৈরি করতে আহ্বান করেন নি। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী ও উগ্র মৌলবাদীদের একজনকেও দেখা যায় না যে, সে খ্রিস্টানদেরকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। তারা হয়ত মি. বুশকে হত্যার আহ্বান করছে। কিন্তু তা তার খ্রিস্টান হওয়ার কারণে নয়, আমেরিকান হওয়ার কারণে নয় বা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সেবক হওয়ার কারণে নয়, বরং তাকে আগ্রাসক, জালিম ও হত্যাকারী বলে মনে করার কারণে।

একই কারণে তারা হয়ত আমেরিকা বা ইসরাঈলের ধ্বংসের জন্য আহ্বান করছে। কিন্তু কখনোই তারা কোনো ইহূদী বা খ্রিস্টানকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর জন্য আহ্বান করছে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের মিথ্যাচার ও অপপ্রচার ইসলামী জঙ্গিবাদ-কে যেভাবে চিত্রিত করছে তা কখনোই সত্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ, কখনো তা মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীকার আদায়ের সংগ্রাম বা আগ্রাসন বিরোধী জিহাদ। তারপরও দেখা যায় যে, কোনো কোনো মুসলিম ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসে লিপ্ত হচ্ছে। পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ ও গবেষকগণ তাদের কর্মকাণ্ড কে ইসলামী জঙ্গিবাদ ও সভ্যতার সংঘাত-এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। পক্ষান্তরে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদেরকে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ ও অমুসলিমদের ক্রীড়ানক বলে দাবি করেন। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, তাদের মধ্যে কেউ অমুসলিমদের ক্রীড়ানক বা এজেন্ট হলেও সাধারণ অনেক যুবক শুধু ইসলামের আবেগেই তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। ইসলামের কিছু শিক্ষা তারা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে অনেককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল বিকৃতি তাত্ত্বিকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগ কখনো অবহেলা, গালি বা কঠোর শাস্তি দিয়ে অবদমিত করা যায় না। ধর্মীয়ভাবে এগুলির বিকৃতি উপলব্ধি করানোই এরূপ প্রবণতা থামানোর অন্যতম পথ। ইসলামের নামে উগ্রতার উদ্ভবের একটি কারণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিকৃত ধারণা। এ পথে প্রাচীন ও মধ্যযুগেও ইসলামের নামে সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্ম ও প্রসারের ঘটনা ঘটেছে। এগুলির অন্যতম ছিল প্রথম হিজরী শতকে আলী (রা.)-এর শাসনামলে আবির্ভুত খারিজী দল, ৫ম হিজরী শতকে আবির্ভুত বাতিনী হাশাশীন সম্প্রদায় এবং আধুনিক মিসরের জামাআতুল মুসলিমীন সংগঠন। বাংলাদেশে সাহাদাত-ই-আল হিকমা, জামায়েতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি, জাগ্রত মুসলিম বাংলাদেশ বা জেএমজিবি, হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলাম (হুজি), হিজবুত তাহরীর ও আনসার উল্লাহ বাংলা টিম ইত্যাদি। জঙ্গি কর্মকাণ্ডেলিপ্ত মানুষদের কথাবার্তা ও দাবিদাওয়ার সাথে উপর্যুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির বিশ্বাস, তত্ত্ব ও কর্মের অদ্ভুত মিল দেখা যায়।

জঙ্গিবাদ বনাম ইসলাম

আরো বেশি ভয়ঙ্কর বিষয় জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের নামে ইসলামী দাওয়াতের কণ্ঠ রুদ্ধ করা। মাওবাদী সন্ত্রাসীগণ বা আমাদের দেশের চরমপন্থী বলে কথিত "বামপন্থী জঙ্গিগণ" যে মতাদর্শ ও দাবিদাওয়া প্রচার করেন মূলধারার মার্কসবাদী, সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী বা বামপন্থীগণও একই মতাদর্শ ও দাবিদাওয়া প্রচার করেন। অনুরূপভাবে পার্থক্য হলো কর্মপদ্ধতিতে। সাম্যবাদী জঙ্গি বা সমাজতন্ত্রী সন্ত্রাসীদের কারণে কেউ মূলধারার সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীদেরকে দায়ী করেন না বা "চরমপন্থা" দমনের নামে বামপন্থী রাজনীতি ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন না। কেউ বলেন না যে, সাম্যবাদী রাজনীতির কারণেই চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী জন্ম নিচ্ছে; কাজেই সাম্যবাদী রাজনীতি বন্ধ করা হোক। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। জঙ্গিবাদ দমনের অযুহাতে অনেক সময় ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আইন ও বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি বা ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশের দাবি বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়।

বস্তুত, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারেন। যারা ইসলামী মূল্যবোধ, আখলাক-আচরণ, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুকেই "আফিম", "প্রতিক্রিয়াশীলতা" বা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলে বিশ্বাস করেন, অথবা তাদের বাণিজ্যিক, সাম্রাজ্যবাদী বা অনুরূপ স্বার্থের প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন তারা জঙ্গিবাদের অযুহাতে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিস্তারের বা ইসলামী আদর্শ বিস্তারের সকল কর্ম নিষিদ্ধ করার দাবি করতে পারেন। মত প্রকাশের অধিকার তাদের আছে।

অনুরূপভাবে "ইসলামপন্থীরা" চরমপন্থা নির্মূল বা অনুরূপ কোনো অযুহাতে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী আদর্শ প্রচার নিষিদ্ধ করার দাবি করতে পারেন। মত প্রকাশের অধিকার তাদের আছে।

তবে সরকার ও প্রশাসনকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। তাদের নিজস্ব কোনো মত বা পক্ষ থাকলেও সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাদের দায়িত্ব হয় সকলের অধিকার রক্ষা করা এবং দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখা। আমাদের বুঝতে হবে যে, ভাল বা মন্দ কোনো কথারই "কণ্ঠ" রুদ্ধ করার প্রবণতা কখনোই ভাল ফল দেয় না। বিশেষত জঙ্গিবাদের নামে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আদর্শ প্রচার, শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আইনসম্মত দাওয়াতকে নিষিদ্ধ বা বাধাগ্রস্ত করলে তা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণের অপরাধ ছাড়াও দেশ ও জাতির জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনবে। এ জাতীয় যে কোনো কর্ম জঙ্গিদেরকে সাহায্য করবে, তাদের প্রচার জোরদার করবে, তাদের নতুন রিক্রুটমেন্ট দ্রুত বাড়বে এবং দেশ ও জাতিকে এক ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী অশান্তির মধ্যে ফেলে দিবে।

বাংলাদেশী জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ে আলোচনায় প্রকাশিত মতামত থেকে এই রকমের ধারণা জন্মাতে পারে যে বিদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গি বা উগ্রপন্থীদের যোগাযোগের প্রশ্নই অবান্তর। বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতি নাকচ করতে গিয়ে কেউ কেউ এমন বলছেন, যেন বাংলাদেশে বিদেশি জঙ্গিদের উপস্থিতি বা তৎপরতার কথা এই প্রথম শোনা গেল। এ বক্তব্য যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকে কিছুদিন আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জঙ্গিদের উপস্থিতি রয়েছে বলেই বলার চেষ্টা করেছেন। সরকারের অবস্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেভাবে এ রকম আশঙ্কাকে নাকচ করে দিচ্ছেন, সেটা উদ্বেগজনক। কেননা, বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যক্রমের যে ইতিহাস, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গিদের সম্পর্ক ছিল। নিরাপত্তা বিশ্লেষক, দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা, সন্ত্রাসবাদ বিষয়ের সাংবাদিক, নিরাপত্তা নীতিমালা তৈরির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের কাছে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিষয়টি প্রায় দুই দশকের পুরোনো। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সূচনা নব্বইয়ের দশকের কথাই বলবেন। এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সূচনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বিদেশি সংশ্লিষ্টতা। এ দেশে জঙ্গিবাদের উৎসমুখ বলে যাকে চিহ্নিত করা যায়, সেই হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর (হুজি) কার্যত প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকায়, জাতীয় প্রেসক্লাবে। আফগান মুজাহিদদের কাবুল বিজয়ে উল্লসিত ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি স্বেচ্ছাসেবীদের একাংশ সংবাদ সম্মেলন করেছিল সেদিন। সাংগঠনিকভাবে হুজি সংগঠিত হচ্ছিল আরও কয়েক বছর আগ থেকে। পাকিস্তানে হুজির প্রাথমিক রূপ তৈরি হয় ১৯৮০ সালে, কিন্তু এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৮ সালে এবং এর প্রসার ঘটে পরবর্তী চার বছরে। এই সময়েই সাংগঠনিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশে বিস্তারের পরিকল্পনা করা হয় এবং তার অংশ হিসেবেই

বাংলাদেশে হুজির যাত্রা শুরু। পাকিস্তানে হুজির সংগঠকেরা প্রধানত বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল রোহিঙ্গাদের লড়াইকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারকে অস্থিতিশীল করতে।[৮৩৬] বাংলাদেশে হুজির বিস্তার দ্রুততা লাভ করে অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিষ্ঠিত জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) সঙ্গে এর সাংগঠনিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর। জেএমবির প্রতিষ্ঠা ১৯৯৮ সালে, এর নামকরণ হয় ২০০১ সালে। কিন্তু জেএমবি ও হুজির সম্পর্ক গড়ে ওঠার পটভূমি তৈরি হয় জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবদুর রহমান যখন জেএমবি প্রতিষ্ঠার লক্ষে ১৯৯৬ সালের দিকে দেশের কিছু আলেম ও ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। সেই সূত্রেই হুজির নেতা মুফতি হান্নানের সঙ্গে আবদুর রহমানের যোগাযোগ। ১৯৯৬ সালের ১৯ জানুয়ারি কক্সবাজারের উখিয়ায় হুজির যে ৪১ জন কর্মী সশস্ত্র অবস্থায় আটক হন, তাঁদের মামলা তদারকির জন্য আবদুর রহমান হুজির প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যান। এই যোগাযোগের পরিণতিতেই হুজি ও জেএমবির মধ্যে সাংগঠনিক সংশ্লিষ্টতা তৈরি হয়। বাংলাদেশের সম্ভাব্য জঙ্গিদের দেশের বাইরে যোগাযোগ শুরু হয় ১৯৯৭-৯৮ সালে। ভারতীয় নাগরিক আবদুল করিম টুন্ডার সঙ্গে আবদুর রহমানের ১৯৯৬ সালে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠা এ দেশে জঙ্গিবাদের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। টুন্ডা পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তাইয়েবার শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মনে করে যে ১৯৯৪ সালে টুন্ডা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তাঁর হাত ধরেই আবদুর রহমান পাকিস্তানে প্রশিক্ষণের জন্য যান এবং মারকাজ আদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ, যা লস্কর-ই-তাইয়েবার উৎস সংগঠন, এর সঙ্গে যুক্ত হন, পরিচিত হন হাফিজ সাঈদের সঙ্গে। ভারতীয় গোয়েন্দারা সব সময় অভিযোগ করে এসেছে যে টুন্ডা বাংলাদেশ থেকে ভারতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছেন। তারা দাবি করে যে ১৯৯৮ সালে দিল্লিতে আটক দুই বাংলাদেশি জেএমবির সদস্য এবং তাঁরা টুন্ডার মাধ্যমে ভারতে এসেছিলেন। ২০১৩ সালে টুন্ডা আটক হয়ে বর্তমানে ভারতে বিচারাধীন আছেন।

বাংলাদেশে বিদেশি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতির বিষয়টি আমরা আরও জানতে পারি ২০০৮ ও ২০০৯ সালে। আবদুর রউফ দাউদ মার্চেন্ট ও জাহেদ শেখ নামে দুজন ভারতীয় জঙ্গির আটকের ঘটনা ঘটে। ২০০৯ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় কথিত আরেফ রেজা কমান্ডো ফোর্সের মুফতি ওবায়েদুল্লাহসহ আটক হন মোট ছয়জন, তাঁদের মধ্যে একাধিক সদস্য স্বীকার করেন যে, তাঁরা অনেক দিন ধরে বাংলাদেশে বাস করছেন; ওবায়েদুল্লাহ ১৯৯৫ সালে ও হাবিবুল্লাহ ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশে আছেন বলে দাবি করেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। বাংলাদেশকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য লস্কর-ই-তাইয়েবার উৎসাহ কখনোই হ্রাস পায়নি, আর তারা যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছে, তা সুবিদিত। ফলে বাংলাদেশের এই জঙ্গিদের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের সম্পর্ক যে অব্যাহত ছিল, সেটা আমরা বুঝতে পারি। বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে বিদেশি যোগাযোগের আরেকটি পথ হচ্ছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম চালিয়ে এসেছে। মিয়ানমার সরকারের অন্যায় ও অমানবিক আচরণ রোহিঙ্গাদের লড়াইয়ের ন্যায়সংগত কারণ তৈরি করেছে, কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের ভূমিকা নিরাপত্তার জন্য হয়েছে হুমকি। রোহিঙ্গা যোদ্ধাদের সঙ্গে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী জঙ্গিদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি। তাদের উপলক্ষ করেই পাকিস্তানের হুজি এ দেশে তাদের কাজ সম্প্রসারণ করেছিল। কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলো অস্ত্র সংগ্রহের জন্য যে কেবল তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শিকভাবে ঐকমত্য পোষণকারীদের সঙ্গেই কাজ করেছে, তা নয়। তাদের হাতে আসা অস্ত্রের এক বড় অংশ এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্রের কালোবাজার থেকে। এ ক্ষেত্রে থাইল্যান্ডের গোপন অস্ত্রবাজারগুলো সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু গোপন বাজারই তাদের একমাত্র উৎস ছিল না। যেগুলোকে গ্রে মার্কেট বা ধূসর বাজার, অর্থাৎ যেগুলো কোনো কোনো দেশের গোয়েন্দা সংস্থার জ্ঞাতসারে, এমনকি প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে, দেশের স্বার্থ

---

[৮৩৬]. আলী রিয়াজ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা*, দৈনিক প্রথম আলো, ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবর তিন পর্বে প্রকাশিত

বিবেচনায় হস্তান্তরিত হয়, সেগুলোও কাজ করেছে। সাধারণভাবে গ্রে মার্কেটের উদাহরণ হিসেবে দেশে দেশে বিপ্লবী থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী থেকে মাদক পাচারকারীদের হাতে গোয়েন্দাদের অস্ত্র তুলে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। এই অঞ্চলে মিয়ানমারের ওপর চীনের প্রভাব হ্রাসের জন্য সরকারকে চাপে রাখতে আশির দশকের শেষ পর্যায় থেকে প্রায় দেড় দশক ধরে কারেন গেরিলাদের প্রতি ভারতের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল; ভারত তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে বলেও অভিযোগ আছে। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য কারেন গেরিলাদের সঙ্গে রোহিঙ্গারা সহযোগিতা করেছে এবং কক্সবাজারের প্রত্যন্ত উপকূলকে ব্যবহার করা হয়েছে অস্ত্র হস্তান্তরের কেন্দ্র হিসেবে। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত মহাসাগরের নারকোনডাম দ্বীপের কাছে একটি এবং তার তিন মাস পরে প্রায় ওই একই এলাকায় আরেকটি মোট দু'টি অবৈধ অস্ত্রের চালান আটকের ঘটনা ঘটে। ভারতের নৌবাহিনীর আটক করা এসব অস্ত্রের চালান আরাকান আর্মি ও কারেন গেরিলাদের জন্য যাচ্ছিল এবং সেগুলোর গন্তব্য ছিল কক্সবাজার। এই অস্ত্র আটক এবং আটককৃত ব্যক্তিদের বিষয়ে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং নৌবাহিনীর মধ্যে সে সময় টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়েছে। কারেনদের সঙ্গে আদর্শিক পার্থক্যকে সরিয়ে রেখে যেমন রোহিঙ্গারা একত্রে কাজ করেছে, ঠিক একইভাবে তাদের সঙ্গে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে ওঠার ঘটনা ঘটেছে। বিস্ময়কর এই যে, ভারতের যে সব জঙ্গিগোষ্ঠী ভারতের উত্তরাঞ্চলে বাঙালি, বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে, হত্যাকা- ঘটিয়েছে, তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি ইসলামপন্থী জঙ্গিরা দ্বিধান্বিত হয়নি। এই ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জঙ্গিগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হলে তারা কেবল আদর্শিক বিবেচনাতেই সহযোগিতা করবে তা নয়, বিভিন্ন বিবেচনায় দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে সহযোগিতার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাতে অর্থ-অস্ত্র-নিরাপদ আশ্রয় অনেক কিছুই বিনিময় হতে পারে। ফলে সীমান্ত ছাড়িয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব।[৮৩৭]

নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রবাদী জঙ্গি দলসমূহ

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে যে সকল উগ্রবাদী জঙ্গি দলসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাদের তালিকা নিম্নরূপ-

১. সাহাদাত-ই-আল হিকমা- নামক সংগঠনটিকে ৯ ফেব্রয়ারি, ২০০৩ তারিখে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৮৩৮]
২. জামায়েতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি ও
৩. জাগ্রত মুসলিম বাংলাদেশ বা জেএমজিবি- কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে।[৮৩৯]
৪. হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলাম (হুজি)- কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ১৭ অক্টোবর, ২০০৫ সালে।[৮৪০]
৫. হিজবুত তাহরীর কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ২২ অক্টোবর, ২০০৯।
৬. আনসার উল্লাহ বাংলা টিম কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ২৫ মে, ২০১৫।

কালো তালিকাভূক্ত দলসমূহ

বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ এপ্রিল মাসে সাতটি সংগঠনকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল-

১. হিজবুত তাহরীর
২. ইসলামি সমাজ
৩. ওলেমা আঞ্জুমান আল বাইনিয়াত
৪. ইসলামিক গণতন্ত্র দল

---

৮৩৭. আলী রিয়াজ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান*, ***বর্তমান ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা***, দৈনিক প্রথম আলো, ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবর তিন পর্বে প্রকাশিত

৮৩৮. সুব্রত শুভ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার*, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, Categories: ধর্ম, বাংলাদেশ, মুক্তমনা, রাজনীতি। Tags: জঙ্গিবাদ

৮৩৯. রাইজিংবিডি.কম, ২৪ জুলাই ২০১৬, জঙ্গি হামলা : উদীচী থেকে শোলাকিয়া, (https://www.risingbd.com/travel/news/178775)

৮৪০. সুব্রত শুভ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার*, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, ***প্রাগুক্ত***

৫. তওহিদ ট্রাস্ট
৬. তামির উদ্দীন এবং
৭. আল্লাহ দল।[৮৪১]

বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালের অগাস্টে আরো দুইটি দলকে কালো তালিকাভুক্ত করে-
১. শাহদাত-ই নবয়ুত ও
২. আল মারকজুল আল ইসলাম।[৮৪২]

বিশেষ ২৩ জেলায় জঙ্গি তৎপরতা

গোয়েন্দাদের তথ্যানুযায়ী রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া, রংপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, সাতক্ষীরা, গাজীপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, পাবনা, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার, টেকনাফ ও সিলেট জেলায় এখনো জঙ্গি তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।[৮৪৩]

নিষিদ্ধ চারটি আত্মস্বীকৃত জঙ্গি প্রতিষ্ঠান-

১. শাহাদাত-ই-আল হিকমা (২০০৪),
২. জমিয়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি,২০০৫),
৩. জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি,২০০৫) ও
৪. হরকাতুল জিহাদ (২০০৫)! [৮৪৪]

বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনসমূহ

শুধুমাত্র বাংলাদেশেই ৩০টি কিংবা তারও বেশি জঙ্গী সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংগঠনগুলো হলো-

১. মুজাহিদ অফ বাংলাদেশ,
২. কালো তালিকাভুক্ত ইসলামী সমাজ,
৩. দাওয়াতে ইসলাম,
৪. ওলামা আঞ্জুমান আল বাইয়্যিনাত,
৫. ইসলাম ও মুসলিম,
৬. হেফাজতে ইসলামী বাংলাদেশ,
৭. আল হারাত আল ইসলামিয়া,
৮. জামায়াতুল ফালাইয়া,
৯. তাওহিদী জনতা,
১০. বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট,
১১. জুম্মাতুল আল সাদাত,
১২. শাহাদাত-ই-নবুওয়াত,
১৩. জামায়াত-ই-ইয়াহিয়া আল তুরাত,
১৪. জইশে মোস্তফা বাংলাদেশ,
১৫. আল জিহাদ বাংলাদেশ,
১৬. ওয়ারাত ইসলামিক ফ্রন্ট,
১৭. জামায়াত-আল-সাদাত,
১৮. আনসার রাজশাহী,

---

[৮৪১]. বাংলাদেশ জার্নাল, দেশে অর্ধশত জঙ্গি সংগঠন, নিষিদ্ধ মাত্র ৮টি! , ২৭ নভেম্বর ২০১৯ (https://www.bd- journal.com/bangladesh/96982.)

[৮৪২]. সুব্রত শুভ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার*, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ২

[৮৪৩]. https://blog.muktomona.com/2016/04/24/48844, টাইম লাইন: বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার, ২৪ এপ্রিল ২০১৬

[৮৪৪]. সুব্রত শুভ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার*, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৩

১৯. আল খিদমত,
২০.হরকত-এ ইসলাম আল জিহাদ,
২১. মুসলিম মিল্লাত শারিয়া কাউন্সিল,
২২. ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ,
২৩.জইশে মোহাম্মদ,
২৪. আল ইসলাম মার্টায়ারস ব্রিগেড,
২৫.লস্কর-ই-তৈয়্যবা,
২৬. হিযবুল্লাহ ইসলামী সমাজ,
২৭.হরকাতুল মুজাহিদীন,
২৮.নুসরাতুল মুসলেমিন,
২৯. ইসলামী জিহাদ আন্দোলন বাংলাদেশ
৩০. ইসলামী ছাত্রশিবির,
৩১. কতল বাহিনী,
৩২.শহীদ নাসিরুল্লাহ খান আরাফাত ব্রিগেড,
৩৩. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি,
৩৪.তামির-উল-দীন বাংলাদেশ,
৩৫. তাওহিদট্রাস্ট।[৮৪৫]

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জঙ্গি সংগঠনগুলো-

১. পাকিস্তানের লস্করই তাইবা,
২. হরকত উল মুজাহিদ,
৩. জম্মু ও কাশ্মির স্বাধীনতা ফ্রন্ট (LKLF),
৪. জোশ-ই মুহাম্মদ (JeM),
৫. জোশ-ই মোস্তফা,
৬. ভারতের কাশ্মীর ভিত্তিক সংগঠন-আসিফ রেজা কমান্ডো ফোর্স (ARCF),
৭. তাহরিক-ই-জাভেদ-ইসলামি কাশ্মির (TJI),
৮. হরকতুল জিহাদুল ইসলামি,
৯. হিজবুত-উল-মুজাহেদিন,
১০. হেজবি ইসলামি,
১১. জামাত-উল-মুজাহেদিন এবং
১২. হরকত-উল-আনসার।[৮৪৬]

মায়ানমার ভিত্তিক জঙ্গি গ্রুপঃ

১. রোহিঙ্গা সংহতি সংস্থা -Rohingya Solidarity Organisation (RSO)
২. আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল সংস্থা -Arakan Rohingya National Organisation (ARNO)
৩. ন্যাশেনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকান - National United Party of Arakan (NUPA)
৪. আরাকান রোহিঙ্গা ফোর্স- Arakan Rohingya Force
৫. ইসলামিক সংহতি ফ্রন্ট- Islamic Solidarity Front
৬. আরাকান পিপলস আর্মি- Arakan Peoples Army
৭. লিবারেশন মায়ানমার ফোর্স-Liberation Myanmar Force

---

৮৪৫. সুব্রত শুভ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার*, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, Categories: ধর্ম, বাংলাদেশ, মুক্তমনা, রাজনীতি Tags: জঙ্গিবাদ

৮৪৬. https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/24140, ২০ জানুয়ারী ২০১৫

৮. আরাকান মুজাহিদ পার্টি- Arakan Mujahid Party
৯. রোহিঙ্গা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফোর্স- Rohingya Independents Force
১০. রোহিঙ্গা ইনডিপেন্ডেন্স আর্মি- Rohingya Independence Army
১১. রোহিঙ্গা পাট্রিয়টিক ফ্রন্স- Rohingya Patriotic Front,
১২. রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট এবং ইউনাইটেণ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশান-Rohingya Islamic Front and United students Association of Arakan Movement (USM)
১৩. আকামুল মুজাহিদিন (এএমএম)- Akamula Mujahideen
১৪. হারাকাহ আল-ইয়াকিন- Harakah al-Yaqin[৮৪৭]

জঙ্গি অর্থায়নে অভিযুক্ত বিভিন্ন এনজিও সংস্থা

বাংলাদেশে ৫৭৭টির বেশি এনজিও জঙ্গিদের পেছনে বিপুল অর্থ ঢালছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং নাশকতা সৃষ্টিতে সন্দেহভাজন ৫৭৭টি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে সরকার। জঙ্গি অর্থায়নে জড়িত বলে অভিযুক্ত এনজিওর বেশির ভাগই মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ১৮টি ব্যাংক-বীমা ও সেবা খাতের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে কড়া নজরদারি করছে সরকার। জঙ্গি সংগঠনগুলোকে অর্থদাতাদের একটি তালিকা নিয়ে কাজ করছে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। বেসরকারি একটি ব্যাংকসহ একাধিক এনজিও প্রতিষ্ঠান ও জামায়াত প্রভাবিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ তালিকায়। জঙ্গি বিস্তারে নেপথ্য ভূমিকায় থাকা অর্থদাতাদের রাজনৈতিক পরিচয় বের করতেও কাজ করছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। জঙ্গি অর্থায়নে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রথমে ৫৬৩ এনজিও এবং পরে আরও ১৪টি এনজিওসহ মোট ৫৭৭ প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকাসংবলিত ২১৬ পাতার প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। জেএমবির আর্থিক মদদদাতা হিসেবে অভিযুক্ত রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী সৌদি আরব সরকারের একটি সাহায্য সংস্থা, যা বিশ্বব্যাপী মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (এমডব্লিউএম) নামে পরিচিত। এটির আরেকটি সহযোগী এনজিও ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন (আইআইআরও)। এ ছাড়া জামায়াত ও এর নেতাদের পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক প্রতিষ্ঠান জঙ্গি অর্থায়নে জড়িত। নিচে কিছু সংস্থার নাম উল্লেখ করা হল-

১. রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি: Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)
২. রাবেতা আল-আলম আল-ইসলাম: Rabita al-Alam al-Islami
৩. সোসাইটি অব সোসিয়াল রিফর্মস: Society of Social Reforms,
৪. আল-মুনতাদা আল ইসলামি: Al-Muntada Al-Islami
৫. ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি রিলিফ এজেন্সি: Islamic Relief Agency
৬. আল ফুরকান ফাইন্ডেশান: Al-Furqan Foundation
৭. আর্ন্তজাতিক রিলিফ সংস্থা: International Relief Organization
৮. কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি- Kuwait Joint Relief Committee,
৯. মুসলিম এইড বাংলাদেশ: Muslim Aid Bangladesh
১০. দার আল খাইর- Dar Al-Khair
১১. হায়াতুল ইগাছা- Hayatul Igachha
১২. কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি- Qatar Charitable Society
১৩. তাওহিদী নূর- Towhidi Nur
১৪. সৌদিভিত্তিক হায়াতুল ইগাছা এবং দ্য গ্রিন ক্রিসেন্ট
১৫. ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন (আইআইআরও)

---

[৮৪৭]. সুব্রত শুভ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার*, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, Categories: ধর্ম, বাংলাদেশ, মুক্তমনা, রাজনীতি। Tags: জঙ্গিবাদ

১৬. রিবাইবাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আরআইএইচএস)
১৭. সোসাইটি অব সোশ্যাল রিফর্ম
১৮. কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি
১৯. আল মুনতাদা আল ইসলামী
২০. সৌদিভিত্তিক আরব সরকারের সাহায্য সংস্থা মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (এমডব্লিউএম)
২১. জামায়াতের কৃষক সংগঠন হিসেবে পরিচিত 'বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি'
২২. তাওহীদি নুর ও আলমুনতাদা আল ইসলামি[৮৪৮]

প্রকাশ্যে বিভিন্ন জঙ্গিদলের উত্থান পর্ব

৩০ এপ্রিল, ১৯৯২: জঙ্গি সংগঠন হুজি জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে দল তৈরির ঘোষণা দেয়।
৬ মে, ১৯৯৩: ইসলামিক সমাজ নামে সংগঠনটি জামাতের সাপোর্টে সৃষ্টি হয়।
১৯৯৪: টাঙ্গাইলের করতিয়া গ্রামে হিজবুত তাওহীদ গঠন হয়।'
১৯৯৮: সাবেক হুজি নেতা শায়েখ আব্দুল রহমান জামালপুরে জেএমবি গঠন করে।
১৯৯৮: বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে জেএমবির আরেকটি অংশ জেএমজিবি গঠন করা হয়। সংগঠনটির নাশকতার শুরু হয় ২০০৪ সালে।
২০০১: হিজবুত তাহরীর সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করে।
২০০৭: আনসারউল্লাহ তাদের কার্যক্রম শুরু করে।
২০০৮: হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামি বাংলাদেশ (হুজি-বি) ডিজেএফআই-এর সহযোগিতায় রাজনৈতিক দল ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি (আইডিপি) তৈরি করে।
২০১৩: চট্টগ্রামে ছাত্র শিবিরের সাবেক সদস্যদের মাধ্যমে শহিদ হামজা ব্রিগেড গঠন হয়।
২০১৩: মুজাজিত অব বাংলাদেশ তাদের কার্যক্রম শুরু করে।
২০১৪: বাংলাদেশ জিহাদী গ্রুপ নামে আলাদা একটি গ্রুপের সন্ধান পাওয়া যায়।
২০১৫: জুনুদ আল তৈহিদ আল খলিফা নামক আরেকটি গ্রুপের সন্ধান পাওয়া যায়।
২০১৫: ইত্তেহাদুল মুজাহিদিনের সন্ধান পাওয়া যায়।

[৮৪৮]. সুব্রত শুভ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার*, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, Categories: ধর্ম, বাংলাদেশ, মুক্তমনা, রাজনীতি। Tags: জঙ্গিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার বিবরণ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলার ইতিহাস
আনসার আল ইসলাম ও আইএস এর জঙ্গি কার্যক্রম
আনসার আল ইসলাম
নব্য জেএমবি জঙ্গি হামলা
বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা
বিভিন্ন জঙ্গিদলের সশস্ত্র হামলা সমূহের বিবরণ

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার বিবরণ

একটি দেশে কেন সহিংস উগ্রপন্থা বা জঙ্গিবাদ বিস্তার লাভ করে, কেন এ ধরনের আদর্শ মানুষকে আকর্ষণ করে, কারা জঙ্গিবাদের প্রতি আকর্ষিত হয়? কয়েক দশক ধরেই সমাজবিজ্ঞানী, নিরাপত্তাবিষয়ক গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারকেরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে গত শতকের ষাটের দশকে, যখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি মানুষের আকর্ষণ তৈরি হয় এবং বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের পথে সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু তার আগেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সহিংসতার ব্যবহারকে[৮৪৯] বোঝার জন্যও একই ধরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। সত্তরের দশকে ইতালির রেড ব্রিগেড, জার্মানির বাদের-মেইনহফ, জাপানে রেড আর্মিকে যাঁরা অনুসরণ করেছেন, সে সব গবেষকও এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। ফলে এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে কখনোই ঘাটতি ছিল না। এই প্রশ্নগুলো নতুন করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর; আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আল-কায়েদার আবির্ভাব, আফগানিস্তানে তালেবানের গ্রহণযোগ্যতা এই প্রশ্নগুলোতে নতুন মাত্রা যোগ করে দেয়।

এই পর্যায়ে রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে ধর্মের প্রশ্ন। কেউ কেউ এই প্রশ্নও তোলেন যে, রাজনৈতিক আদর্শ ও ধর্মের মধ্যে কোনো বিভাজন টানা উচিত হবে কি না। রাজনৈতিক ইসলামের মধ্য থেকে একটি ধারা আগেও সহিংসতাকে তাদের কৌশল হিসেবেই শুধু বেছে নিয়েছিল তা নয়, তারা তাদের কাঙ্খিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় একেই একমাত্র পথ বলেও বিবেচনা করে সে পথেই অগ্রসর হয়েছে।

৮৪৯ . https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html.

তালেবান সেই ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। ২০০১ সালের ঘটনাবলির কারণে তাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হয়। এই ধারার লক্ষ সীমিত বলেই বিবেচিত হওয়া দরকার, কেননা নিজস্ব রাষ্ট্রের মধ্যেই তারা তাদের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অপরপক্ষে দেখা যায় যে, ইসলামের রাজনৈতিক দিককে আশ্রয় করে আরও সংগঠনের আবির্ভাব বা পুনরুত্থান ঘটে, যাদের লক্ষ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রসীমাকে অস্বীকার করে তাদের ভাষায় খেলাফত প্রতিষ্ঠা। একই সঙ্গে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক কাঠামোকে তারা চ্যালেঞ্জ করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। কৌশল ও কর্মপদ্ধতি তাদের জন্য গৌণ বিষয়। হিযবুত তাহ্‌রীর সেই ধারার প্রতিনিধি।

এই ঘটনাপ্রবাহ ইসলামপন্থী রাজনীতির মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধারার জন্ম দেয়, তেমনি এসব ধারার আবেদন বোঝার তাগিদ তৈরি হয়। অবশ্যই এই ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়নি। চলমান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি, অর্থনীতির বিশ্বায়ন, প্রযুক্তির উৎকর্ষ সবই তাকে প্রভাবিত করেছে। ২০১০ সাল নাগাদ দেখা যায় যে, আরও একধরনের সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে, যারা যুদ্ধবিধ্বস্ত কিংবা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত অঞ্চলগুলোয় তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের রাষ্ট্র, যাকে তারা খেলাফত বলে বর্ণনা করে প্রতিষ্ঠা করে এবং সারা পৃথিবীর মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হয়ে ওঠে। নাইজেরিয়ার বোকো হারাম ও ইরাকে ইসলামি রাষ্ট্র এর উদাহরণ। এই ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি ২০০১ সাল থেকে ইসলামপন্থী সহিংস চরমপন্থী সংগঠনগুলো নিয়ে গবেষণার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসব গবেষণার ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত না করে অনেক বিশ্লেষক, রাজনীতিবিদ সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে তাঁদের ধারণাকে প্রকৃত কারণ বলে বর্ণনা করতে শুরু করেন। এই প্রবণতার সবচেয়ে বড় দিক হলো এই যে তাঁরা ধরে নিলেন যেই দারিদ্র হচ্ছে সহিংস চরমপন্থার কারণ এবং সুযোগবঞ্চিত মানুষেরা জঙ্গি সংগঠনের আদর্শের প্রতি আকর্ষিত হয়। তালেবান নেতৃত্ব, পাকিস্তানের বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাংগঠনিক কাঠামো ও আফগান যুদ্ধে পাকিস্তানি কয়েকটি মাদরাসার ভূমিকার ওপরে নির্ভর করে অনেকে মাদরাসাকেই ইসলামপন্থী সহিংস চরমপন্থার উৎস বলে প্রচার করতে থাকে। এসব ধারণা শিগগিরই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে শুরু করে; কেননা দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের অধিকাংশ নেতা কিংবা আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত কিংবা ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত নয়। পরবর্তী কয়েক বছরে গবেষকেরা তাঁদের অতীত গবেষণা, সংগৃহীত তথ্য ইত্যাদির আলোকে কিছু সাধারণ উপসংহারে উপনীত হন। যাতে ধারণা দেওয়া হয় যে সন্ত্রাসবাদের কিছু ভিত্তিগত (আন্ডারলায়িং), অন্যভাবে বললে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল কারণ রয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে আরও সুনির্দিষ্ট, বাস্তবতানির্ভর ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণা কাজের পরে দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরনের মূল কারণ চিহ্নিত করার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন একই রকমের আর্থসামাজিক অবস্থা সবাইকে সন্ত্রাসী করে তুলছে না। তা ছাড়া যারা এই ধরনের সন্ত্রাসী কাজে যুক্ত হয়, তারা কেবল পরিস্থিতির চাপে যোগ দেয় না, ক্ষেত্রবিশেষে কিছুর আকর্ষণে যুক্ত হয়। সেটা বিশেষ করে কোনো নেতার আকর্ষণ হতে পারে, হতে পারে যে এই ধরনের সংগঠন তাকে এমন কিছু দিতে পারে, যা তাকে সমাজের অন্য কোনো সংস্থা, পরিবার বা বন্ধু দিতে পারছে না। তা ছাড়া মানুষ স্বেচ্ছায় অনেক কিছু করে, কেবল পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করে না। সন্ত্রাসের মূল কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টার একটা বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে, ধরে নেওয়া হয় যে সম্ভাব্য সন্ত্রাসীরা কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা দিয়ে প্রভাবিত হয়।

এসব দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে গবেষকেরা গত কয়েক দশকে বিভিন্ন দেশে যেখানে জঙ্গিবাদ প্রসারিত হয়েছে, যেসব ব্যক্তি জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হয়েছে, যেসব জঙ্গি সংগঠন শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে, তাদের ওপর গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে জঙ্গি হয়ে ওঠা এবং জঙ্গিবাদের প্রসারের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় চালকের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো ব্যক্তিকে সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দেয়, সমাজে জঙ্গিবাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে এবং সন্ত্রাসী সংগঠন তৈরি করে। এইা চালিকাগুলোকে ভাগ করা হয়েছে চারটি ভাগে: ক) অভ্যন্তরীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক খ) রাজনৈতিক, গ) সাংস্কৃতিক ও ঘ) বৈশ্বিক।

Dhaka University Institutional Repository

ক) অভ্যন্তরীণ চালকের মধ্যে রয়েছে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্নতা বা প্রান্তিকতা অনুভব করা, সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়া, হতাশার বোধ, অন্যদের তুলনায় বঞ্চিত অনুভব করা। আর অর্থনৈতিকভাবে চরম দৈন্যতা, দারিদ্রতার সীমার নীচে বসবাস ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া।
খ) রাজনৈতিক চালকগুলোর মধ্যে আছে রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, সরকারের কঠোর দমন, নিপীড়ন, হত্যা, গুম, খুন, বিনা বিচারে হত্যা ও সুস্পষ্টভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সর্বব্যাপী দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের দায়মুক্তির ব্যবস্থা, স্থানীয়ভাবে অব্যাহত সংঘাত, সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এলাকা তৈরি হওয়া। গ) সাংস্কৃতিক চালকের মধ্যে আছে এই ধারণা বিরাজ করা বা তৈরি হওয়া যে ইসলাম আক্রমণের বা বিপদের মুখোমুখি, নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হুমকির মুখে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজের ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ বা সমাজে অন্যদের ওপরে নিজের ইসলামি সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়া।
ঘ) বৈশ্বিক চালকের মধ্যে আছে নিজেদের ভিকটিম বলে মনে করা। একার্থে এটি সাংস্কৃতিক চালকের সঙ্গে যুক্ত। ইসলাম বিপদের মুখে এই ধারণার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় যে মুসলিম জনগোষ্ঠী অন্যত্র অন্যায় ও বৈষম্যের শিকার, যদি এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে বিশ্বব্যবস্থা মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য অন্যায্য, তাহলে তা এক শক্তিশালী চালকের ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ছাড়া বৈশ্বিক চালকের আরেকটি হচ্ছে ‘কাছের শত্রু-দূরের শত্রুর ধারণা। যখন অভ্যন্তরীণভাবে দেশের ভেতরে নিপীড়ন বৃদ্ধি পায়, যখন কাছের শত্রুকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় না, তখন দেশের বাইরে দূরের শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের অভিযান চালানোর আগ্রহ তৈরি হয়। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শত্রু বলে বিবেচনা করে, তার কারণগুলোর মধ্যে নিপীড়ক সরকারগুলোর প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সমর্থন অন্যতম বলেই তাদের দলিলপত্র, প্রচারণা ও সদস্য সংগ্রহের প্রচারণায় স্পষ্ট। এই চালকগুলো একক ও সম্মিলিতভাবে কাজ করে এবং সব জায়গায় সবগুলো না থাকলেও তার কার্যকারিতা অক্ষত থাকে বলেই দেখা গেছে। আজ যখন বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেট (আইএস) বা আল-কায়েদার মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সে সময় বোঝা দরকার কোন ধরনের পরিস্থিতিতে কোন ধরনের চালক দেশীয় বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের জন্য অনুকূল অবস্থার জন্ম দেয়। জঙ্গিবাদ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হলে এসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলার ইতিহাস

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলার ইতিহাস স্বল্প পরিসরের হলেও তার নিঃসংশতা ও ভয়াবহতা অত্যন্ত মারাত্মক। যা গুলশানে নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে দেশে জঙ্গিবাদ এক ভয়ংকর স্তরে পৌঁছেছে। ব্যক্তি, আক্রমণ, লক্ষবস্তু ও অস্ত্রের ধরণ বিশ্লেষণ করে একে দেশে বিপজ্জনক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের তৃতীয় পর্যায় বলা যায়। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের গোড়াপ্তিত্তন হয়েছিল গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুতে আফগান ফেরত মুজাহিদদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র গোষ্ঠীর কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে জঙ্গিদের তৎপরতার সময়টাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. আশির দশকের মধ্যভাগে জন্ম নেওয়া মুসলিম মিল্লাত বাহিনী।
২. শেষ দিকে জন্ম নেওয়া হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশকে (হুজি-বি) এ দেশে প্রথম প্রজন্মের জঙ্গি সংগঠন বলা যায়।
৩. এর এক দশক পর জন্ম নেয় জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), যার লক্ষ ছিল

দেশে শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করা। জেএমবির জন্মের ঠিক এক দশক পর উত্থান ঘটে বর্তমানে সক্রিয় দুই জঙ্গিগোষ্ঠীর। এর একটি ব্লগার হত্যার ঘটনায় জড়িত আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বা আনসার আল ইসলাম। তারা আল-কায়েদার অনুসারী। অপর গোষ্ঠীকে পুলিশ বলছে নব্য জেএমবি। তবে তারা নিজেদের ইসলামিক স্টেট বা আইএস বলে দাবি করে। এই দুই গোষ্ঠীতেই মাদরাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাও যুক্ত হয়েছেন, যার একটি রূপ দেখা গেছে গুলশানে।[৮৫০]

সূচনায় মুসলিম মিল্লাত বাহিনী

তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায়, আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশি মুজাহিদদের প্রত্যাবর্তনের আগে, ১৯৮৬ সালে মুসলিম মিল্লাত বাহিনী গঠন করেন চাকরিচ্যুত সেনা কর্মকর্তা মতিউর রহমান।[৮৫১] এর কয়েক বছর আগে কিছুসংখ্যক বাংলাদেশি ফিলিস্তিনে গিয়েছিলেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে লড়াই করতে। এ জন্য তাঁরা ভাতাও পেয়েছিলেন। একই সময়কালে ফ্রিডম পার্টিও অনেককে প্রশিক্ষণের জন্য লিবিয়ায় পাঠিয়েছিল। মুসলিম মিল্লাত বাহিনীর প্রধান চাকরিচ্যুত মেজর মতিউর রহমান মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে এসে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার শিমুলিয়ায় নিজ গ্রামে আস্তানা গড়ে তোলেন। পাঁচ একরের ওই আস্তানায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু করেন। কিন্তু এলাকায় তিনি পীর মতিউর নামে পরিচিতি পান। পাকুন্দিয়ার ওই আস্তানায় সদস্যদের থাকার জন্য ১৩১টি ঘর ও বেশ কিছু তাঁবু এবং ৬১টি পরিখা (বাংকার) তৈরি করা হয়েছিল। ছিল নিজস্ব জেনারেটরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। একটা মাদরাসাও করা হয়েছিল সেখানে। নাম শিমুলিয়া ফরজে আইন মাদরাসা। তার ফরজে কেফায়া বিভাগে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। ওই প্রতিষ্ঠানের তিন শতাধিক ছাত্রের সবাই ছিল কুমিল্লা, যশোর, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর, মাগুরা, কুষ্টিয়া ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার। ১৯৮৯ সালের ১২ ডিসেম্বরে পুলিশ পীর মেজর (অব.) মতিউর রহমানের আস্তানায় অভিযান চালাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ হয়। আড়াই দিন ধরে চলে ওই বন্দুকযুদ্ধ। এতে পুলিশের দুই সদস্যসহ ২১ জন নিহত হন। আহত হন ২০ জন। পুলিশের পাঁচ শতাধিক সদস্য ওই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মর্টারের গোলাবর্ষণও করতে হয়েছিল। আহত অবস্থায় পালাতে গিয়ে পীর মতিউর ও তাঁর ৪৮ সঙ্গী গ্রেপ্তার হন। তাঁর আস্তানা থেকে রাইফেল, রিভলবার, বন্দুক, তির-ধনুক, বল্লম, লাঠি, তলোয়ারসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-গুলি, খাকি পোশাক ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হয় ২৭টি পাসপোর্ট, যেগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ভিসা ছিল। দেশে ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর সশস্ত্র তৎপরতার ওটাই ছিল প্রথম বহিঃপ্রকাশ। পীর মতিউর রহমানের গ্রেপ্তারের পর মুসলিম মিল্লাত বাহিনীর আর কোনো তৎপরতার খবর পাওয়া যায়নি। যদিও মতিউর রহমান পরবর্তী সময়ে জামিনে বেরিয়ে যান। এরপর তাঁর গতিবিধির ওপর কোনো নজরদারি করা হয়নি। একটি গোয়েন্দা তথ্যে বলা হয়েছে যে, কয়েক বছর আগে সর্বশেষ জানা গিয়েছিল, মতিউর রহমান তাঁর দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রীকে নিয়ে রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বসবাস করছেন। তবে এর পর শত চেষ্টা করেও তাঁর সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।[৮৫২]

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি-বি)

বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি ওয়াকিবহাল বিভিন্ন সূত্র ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার নথি, গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও সংগঠনগুলোর নিজস্ব মুখপত্র, পুস্তিকা পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, আফগান যুদ্ধ চলাকালে এ দেশ থেকে প্রকাশ্যে মুজাহিদ সংগ্রহ করা হয়েছিল। তখন ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সামনে ব্যানার টানিয়েও সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধের শেষের দিকে আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তের খোস্ত রণাঙ্গনে হুজির জন্ম হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, যেখানে বা যে দেশে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ হবে, সেখানে মুজাহিদ পাঠানো। বাংলাদেশে সংগঠনটির শাখা খোলা হয়েছিল মিয়ানমারের আরাকানে স্বাধীনতাকামী রোহিঙ্গা মুসলমানদের হয়ে লড়াই করার জন্য। ১৯৮৯ সালে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি-বি) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যশোরের মনিরামপুরের মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী। কিন্তু ওই বছরই আফগানিস্তানের

---

৮৫০. দৈনিক প্রথম আলো, *বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস*, https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html.

৮৫১. দৈনিক কালের কণ্ঠ, পীর মতিউর রহমান ও তাঁর মুসলিম মিল্লাত বাহিনী, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ. ৪ (https://www.kalerkantho.com/print-edition/s.s.c-prostoti-sonkha/2011/02/19/131454)

৮৫২. https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html.

খোস্তে মাইন অপসারণের সময় মাওলানা ফারুকী নিহত হন। পরে ১৯৯২ সালে ৩০ এপ্রিল ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করে হুজি-বি। আফগানফেরত মুজাহিদদের বেশির ভাগই এর সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁরা ছিলেন এ দেশে ভারতের দেওবন্দ ধারার মাদরাসায় শিক্ষিত এবং হানাফি মাজহাবের। তবে সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অনেকে পাকিস্তানের বিভিন্ন মাদরাসায় লেখাপড়া করেছিলেন। আফগান যুদ্ধের সময় তাঁরা গেরিলাযুদ্ধ ও ভারী অস্ত্র চালনায় প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। এই নেতাদের গড়া সংগঠন হুজি-বিকে এ দেশে জঙ্গি তৎপরতার গোড়াপত্তনকারী বলে মনে করা হয়। সংগঠনের শুরুর দিকে এসব আফগান মুজাহিদ ছিলেন এ দেশে দেওবন্দ ধারার কওমি মাদরাসার ছাত্রদের কাছে বিরাট শ্রদ্ধার পাত্র। আর সেই ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা আরাকানের মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে দেশের বিভিন্ন মাদরাসা থেকে সদস্য সংগ্রহ শুরু করেন। তাঁরা বাছাই করা সদস্যদের জন্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবানের পাহাড়ি এলাকায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। এসব প্রশিক্ষণকেন্দ্র নিয়ে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে নানা খবর বের হয়েছিল। '[৮৫৩] ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছিল হুজি-বির উত্থান ও বিস্তারপর্ব। হুজি-বির সমসাময়িক সময়ে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকায় সংগঠিত ও সক্রিয় হয় রোহিঙ্গাদের দুই সশস্ত্র সংগঠন আরএসও (রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন) ও এআরএনও (আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন)। হুজি-বি ও রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরা ছিল একে অন্যের সহযোগী। তখন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহযোগিতার নামে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিভিন্ন এনজিও থেকে বিপুল অর্থসাহায্যও এসেছিল বলে পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমে খবর বের হয়। ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৫ সালে নাইক্ষ্যংছড়ির জঙ্গল থেকে বিডিআর-র‍্যাব বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র উদ্ধার করেছিল, যা রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলোর বলে ধারণা করা হয়।[৮৫৪]

ওই সময় মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধানকালে হুজির বিষয়ে ওয়াকিবহাল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছিল, ১৯৯৮ সালের দিকে আরাকানভিত্তিক সংগঠনগুলোতে আর্থিকসহ নানা বিষয়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধ তৈরি হয়। ওই সময় থেকে হুজি-বি আরাকান থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেশের ভেতরে তৎপরতা বাড়ায়। সংগঠনটি প্রথম নাশকতামূলক বোমা হামলা করে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ ওই হামলায় ১০ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। কিন্তু তখন পর্যন্ত এ ধরনের জঙ্গিগোষ্ঠীর বিষয়ে দেশবাসীর তেমন কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তখনকার সরকারও এ মামলায় প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল বিএনপির নেতা তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্যদের আসামি করে তদন্ত শেষ করে। উদীচীর হামলার সাত মাসের মাথায় ৮ অক্টোবর খুলনায় আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলায় আটজন নিহত হন। তারপর ২০০০ সালের ২০ জুলাই গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এর জনসভাস্থলের কাছে ও হেলিপ্যাডে বোমা পেতে রাখার ঘটনা ধরা পড়ার পর প্রথম হরকাতুল জিহাদ ও মুফতি হান্নানের নাম জানাজানি হয়। তবে মুফতি হান্নানকে তৎকালীন সরকার গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এরপর ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে রমনার বটমূলে, ৩ জুন গোপালগঞ্জের বানিয়ারচরে গির্জায়, ১৬ জুন নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বোমা হামলা হয়।

চার দলীয় জোট সরকার আমলে ২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি হবিগঞ্জে সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়াকে হত্যা করা পর্যন্ত হুজি-বি ৬ বছরে দেশে ১৩টি বোমা ও গ্রেনেড হামলা চালায়। এতে মোট ১০৯ জন নিহত হন। আহত হন ৭০০ জনের বেশি মানুষ। অনেকে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যান। এর মধ্যে হুজি-বির জঙ্গিরা সবচেয়ে বড় ভয়াবহ হামলা চালায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকায় তখনকার বিরোধীদলীয় নেত্রীর জনসভায়। ওই গ্রেনেড হামলায় ২২ জন নিহত হন। আহত হন বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ কয়েক শ নেতা-কর্মী। এ ঘটনার পর আর্জেস গ্রেনেড আলোচনায় আসে। একই ধরনের গ্রেনেড ব্যবহার করে ২০০৪ সালের ২১ মে সিলেটে হজরত শাহজালালের (রহ.) মাজারে তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। পরে তদন্তে

---

[৮৫৩] . https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/24140 , ২০ জানুয়ারী ২০১৫

[৮৫৪] . দৈনিক প্রথম আলো, *বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস*, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ. ১

বেরিয়ে আসে যে এসব গ্রেনেডের চালান এসেছিল পাকিস্তান থেকে। পরবর্তী সময়ে মুফতি হান্নানসহ একাধিক জঙ্গিনেতা আদালতে জবানবন্দিতে বলেছেন, এসব গ্রেনেড এসেছিল পাকিস্তান থেকে। আনোয়ার চৌধুরী ছাড়া বাকি হামলার বেশির ভাগই ছিল তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ তাঁর দলীয় নেতাদের লক্ষ করে। কিন্তু আগের ১৪ দলীয় মহাজোট সরকারের মতো পরে চার দলীয় জোট সরকারও এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। উপরন্তু ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় জজ মিয়া নাটক সাজিয়ে তদন্তকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করে চার দলীয় জোট সরকার। যদিও এসব হামলার প্রধান পরিকল্পনাকারী মুফতি হান্নানকে তৎকালীন চারদলীয় সরকারের আমলেই ২০০৫ সালের ১ অক্টোবর ঢাকার বাড্ডার আস্তানা থেকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁকে টানা ১২০ দিন রিমান্ডে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আর তখনই মুফতি হান্নান ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার কথা স্বীকার করে এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নাম বলেছিলেন। কিন্তু র‍্যাব বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তা গোপন করে।'[৮৫৫] মামলাটি ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টার শুরু থেকেই এ বিষয়সহ হুজি-বির তৎপরতার বিষয়ে পত্রিকায়[৮৫৬] টানা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে থাকে পুরো তথ্য। পরে ২০০৭ সালে এক-এগারোর পটপরিবর্তনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে ২১ আগস্ট মামলার নতুন করে তদন্তের উদ্যোগ নেয়। ২০০৮ সালে মুফতি হান্নান, চার দলীয় জোট সরকারের উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, তাঁর ভাই মাওলানা তাজউদ্দিনসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় সিআইডি। পরে ২০০৯ সালে ১৪ দলীয় মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে অধিকতর তদন্ত করিয়ে চার দলীয় জোট সরকারে নেতা তারেক রহমান, জামায়াত নেতা আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাসহ আরও ৩০ জনকে আসামি করে। মামলাটির বিচার কার্য সমাপ্ত করে। ২০০৭ সালে হুজি-বি যখন প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসার চেষ্টা করছিল তখন এর আমির মাওলানা আবদুস সালাম দাবি করেছিলেন, ১৯৯৮-৯৯ সালে হুজি-বি তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল-

ক) যার একাংশের নেতৃত্বে ছিলেন গোপালগঞ্জের মুফতি আবদুল হান্নান।

খ) আরেক অংশের নেতৃত্বে ছিলেন মাদারীপুরের মুফতি আবদুর রউফ।

গ) আর হুজির মূলধারাটি আবদুস সালাম, সিলেটের হাফেজ ইয়াহিয়া, কিশোরগঞ্জের মুফতি শফিকুল ইসলাম, কুমিল্লার আবদুল হাই, খুলনার শেখ ফরিদদের নেতৃত্বে ছিল। আবদুস সালাম গ্রেপ্তারের পর পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদেও তিনি এমনটা দাবি করেছিলেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে মুফতি হান্নান হুজি নামেই তৎপরতা চালালেও মুফতি রউফের সংগঠনের সর্বশেষ নাম ছিল তাআমির উদ-দীন বাংলাদেশ। অবশ্য হুজির মূলধারার দাবিদার অংশের নেতারা বিভিন্ন সময়ে দাবি করেছিলেন, মুফতি হান্নান হুজি নামে তৎপরতা চালালেও তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল মুজাহিদীনের যোগাযোগ ছিল। আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলাকালে হান্নান পাকিস্তানে হরকাতুল মুজাহিদীনের সঙ্গে যুক্ত হন বলে তাঁদের দাবি। হুজি-বির বিষয়ে ওয়াকিবহাল একাধিক সূত্রের দাবি, মুফতি হান্নান ও তাঁর সংগঠন একটা পর্যায়ে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ও পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তাইয়্যেবার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আর এ ক্ষেত্রে চার দলীয় জোট সরকারের উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুর ভাই মাওলানা তাজউদ্দিন ছিলেন একজন সমন্বয়ক। এ জোট সরকারের আমলে প্রভাবশালী একটি গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের কেউ কেউ হুজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার তদন্তে এমন তথ্য-প্রমাণ মেলায় কয়েকজন কর্মকর্তাকে আসামি করা হয় এবং কয়েকজন রাজসাক্ষী হন। হুজির নেতারা তিন ভাগে ভাগ হওয়ার দাবি করলেও ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার তদন্তে যুক্ত সিআইডির একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার মতে, ভেতরে ভেতরে তাঁরা সবাই ছিলেন এক। ২০০১-২০০৬ সালে তৎকালীন সরকার জঙ্গিগোষ্ঠীর বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা, ক্ষেত্রবিশেষে সহযোগিতার* অভিযোগ প্রকট ছিল। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট জেএমবি দেশব্যাপী বোমা হামলা চালানোর পর তৎকালীন সরকার জঙ্গিবিরোধী অভিযানে সক্রিয় হয়।'[৮৫৭] এরপর জেএমবির শীর্ষ নেতাদের প্রায় সবাইকে গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায়

---

[৮৫৫]. বিডিনিউজ২৪ডটকম, প্রাগুক্ত

[৮৫৬]. দৈনিক প্রথম আলো, *বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস*, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ. ২

[৮৫৭]. ঢাকা টাইমস, ১৭ আগস্ট ২০২১

আনে। কিন্তু মুফতি হান্নান ছাড়া হুজির আর কোনো উল্লেখযোগ্য নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি তখন। হুজির নেতাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখার বিষয়েও পত্রিকায়[৮৫৮] বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় ২০০৫ সালে।

এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে হুজির মূলধারার দাবিদার অংশ ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। হুজি-বিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ২০০৫ সালের অক্টোবরে। এরপর তৎকালীন সরকারের শেষ দিকে এক দফা ব্যর্থ হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে হুজি একটি গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকর্তার পরামর্শে আবার নাম পাল্টে ইসলামি গণ-আন্দোলন বা আইডিপি নামে প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসার চেষ্টা করে। তারা পল্টনে দলীয় কার্যালয় খোলে এবং নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে। তখন পত্রিকায় এ নিয়ে খবর প্রকাশের পর বিষয়টি আলোচনায় আসে। মার্কিন দূতাবাস থেকেও এ দলটির নিবন্ধনের বিষয়ে আপত্তি দেওয়া হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত দলটি কমিশনের নিবন্ধন পায়নি। ২০০৯ সালে তৎকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক বছরের মধ্যে হুজির কথিত মূলধারাসহ তিন অংশেরই প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গিরা গ্রেপ্তার হন। মূলত এরপর এ দেশে হুজি বা প্রথম প্রজন্মের জঙ্গি দলটির যুগের সমাপ্তি ঘটে। যদিও মাঝে হুজির কারাবন্দী নেতা মাওলানা আবু সাঈদ ওরফে আবু জাফরের কিছু অনুসারী নতুন নামে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরা সবাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান।

বিদেশী ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, ইসলামি জঙ্গি তৎপরতার ব্যাধিটির জন্ম পাকিস্তানের করাচি ও খোস্তে। এখন তা পাচার হয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই সর্বত্র পাকিস্তানি প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।* নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ স্টাডিজের রিসার্চ ফেলো শাফকাত মুনীর প্রথম আলোকে বলেন, আফগান ফেরত মুজাহিদরা কেবল বাংলাদেশে নয়, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, চেচনিয়াসহ নানা দেশে জঙ্গিগোষ্ঠী তৈরি করে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করেছিল। তারা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কতটা হুমকি হতে পারে তা ১৯৯৯ সাল থেকে হুজি-বির নাশকতার পর থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, তার আগে ১৯৯৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট জিহাদের যে ডাক দিয়েছিল, যেটা আল-কায়েদা সনদ হিসেবে পরিচিত, তাতে ফজলুর রহমান নামে এক বাংলাদেশির সই ছিল। সেই ফজলুর রহমান কে-তা এখনো জানা যায়নি। শাফকাত মুনীর বলেন, এখন দেশে যে জঙ্গিবাদ চলছে, তা বুঝতে এর অতীতটা পর্যালোচনা করতে হবে। আফগান যুদ্ধে কতজন বাংলাদেশি অংশ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে কতজন হুজি-বিতে যোগ দিয়েছিল, বাকিরা কোথায় আছে, এ সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।[৮৫৯]

জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ

হরকাতুল জিহাদের (হুজি-বি) জন্মের এক দশক পর ১৯৯৮ সালে জন্ম নেয় জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই জঙ্গি সংগঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সালাফি মতাদর্শী উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। জেএমবি সাড়ে চার বছরে দেশে ২৬টি হামলা চালায়। এসব ঘটনায় ৭৩ জন নিহত এবং প্রায় ৮০০ জন আহত হন। একই সময়কালে হরকাতুল জিহাদও (হুজি-বি) বেশ কয়েকটি নাশকতামূলক হামলা চালায়। সব মিলিয়ে তখন দেশে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তান-আফগানিস্তানকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন হুজি ও জেএমবির মধ্যে ধর্মীয় মাজহাবগত পার্থক্য রয়েছে। হুজি সদস্যরা ছিলেন হানাফি মাজহাবের এবং দেওবন্দ ধারার কওমি মাদরাসা থেকে লেখাপড়া করা। আর জেএমবির সদস্যরা বেশির ভাগ এসেছেন মাদরাসা বোর্ডের অধীনে থাকা মাদরাসা থেকে এবং আহলে হাদিস ধারার মাদরাসা থেকে। জেএমবির নেতা-কর্মীরা সবাই এসেছেন আহলে হাদিস বা লা মাজহাবি (মাজহাববিরোধী) ধারা থেকে। প্রতিষ্ঠাকালীন শীর্ষ নেতাদের একজন মো. ফারুক হোসেন ওরফে

---

৮৫৮. https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html.

৮৫৯. দৈনিক প্রথম আলো, *বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস*, https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html.

Dhaka University Institutional Repository

খালেদ সাইফুল্লাহ ছিলেন হানাফি মাজহাবের এবং সাবেক হুজি সদস্য। তিনি জেএমবিতে আসার আগে আহলে হাদিস মতাদর্শ গ্রহণ করেন।

আহলে হাদিস ধারাটি আগে ওহাবি নামে বেশি পরিচিত ছিল। মধ্যপ্রাচ্যসহ বহির্বিশ্বে তারা সালাফি হিসেবে পরিচিত। ধারাটি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হলেও মধ্যপ্রাচ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সৌদি আরবের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে সালাফি ধারার জিহাদি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ধারণা পান বা আগ্রহী হন জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শায়খ আবদুর রহমান। জেএমবির লক্ষ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। তারা ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে ৫০০ বোমা ফাটিয়ে প্রচারপত্রে বলেছিল, তারা এ দেশে আল্লাহর আইন বা শরিয়া আইন বাস্তবায়ন করতে চায়।'[৮৬০] জেএমবিকে হোমগ্রোন বা দেশজ সংগঠন বলা হলেও শুরু থেকেই এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ রহমানের লক্ষ ছিল আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের সহযোগিতা নিয়ে এ দেশে সশস্ত্র লড়াইয়ের ক্ষেত্র তৈরি করা। এর মধ্যে পাকিস্তান, ভারত ও যুক্তরাজ্যকেন্দ্রিক সালাফি মতাদর্শের একাধিক সংগঠনের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপনও করেছিলেন। নিজে অস্ত্র ও বিস্ফোরকের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন পাকিস্তানে জঙ্গিদের একটি আস্তানায়। গ্রেপ্তার থাকা অবস্থায় তিনি এর বিস্তারিত বিবরণ দেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে।'[৮৬১]

শায়খ আবদুর রহমানের বাড়ি জামালপুরের চরশী এলাকায়। বাবা মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফজল ছিলেন আহলে হাদিস মতাদর্শীদের কাছে একজন প্রখ্যাত আলেম ও জনপ্রিয় বক্তা। শায়খ রহমান জামালপুরের কামাল খান হাট সিনিয়র মাদরাসা থেকে ১৯৭৮ সালে ফাজিল (স্নাতক সমমান) পাস করেন। রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ ইসলামিয়া মাদরাসায় তিনি কামিল পড়েন। ১৯৮০ সালে বৃত্তি নিয়ে চলে যান মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে।'[৮৬২] সেখান থেকে তিনি লিসান্স* ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে আসেন ১৯৮৫ সালে। ২০০৬ সালের ২ মার্চ গ্রেপ্তার হওয়ার পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে শায়খ আবদুর রহমান বলেছেন, 'সৌদি আরবে থাকাকালীন মিসরভিত্তিক মুসলিম ব্রাদারহুডের* সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। বিশ্বজুড়ে জিহাদি কর্মকাণ্ড পরিব্যাপ্ত হওয়ার কারণে বাংলাদেশেও ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যম

হিসেবে জিহাদকে বেছে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি। পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশে ফিরে এসে জামায়াতে ইসলামীর কার্যপদ্ধতি তথা গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে আমার নীতিগত পার্থক্যের কারণে আমি তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে না পেরে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশে ইসলামিক আইন কায়েমের জন্য আলাদা জিহাদি সংগঠন তৈরির পরিকল্পনা করি। দেশে ফেরার পর শায়খ রহমান প্রথমে জামালপুরে তাঁর শ্বশুরের প্রতিষ্ঠিত মির্জা কাশেম সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানে একটি সাবান কারখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর ১৯৮৬ সালে সৌদি দূতাবাসে চাকরি নেন তিনি। সেখানে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চাকরি করেন। এরপর কখনো সারের ব্যবসা, কখনো বিদেশ থেকে ছোলা ও মসুরের ডাল আমদানি, কখনো আরবি অনুবাদ প্রতিষ্ঠান এমন নানা ব্যবসা করেন। ব্যবসার আড়ালে জিহাদি সংগঠন করার প্রাক-প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন ছদ্মনামে জিহাদি বই লেখা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে এসব বই জেএমবির সদস্যদের পাঠ্য ছিল। জেএমবি প্রতিষ্ঠার আগে শায়খ আবদুর রহমান ১৯৯৫ সালে হরকাতুল জিহাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। জবানবন্দিতে তাঁর ভাষ্য ছিল এমন প্রাথমিকভাবে আমার হরকাতুল জিহাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ধর্মীয় মতাদর্শগত, বিশেষত মাজহাবি পার্থক্যের কারণে আমি হরকাতুল জিহাদ সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার প্রাথমিক চিন্তাধারা থেকে সরে এসে নিজস্ব দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিই। সংগঠন তৈরির প্রস্তুতিপর্বে শায়খ রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ভারতের জঙ্গিনেতা আবদুল করিম টুন্ডার সঙ্গে। শায়খ রহমানের ভাষ্য অনুযায়ী, তখন ঢাকার যাত্রাবাড়ী

---

৮৬০. বাংলানিউজ২৪ডটকম, ১৭ আগস্ট ২০২০ (https://www.banglanews24.com/national/news/bd/806253.details.)

৮৬১. *প্রাগুক্ত*

৮৬২. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৭ আগস্ট ২০১৭, ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলা, (https://www.kalerkantho.com/print- edition/sub- editorial/2017/08/17/532604)

আহলে হাদিস মতাদর্শের বড় মাদরাসার পাশে একটি ছাত্র মেসকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করতেন পাকিস্তানের ভয়ংকর জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তাইয়্যেবার নেতা টুন্ডা। ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে টুন্ডার ব্যবস্থাপনায় বিমানযোগে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে যান শায়খ আব্দুর রহমান। এরপর তাঁকে লাহোরে অবস্থিত মার্কাজ আদ-দাওয়া ওয়াল ইরশাদের* প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে যান টুন্ডা। সেখান থেকে পরে মুজাফফরাবাদে গিয়ে লস্কর-ই-তাইয়্যেবার প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ২০ দিন অস্ত্র, বিস্ফোরক, রণকৌশল ও গোপনীয়তা রক্ষার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন তিনি।[৮৬৩] জবানবন্দিতে শায়খ আব্দুর রহমান বলেছেন, ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে জেএমবি প্রতিষ্ঠা করেন আবদুর রহমান। ২০০২ সালের প্রথম দিকে আবার পাকিস্তানে যান তিনি। সেখানে লস্কর-ই-তাইয়্যেবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত আমির আবদুস সালাম ভাট্টিসহ অন্যান্য নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁদের জেএমবির গঠনতন্ত্র, লক্ষ ও কর্মসূচিসংবলিত আরবিতে লেখা চার পৃষ্ঠার একটি লিখিত পুস্তিকা দেন শায়খ রহমান। ওই পুস্তিকায় বাংলাদেশে কেন কিতাল বা জিহাদ প্রয়োজন, তার কারণ উল্লেখ করা হয়। কারণগুলো হলো-

১. বাংলাদেশে ইসলামি হুকুমত কায়েম নেই
২. ভারতের আগ্রাসী মনোভাব
৩. বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের তৎপরতা
৪. সারা দেশে বিভিন্ন পশ্চিমা মিশনারির ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড । জেএমবি প্রতিষ্ঠা করে নিজেই আমির হন শায়খ আব্দুর রহমান।[৮৬৪] ঢাকার খিলগাঁওয়ে একটি ভাড়া বাসায় বসে প্রথম শূরা কমিটি হয়। তাতে শায়খ আবদুর রহমান ছাড়া বাকি সদস্যরা ছিলেন খালেদ সাইফুল্লাহ, হাফেজ মাহমুদ, সালাউদ্দিন, নাসরুল্লাহ, শাহেদ বিন হাফিজ ও টাঙ্গাইলের রানা। অবশ্য পরে শাহেদ বিন হাফিজ ও রানা মতবিরোধের কারণে দল ছাড়েন। ২০০১ সালে শুরা কমিটিতে যুক্ত হন ফারুক হোসেন ওরফে খালেদ সাইফুল্লাহ, আসাদুজ্জামান হাজারী, আতাউর রহমান সানি (শায়খ রহমানের ভাই), আবদুল আউয়াল (জামাতা) ও সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই। তাঁদের মধ্যে ২০০২ সালে নাসরুল্লাহ রাঙামাটিতে বোমা বিস্ফোরণে মারা যান। ২০০৩ সালে আসাদুজ্জামান হাজারী অসুস্থতার কারণে সংগঠন ছেড়ে দেন। অন্যদের মধ্যে এখন সালাহউদ্দিন ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। সালাহউদ্দিনকে ২০১৪ সালে ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রিজনভ্যানে হামলা করে ছিনিয়ে নেয় জঙ্গিরা।[৮৬৫] জেএমবি দেশকে মোট ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করে কার্যক্রম শুরু করে। মূলত আহলে হাদিস-অধ্যুষিত এলাকায় দাওয়াতি কাজ বা সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কাজ শুরু হয়। উত্তরাঞ্চলের ১৫ জেলার বাইরে জামালপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ ও সাতক্ষীরার কিছু এলাকায় আহলে হাদিস মতাদর্শের লোকজনের বসবাস। তাই প্রথম কয়েক বছরে আবদুর রহমানসহ শুরা সদস্যরা এসব এলাকা চষে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন আহলে হাদিস মসজিদ ও মাদরাসায় বক্তৃতা করেছেন। ২০০৪ সাল থেকে পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে এই ওই সব এলাকা ঘুরে এমন তথ্য বেরিয়ে আসে।

শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মূলত ওই সব এলাকার আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের একটি অংশের ওপর ভর করেই জেএমবির বিস্তার লাভ করেছে। এর মধ্যে বগুড়া, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রংপুর থেকে সবচেয়ে বেশি সদস্য সংগ্রহ করেছে বর্তমানে নিষিদ্ধ এই সংগঠন। প্রশিক্ষণকেন্দ্রও গড়ে তোলে এসব এলাকার চরাঞ্চলে। তিন ধরনের প্রশিক্ষণ শেষে বাছাই করা সদস্যদের বোমা তৈরি ও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। সদস্য সংগ্রহের পর প্রত্যেকের ছদ্মনাম বা সাংগঠনিক নাম দেওয়া হয়। এরপর কাট আউট পদ্ধতিতে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে কার্যক্রম চালানো হয়। বার্তা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নানা কোড শব্দ ব্যবহার করে জেএমবি। আর এসব সাংগঠনিক গোপনীয়তা রক্ষার কৌশল লস্কর-ই-তাইয়্যেবা থেকেই শিখেছেন বলে শায়খ আবদুর রহমান জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন।

---

৮৬৩ . https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html .
৮৬৪ . দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ (https://www.bd-pratidin.com/various/2013/12/15/32249)
৮৬৫ . দৈনিক প্রথম আলো, *বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস*, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬,

কারও দায়িত্ব বা কর্ম এলাকা যতবার পাল্টায়, ততবার নতুন নতুন ছদ্মনাম ধারণ করতেন তাঁরা। শায়খ রহমানের নিজের ছদ্মনাম ছিল এহসান। শুরুর দিকে তাঁরা কয়েকজন বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি পাহাড়ে রোহিঙ্গা জঙ্গিগোষ্ঠীর ক্যাম্পে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র চালনা শিখে এসেছিলেন। বিনিময়ে তাঁদের বোমা তৈরির (আইইডি) প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

অবশ্য জেএমবির প্রথম পর্বে আগ্নেয়াস্ত্রের খুব একটা ব্যবহার ছিল না। তারা মূলত বোমার ব্যবহার করেছে, যার বেশির ভাগ উপাদান দেশ থেকে নেওয়া। বিস্ফোরক জেলসহ কিছু কিছু উপাদান ভারত থেকে সংগ্রহ করা হতো। শায়খ রহমান বলেছেন, তাঁরা কিছু ওয়ান শুটারগান (হাতে তৈরি দেশীয় অস্ত্র) ভারত থেকে এনেছিলেন। এর বাইরে বাংলা ভাই একটি এসএমজি ব্যবহার করতেন, সেটা বাগমারায় চরমপন্থীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। জেএমবির প্রথম পর্বে, অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ফাঁসির আগ পর্যন্ত কত সদস্য ছিলেন, তার কোনো প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না। চার দলীয় জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে কখনো ৫ হাজার, কখনো ২৫ হাজার সদস্য থাকার কথা বলা হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করেন, এমন ব্যক্তিদের তখনকার ধারণা ছিল, এহসার (সার্বক্ষণিক কর্মী), গায়রে এহসার (সাধারণ সদস্য বা সমর্থক) ও তাঁদের স্ত্রীদের সদস্য হিসেবে ধরলে মোট সদস্য ৫ হাজার হতে পারে। এর মধ্যে ২০০৫ সালে দেশব্যাপী বোমা হামলার পর সাত শতাধিক গ্রেপ্তার হন।[৮৬৬] ২০০২ সালে ভারতের মালদহে জেএমবির ৬৫তম কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির সহায়তায় ভারত থেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করা হতো বলে পরে জঙ্গিনেতারা জবানবন্দিতে বলেছেন। ২০১৪ সালে ভারতের বর্ধমান বিস্ফোরণের ঘটনার পর সে দেশে জেএমবির উপস্থিতির কথা আলোচনায় আসে। ২০০৫ সালে একযোগে ৬৩ জেলায় বোমা ফাটিয়ে ও প্রচারপত্র ছড়িয়ে আনুষ্ঠানিক জানান দেওয়ার আগ পর্যন্ত জেএমবি খুব একটা পরিচিত ছিল না মানুষের কাছে। যদিও এর আগের বছর ২০০৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে রাজশাহীর বাগমারা ও পাশের দুই জেলার দুই উপজেলা রানীনগর ও আত্রাইয়ে কথিত বাম চরমপন্থী দমনে বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে অভিযানের পর থেকে দেশ-বিদেশের গণমাধ্যমে এই উগ্র গোষ্ঠীর তৎপরতার কথা আসছিল। তখন তারা জেএমবি নামটি প্রচার করেনি। তখন তারা নাম বলেছিল জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ বা জেএমজেবি।'[৮৬৭]

তবে পরবর্তী সময়ে প্রথম আলোর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বাস্তবে জেএমবির প্রথম নাশকতার শুরু ২০০১ সালে। ওই বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরার রক্সি সিনেমা হল ও সার্কাস মাঠে বোমা হামলা চালায় তারা। এতে ৩ জন নিহত ও প্রায় ১০০ জন আহত হন। এরপর ২০০২ সালের ১ মে নাটোরের গুরুদাসপুরে কিরণ সিনেমা হলে ও ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে চারটি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। তারা ২০০৫ সালের ১৭ আগস্টের আগ পর্যন্ত ১৮টি ঘটনা ঘটায়। তারপরও তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের টনক নড়েনি। বরং তারা দেশে জঙ্গি নেই, এসব মিডিয়ার (গণমাধ্যম) সৃষ্টি বলে দায় এড়াতে চেয়েছিল । বিস্ময়করভাবে ময়মনসিংহের সিনেমা হলের বোমা হামলা মামলায় আসামি করা হয় শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন, সাবের হোসেন চৌধুরীর মতো ব্যক্তিদের। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এসে জেএমবি উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি শুরু করে। এ নিয়ে দেশে-বিদেশের চাপের মুখে তৎকালীন সরকার ২০০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জেএমবি ও জেএমজেবিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৮৬৮]

জেএমবির প্রধানের দাবি, তাঁদের দলে আলাদা করে আত্মঘাতী বা ফিদায়ি ইউনিট ছিল না। তবে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সদস্য ফিদায়ি (আত্মঘাতী) হতে উদ্বুদ্ধ হয়।'[৮৬৯] জেএমবির নেতাদের ধারণা ছিল, ১৭ আগস্ট হামলায় ব্যবহৃত বোমায় যেহেতু স্প্লিন্টার দেওয়া হয়নি এবং এতে হতাহত হবে না, তাই সরকার খুব একটা কিছু করবে না। এ ছাড়া এক বছর আগে

---

৮৬৬. *প্রাগুক্ত*

৮৬৭. https://www.dw.com/bn, ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

৮৬৮. *প্রাগুক্ত*

৮৬৯. দৈনিক বার্তা, ১১ মার্চ ২০১৭ (http://www.doinikbarta.com/tag)

রাজশাহীর তিন উপজেলায় তাদের তৎপরতায় স্থানীয় পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের সাংসদ-মন্ত্রীরা যেভাবে সহযোগিতা দিয়েছিলেন, তাতেও জেএমবির নেতাদের মধ্যে এমন প্রত্যাশা জন্মেছিল। কিন্তু ১৭ আগস্টের হামলার পর নানামুখী চাপে র‍্যাব-পুলিশকে ব্যাপকভাবে অভিযানে নামতে হয়। কিন্তু নভেম্বর-ডিসেম্বরে জেএমবি ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, গাজীপুর ও নেত্রকোনায় পাঁচটি আত্মঘাতী হামলা চালায়। ওগুলোই ছিল দেশে জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রথম আত্মঘাতী হামলা। জেএমবি সাড়ে ৪ বছরে ২৬টি হামলায় ৭৩ জনকে হত্যা করে। এসব ঘটনায় আহত হন প্রায় ৮০০ মানুষ।[৮৭০]

শুরু থেকেই জেএমবি মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক একাধিক এনজিওর সহযোগিতা পেয়েছিল বলে অভিযোগ আছে। এর মধ্যে কুয়েতভিত্তিক রিভাইবাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি অন্যতম। এ বিষয়ে পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। শায়খ আবদুর রহমান জবানবন্দিতে বলেছেন, তাঁদের সঙ্গে পাকিস্তানের লস্কর-ই-তাইয়্যেবার বাইরে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আল মুহাজেরুন নামের একটি জিহাদি সংগঠনের যোগাযোগ ছিল। এর প্রধান সিরীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক শায়খ ওমর বাক্রি। সংগঠনটি বাংলাদেশে তাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য জেএমবিকে অনুরোধ করেছিল। তারা এসে চরাঞ্চলে জেএমবির প্রশিক্ষণ সরেজমিনে দেখেও যায়। পরে ১৭ আগস্টের হামলার পর জেএমবি চাপে পড়লে টেলিফোনে আল মুহাজেরুনের নেতারা জেএমবিকে বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাসে হামলা, র‍্যাবের ওপর আক্রমণ এবং বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অপহরণ বা তাঁদের ওপর হামলা চালানোর পরামর্শ দিয়েছিল বলে জানান শায়খ আবদুর রহমান। ২০০৬ সালের ২ মার্চ সিলেটে সপরিবার গ্রেপ্তার হন শায়খ রহমান। এর আগে-পরে বাংলা ভাইসহ জেএমবির তখনকার শীর্ষ পর্যায়ের প্রায় সব নেতা ধরা পড়েন। ২০০৬ সালে জোট সরকারের শেষ দিকে জেএমবির প্রধান শায়খ আবদুর রহমান, দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইসহ ছয় জঙ্গির ফাঁসির আদেশ হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর ২০০৭ সালের ৩ মার্চ তাঁদের ফাঁসি কার্যকর হয়। এর মধ্য দিয়ে জেএমবির প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এরপর হবিগঞ্জের মাওলানা সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে নতুন কমিটি করে সংগঠনটি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ২০১০ সালে তিনিসহ নতুন নেতৃত্বের অনেকে ধরা পড়ায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৮৭১]

আনসার আল ইসলাম ও আইএস এর জঙ্গি কার্যক্রম

জেএমবির উৎখাতের পরপরই সক্রিয় হয় আল-কায়েদার অনুসারী আরেক সংগঠন আনসার আল ইসলাম। ’[৮৭২] ২০১৩ সালে ব্লগার রাজীব হায়দার হত্যার মধ্য দিয়ে তারা আলোচনায় আসে। আর ভঙ্গুর জেএমবির গর্ভ থেকে জন্ম নেয় আরেকটি জঙ্গিগোষ্ঠী। তারাই এখন নিজেদের আইএস দাবি করে দেশে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। কলম্বোভিত্তিক রিজিওনাল সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদের মতে, ‘সারা বিশ্বে এখন যে সন্ত্রাসবাদ আমরা দেখছি, সেটার মূলে রয়েছে সালাফিবাদ। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়।’ তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বিগত শতকের সত্তরের দশক থেকে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কিছু ধনী সালাফিবাদ প্রসারে বিনিয়োগ শুরু করে। এরপর গত সাড়ে তিন দশকে সালাফিবাদের পাশাপাশি উগ্র মতাদর্শ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। এ থেকে ইউরোপ-আমেরিকাও বাদ যায়নি।

অধ্যাপক ইমতিয়াজ বলেন, ‘আমরা শান্তির ধর্ম ইসলামের কথা বলি। কিন্তু সেটা মুখে মুখে। উগ্রবাদের বিপরীতে সহিষ্ণু ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য কোনো উদ্যোগ, বিনিয়োগ নেই। এ বিষয়ে রাষ্ট্রও মনোযোগ দেয়নি।’ সাত বছর বিরতির পর আবার হামলা ও হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে দেশে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে দু'টি জঙ্গিগোষ্ঠী। আগের দু'টি সংগঠনের ভেতর থেকে জন্ম নেওয়া এ দুই সংগঠন গত সাড়ে তিন বছরে ৬২টি হামলায় জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছে ৯৪ জন।

---

[৮৭০]. *প্রাগুক্ত*

[৮৭১]. https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html. ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬

[৮৭২]. https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1298248.bdnews, ৫ মার্চ ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

এর মধ্যে সর্বশেষ গুলশানে হামলার মধ্য দিয়ে চরম নৃশংসতা নিয়ে হাজির হয়েছে আইএস মতাদর্শ অনুসরণকারী গোষ্ঠীটি। এ হামলার পর বাংলাদেশের নাম সন্ত্রাসবাদী হামলার বৈশ্বিক মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে মাঠে নামা দুই জঙ্গি সংগঠনের একটি হলো আল-কায়েদার অনুসারী আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এবং অপরটি সরকারি ভাষ্য বর্তমান নাম আনসার আল ইসলাম অনুযায়ী নব্য জেএমবি, যারা নিজেদের আইএস দাবি করে। লক্ষবস্তু বা টার্গেট এখন পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন হলেও দুটি সংগঠনই সালাফি বা আহলে হাদিস মতাদর্শী। দুই গোষ্ঠীরই সদস্যদের বড়অংশ তরুণ এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়াকরা সচ্ছল পরিবারের সদস্য। পত্রিকার অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লক্ষবস্তু বানিয়ে এ দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র গোষ্ঠীর তৎপরতা শুরু হয়েছে অন্তত দেড় দশক আগে।'[৮৭৩] আর এর শুরুটা করেছে ধর্মভিত্তিক আরেক সংগঠন বর্তমানে নিষিদ্ধ হিযবুত তাহ্‌রীর। এর পরপর যুক্ত হয় জামাআতুল মুসলেমিন নামে আরেক সালাফিবাদী সংগঠন, যার গর্ভ থেকে জন্ম নেয় আনসারুল্লাহ বাংলা টিম।[৮৭৪]

সূচনায় হিযবুত তাহ্‌রীর

খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ নিয়ে বিভিন্ন দেশে সক্রিয় আন্তর্জাতিক সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীর বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করে ২০০১ সালে। '[৮৭৫] উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়া কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে যুক্তরাজ্য থেকে হিযবুত তাহ্‌রীর মতাদর্শ এ দেশে আসে। সম্পূর্ণ নগরকেন্দ্রিক এই সংগঠন শুরু থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের লক্ষবস্তু করে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৩ সাল থেকে হিযবুত তাহরীরের কার্যক্রম দৃশ্যমান হতে শুরু করে। শুরুর দিকে মূলত তারা ঢাকার বিভিন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিলনায়তনে ঘরোয়া সভা-সেমিনার করত। ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা ভঙ্গ করে ঢাকায় মিছিল-সমাবেশ করে সংগঠনটি প্রথম দেশের গণমাধ্যমের দৃষ্টি কাড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) কয়েকজন শিক্ষকের নেতৃত্বে দেশে হিযবুত তাহ্‌রীরের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সংগঠনটি ঢাকার বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্তার লাভ করে। এর মধ্যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। হিযবুত তাহ্‌রীর মনে করে, গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ। তাই গণতন্ত্র অবশ্য পরিত্যাজ্য। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংগঠনটির পোস্টার, পুস্তিকা, প্রচারপত্রেও একই রকম কথা বলা হয়। সংগঠনটি নিষিদ্ধ হওয়ার আগে বিভিন্ন সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে পত্রিকার প্রতিবেদকের সঙ্গে হিযবুত তাহ্‌রীরের শীর্ষস্থানীয় একাধিক নেতার কথা হয়। তাঁরা দাবি করেন, তাঁরা অন্য জঙ্গি সংগঠনের মতো নাশকতা বা সশস্ত্র পন্থায় লক্ষ অর্জনে বিশ্বাসী নন। তাঁরা মনে করেন, মুসলিমপ্রধান দেশে সরকারি বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ জন্য সরকারি বাহিনী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা ব্যক্তিদের সন্তানদের প্রতি সংগঠনটির বাড়তি আগ্রহ রয়েছে। নিষিদ্ধ হওয়ার আগে-পরে সরকারি বাহিনীর উদ্দেশে পোস্টার, প্রচারপত্রও প্রকাশ করে হিযবুত তাহ্‌রীর। ২০০৮ সালে সংগঠনটির গুরুত্বপূর্ণ এক নেতা বলেছিলেন, তখন পর্যন্ত তাঁদের সদস্যসংখ্যা ১০ হাজারের অধিক। যাঁদের অধিকাংশই রাজধানীকেন্দ্রিক। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও কুমিল্লায় সংগঠনটির কার্যক্রম আছে, সদস্যসংখ্যা খুব বেশি নয়। সরকার ২০০৯ সালের ২২ অক্টোবর 'জননিরাপত্তার স্বার্থে' হিযবুত তাহ্‌রীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর সংগঠনটির বেশ কিছু সদস্য গ্রেপ্তার হন। তবে তাঁদের কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। শুরুর দিকে সদস্যদের অনেকে লেখাপড়া শেষ করে বিভিন্ন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছেন। তারা সদস্য সংগ্রহে একটা বড় ভূমিকা রাখেন বলে অভিযোগ আছে।[৮৭৬]

---

[৮৭৩]. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৬ মার্চ ২০১৮ (https://www.kalerkantho.com/print-edition/sub- editorial/2018/06/609903)

[৮৭৪]. দৈনিক প্রথম আলো, https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html

[৮৭৫]. The Daily Star, 25 Dec 2021 (https://www.thedailystar.net/bangla)

[৮৭৬]. https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html

জামাআতুল মুসলেমিন

হিযবুত তাহ্‌রীরের অনেকটা কাছাকাছি সময়ে জামাআতুল মুসলেমিন নামে আরেক কট্টরপন্থী সংগঠন গোপন সাংগঠনিক কার্যক্রম চালালেও তারা খুব একটা আলোচনায় আসেনি। সংগঠনটি আল-কায়েদার আরব উপদ্বীপের নেতা ইয়েমেনের আনওয়ার আওলাকির অনুসারী। এ সংগঠনটিও ইংরেজি মাধ্যমে পড়া এবং সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের লক্ষবস্তু করে সদস্য সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করে। তবে গ্রামের, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের সন্তান এবং মাদরাসায় লেখাপড□করেছে এমন সদস্যও এই দলে ছিল। জামাআতুল মুসলেমিনের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানও ছিল, যার কার্যক্রম এখন বন্ধ। নাম রিসার্চ সেন্টার ফর ইউনিটি ডেভেলপমেন্ট (আরসিইউডি)। ২০০৫ সাল পর্যন্ত রাজধানীর ধানমন্ডিতে এর কার্যালয় ছিল। এটি দেশি-বিদেশি জঙ্গি সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কাজ করত বলে অভিযোগ ছিল। এ নিয়ে ২০১১ সালের ২ মার্চ প্রথম আলোয় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তার আগে ওই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. আবদুর রশিদ চৌধুরী এ প্রতিবেদককে বলেছিলেন, আরসিইউডির মূল উদ্যোক্তা রেজাউল রাজ্জাক, যিনি ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান আবদুর রাজ্জাক লস্করের ছেলে।

২০১৩ সালের জুনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জঙ্গি প্রতিরোধ ও প্রতিকার কমিটিতে উত্থাপিত এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে জামাআতুল মুসলেমিনের আমির হিসেবে রেজাউল রাজ্জাকের নাম উল্লেখ করা হয়। সংগঠনটি সম্পর্কে আর কোনো তথ্য ওই নথিতে নেই। অনুসন্ধানে জানা গেছে, রেজাউল রাজ্জাক যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চশিক্ষা শেষে ঢাকার বনানীতে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১৪ সালে জানিয়েছিল, রেজাউল রাজ্জাক ২০১০ সালের জুন থেকে তাদের সঙ্গে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা রেজাউল রাজ্জাকের নথিতে তাঁর স্থানীয় ঠিকানা ছিল না। আমেরিকার একটি ঠিকানা দেওয়া ছিল। রেজাউল বর্তমানে মালয়েশিয়ায় আছেন বলে পুলিশের একটি সূত্র জানায়। আরসিইউডি ও জামাআতুল মুসলেমিনের কেউ কেউ ইয়েমেনে গিয়ে আল-কায়েদার নেতা আনোয়ার আওলাকির (পরে নিহত) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলে গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য রয়েছে। জানা গেছে, জামাআতুল মুসলেমিন বিলুপ্ত হওয়ার আগে শেষ আমির ছিলেন ইজাজ হোসেন ওরফে কারগিল। তাঁর বাসা ছিল রাজধানীর কলাবাগানে। তিনি ২০০৮ সালে পাকিস্তানে চলে যান।[৮৭৭]

আনসার আল ইসলাম

জামাআতুল মুসলেমিন থেকেই ২০০৭ সালের শেষ দিকে বা ২০০৮ সালের শুরুতে জন্ম নেয় আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বা আনসার আল ইসলাম। জন্মসূত্রে সংগঠনটি সালাফি মতাদর্শী এবং আল-কায়েদার নেতা আনওয়ার আওলাকির অনুসারী। আনসারুল্লাহর সদস্যদের বেশির ভাগই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, বিত্তবানের সন্তানও রয়েছে। তবে অল্প শিক্ষিত ও মাদরাসাপড়ুয়াও রয়েছে, যারা সংখ্যায় বেশ কম। শুরুতে তাদের ইন্টারনেটকেন্দ্রিক তৎপরতা ও প্রচারণা ছিল ব্যাপক। ইউটিউবে থাকা আনসারুল্লাহর প্রধান তাত্ত্বিক নেতা মুফতি জসিমউদ্দিন রাহমানীর বিভিন্ন বক্তৃতা ও খুতবা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এ সংগঠনটির সুদূরপ্রসারী লক্ষ সশস্ত্র লড়াই। তবে তার আগে সদস্য সংগ্রহ ও আর্থিক সামর্থ্য অর্জনকে জরুরি মনে করে তারা। জসিমউদ্দিন রাহমানী সর্বশেষ রাজধানীর বসিলায় একটি মসজিদের খতিব ছিলেন। ২০১৩ সালে আনসারুল্লাহর প্রধান মুফতি জসিমউদ্দীনসহ আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তখন ঢাকার ডিবির একাধিক সূত্র জানিয়েছিল, জামাআতুল মুসলেমিনের ইজাজ হোসেন আনসারুল্লাহর অন্যতম প্রধান। তিনি পাকিস্তানে বসে ইন্টারনেট যোগাযোগের মাধ্যমে সংগঠনের কর্মীদের সক্রিয় রাখছেন। ২০১৩ সালে ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দারকে হত্যার পর এই সংগঠনের কথা প্রথম জানাজানি হয়। ওই ঘটনায় সরাসরি জড়িত সবাই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই মামলার বিচার শেষে রায়ে দুজনের ফাঁসি এবং মুফতি জসিমউদ্দিন

বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস, editorial/22 ডিসেম্বর, ২০১৬,

[৮৭৭]. পাকিস্তানের ডন পত্রিকা, ১০ জানুয়ারি ২০১৫ পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

রাহমানীসহ বাকি পাঁচজনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। গণজাগরণ মঞ্চ সৃষ্টির পর থেকেই নাস্তিক, ধর্মের অবমাননাকারী ব্লগার'দের হত্যার বিষয়ে আনসারুল্লাহর প্রধান জসিমউদ্দীন রাহমানী ফতোয়া দিচ্ছিলেন এবং খুতবায় বয়ান করে আসছিলেন। এসব তাঁরা তাঁদের ওয়েব পেজে প্রচারও করেছেন। ২০১৩ সালে রাজীব হত্যার পর দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ২০১৫ সালে আবার হত্যাকা- শুরু করে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। তার আগে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে আল-কায়েদার নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরি এক ভিডিও বার্তার মধ্য দিয়ে আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখা (একিউআইএস) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এর পরপরই বাংলাদেশের আনসারুল্লাহ একিউআইএসের অধিভুক্ত হয় বলে তখন ঢাকায় জঙ্গিবাদ দমনে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ একাধিক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে বলেছিলেন। এরপর আনসারুল্লাহ নাম পাল্টিয়ে আনসার আল ইসলাম নাম ধারণ করে এবং নিজেদের একিউআইএসের বাংলাদেশ শাখা দাবি করে। আনসারুল্লাহ বা আনসার আল ইসলাম এ পর্যন্ত ১৩ জনকে হত্যার দায় স্বীকার করেছে। তাদের বেশির ভাগই ব্লগার। এর বাইরে রয়েছেন প্রকাশক, শিক্ষক ও সমকামীদের অধিকারকর্মী। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, জসিমউদ্দীন রাহমানী গ্রেপ্তার হওয়ার পর আনসারুল্লাহর প্রধান হন পাকিস্তানপ্রবাসী ইজাজ হোসেন ওরফে সাজ্জাদ ওরফে কারগিল। এর আগ পর্যন্ত তিনি আনসারুল্লাহর অপারেশনাল প্রধান ছিলেন। ইজাজ গত বছর করাচিতে এক বন্দুকযুদ্ধে আল-কায়েদার আরও কয়েকজনের সঙ্গে নিহত হন।[৮৭৮] এরপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত ও পলাতক মেজর জিয়াউল হককে আনসারুল্লাহর সামরিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে গোয়েন্দা সংস্থার বরাতে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে খবর বের হয়।'[৮৭৯] এই জিয়াকে ধরিয়ে দিতে ২০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল পুলিশ। আনসারুল্লাহর কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মেজর জিয়া দায়িত্ব নেওয়ার পর সংগঠনটির হত্যাযজ্ঞের সংখ্যা বেশ বেড়ে যায়। মূলত চাপাতি ব্যবহার করলেও শেষ দিকে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও করেছিল তারা। এখন পর্যন্ত নাশকতা বা বিস্ফোরক ব্যবহার না করলেও গত ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকায় সংগঠনটির তিনটি আস্তানা থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধারের দাবি করেছে পুলিশ। তাদের আস্তানায় তখন গাড়িবোমা তৈরির আলামত মিলেছিল বলেও পরে খবর বের হয়।[৮৮০]

নব্য জেএমবি জঙ্গি হামলা

গত বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে দেশে ভিন্ন মাত্রার সন্ত্রাসবাদী হামলা ও সিরিয়া-ইরাকভিত্তিক আইএসের নামে দায় স্বীকার করে ব্যাপক আলোচনায় আসে এই জঙ্গিগোষ্ঠীটি। তবে সরকার ও পুলিশ বলছে, তারা নব্য জেএমবি। পুরোনো জেএমবির একটি অংশ বেরিয়ে এসে নতুন নেতৃত্বে সক্রিয় হয়েছে। অবশ্য এই নব্য জেএমবি নিজেদের আইএস দাবি করে। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে পুরোনো জেএমবির অনেক তফাত। নব্য জেএমবির সদস্যদের একটা বড় অংশ আধুনিক, বিত্তবান পরিবারের সন্তান, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আইএস যাদের শত্রু মনে করে, তারাও তাদের শত্রু মনে করে। তারাই এ দেশে প্রথম শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করেছে। এ ছাড়া একের পর এক পুরোহিত, সেবায়েত, বৌদ্ধভিক্ষু, খ্রিষ্টানধর্মের মানুষ ও বিদেশি নাগরিককে হত্যা করেছে। এসব হত্যার পর নিহতদের ক্রুসেডার আখ্যা দিয়ে আইএসের নামে দায় স্বীকার করা হয়। বিভিন্ন সময়ে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আইএস অনুসারী এই জঙ্গিগোষ্ঠী সংগঠিত হচ্ছিল বছর তিনেক ধরে; যার প্রথম প্রকাশ সম্ভবত ২০১৩ সালের ৮ আগস্ট খুলনার খালিশপুরে উম্মুল মোমেনিন দাবিদার কথিত ধর্মীয় নেতা তৈয়বুর রহমান ও তাঁর কিশোর ছেলেকে জবাই করে হত্যার ঘটনা। এর চার মাস পর ২১ ডিসেম্বর ঢাকার গোপীবাগে ইমাম মাহদীর প্রধান সেনাপতি দাবিদার লুৎফর রহমানসহ ছয়জনকে একই কায়দায় হত্যা করা হয়। এরপর গত বছরের ২১ এপ্রিল আশুলিয়ায় ব্যাংক ডাকাতির আগ পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর হত্যাযজ্ঞের খবর পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয়, এই দেড় বছর ছিল তাদের প্রস্তুতির পর্ব। এই নব্য জেএমবিতেও যে শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সন্তান, ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভিড়ছে, তা অনেক আগেই আঁচ করা

---

৮৭৮ . https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html

৮৭৯ . http://newsnine24.com, 29 Feb 2020

৮৮০ . https://www.habibur.com/page/history-of-extremism-in-bangladesh.html

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছিল। ২০১৪ সালে একটি বহুজাতিক কোম্পানির আইটি শাখার প্রধান আমিনুল বেগ এবং একাধিক সামরিক-বেসামরিক পদস্থ কর্মকর্তার ছেলে ও লন্ডনপ্রবাসী গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গুলশানে হামলায় নিহত এবং পরে কল্যাণপুরে পুলিশের অভিযানে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেও জানা গেছে, তাদের আচরণে পরিবর্তন দেখা গেছে বছর তিনেক আগে থেকে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় ইতালির নাগরিক সিজার তাবেলা এবং ৩ অক্টোবর রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোশিকে হত্যার পর আইএস দায় স্বীকার করলে সরকার তা জোরের সঙ্গে নাকচ করে দেয়। তবে আইএস আছে বা নেই এই বিতর্কে হত্যাকা- থেমে থাকেনি। এই গোষ্ঠী সারাদেশে গত ১০ মাসে ৪২টি হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। এর মধ্যে ২৮টি ঘটনায় আইএস দায় স্বীকার করেছে। সর্বশেষ দায় স্বীকার করে গত ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলার। কেবল তা-ই নয়, ১২ ঘণ্টার জিম্মি সংকট চলাকালে ভেতরের হত্যাকা-ের বিষয়ে কয়েক দফা আপডেট ও নিহত ব্যক্তিদের ছবি প্রকাশ করেছে এই গোষ্ঠী। সিঙ্গাপুরভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স অ্যান্ড টেররিজমের (আইসিপিভিটি) প্রধান রোহান গুনারত্ন রয়টার্সকে বলেছেন, তিনি গবেষণায় পেয়েছেন যে, বাংলাদেশের জঙ্গিরা আইএসের কাছ থেকে আর্থিকসহ সাংগঠনিক নির্দেশনা ও অন্যান্য সহায়তা পেয়েছে। ৩ আগস্ট রয়টার্সের এ-বিষয়ক এক প্রতিবেদনে রোহান গুনারত্নের এই বক্তব্য উল্লেখ করা হয়। এর আগে গত ২১ মে থেকে রোহান গুনারত্নের নেতৃত্বে আইসিপিভিটি ঢাকায় পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ইউনিটের সদস্যদের পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন এসব জঙ্গি মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু জঙ্গি গ্রেপ্তার হলেও পরিস্থিতি যে এত ভয়ংকর পর্যায়ে যাচ্ছে, তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সরকারের বাহিনীগুলোর ঘাটতি ছিল। তবে গুলশান হামলার পর সরকার জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। গত ২৬ জুলাই ভোরে ঢাকার কল্যাণপুরে পুলিশের অভিযান এবং নয় জঙ্গি নিহত হওয়ার ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, গুলশান হামলার মতো আরেকটি ভয়ংকর হামলা থেকে দেশ রক্ষা পেয়েছে।[৮৮১] গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে গুলশান ও রংপুরে দুই বিদেশি হত্যার আগ পর্যন্ত পুলিশ অনেকগুলো সংবাদ ব্রিফিংয়ে, মামলায় আইএসের সমন্বয়কারী, রিক্রুটার বা সিরিয়ায় যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কথা বলেছে। এর মধ্যে আইএস সন্দেহে ২০১৫ সালের প্রথম ছয় মাসে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা দেশে আইএসের মতাদর্শ প্রচারে জড়িত ছিলেন এবং সিরিয়ায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে পুলিশ তখন বলেছিল। আইএস অনুসারী এই গোষ্ঠী দেশি-বিদেশি জঙ্গিনেতাদের বক্তব্য, পুস্তিকা এবং বোমা তৈরি ও জঙ্গি প্রশিক্ষণের নির্দেশিকা বাংলায় অনুবাদ করে ইন্টারনেটে নিজস্ব ওয়েব পেজে ও অনলাইনে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করছিল। ২০১৫ সালের ২৪ মে আমিনুল বেগ ও সাকিব বিন কামাল নামে দুজনকে গ্রেপ্তারের পর ডিবি কর্মকর্তারা বলেছিলেন, দেশের কিছু যুবক আইএসের পক্ষে লড়াই করতে সিরিয়া বা ইরাকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।'[৮৮২] আমিনুল বেগ এমন একটি দলের নেতা। কয়েকজন আইএসে যোগ দিতে সিরিয়ায় চলে গেছেন। আরও ২০-২২ জন যাওয়ার চেষ্টায় আছেন। এমন কিছু ব্যক্তিকে পরবর্তী সময়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে তখন পুলিশের পক্ষ থেকে বলাও হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে কেউ সিরিয়ায় গিয়ে আইএসে যোগ দিয়েছে কি না, এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেনি। তবে বিচ্ছিন্নভাবে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৫ জন বাংলাদেশির নাম এসেছে, যাঁরা সিরিয়া গেছেন বলে মনে করা হয়। তাদের মধ্যে দুজন সেখানে মারাও গেছেন। একজন বিডিআর বিদ্রোহে নিহত এক সেনা কর্মকর্তার ছেলে আশিকুর রহমান এবং অপরজন সাইফুল হক, যিনি ২০১৪ সালের আগস্টে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সিরিয়ায় যান। গত ২০১৪ সালে ১০ ডিসেম্বর আইএসের কথিত রাজধানী সিরিয়ার রাকায় বিমান হামলায় নিহত হন সাইফুল। ২৯ ডিসেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ খবর প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, সাইফুল আইএসের শীর্ষস্থানীয় ১০ জনের একজন ছিলেন। তিনি আইএসের হয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে

[৮৮১]. দৈনিক প্রথম আলো, *বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস*, ***প্রাগুক্ত***

[৮৮২]. দৈনিক যুগান্তর ২৮ মার্চ ২০১৯ (https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/160226)

যোগাযোগের পরিকল্পনাকারী, হ্যাকিং কর্মকাণ্ড , নজরদারি প্রতিরোধ প্রযুক্তি ও অস্ত্র উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

দ্য ফিসক্যাল টাইমস নামে মার্কিন সাময়িকীর গত বৃহস্পতিবারের এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, ইরাক ও সিরিয়ায় আইএস দ্রুত ভূমি হারাচ্ছে। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা মনে করছেন, এটা নতুন এক উদ্বেগের জন্ম দিতে পারে। এটা শুধু প-িমা দেশগুলোর জন্য উদ্বেগের কারণ হবে না। মার্কিন প্যাসিফিক কমান্ডের কমান্ডার অ্যাডমিরাল হ্যারি হ্যারিস সম্প্রতি বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, ভারত-এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে আইএস।' সাময়িকীটি বলেছে, মার্কিন সেনা কর্মকর্তার এই বক্তব্য এমন এক সময় এলো, যখন বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মতো এশিয়ার দেশগুলোয় একের পর এক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটছে। জঙ্গিবাদ বিষয়ক গবেষক, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক আলী রীয়াজের মতে, এখন যে পরিস্থিতি, তাতে আল-কায়েদা না আনসারুল্লাহ, আইএস না জেএমবি বলব; এ বিতর্কের সময় পেরিয়ে গেছে। আলী রীয়াজ প্রথম আলোকে বলেন, বৈশ্বিকভাবে জঙ্গিবাদ উত্থানের একটা পরিবেশ তৈরি রয়েছে। এখন দেশের অভ্যন্তরেও অনুকূল পরিবেশ থাকলে তা দ্রুত বন্ধ করতে হবে। কেবল সামরিকভাবে পদক্ষেপ নিয়ে বা জঙ্গিদের মেরে দমন করা যাবে না। একটা রাজনৈতিক কৌশল থাকতে হবে, যাতে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে যুক্ত করা যায়।[৮৮৩]

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা

ইতালির এক নাগরিককে হত্যার এক সপ্তাহের মধ্যে এক জাপানিকে হত্যার ঘটনা এবং এসবের দায় স্বীকার করে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) দেওয়া কথিত বিবৃতির প্রেক্ষাপটে কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের আলোচনা হচ্ছে। এক বিরল ঐকমত্যের ঘটনা ঘটিয়ে চার দলীয় জোট সরকার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকার-সমর্থকেরা বলছেন যে দেশে জঙ্গি নেই, দেশ জঙ্গিবাদের কবলে পড়েনি। কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন যে দেশে কখনোই জঙ্গিবাদ ছিল না। কেননা, বাংলাদেশের মানুষ জঙ্গিবাদের সমর্থক নয়। বাংলাদেশের মানুষ যে চরমপন্থী মতামতকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে না, সেটা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত আমরা সরকারিভাবেই দেশে আইএস এবং ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার শাখার লোকজন রয়েছে বলে বলতে শুনেছি। ২০১৪ সালের জুলাই থেকে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত এক বছরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরগুলো আমাদের এ বিষয়ে পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করতে পারে। দৈনিক প্রথম আলো, জনকণ্ঠ ও নিউ এজ-এ এই সময়ে জঙ্গি আটক বিষয়ে যেসব খবর ছাপা হয়েছে, তার দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে, এ বিষয়ে ৬৭টি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম আলোয় ২৯টি, জনকণ্ঠ পত্রিকায় ২০টি ও নিউ এজ-এ ১৮টি। এসব খবর অনুযায়ী জঙ্গি সন্দেহে আটকের সংখ্যা ১০০ জন এবং সন্দেহভাজন ১২ জন, যাদের আটক করা যায়নি। এই আটক জঙ্গিদের সম্পর্কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিশেষ করে র‍্যাবের পক্ষে থেকে যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে যে তারা কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত হতে আগ্রহী। সাংগঠনিক সংশ্লিষ্টতার হিসাব পাওয়া গেছে ১০৪ জনের* (এর মধ্যে ১২ জন আটক হয়নি, তবে তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছে)। এই হিসাব অনুযায়ী জেএমবির সঙ্গে যুক্ত ২৫ জন, আইএসের সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত হতে আগ্রহী ২২, শহীদ হামজা ব্রিগেডের সঙ্গে যুক্ত ১৯ জন, আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সঙ্গে জড়িত ১৪ জন, হরকাতুল জিহাদ বা হুজির সঙ্গে জড়িত ১৩ জন এবং বাংলাদেশ জিহাদ গ্রুপের সঙ্গে জড়িত ১১ জন। এই হিসাবের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আটক জঙ্গিদের মধ্যে আইএসের সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত হতে আগ্রহীরা রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আটক জঙ্গিদের মধ্যে একাধিক সদস্যকে বাংলাদেশে আইএসের

[৮৮৩]. আলী রিয়াজ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা*, দৈনিক প্রথম আলো, ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবর তিন পর্বে প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে আটক শাখাওয়াতুল কবিরকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেভাবেই পরিচয় করিয়ে দেয়। আবার মে মাসে যখন আবদুল্লাহ আল গালিব বলে এক সদস্যকে আটক করা হয়, তাঁকেও একইভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ২৬ মে কোমল পানীয় উৎপাদনকারী একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত আমিনুল ইসলাম বেগকে আটক করার পর গণমাধ্যমে তাঁকে আইএসের রিক্রুটার চিহ্নিত করা হয়।

এসব তথ্য এ ধারণাই তৈরি করে যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকার আইএস ও আল-কায়েদার উপস্থিতির বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল আছে। শুধু তা-ই নয়, সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের নেতাদের এই বলে সমালোচনা করা হয়েছে যে তাঁরা তালেবান এবং আইএসের পুতুল মাত্র। আমরা জানি যে যেকোনো দেশে এসব আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের উপস্থিতির পরিণতি ভয়াবহ অবস্থার তৈরি করে। এটাও আমরা জানি যে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো সেখানেই উপস্থিত হয়, যেখানে তাদের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। অন্যপক্ষে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি বিদেশি শক্তিগুলোকে সংঘাতে টেনে আনে। আইএসের উত্থান ঘটেছে ইরাকে, যখন দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামো বিরাজমান সংকটের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রেক্ষাপট অবশ্যই ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। পশ্চিমা দেশগুলোর স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইএসের উত্থান বলে যারা বিশ্বাস করেন এবং যারা করেন না, তারা এ বিষয়ে একমত হবেন যে, এ ধরণের পরিস্থিতি বিশ্বশক্তিকে এমনভাবে যুক্ত করে যে তা থেকে সহজে বেরিয়ে আসা যায় না। সিরিয়ায় পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি রাশিয়ার অংশগ্রহণ তার বড় প্রমাণ। এক-দেড় বছর ধরে আইএসের উপস্থিতি বা সম্ভাব্য উপস্থিতির কথা বলার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দল ও সরকার এর কারণ অনুসন্ধান, কারা এ ধরণের সংগঠনে যুক্ত হতে পারে, তা চিহ্নিত করা এবং তা মোকাবিলায় কী ব্যবস্থা বিবেচনা করেছে তা সাধারণের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি বিষয়ে বক্তব্য পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ আছে, তার সদুত্তর পাওয়া যায় না। ২০১৪ সালের একপক্ষীয় নির্বাচনের কারণে পশ্চিমা দেশগুলো বর্তমান সরকারের বিষয়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করত, সেগুলো নিষ্পত্তিতে সরকার উৎসাহ দেখায়নি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সরকার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান যে জোরদার, সেটা বারবার বলার চেষ্টা করেছে। এতে পশ্চিমাদের পাশাপাশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মনোযোগও আকর্ষিত হয়েছে কি না, সেটাও ভাবা দরকার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, কেবল সন্দেহভাজনদের আটক, তাদের বিচার কিংবা সাধারণের মনে ভীতি তৈরি করে জঙ্গিবাদ দেশীয় সংগঠনের বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের মোকাবিলা করা যায় না। এ বিষয়ে বাংলাদেশে যতটা আলোচনা হয়, ততটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকে না। দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা অনেক সময়ই এই দুর্বলতার কারণ। এই পটভূমিতেই আমরা প্রথমে ইতালির এক নাগরিক হত্যা এবং পরে এক জাপানিকে হত্যার ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। ইতালির নাগরিকের হত্যার পরই যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত একটি বেসরকারি সংগঠন যার বিষয়ে অনেক নিরাপত্তা বিশ্লেষকের মনে প্রশ্ন রয়েছে, এই মর্মে জানায় যে, এ হত্যার দায় আইএস স্বীকার করেছে। আর জাপানের নাগরিক হত্যার পর বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে যে, আইএস নিজেদের টুইট একাউন্ট থেকে এ হত্যার দায় স্বীকার করেছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ব্লগার হত্যার ঘটনা এবং সেসব হত্যার দায়িত্ব স্বীকারসূচক বিবৃতির প্রেক্ষাপটে এই বিবৃতিকেও কেউ কেউ গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, কারও কারও মনে সংশয় তৈরি হয়েছে। তারপর সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবেই বলা হলো যে দেশে আইএসের অস্তিত্ব নেই।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, সরকার কি অস্বীকারের সংস্কৃতির বশবর্তী হয়ে এ বক্তব্য দিচ্ছে? এ ধরণের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য নতুন নয়। ২০০৫ সালে চার দলীয় জোট সরকারের ক্ষমতাসীনেরা অভ্যন্তরীণ জঙ্গিদের উপস্থিতি বিষয়ে এ কৌশল নিয়েছিল। সরকারের মনে কি এ ধারণা তৈরি হয়েছে যে আইএসের উপস্থিতির স্বীকৃতি ২০০৯ সাল থেকে জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় তারা যে সাফল্য দাবি করে এসেছে, তাকে ম্লান করে দেয়? নাকি তারা অনুধাবন করছে যে এ ধরণের সংগঠনের উপস্থিতি প্রমাণিত হলে এযাবৎকালে আমরা অন্যত্র যে ধরনের পরিণতি দেখেছি, সে দিকেই দেশ এগোতে শুরু করবে? তাহলে জঙ্গিবাদের

প্রশ্নকে প্রাধান্য দিয়ে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি করা হয়েছে, তা বাস্তব নয়? অধ্যাপক আলী রিয়াজ বলেন, বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতি এবং এই হত্যাকা- বিষয়ে দেওয়া কথিত বিবৃতি বিষয়ে যারা সংশয়ী, আমি তাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু বাংলাদেশে বিদেশি জঙ্গিদের উপস্থিতি বা তার আশঙ্কাকে যারা এক কথায় নাকচ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে অপারগ। কেননা, গত দুই দশকে বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যক্রমের একটা ইতিহাস আছে এবং সেখানে বিভিন্নভাবেই বিদেশি যোগাযোগের প্রমাণ উপস্থিত।[৮৮৪]

দেশীয় জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ে আলোচনায় প্রকাশিত মতামত থেকে এই রকমের ধারণা জন্মাতে পারে যে বিদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গি বা উগ্রপন্থীদের যোগাযোগের প্রশ্নই অবান্তর। বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতি নাকচ করতে গিয়ে কেউ কেউ এমন বলছেন, যেন বাংলাদেশে বিদেশি জঙ্গিদের উপস্থিতি বা তৎপরতার কথা এই প্রথম শোনা গেল। এ বক্তব্য যাঁরা দিচ্ছেন, তাদের অনেকে কিছুদিন আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জঙ্গিদের উপস্থিতি রয়েছে বলেই বলার চেষ্টা করেছেন। সরকারের অবস্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে তারা যেভাবে এ রকম আশঙ্কাকে নাকচ করে দিচ্ছেন, সেটা উদ্বেগজনক। কেননা, বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যক্রমের যে ইতিহাস, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গিদের সম্পর্ক ছিল। নিরাপত্তা বিশ্লেষক, দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা, সন্ত্রাসবাদ বিষয়ের সাংবাদিক, নিরাপত্তা নীতিমালা তৈরির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের কাছে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিষয়টি প্রায় দুই দশকের পুরোনো। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সূচনা নব্বইয়ের দশকের কথাই বলবেন। এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সূচনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বিদেশি সংশ্লিষ্টতা।'[৮৮৫] এ দেশে জঙ্গিবাদের উৎসমুখ বলে যাকে চিহ্নিত করা যায়, সেই হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর (হুজি) কার্যত প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকায়, জাতীয় প্রেসক্লাবে। আফগান মুজাহিদদের কাবুল বিজয়ে উল্লসিত ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি স্বেচ্ছাসেবীদের একাংশ সেদিন সংবাদ সম্মেলন করেছিল।'[৮৮৬] সাংগঠনিকভাবে হুজি সংগঠিত হচ্ছিল আরও কয়েক বছর আগ থেকে। পাকিস্তানে হুজির প্রাথমিক রূপ তৈরি হয় ১৯৮০ সালে, কিন্তু এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৮ সালে এবং এর প্রসার ঘটে পরবর্তী চার বছরে। এই সময়েই সাংগঠনিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশে বিস্তারের পরিকল্পনা করা হয় এবং তার অংশ হিসেবেই বাংলাদেশে হুজির যাত্রা শুরু। পাকিস্তানে হুজির সংগঠকেরা প্রধানত বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল রোহিঙ্গাদের লড়াইকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারকে অস্থিতিশীল করতে।[৮৮৭]

বাংলাদেশে হুজির বিস্তার দ্রুততা লাভ করে অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিষ্ঠিত জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) সঙ্গে এর সাংগঠনিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর। জেএমবির প্রতিষ্ঠা ১৯৯৮ সালে, এর নামকরণ হয় ২০০১ সালে। কিন্তু জেএমবি ও হুজির সম্পর্ক গড়ে ওঠার পটভূমি তৈরি হয় জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবদুর রহমান যখন জেএমবি প্রতিষ্ঠার লক্ষে ১৯৯৬ সালের দিকে দেশের কিছু আলেম ও ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। সেই সূত্রেই হুজির নেতা মুফতি হান্নানের সঙ্গে আবদুর রহমানের যোগাযোগ। ১৯৯৬ সালের ১৯ জানুয়ারি কক্সবাজারের উখিয়ায় হুজির যে ৪১ জন কর্মী সশস্ত্র অবস্থায় আটক হন, তাঁদের মামলা তদারকির জন্য আবদুর রহমান হুজির প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যান। এই যোগাযোগের পরিণতিতেই হুজি ও জেএমবির মধ্যে সাংগঠনিক সংশ্লিষ্টতা তৈরি হয়।

---

৮৮৪. আলী রিয়াজ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা*, দৈনিক প্রথম আলো, ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবর তিন পর্বে প্রকাশিত

৮৮৫. কথকতা, ৮ অক্টোবর ২০১৫ (http://kathakata.com)

৮৮৬. দৈনিক কালের কণ্ঠ, প্রাগুক্ত, ০৮ অক্টোবর ২০১৫

৮৮৭. আলী রিয়াজ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা*, দৈনিক প্রথম আলো, ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবর তিন পর্বে প্রকাশিত

বাংলাদেশের সম্ভাব্য জঙ্গিদের দেশের বাইরে যোগাযোগ শুরু হয় ১৯৯৭-৯৮ সালে। ভারতীয় নাগরিক আবদুল করিম টুন্ডার সঙ্গে আবদুর রহমানের ১৯৯৬ সালে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠা এ দেশে জঙ্গিবাদের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। টুন্ডা পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তাইয়্যেবার শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মনে করে যে ১৯৯৪ সালে টুন্ডা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন।'[৪৪৪] তাঁর হাত ধরেই আবদুর রহমান পাকিস্তানে প্রশিক্ষণের জন্য যান এবং মারকাজ আদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ, যা লস্কর-ই-তাইয়্যেবার উৎস সংগঠন, এর সঙ্গে যুক্ত হন, পরিচিত হন হাফিজ সাঈদের সঙ্গে। ভারতীয় গোয়েন্দারা সব সময় অভিযোগ করে এসেছে যে, টুন্ডা বাংলাদেশ থেকে ভারতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছেন। তারা দাবি করে যে, ১৯৯৮ সালে দিল্লিতে আটক দুই বাংলাদেশি জেএমবির সদস্য এবং তাঁরা টুন্ডার মাধ্যমে ভারতে এসেছিলেন। ২০১৩ সালে টুন্ডা আটক হয়ে বর্তমানে ভারতে বিচারাধীন আছেন। বাংলাদেশে বিদেশি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতির বিষয়টি আরও জানা যায় ২০০৮ ও ২০০৯ সালে। আবদুর রউফ দাউদ মার্চেন্ট ও জাহেদ শেখ নামে দুজন ভারতীয় জঙ্গির আটকের ঘটনা ঘটে। ২০০৯ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় কথিত আরেফ রেজা কমান্ডো ফোর্সের মুফতি ওবায়েদুল্লাহসহ আটক হন মোট ছয়জন, তাঁদের মধ্যে একাধিক সদস্য স্বীকার করেন যে তাঁরা অনেক দিন ধরে বাংলাদেশে বাস করছেন; ওবায়েদুল্লাহ ১৯৯৫ সালে ও হাবিবুল্লাহ ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশে আছেন বলে দাবি করেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। বাংলাদেশকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য লস্কর-ই-তাইয়্যেবার উৎসাহ কখনোই হ্রাস পায়নি, আর তারা যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছে, তা সুবিদিত। ফলে বাংলাদেশের এই জঙ্গিদের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের সম্পর্ক যে অব্যাহত ছিল, সেটা বুঝা যায়। বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে বিদেশি যোগাযোগের আরেকটি পথ হচ্ছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম চালিয়ে এসেছে। মিয়ানমার সরকারের অন্যায় ও অমানবিক আচরণ রোহিঙ্গাদের লড়াইয়ের ন্যায়সংগত কারণ তৈরি করেছে, কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের ভূমিকা নিরাপত্তার জন্য হয়েছে হুমকি। রোহিঙ্গা যোদ্ধাদের সঙ্গে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী জঙ্গিদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি। তাদের উপলক্ষ করেই পাকিস্তানের হুজি এ দেশে তাদের কাজ সম্প্রসারণ করছিল।

কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলো অস্ত্র সংগ্রহের জন্য যে কেবল তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শিকভাবে ঐকমত্য পোষণকারীদের সঙ্গেই কাজ করেছে, তা নয়। এদের হাতে আসা অস্ত্রের এক বড় অংশ এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্রের কালোবাজার থেকে। এ ক্ষেত্রে থাইল্যান্ডের গোপন অস্ত্রবাজারগুলো সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু গোপন বাজারই এদের একমাত্র উৎস ছিল না। যেগুলোকে গ্রে মার্কেট বা ধূসর বাজার, অর্থাৎ যেগুলো কোনো কোনো দেশের গোয়েন্দা সংস্থার জ্ঞাতসারে, এমনকি প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে, দেশের স্বার্থ বিবেচনায় হস্তান্তরিত হয়, সেগুলোও কাজ করেছে। সাধারণভাবে গ্রে মার্কেটের উদাহরণ হিসেবে দেশে দেশে বিপ্লবী থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী থেকে মাদক পাচারকারীদের হাতে গোয়েন্দাদের অস্ত্র তুলে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। এই অঞ্চলে মিয়ানমারের ওপর চীনের প্রভাব হ্রাসের জন্য সরকারকে চাপে রাখতে আশির দশকের শেষ পর্যায় থেকে প্রায় দেড় দশক ধরে কারেন গেরিলাদের প্রতি ভারতের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল; ভারত তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে বলেও অভিযোগ আছে। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য কারেন গেরিলাদের সঙ্গে রোহিঙ্গারা সহযোগিতা করেছে এবং কক্সবাজারের প্রত্যন্ত উপকূলকে ব্যবহার করা হয়েছে অস্ত্র হস্তান্তরের কেন্দ্র হিসেবে।

১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত মহাসাগরের নারকোনডাম দ্বীপের কাছে একটি এবং তার তিন মাস পরে প্রায় ওই একই এলাকায় আরেকটি মোট দু'টি অবৈধ অস্ত্রের চালান আটকের ঘটনা ঘটে। ভারতের নৌবাহিনীর আটক করা এসব অস্ত্রের চালান আরাকান আর্মি ও কারেন গেরিলাদের জন্য যাচ্ছিল এবং সেগুলোর গন্তব্য ছিল কক্সবাজার। এই অস্ত্র আটক এবং আটককৃত ব্যক্তিদের বিষয়ে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং নৌবাহিনীর মধ্যে সে সময় টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়েছে।

---

৪৪৪. *প্রাগুক্ত,* ০৮ অক্টোবর ২০১৫

কারেনদের সঙ্গে আদর্শিক পার্থক্যকে সরিয়ে রেখে যেমন রোহিঙ্গারা একত্রে কাজ করেছে, ঠিক একইভাবে তাদের সঙ্গে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে ওঠার ঘটনা ঘটেছে। বিস্ময়কর এই যে, ভারতের যে সব জঙ্গিগোষ্ঠী ভারতের উত্তরাঞ্চলে বাঙালি, বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি ইসলামপন্থী জঙ্গিরা দ্বিধান্বিত হয়নি। এই ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জঙ্গিগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হলে তারা কেবল আদর্শিক বিবেচনাতেই সহযোগিতা করবে তা নয়, বিভিন্ন বিবেচনায় দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে সহযোগিতার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাতে অর্থ-অস্ত্র-নিরাপদ আশ্রয় অনেক কিছুই বিনিময় হতে পারে। ফলে সীমান্ত ছাড়িয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। অস্বীকার করলেই তা অপসৃত হবে না। ফলে জঙ্গিবাদ মোকাবিলার প্রথম বিবেচনা হচ্ছে কী কী কারণে জঙ্গিবাদ বা সহিংস চরমপন্থার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়, কী কী উপাদান দেশের অভ্যন্তরে জঙ্গিবাদকে আদর্শিকভাবে বা কৌশল হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, সেগুলোকে চিহ্নিত করা, তার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।[৮৮৯]

বিভিন্ন জঙ্গিদলের সশস্ত্র হামলা সমূহের বিবরণ-

১৯৯৯ সালে জঙ্গিদের বোমা হামলা

বাংলাদেশে জঙ্গিদলের বোমা হামলার সূত্রপাত হয় ১৯৯৯ সালের ৬ই মার্চ মধ্যরাতে (রাত ১: ১০ মিনিট) সংস্কৃতি রক্ষা দিবসে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনে পূর্ব থেকে পরিকল্পিতভাবে পুতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে যে নারকীয়, নৃশংস কাপুরুষচিত হামলা চালানো হয়েছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এটিই ছিল সন্ত্রাসী বোমা হামলার প্রথম ঘটনা। এ বোমা হামলায় ৫ জন গঠনাস্থলে নিহত হন। তারা হলো- নূর ইসলাম, ইলিয়াছ মুন্সি, তপন, সন্ধ্যা ঘোষ ও বাবুল সূত্রধর।'[৮৯০]

২০০১ সালে জঙ্গিদের বোমা হামলা

২০০১ সালের ১৪ই এপ্রিল বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ১০ জন নিহত, অন্তত ১১ জন আহত এবং অনেকেই পঙ্গু হন। ঐ ঘটনায় করা দু'টি মামলায় মুফতি হান্নানসহ হুজি'র ১৪ নেতা-কর্মীকে আসামী করা হয়। বিগত চার দলীয় জোট সরকারের উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টুর ভাই মাওলানা তাজউদ্দিন সহ ৮ আসামী পলাতক ছিলেন।'[৮৯১] ২০০১ সালের ২০ জানুয়ারী পল্টনে সিপিবি'র সমাবেশে হরকাতুল জিহাদ বোমা হামলা করে। এতে ঘটনাস্থলে ৪ জন নিহত এবং কমপক্ষে ১৫ জন গুরুতর আহত হয়। এ ব্যাপারে তখন নগরীর মতিঝিল তাথানায় মামলা দায়ের {নং-৬০(১)০১} করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা ঐ মামলার ২, ২০ ও ২২ নম্বর পলাতক আসামী। গ্রেফতারকৃত মাওলানা মোঃ ইদ্রিস আলী ও মাওলানা মোঃ আব্দুল লতিফ ২০০১ সালে রমনা বটমূলে বোমা হামলা মামলার পলাতক আসামী।'[৮৯২]

২০০৪ সালে জঙ্গিদের বোমা হামলা

২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট ঢাকা বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এক জনসভায় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার উপর বর্ষন করা হয় ভয়নাক গ্রেনেড বৃষ্টি। এ ঘটনায় প্রাণ হারান ২৭ জন নারী ও পুরুষ। আজীবন পঙ্গুত্ব বরণ করেন শত শত নিরপরাধ মানুষ। অবিশ্বাসী হলেও সত্য যে, এতে শুধু শেখ হাসিনাকেই লক্ষ্য করে অনিক নিকট থেকে অনবরত গ্রেনেড ছোড়া হলেও মহান রক্ষাকর্তা আল্লাহ্

---

[৮৮৯]. সুব্রত শুভ, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার*, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, Categories: ধর্ম, বাংলাদেশ, মুক্তমনা, রাজনীতি। Tags: জঙ্গিবাদ

[৮৯০]. দৈনিক গ্রামের কাগজ, ২৩শে জুন ২০১০ খ্রি. বুধবার, ৮৭ সংখ্যা, রেজি. ইং কে এন ৩৯৬ যশোর ১২তম বর্ষ ১০ই রজব, ১৪৩১ হি. আষাঢ় ১৪১৭বঙ্গাব্দ (http://gramerkagog.com//details.php?cid 2&id= 365)

[৮৯১]. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, মঙ্গলবার ২২ জুন ২০১০, ৮ আষাঢ় ১৪১৭, ৯ রজব ১৪৩১ হি. (http://www.prothom- alo.com/details/date 2010-01-14/news/34914)

[৮৯২]. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা সোমবার ১৫ মার্চ ২০১০, ১ চৈত্র ১৪১৬, ২৮ রবিউল আউয়্যাল ১৪৩১ হি. পৃ. ৮

তা'আলার বিশেষ রহমতে অলৌকিকভাবে বেঁচে যান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা।'[৮৯৩]

২০০৪ সালের ১২ই জানুয়ারী সিলেট হযরত শাহ্ জালাল (রহ.) এর মাযার প্রাঙ্গনে প্রথম দফায় বোমা হামলা হয়। একই বছরে ৫ই আগষ্ট নগরীর রংমহল, মনিকা ও অবকাশ সিনেমা হলে একযোগে বোমা হামলা চালানো হয়। ২৪শে ডিসেম্বর বিকালে মহিলা আওয়ামীলীগ কার্যালয়ে গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটে। মাজারের বার্ষিক ওরশ চলাকালে রাত সোয়া ৮.০০ টায় বোমা হামলায় মারা যান তিন ভক্ত। এছাড়াও এ ঘটনায় আহত হয় সত্তর জন। রংমহল সিনেমা হলের প্রধান ফটকে বোমা হামলায় জৈন্তাপুর উপজেলার আনোয়ার হোসেনের ছেলে শাহাদ আহমদ (১২) ঘটনাস্থলে নিহত হয়। অপর দু'টি সিনেমা হলের মধ্যে নগরীর বাগবাড়ির মনিকা সিনেমা হলে বোমার বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হননি। তালতলার অবকাশ সিনেমা হলে পুঁতে রাখা বোমাটি বিস্ফোরণ হয়নি। মহিলা আওয়ামীলীগ কার্যালয়ে গ্রেনেড হামলায় আওয়ামীলীগ দলীয় সংসদ সদস্য সৈয়দা জেবুন্নেছা হকসহ ২০ জন আহত হন।'[৮৯৪]

২০০৫ সালে জঙ্গিদের বোমা হামলা

নেত্রকোনা উদীচীতে জঙ্গি বোমা হামলার চতুর্থ বার্ষিকী দিনব্যাপী কর্মসূচীর দিনে জানা যায় যে, ২০০৫ সালের মঙ্গলবার, ৮ই ডিসেম্বর সকালে জিএমবি'র আত্মঘাতী জঙ্গিরা জেলা শহরের অজহর রোডে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর কার্যালয়ের সামনে পরপর দু'টি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। উদীচীর সহ-সাধারণ সম্পাদক খাজা হায়দার হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক সুদীপ্তা পাল শেলীসহ ৮ জন নিহত হন। নিহত অন্যান্যরা হলেন, ভিক্ষুক জয়নাল আবেদীন, আফতাব উদ্দিন, রইস উদ্দিন, গৃহিণী রাণী আক্তার, মোটর গ্যারেজ কর্মচারী যাদব দাশ ও আত্মঘাতী কিশোর কাফি এ ছাড়াও সেদিনের ঘটনায় আহত হন প্রায় অর্ধশতাধিক ব্যক্তি।'[৮৯৫]

গোয়েন্দাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালের ১৭ই আগস্ট সারা দেশে একসঙ্গে সিরিজ বোমা হামলা চালায় ওহাবী মাওলানা আব্দুর রহমান ও সন্ত্রাসীর দল জেএমবি। ঐ হামলার মাধ্যমে জেএমবি তাদের শক্তির মহড়া দেয়।'[৮৯৬]

২০১০ সালে জঙ্গিদের বোমা হামলা

আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে ১৪ দলের আমল

২৫ মে, ২০২০

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী কুতুরপুর গ্রামের মাঠ থেকে ব্র্যাক এনজিওর মাঠকর্মী সাইফুল ইসলাম (৩৮) এর মরদেহ উদ্ধার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। সাইফুল ইসলাম উপজেলার সীমান্তবর্তী পিরপুরকুল্লা গ্রামের আব্দার আলীর ছেলে। সে চাপাইনবাবগঞ্জ বটতলা হাটের চার ব্র্যাক এনজিও কর্মরত ছিল'[৮৯৭] চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বাঘাডাঙ্গার গীর্জাপাড়ায় এক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আহত ১ জন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদনে ২০২০ সালে সংগঠিত তিনটি সন্ত্রাসী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি ঘটে ২৮ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে। একটি পুলিশ বক্সের কাছে একটি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে। ৩১ জুলাই নওগাঁ জেলায় একটি মন্দিরে হামলা হয়, সেখানে একটি বোমা পেতে রাখা হয়েছিল। দুটি হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএস।'[৮৯৮]

২০১৮ খ্রি.

---

৮৯৩. C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\দৈনিক আজাদী- চিঠিপত্র বিস্তারিত.htm

৮৯৪. সিলেট অফিস/ন্যাশনালনিউজ/প্রতিনিধি/এমএম/০৫জুন/০০৫৫ঘ (http://www.nationalnews.com.bd/index.php?emd details.news&newsld=10146)

৮৯৫. (http://www.al-ihsan.net/FullText.aspx?subid=4&textid-60,

৮৯৬. (http://www.al-ihsan.net/FullText.aspx?subid=4&textid-60, প্রাগুক্ত

৮৯৭. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৫ মে ২০২০ (https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/05/25/915591)

৮৯৮. https://www.jaijaidinbd.com/national/221248

২০১৭ খ্রি.

১৫ই অগাস্ট, ২০১৭ খ্রি.

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে মিছিলে হামলার পরিকল্পনা সাইফুল ইসলামের ছিল জানিয়ে আইজিপি বলেন, 'এই ৩২ নম্বরকে কেন্দ্র করে যে মিছিলগুলো আসবে, সেই মিছিলে আত্মঘাতী বোমা হামলা করবে এবং শত শত লোককে মেরে ফেলবে এ ধরনের প্রস্তুতি ছিল তার। গোয়েন্দারা তাকে ফলো করে জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পায়। ওলিও হোটেলে তল্লাশি করে একটি রুমে রেসপন্স পাওয়া গেল, তাতে বুঝা গেল সে জঙ্গি। আমরা তাকে আটকে রাখলাম এবং তাকে সালে-ার করতে বললাম। কিন্তু সে সালেণ্ডার করেনি।' সাইফুলের পিতা জামাতের রাজনীতির সাথে জড়িত।

১১ মে, ২০১৭

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার হাবাসপুরে জঙ্গি আস্তানায় অপারেশন সান ডেভিল অভিযানে ছয়জন নিহত হয়েছেন। জঙ্গিদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণের সময় একজন নারী ও পুরুষ দৌড়ে গিয়ে কাছে থাকা ফায়ার সার্ভিসের আব্দুল মতিনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেন। পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান গোদাগাড়ী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ফায়ারম্যান আবদুল মতিন। আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিহত হন ওই আস্তানার পাঁচজন জঙ্গি। এ ঘটনায় আহত হন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমিত চৌধুরী, গোদাগাড়ী থানার এএসআই উৎপল কুমার ও কনস্টেবল তৌহিদুল ইসলাম। নিহত জঙ্গিরা হলেন সাজ্জাদ আলী (৫০), তার স্ত্রী বেলি বেগম (৪৫), ছেলে আল-আমিন (২৫), মেয়ে কারিমা খাতুন (১৭) এবং বহিরাগত যুবক আশরাফুল। সাজ্জাদের আরেক মেয়ে সুমাইয়া তিন ঘন্টা বসে থাকার পর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সুমাইয়ার দুই সন্তান জুবায়ের (৭) ও দেড় মাস বয়সী আফিয়াকে পুলিশ ওই আস্তানা থেকে উদ্ধার করেন। পুলিশ জানায়, ওই বাড়িটি কাপড় ব্যবসায়ী সাজ্জাদ আলী নিজেরই।'[৮৯৯]

২৭ এপ্রিল, ২০১৭

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মোবারকপুর ইউনিয়নের শিবনগর এলাকার 'জঙ্গি আস্তানায়' পরিচালিত অভিযান 'অপারেশন ঈগল হান্ট'-এ আবুসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এর আগে বিকেল সোয়া চারটার দিকে জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানায় পুলিশ। সে সময় এ আহ্বানে কেউ সাড়া দেয়নি। ওই আহ্বানের পর একপর্যায়ে জঙ্গি আস্তানা থেকে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। পুলিশ জানায় চারজনই আত্মঘাতী হয়েছেন। এ ছাড়া ওই 'জঙ্গি আস্তানা' থেকে আহত এক নারী ও এক শিশুকে উদ্ধারের পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'[৯০০]

২৯ মার্চ, ২০১৭

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের নাসিরপুরের বাগানবাড়ি গ্রামে জঙ্গিবিরোধী অভিযানের সময় পুলিশের উপর গ্রেনেড ও গুলি করে জঙ্গিরা। জঙ্গি আস্তানায় সোয়াটের অপরেশনের নাম- অপারেশন হিট ব্যাক। এ অভিযানে মারা যান ৭ থেকে ৮ জন।'[৯০১]

২৫ মার্চ, ২০১৭

সেনাবাহিনীর ব্রিফিংস্থলের কাছে দুই দফায় বোমা বিস্ফোরণ, নিহত ৬, আহত ৫০ জন। নিহতদের মধ্যে দুই পুলিশ সদস্য, আহতদের মধ্যে ২ সেনা সদস্য রয়েছেন। বোমা হামলায় র‍্যাবের গোয়েন্দা প্রধান লে. কর্নেল আবুল কালাম আজাদ গুরুতর আহত হয়ে ৩০ মার্চ মারা যান। এছাড়া ঘটনাস্থল হতে অবিস্ফোরিত একটি মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়। গতকাল (২৪শে মার্চ) থেকে সিলেট মহানগরের দক্ষিণ সুরমার

---

৮৯৯. বাংলাদেশ প্রতিদিন, শনিবার, ১৩ মে, ২০১৭, সম্পাদক: নঈম নিজাম (https://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/05/13/231078)

৯০০. the report24.com, ২৭ এপ্রিল ২০১৭ 'অপারেশন ঈগল হান্ট' শেষ, ৪ 'জঙ্গি' নিহত, সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু, (http://bangla.thereport24.com/article/186445/index.html)

৯০১. বাংলা নিউজটোয়েন্টিফোর.কম, মার্চ ২৯ ২০১৭, সম্পাদক: জুয়েল মাজহার (https://www.banglanews24.com/national/news/bd/563866.details)

শিববাড়ি এলাকায় সন্দেহভাজন জঙ্গি আস্তানা আতিয়া মহলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী অভিযান পরিচালনা করে। এছাড়া অভিযান পরিচালনা দেখতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হোন ১ এলাকাবাসী। জঙ্গি বিরোধী অভিযানে বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সিলেটে রকেট লঞ্চার ব্যবহার করেছে। এর আগে মর্টার ব্যবহার করা হয় ১৯৮৯ সালে পীর মতিউরের আস্তানার দখল নিতে। সেনা বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অপারেশন টোয়ালাইট-এ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদিনের (জেএমবি) অন্যতম শীর্ষ নেতা মঈনুল ইসলাম ওরফে মুসাসহ এক নারী ও দুই জেএমবি সদস্য নিহত হয়।'[৯০২]

২৪ মার্চ, ২০১৭

ঢাকায় বিমানবন্দর গোলচত্বরে বিস্ফোরণে নিহত ১ (হামলাকারী)। শক্তিশালী এ বিস্ফোরণে আত্মঘাতী ওই ব্যক্তির শরীর পেট বরাবর দ্বিখণ্ডিত হয়ে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার আনুমানিক বয়স ২৫ বছর। আত্মঘাতী হামলার দায় আইএস স্বীকার ও জঙ্গির ছবি প্রকাশ করে আইএস। বাংলাদেশ পুলিশ বলছে এটি আত্মঘাতী হামলা নয়।'[৯০৩]

১৭ মার্চ, ২০১৭

শুক্রবার ঢাকায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন বা র‍্যাবের নির্মাণাধীন সদর দপ্তরে একটি আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে । এতে হামলাকারী নিহত ও দুই ব্যক্তি সদস্য আহত হয় আইএস এই হামলার দ্বায় স্বীকার করেছে। হামলাকারী কালো পাঞ্জাবী পরে হামলা চালায়।'[৯০৪]

৮ মার্চ, ২০১৭

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার কুটুম্বপুর এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশের ওপর বোমা হামলা হয়েছে। এ হামলার পর বোমা ও ছুরিসহ জসিম ও হাসান নামে জেএমবির দুই সদস্যকে আটক করে পুলিশ। মহাসড়কে দ্রুতবেগে আসা একটি বাস চেকপোস্টে থামানোর পর সেটি থেকে নেমেই দুই জঙ্গি বোমা ছোড়ে।

৬ মার্চ, ২০১৭

জঙ্গি নেতা মুফতি হান্নানের বহনকারী প্রিজন ভ্যানে বোমা হামলা। গাজীপুরে টঙ্গী কলেজ গেট এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হরকাতুল জিহাদের নেতা মুফতি হান্নানকে বহনকারী পুলিশের একটি প্রিজন ভ্যান লক্ষ করে ককটেল হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ট্রাফিক পুলিশ।[৯০৫]

সাম্প্রতিক সময়ে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলো'[৯০৬]:

তারিখ	স্থান	অপারেশনের নাম	হতাহত (সন্ত্রাসী)
০১/০৭/২০১৬	**হলি আর্টিজান রেস্তোঁরা, গুলশান, ঢাকা**	Operation Thunderbolt	০৬
২৬/০৭/২০১৬	কল্যাণপুর, ঢাকা	Operation Storm-26	০৯
২৭/০৮/২০১৬	ইারায়নগঞ্জ	Operation Hit Strong-27	০৩
০৮/১০/২০১৬	পাতারটেক ও হাড়িনাল, গাজীপুর	Operation Spate-8	১২
২৪/১২/২০১৬	আশকোনা, ঢাকা	Operation Ripple-24	০২

৯০২. বাংলা ট্রিবিউন, ২৫ মার্চ ২০১৭, সম্পাদক: জুলফিকার রাসেল (https://www.banglatribune.com/192317)

৯০৩. আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন, ২৪ মার্চ ২০১৭ (https://www.anandabazar.com/bangladesh/suicide-blast-at-dhaka-international-airport-police-checkpoint-kills-bomber-bng-dgtl-1.585627)

৯০৪. "Suicide bomber attacks RAB barracks"1 Dhaka Tribune (ইংরেজি ভাষায়), ১৭ মার্চ ২০১৭

৯০৫. সুব্রত শুভ, প্রাগুক্ত, ২৪ এপ্রিল ২০১৬

৯০৬. সম্পাদনা পরিষদ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, প্রফেসরস প্রকাশন, বর্ষ-২২, সংখ্যা-২৫০, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ২১

১৬/০৩/২০১৭	সীতাকু-, চট্টগ্রাম	Operation Assult-16	০৪
২৫/০৩/২০১৭	দক্ষিণ সুরমা, সিওেঁ	Operation Twilight	০৪
৩০/০৩/২০১৭	নাসিরপুর, মৌলভীবাজার	Operation Hit back	০৭
৩১/০৩/২০১৭	কোটবাড়ী, কুমিল্লা	Operation Strike Out	০০
২৬/০৪/২০১৭	শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ	Operation Eagle Hunt	০৪
০৭/০৫/২০১৭	সদর ও মহেষপুর, ঝিনাইদহ	Operation Subtle Split	০২

২০১৬

২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬

দেশে প্রথম নারী জঙ্গি (শাকিরা, ইউরোপে প্রথম নারী জঙ্গির নাম-হাসনা আইটবুলাসেন) সুইসাইডাল ভেস্টের বিস্ফোরণে দুই জন নিহত হন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্মকর্তারা জানান, বাড়ির ভেতরে থাকা তিনজনকে আত্মসমর্পণ করতে বললে বোরকা পরা এক নারী ধীরে ধীরে হেঁটে ঘরে থেকে বের হয়। এ সময় তাকে হাত উঁচু করতে বললে তিনি তা করেনি এবং বোরকা পরা থাকায় বোঝা যাচ্ছিল না তার কোমরে সুইসাইডাল ভেস্ট রয়েছে। ঘরের দরজার কাছে এসে তিনি বিস্ফোরণ ঘটনায়। এতে পুলিশ আহত হয় এবং ৮ বছরের শিশুটি আহত হয়।'[৯০৭]

৭ জুলাই, ২০১৬

২০১৬ সালে ঈদুল ফিতরের দিন (৭ জুলাই) কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় দেশের সবচেয়ে বড় ঈদ জামাতের মাঠের অদূরেই আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে। এ হামলায় জহিরুল ইসলাম ও আনছারুল হক নামে দুইজন পুলিশ কনস্টেবল, স্থানীয় গৃহবধূ ঝর্ণা রাণী ভৌমিক ও আবির রহমান নামে এক জঙ্গি নিহত হন। আহত হন আরো ৮ জন পুলিশ সদস্য।'[৯০৮]

২ জুলাই, ২০১৬

রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয় সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন ২০ জন। তাদের মধ্যে নয়জন ইতালির, সাতজন জাপানের, একজন ভারতের ও তিনজন বাংলাদেশী নাগরিক বলে পরিচয় পাওয়া যায়। ইতালির নয়জন নাগরিকদের মধ্যে ছয়জনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন: ভিন সেন জো, নাদিয়া বেনেদেত্তি, আদি, মার্কো, মারিয়া ও সিমনি। ইতালির নয়জনের নাম পাওয় যায়নি। ভারতের ১৯ বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে যার নাম তারিশি জৈন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলের ছাত্রী, তারিশি ছুটিতে ঢাকায় এসেছিলেন। নিহতদের মধ্যে তিন জন বাংলাদেশী। তারা হলেন, ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের নাতি ফারাজ আইয়াজ হোসেন, ঢাকার ইনস্টিটিউব অব এশিয়ান ক্রিয়েটিভস এর সাবেক পরিচালক ইশরাত আকন্দ এবং ল্যাভেন্ডার গ্রুপের মালেক মনজুর মোরশেদের নাতনি অবিন্তা কবীর।

তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল ধর্মান্ধতার কারণে, জঙ্গিরা বর্বোরচিত ভাবে যারা আয়াত মুখস্থ বলতে পারেনি তাদের সহ মোট ২০ জনকে জবাই করে হত্যা করে । এছাড়া জঙ্গিদের হামলায় ২ পুলিশ সদস্য নিহত হন। আহত হন আরও ২০ জন। এছাড়াও সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় হিন্দু পুরোহিত ভবসিন্ধু বরের কুপিয়ে জখম করা হয়েছে এবং কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের নগুয়া এলাকায় বিবেকানন্দ পাঠাগার ও মন্দিরের

---

[৯০৭]. বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ (https://www.banglanews24.com/national/news/bd/542597.details)

[৯০৮]. বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৮ জুলাই ২০১৬, প্রাগুক্ত

সেবায়েতের ওপর শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে হামলা হয়। এতে সামান্য আহত হলেও সেবায়েত পুলক চক্রবর্তী পুলক (৪৬) নিজ বুদ্ধিমত্তার জোরে বেঁচে যান।[৯০৯]

১ জুলাই, ২০১৬

ঝিনাইদহে হিন্দু সেবায়েত শ্যামানন্দ দাসকে (৬২) ও বান্দরবানে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারীতে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০ টায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আওয়ামী লীগ নেতা মংশৈনু মারমকে (৫৬) কতিপয় জঙ্গি কুপিয়ে হত্যা করে।'[৯১০] একই দিনে ঝালকাঠি সদর উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের দাড়িয়াপুর গ্রামে মহসিন হাওলাদার (৩০) নামের মসজিদের এক মুয়াজ্জিনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। উল্লিখিত হত্যাকা-ের দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট।'[৯১১]

১০ জুন, ২০১৬

পাবনা সদর উপজেলার হেমায়েতপুরে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ সেবাশ্রম সেবক নিত্যরঞ্জন পান্ডেকে (৬২) কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। দেশের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই হত্যার মিল দেখছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শুক্রবার ভোর ৬ টার দিকে পাবনা মানসিক হাসপাতালের মূল ফটকের কাছে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, নিত্যরঞ্জন পান্ডে ভোরে হাঁটতে বের হয়েছিলেন। এ সময় সেবাশ্রমের পাশের হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতাল এলাকায় তার ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এরপর কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। দায় স্বীকার করেছে আইএআইএস।'[৯১২]

৭ জুন, ২০১৬

ঝিনাইদহে বৃদ্ধ পুরোহিত আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলিকে গলা কেটে হত্যা। মঙ্গলবার সকাল নয়টার পর এলাকার একটি মাঠ দিয়ে বাইসাইকেলে করে যাওয়ার সময় তাঁকে হত্যা করা হয়। এ হত্যার দায় স্বীকার করেছে আইএস।'[৯১৩]

৫ জুন, ২০১৬

চট্টগ্রামে পুলিশ সুপার (এসপি) বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা খানমকে গুলি করে হত্যা এবং নাটোরে খ্রিস্টান ব্যবসায়ী সুনীল গমেজকে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জবাই করে হত্যা। সুনীল হত্যায় দায় স্বীকার করেছে আইএস।'[৯১৪]

২৪ মে, ২০১৬

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে জুতা ব্যবসায়ী দেবেশ চন্দ্র প্রামাণিককে কুপিয়ে হত্যা। দায় স্বীকার করেছে আইএস।'[৯১৫]

২০ মে, ২০১৬

কুষ্টিয়ায় সানোয়ার হোসেন (৫৫) নামের এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে কুপিয়ে হত্যা করেছে । এ সময় সাথে থাকা সানোয়ারের বন্ধু কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুজ্জামানের ওপরও হামলা চালায় জঙ্গিরা।'[৯১৬]

১৪ মে, ২০১৬

বান্দরবানের বাইশারী ইউনিয়নের চাক পাড়ার মংশৈ উ চাক (৭৫) নামের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে।'[৯১৭]

---

[৯০৯]. দৈনিক প্রথম আলো, ২ জুলাই ২০১৬ (https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime)

[৯১০]. সময়ের কন্ঠস্বর, চট্টগ্রাম, শুক্রবার, ১ জুলাই, ২০১৬ (https://www.somoyerkonthosor.com/2016/07/01/8822.htm)

[৯১১]. The Daily Star, Sat Jul 2, 2016 (https://www.thedailystar.net/frontpage/another-hindu-priest-murdered-1249114#lg=1&slide=0)

[৯১২]. এটিএন বংলা, পাবনা প্রতিনিধি, একই কায়দায় পাবনায় হিন্দু অশ্রম সেববককে হত্যা (https://www.atnbangla.tv/)

[৯১৩]. bdnews24.com, 08 Jun 2016 (https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1164639.bdnews)

[৯১৪]. বাংলা ট্রিবিউন, ০৫ জুন, ২০১৬ (https://www.banglatribune.com/111135)

[৯১৫]. বাংলাদেশ প্রতিদিন, শুক্রবার ২৭ মে ২০১৬, পৃ. ১ (https://www.bd-pratidin.com/first-page/2016/05/27/147191)

[৯১৬]. The Daily Star, Sat May 21, 2016 (https://www.thedailystar.net/frontpage/homeo-doctor-killed-kushtia-1227316)

০৭ মে, ২০১৬
রাজশাহীর তানোর উপজেলায় মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (৬০) নামে এক পীর সাহেবকে গলা কেটে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজশাহীর তানোর উপজেলার বাঁধাইড় ইউনিয়নের একটি আম বাগান থেকে তার গলা কাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।'[৯১৮]
৩০ এপ্রিল, ২০১৬
নিখিল চন্দ্র জোয়ারদার তিন বছর আগে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে কটূক্তি করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় এলাকার লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে তাকে পুলিশে সোপর্দ করেন। সেই কটুক্তির কারণে তাকে কুপিয়ে ও জবাইকে হত্যা করে ইসলামিক জঙ্গিরা।'[৯১৯]
২৫ এপ্রিল, ২০১৬
ঢাকা ধানমন্ডি-র কলাবাগান লেক সার্কাসের ৩৫ নম্বর বাসায় সোমবার বিকেল ৫টায় সমকামী বিষয়ক পত্রিকা রূপবানের সম্পাদকসহ ২ জন খুন। রূপবান পত্রিকার সম্পাদক জুলহাস মান্নান ইউএসএইডে কর্মরত ছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাবেক প্রটোকল কর্মকর্তাও ছিলেন তিনি। অন্যদিকে মাহবুব তন্ময় ছিলেন নাট্য ও সমকামীদের অধিকার আন্দোলনের কর্মী। খুনিরা আল্লাহ আকবর স্লোগান দিয়ে চলে যায়। হত্যা করে আনসার-আল-ইসলাম।'[৯২০]
২৩ এপ্রিল ২০১৬
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী কে নিজ বাসার পাশে সকাল বেলায় জবাই করে হত্যা করে আইএস।'[৯২১]
৬ এপ্রিল, ২০১৬
গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নাজিমুদ্দিন সামাদকে হত্যা করে আনসার-আল-ইসলাম।'[৯২২]
১৪ মার্চ, ২০১৬
ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রামে হোমিও চিকিৎসক আবদুর রাজ্জাককে খুন করার পর তথাকথিত ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠী দাবী করে যে তিনি শিয়া মতবাদ প্রচার করতেন এবং সে কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে।'[৯২৩]
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে যজ্ঞেশ্বর রায় নামে ওই হিন্দু পুরোহিতকে গলা কেটে হত্যা করে জেএমবি/আইএস।'[৯২৪]
৭ জানুয়ারি, ২০১৬
ঝিনাইদহে হোমিউপ্যাথিক ডাক্তার ছামির উদ্দিন মন্ডলকে হত্যা করে জেএমবি/আইএস।[৯২৫]
১১ জানুয়ারি, ২০১৫
কর্মস্থলে যাওয়ার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজের শিক্ষিকা অঞ্জলী রানী দেবীকে (৫০)। নিহত অঞ্জলীর বাড়ি হাটহাজারী উপজেলার ফতেয়াবাদ শিকারপুরে। হিজাবের জের ধরে চট্টগ্রামে নার্সিং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা অঞ্জনা দেবীকে হত্যা করে জেএমবি।'[৯২৬]

---

[৯১৭]. The Guardian, Sat 14 May, 2016 (https://www.theguardian.com/world/2016/may/14/bangladesh-elderly-buddhist-monk-hacked-to-death-say-police)
[৯১৮]. দৈনিক ইনকিলাব, ৭ মে, ২০১৬, পৃ. ১ (https://www.dailyinqilab.com/article/17452)
[৯১৯]. Tangail24.com 15 Jun 2016 (https://tangail24.com/news/259)
[৯২০]. RFN24.com, 25 Apr 2016 (https://rfn24.com)
[৯২১]. https://us.search.yahoo.com/search?fr=yhs-invalid&p, Apr 23, 2016
[৯২২]. https://www.dw.com/bn, Apr 26, 2016
[৯২৩]. BBc News Bangla, 15 Mar 2016 (https://www.bbc.com/bengali/news/2016/03/160315_bangladesh_shia_killing_is)
[৯২৪]. bdnews24.com, 21 Feb 2016 (https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1108538.bdnews)
[৯২৫]. সুব্রত শুভ, প্রাগুক্ত, ২৪ এপ্রিল ২০১৬
[৯২৬]. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১১ জানুয়ারী ২০১৫ (https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2015/01/11/173843)

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
টিএসসিতে বই মেলা থেকে ফেরার পথে রাত সোয়া নয়টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাশে সন্ত্রাসীরা মুক্তমনার প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান লেখক অভিজিৎ রায় ও তাঁর স্ত্রী নাফিজা আহমেদকে কুপিয়ে জখম করে। আহত অবস্থায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত সাড়ে ১০টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান অভিজিৎ। অভিজিত রায়কে হত্যা, প্রাণে বেঁচে যান স্ত্রী লেখিকা বন্যা আহমেদ। হামলা চালায় আনসারউল্লাহ বাংলা টিম।'[৯২৭]
৩০ মার্চ, ২০১৫
ওয়াশিকুর রহমান ওরফে বাবু দক্ষিণ বেগুনবাড়ি এলাকার দীপিকার মোড়ের কাছে একটি বাসায় সাবলেট থাকতেন। সকাল পৌনে ১০টার দিকে বাসার কাছেই গলিতে (তেজগাঁও এলাকায়) তিনজন চাপাতি নিয়ে ওয়াশিকুরের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে হেফাজতে ইসলাম/আনসারউল্লাহ বাংলা টিম।'[৯২৮]
২১ এপ্রিল, ২০১৫
আশুলিয়ায় বাংলাদেশ কর্মাস ব্যাংকের কাঠগড়া শাখায় জঙ্গি হামলা। ডাকাতির সময় জঙ্গিরা গুলি করে এবং কুপিয়ে ৮ জনকে হত্যা করে।[৯২৯]
১২ মে, ২০১৫
বিজ্ঞান লেখক অনন্ত বিজয় দাসকে সিলেটে হত্যা করে আনসারউল্লাহ।[৯৩০]
৭ অগাস্ট, ২০১৫
ঢাকায় ব্লগার নীলয় নীলকে হত্যা করে আনসার-আল-ইসলাম।[৯৩১]
৯ অগাস্ট ২০১৫
২০১৫ সালের ৯ অগাস্ট নীলফামারীতে শিক্ষক মানব চন্দ্র রায়কে ইজি বাইকের মধ্যে হত্যা করে জঙ্গিরা। দায় স্বীকার করেছে জেএমবি।[৯৩২]
৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
মাহমত উল্লাহ ও তার সহযোগীকে চট্টগ্রামের মাজারে হত্যা করে জেএমবি।
২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
গুলশানে ইতালির নাগরিককে হত্যা করে জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএস।[৯৩৩]
৩ অক্টোরবর, ২০১৫
রংপুরে জাপানি নাগরিক হোসি কুনিওকে হত্যা করে আইএসআইএস।[৯৩৪]
৫ অক্টোবর, ২০১৫
পাবনাতেও চার্চের জাজককে জবাই করে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে আটক হয়েছে শিবির কর্মী।[৯৩৫]
৬ অক্টোরব, ২০১৫
আধ্যাত্মিক নেতা খিজির খানকে হত্যা করে জেএমবি।[৯৩৬]
২২ অক্টোবর, ২০১৫

---

[৯২৭]. দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ (https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime)
[৯২৮]. bdnews24.com, 30 Mar 2015 (https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article946953.bdnews)
[৯২৯]. দৈনিক নবরাজ, ২৩ এপ্রিল ২০১৫ (http://www.dailynabaraj.com/2015/04/23/74186.html)
[৯৩০]. bangla.bdnews24.com, 12 May 2015(https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1108538.bdnews)
[৯৩১]. দৈনিক প্রথম আলো, ৮ আগস্ট ২০১৫ (https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime)
[৯৩২]. bangla.bdnews24.com, 17 Jan 2018(https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1108538.bdnews)
[৯৩৩]. MTnews24.com, 01 Oct 2015 (https://bn.mtnews24.com/jatio/10255/)
[৯৩৪]. BBC NEWS.com, 03 Oct 2015 (https://www.bbc.com/bengali/news/2015/10/151003_bangladesh_japanese_citizen_killing_detained)
[৯৩৫]. দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০১৫ (https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime)
[৯৩৬]. দৈনিক সমকাল, ৭ অক্টোবর ২০১৫ (https://samakal.com/todays-print-edition/tp-last-page/article/1510166091)

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার গাবতলিতে পুলিশ চেক পোস্টে হামলা চালায় আহত হয় পুলিশ সদস্য ইব্রাহিম মোল্লা। হামলা চালায় আইএস/জেএমবি।[৯৩৭]

২৪ অক্টোবর, ২০১৫

শিয়াদের তাজিয়া মিছিলে গ্রেনেড হামলায় নিহত ১, আহত অর্ধশতাধিক। হামলা চালায় আইএস/জেএমবি।

৩১ অক্টোবর, ২০১৫

জাগৃতি প্রকাশক আরেফিন ফয়সাল দীপন ও শুদ্ধস্বরের প্রকাশক টুটুলের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে জাগৃতি প্রকাশনীর নিপত নিহত হোন। একই সময়ে শুদ্ধস্বরের প্রকাশক টুটুলের সাথে গুরুতরভাবে আহত হোন লেখক রণদীপন বসু ও কবি তারেক রহিম। হামলা চালায় আনসার-আল-ইসলাম।[৯৩৮]

৮ নভেম্বর, ২০১৫

রংপুরে বাহাই সেন্টার ডিরেক্টর রুহুল আমিনের ওপর আক্রমণ চালায় জেএমবি/আইএস।[৯৩৯]

১০ নভেম্বর, ২০১৫

রংপুরে মঠাধ্যক্ষকে জবাই করে হত্যা করে জেএমবি/আইএস।

১৮ নভেম্বর, ২০১৫

দিনাজপুরে ইতালিয়ান ডক্টর ও ধর্মযাজককে গুলি করে হত্যা চেষ্টা চালায় জেএমবি/আইএস।

২৬ নভেম্বর, ২০১৫:

বগুড়ায় শিয়া মসজিদে ঢুকে গুলি, মুয়াজ্জিন নিহত। হামলা চালায় আইএস/জেএমবি।[৯৪০]

৩০ নভেম্বর, ২০১৫

দিনাজপুরে ইসকনের প্রেসিডেন্ট বীরেন্দ্র নাথের উপর গুলি চালায় জেএমবি/আইএস।[৯৪১]

৫ ডিসেম্বর, ২০১৫

দিনাজপুরে রাসমেলার যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা বিস্ফোরণ। আহত ১০ জন। জেএমবি/আইএস।

১০ ডিসেম্বর, ২০১৫

দিনাজপুরের কাহারোলে ইসকন মন্দিরে গুলি ও বোমা হামলায় দুইজন আহত। সন্দেহ জেএমবি/আইএস।

১০ ডিসেম্বর, ২০১৫

চুয়াডাঙ্গায় বাউল সংগঠক জাকারিয়া হোসেন জাকির নিহত। সন্দেহ জেএমবি/আইএস ।

১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫

বাউল উৎসবের আয়োজক খুন: দুজনকে পুলিশে সোপর্দ

১৯ ডেসেম্বর, ২০১৫

চট্টগ্রামে নৌ বাহিনীর মসজিদে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায় জেএমবি/হিজবুল ফুজুল

২৫ ডিসেম্বর ২০১৫

রাজশাহীর বাগমারায় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের একটি মসজিদে জুমার নামাজের সময় আত্মঘাতী বোমা হামলায় একজন নিহত হয়েছেন এবং ১০ জন আহত হয়েছে। হামলা চালায়-আইএস/জেএমবি।[৯৪২]

২০১৪

২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

যুবলীগ নেতার নির্দেশে ত্রিশালে পুলিশ মেরে প্রিজন ভ্যান থেকে জঙ্গি ছিনতাই। রোববার সকালে ময়মনসিংহের ত্রিশালের এই ঘটনায় যাদের ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তারা তিনজনই জেএমবির শীর্ষ পর্যায়ের নেতা বলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য জানিয়েছে। এদের মধ্যে সালাউদ্দিন সালেহীন ওরফে সানি (৩৮)

---

[৯৩৭]. দৈনিক কালের কন্ঠ, ০২ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ (https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2017/02/02/458916)

[৯৩৮]. দৈনিক সমকাল, ৩১অক্টোবর ২০১৫ (https://samakal.com/todays-print-edition/tp-last-page/article/1510166091)

[৯৩৯]. দৈনিক ইনকিলাব, ৮ নভেম্বর ২০১৫ (https://www.dailyjanakantha.com/details/article/152969)

[৯৪০]. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ (https://archive1.ittefaq.com.bd)

[৯৪১]. https://blog.muktomona.com › 24 Apr 2016

[৯৪২]. সুব্রত শুভ, প্রাগুক্ত, ২৪ এপ্রিল ২০১৬

এবং রাকিবুল হাসান ওরফে হাফেজ মাহমুদ (৩৫) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। অন্যজন জাহিদুল ইসলাম ওরফে বোমারু মিজান (৩৫) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত।'[৯৪৩]

২৪ জুন, ২০১৪

ব্লগার রাকিব মানষের ওপর হামলা চালায় আনসারউল্লাহ।'[৯৪৪]

২৭ অক্টোরব, ২০১৪

টিভি উপস্থাপক শেখ নুরুল ইসলাম ফারুকীকে হত্যা করে জেএমবি। যদিও তার অনুসারীরা শিবিরের নাম বলেছে।'[৯৪৫]

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

ডেফোডিল ইউনিভার্সিটির ছাত্র আশরাফুল ইসলামকে খুন করে আনসারউল্লাহ।'[৯৪৬]

১৫ নভেম্বর, ২০১৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক একেএম শফিউল ইসলামকে হত্যা করে শিবির/আনসারউল্লাহ বাংলা টিম।[৯৪৭]

১৩ জানুয়ারি, ২০১৩

উত্তরায় ব্লগার আসিফ মহিউদ্দীনের ওপর হামলা করে আনসারউল্লাহ বাংলা টিম।'[৯৪৮]

১৫ ফেবুয়ারি, ২০১৩

ব্লগার রাজিব হায়দারকে খুন করে জঙ্গি সংগঠন আনসারউল্লাহ বাংলা টিম।'[৯৪৯]

২ মার্চ, ২০১৩

সিলেটে ব্লগার ও গণজাগরণ কর্মী জগতজ্যোতী তালুকদারকে খুন করে আনসারউল্লাহ বাংলা টিম।'[৯৫০]

৭ মার্চ, ২০১৩

ঢাকার মিরপুরে ব্লগার ও ইঞ্জিনিয়ার সানিউর রহমানের ওপর হামলা চালায় আনসারউল্লাহ বাংলা টিম।'[৯৫১]

৯ এপ্রিল, ২০১৩

বুয়েটের ছাত্র আরিফ রায়হান দ্বীপকে হত্যা করে আনাসারউল্লাহ বাংলা টিম।'[৯৫২]

১১ অগাস্ট, ২০১৩

গাইবান্ধায় বুয়েট ছাত্র তন্ময় আহমেদ এর ওপর হামলা করে আনসারউল্লাহ বাংলা টিম।[৯৫৩]

৭ অক্টোরব, ২০১৩

লালখান বাজার মাদরাসায় বোমা তৈরি করতে গিয়ে ৩ জঙ্গি নিহত। তারা হুজির সদস্য ছিল।[৯৫৪]

১১ ডিসেম্বর, ২০১৩

গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী জাকারিয়া বাবুকে খুন করে জামাতের কর্মী।[৯৫৫]

২১ ডিসেম্বর, ২০১৩

গোপীবাগে পীর লুৎফর রহমানসহ ৬ জনকে হত্যা করে জেএমবি।[৯৫৬]

---

[৯৪৩]. দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০১৪ (https://www.prothomalo.com/bangladesh)

[৯৪৪]. banglanews24.com, 16 Nov 2014 (https://www.banglanews24.com/national/news/bd/340839.details)

[৯৪৫]. দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ আগস্ট ২০১৪ (https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime)

[৯৪৬]. https://news.priyo.com/articles

[৯৪৭]. সুব্রত শুভ, প্রাগুক্ত, ২৪ এপ্রিল ২০১৬

[৯৪৮]. https://www.dw.com/bn, 2 Apr 2013

[৯৪৯]. http://www.sachalayatan.com/haseeb/47990, 15 Feb 2013

[৯৫০]. দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ মে ২০১৫ (https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime)

[৯৫১]. banglanews24.com, 8Mar 2013 (https://www.banglanews24.com/national/news/bd/179936.details)

[৯৫২]. দৈনিক প্রথম আলো, ০২ জুলাই ২০১৩ (https://www.prothomalo.com/bangladesh)

[৯৫৩]. দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ আগস্ট ২০১৩ (https://www.prothomalo.com/bangladesh)

[৯৫৪]. দৈনিক প্রথম আলো, ০৮ অক্টোবর ২০১৩ (https://www.prothomalo.com/bangladesh)

[৯৫৫]. দৈনিক জনকন্ঠ, ২১ এপ্রিল ২০১৬, (https://www.dailyjanakantha.com/details/article/174105)

জানুয়ারি ২০১২
সেনা বাহিনীর ভাষ্য অনুসারে সেনা বাহিনীতে ক্যু করার চেষ্টা করে জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরীর।[৯৫৭]
২০০৯ সালে গাজীপুরের পুলিশ সুপারের সম্মেলনে গ্রেনেড হামলায় ১২ জন আহত হয়।[৯৫৮]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল

২০০৭১১ এপ্রিল, ২০০৭
ঝালকাঠি পাবলিক প্রোসিকিউটর হায়দার হোসেনকে গুলি করে হত্যা করে জেএমবি।[৯৫৯]

চার দলীয় জোট সরকারের আমল

৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক শেখ তাহের আহমদকে ওপর আক্রমণ করে হত্যা করে শিবির/জেএমবি।[৯৬০]
১৭ অগাস্ট, ২০০৫
জঙ্গিরা ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট একযোগে প্রায় একই সময়ে দেশব্যাপী ৬৩টি জেলায় ৫২৫টি স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। বোমা বিস্ফোরিত স্থানে চিরকুট পাওয়া যায়, যেখানে লেখা-জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ।'[৯৬১] একযোগে বোমা হামলায় ২ জন নিহত ও ২ শতাধিক মানুষ আহত হয়। হামলা চালায় জেএমবি।'[৯৬২]
২৭ জানুয়ারী ২০০৫ সালে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার বৈদ্যের বাজারে গ্রেনেড হামলায় সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া সহ ৫ জন নিহত ও কমপক্ষে ৭০ জন আহত হয়েছিলেন।[৯৬৩] হামলা চালায় জংঙ্গি সংগঠন হুজি।
৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে খুলনা প্রেসক্লাবে বোমা বিস্ফোরণে ১ জন সাংবাদিক নিহত, আহত ৫ জন।'[৯৬৪]
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালোবাসা দিবসের অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ। আহত ৮ জন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী আলোচনাসভায় বোমা বিস্ফোরণ।'[৯৬৫]
৩ অক্টোবর, ২০০৫
চট্টগ্রাম আদালতের দ্বিতীয় যুগ্ম জেলা জজ আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন এবং মহানগর হাকিম আকরাম হোসেনের এজলাসে জেএমবি জঙ্গিরা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায়। দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলায় আবু সৈয়দ দিলজার হোসেনের আদালত চলাকালে জঙ্গি শাহাদাত আলী ওরফে লাল্টু এজলাসের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করে। বাধা পেয়ে হাতে থাকা একটি বই-বোমা বিচারককে লক্ষ করে নিক্ষেপ করলে সেটি বিচারকের সামনের টেবিলের কাচের ওপর পড়ে কিছু অংশ ভেঙে যায় এবং অবিস্ফোরিত অবস্থায় পড়ে থাকে। শাহাদাত আলী পালানোর চেষ্টা করলে তাকে লোকজন ধরে ফেলে। এর

---

[৯৫৬]. দৈনিক সমকাল, ০৪ ডিসেম্বর ২০১৫ (https://samakal.com/capital/article/1512177644) এপ্রিল ২০১৬
[৯৫৭]. সুব্রত শুভ, প্রাগুক্ত, ২৪ এপ্রিল ২০১৬
[৯৫৮]. banglanews24.com, 21 Aug 2013 (https://www.banglanews24.com/national/news/bd/218343.details
[৯৫৯]. সুব্রত শুভ, প্রাগুক্ত
[৯৬০]. দৈনিক প্রথম আলো, ০২ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ (https://www.prothomalo.com/bangladesh)
[৯৬১]. দৈনিক কালের কন্ঠ, ১৭ আগস্ট ২০১৯, https://www.kalerkantho.com/print-edition/sub-editorial/2019/08/17/803807
[৯৬২]. বিবিসি বাংলা, ১৭ আগস্ট ২০২০, https://www.bbc.com/bengali/news-53809115
[৯৬৩]. দেশসংবাদ, ২৬ জানুয়ারী ২০২০, https://www.deshsangbad.com/details.php?id=93189
[৯৬৪]. https://lutfurrahmanswebsite.blog, 21 Dec 2017 (https://lutfurrahmanswebsite.blog/2017/12/21)
[৯৬৫]. দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ (https://www.prothomalo.com/opinion/column)

১০ মিনিট আগে মহানগর হাকিম আকরাম হোসেনের এজলাসে লাল রঙের জ্যামিতি বক্সে রক্ষিত বোমা ছুড়ে মারা হয়। এ ঘটনায় নগরীর কোতোয়ালি থানায় বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা হয়।'[৯৬৬]
৩ অক্টোবর ২০০৫
লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর এবং চট্টগ্রামের কোর্টে বোমা বিস্ফোরণ। নিহত ৩ জন, লক্ষ্মীপুর কোর্টের ১ জন বিচারকসহ আহত হন ৩৮ জন।[৯৬৭]
১৪ নভেরম্বর, ২০০৫
ঝালকাঠিতে বিচারক সোহেল আহমেদ চৌধুরীর ও জগন্নাথ পাঁড়ি'কে বোমা হামলা করে খুন করা হয়। হামলা চালায় জেএমবি।[৯৬৮]
২৯ নভেম্বর, ২০০৫
গাজিপুরের জেলা বার এসোসিয়েশন অফিসে জঙ্গি সদস্য আসাদ আত্মঘাতি বোমা হামলা চালায়। এতে ৪ জন্য আইনজীবীসহ মোট নিহত হয় ৮ জন। আসাদ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সদস্য।
৮ ডিসেম্বর, ২০০৫
আত্মঘাতি বোমা হামলায় ৮ জন নিহত। হামলা চালানো হয় উদিচী ও শত দল শিল্পগোষ্ঠীর অফিসে। হামলা চালায় জেএমবি।[৯৬৯]

১২ জানুয়ারি ২০০৪
হযরত শাহজালাল (র.) মাজার প্রাঙ্গণে বোমা হামলা হয়। এতে সাত জন নিহত হয়।'[৯৭০]
২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা চালায় জঙ্গি সংগঠন জেএমবি।'[৯৭১]
২১ মে ২০০৪ সিলেটে হজরত শাহজালালের মাজারে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার হোসেনের ওপর আর্জেস গ্রেনেড হামলা। নিহত ২, হাইকমিশনারসহ আহত হয় ৭০। হামলা চালায় জঙ্গি সংগঠন হুজি।'[৯৭২]
২৭ জুন, ২০০৪
খুলনায় দৈনিক জন্মভূমির অফিসে বোমা বিস্ফোরণে সাংবাদিক হুমায়ুন কবির বালু নিহত হন।'[৯৭৩]
৭ আগস্ট ২০০৪
সিলেটে গুলশান হোটেলে আর্জেস গ্রেনেড বিস্ফোরণে ১ জন নিহত ও ৪০ আহত হয়।'[৯৭৪]
২১ অগাস্ট, ২০০৪
বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড হামলায় ২৩ জন নিহত আহত শতাধিক। হামলা চালায় জঙ্গি সংগঠন হুজি।'[৯৭৫]
১৬ নভেম্বর, ২০০৪
মৌলভীবাজারে যাত্রা প্রদর্শনীতে বোমা বিস্ফোরণে আহত ১০ জন।'[৯৭৬]
২৪ ডিসেম্বর, ২০০৪ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ইউনুস আলীকে হত্যা করা হয়। হত্যা করে-জেএমবি/শিবির।[৯৭৭]

---

৯৬৬. দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ (https://www.prothomalo.com)
৯৬৭. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৭ আগস্ট ২০১৭ (https://www.kalerkantho.com/print-edition/sub-editorial/2017/08/17/532604)
৯৬৮. দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ নভেম্বর ২০২১ (https://www.prothomalo.com/bangladesh/district)
৯৬৯. সুব্রত শুভ, প্রাগুক্ত, ২৪ এপ্রিল ২০১৬
৯৭০. risingbd.com, 24 জুলাই ২০১৬ (https://www.risingbd.com/travel/news/178775)
৯৭১. দৈনিক প্রথম আলো, ১১ জুলাই ২০১৩ (https://www.prothomalo.com/bangladesh)
৯৭২. Jagonews24.com, ১৩ জানুয়ারী ২০১৭ (https://www.jagonews24.com/country/news/192253)
৯৭৩. দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ জানুয়ারী ২০২১ (https://www.dailyinqilab.com/article/351069)
৯৭৪. risingbd.com, ২৪ জুলাই ২০১৬ (https://www.risingbd.com/travel/news/178775)
৯৭৫. দৈনিক প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০১৮ (https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime)
৯৭৬. risingbd.com, ২৪ জুলাই ২০১৬ (https://www.risingbd.com/travel/news/178775)
৯৭৭. সুব্রত শুভ, প্রাগুক্ত, ২৪ এপ্রিল ২০১৬

১৭ জানুয়ারি ২০০৩-এ টাঙ্গাইলের সখিপুরের ফালুচাঁদ ফকিরের মাজারের মেলায় বোমা বিস্ফোরণ। নিহত ৮, আহত হয় ১৫।'[৯৭৮]

১ মার্চ, ২০০৩ সালে খুলনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় কর্তব্যরত পুলিশের ওপর বোমা হামলা। নিহত হয় ১, কয়েকজন আহত হয়।[৯৭৯]

২০০২ সালে সিরাজগঞ্জ ও সাতক্ষীরায় বোমা হামলার ঘটনায় ১৫ নিহত হয়।'[৯৮০]

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০২-এ সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চার জন মারা যায়।'[৯৮১]

৭ ডিসেম্বর, ২০০২

ময়মনসিংহে ৪টি সিনেমা হলে একযোগে বোমা হামলায় ১৭ জন নিহত হয়। হামলা চালায় জেএমবি।[৯৮২]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে বাঘের হাটের মোল্লাহাটের খলিলুর রহমান ডিগ্রি কলেজে রিমোট কন্টোলে নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত, ৫০ জন আহত হয়। বোমা হলামার দায় স্বীকার করে জেএবি ও জঙ্গি সংগঠন হুজি।[৯৮৩]

১৪ দলীয় মহাজোট সরকারের আমল

৩ জুন, ২০০১ সালে গোপালগঞ্জের বানিয়াচং গীর্জায় প্রার্থনা চলাকালে বোমা হামলায় ১০ জন নিহত, আহত অর্ধশত।[৯৮৪]

২০ জানুয়ারি, ২০০১ সালে সিপিবি'র মিটিংয়ে বোমা হামলায় ৫ জন নিহত। হামলা চালায় জঙ্গি সংগঠন হুজি।'[৯৮৫]

১৪ এপ্রিল, ২০০১ সালে রমনা বটমূলে বোমা হামলায় ১০ জন নিহত। হামলা চালায় জঙ্গি সংগঠন হুজি।[৯৮৬]

২০ জুলাই, ২০০০ সালে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার জনসভায় ৭৬ কেজি ওজনের পুঁতে রাখা বোমা উদ্ধার করা হয়। জনসভা শুরুর আগেই এই শক্তিশালী বোমাটি উদ্ধার হওয়ায় বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা থেকে বেঁচে যায় দেশ।'[৯৮৭] জঙ্গি সংগঠন হুজি এতে জড়িত ছিল।

২০০০ সালে "নারী তুমি মানুষ ছিলে কবে ?" বইটি লেখার অপরাধে লেখক মনির হোসেইন সাগরকে খুন করে জেএমবি। ২০০৬ সালে গোয়ান্দা জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে তারা শুধু হুমায়ুন আজাদকে নয় ২০০০ সালে সাগরকেও খুন করে।[৯৮৮]

১৮ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে কবি শামসুর রাহমানের উপর হামলা করে জঙ্গি সংগঠন হুজি।'[৯৮৯]

৬ মার্চ, ১৯৯৯ সালে যশোরে উদীচি অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ১০ জন নিহত। হামলা চালায় জঙ্গি সংগঠন হুজি।'[৯৯০]

---

[৯৭৮]. দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারী ২০১৭ (https://www.prothomalo.com/bangladesh)

[৯৭৯]. দৈনিক জাগরণ, ১ জুলাই ২০২১ (https://www.dailyjagaran.com/opinion/news/63829)

[৯৮০]. Banglanews24.com, ২১ আগস্ট ২০১৩ (https://www.banglanews24.com/print/218343)

[৯৮১]. Banglanews24.com, প্রাগুক্ত

[৯৮২]. সুব্রত শুভ, প্রাগুক্ত, ২৪ এপ্রিল ২০১৬

[৯৮৩]. দৈনিক প্রথম আলো, ২২ আগস্ট ২০১৩ (https://www.prothomalo.com/bangladesh)

[৯৮৪]. banglanews24.com, 28 Feb 2012 (https://www.banglanews24.com/national/news/bd/92092.details)

[৯৮৫]. বাংলা ট্রিবিউন, ১৯ জানুয়ারী ২০২১ (https://www.banglatribune.com/politics/662871)

[৯৮৬]. সুব্রত শুভ, প্রাগুক্ত,

[৯৮৭]. দৈনিক কালের কন্ঠ, ২১ আগস্ট ২০১৭ (https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2017/08/21/534263)

[৯৮৮]. প্রাগুক্ত,

[৯৮৯]. https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1098259.bdnews, Feb 1, 2016

[৯৯০]. দৈনিক প্রথম আলো, ০৬ মার্চ, ২০১৭ (https://www.prothomalo.com/opinion/column)

Dhaka University Institutional Repository

৮ অক্টোবর, ১৯৯৯ সালে খুলনা শহরে আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলায় ৮ জন নিহত। হামলা চালায় জঙ্গি সংগঠন হুজি।[৯৯১]

পঞ্চম অধ্যায়

[৯৯১], প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

জিহাদের নামে বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

বিভ্রান্তির সমকালীন প্রেক্ষাপট

জিহাদ বা কিতাল বিষয়ক অপপ্রচার

জিহাদের নামে কাফির ও মুশরিক হত্যায় বিভ্রান্তি

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় খারিজীগণের বিভ্রান্তি

ইসলামী শরীয়তে প্রকৃত জিহাদ ও তার পূর্বশর্ত

জিহাদের শাব্দিক অর্থ

জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা

জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্যাবলী

Dhaka University Institutional Repository

জিহাদ বা কিতাল ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী
জিহাদের ফযীলত ও বিধান
জিহাদ বা কিতাল সম্পর্কে আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের কতিপয় বিভ্রান্তির অপনোদন
বাতিল দল-উপদলসমূহের জিহাদ বা কিতাল বিষয়ক বিভ্রান্তি
বাতিল ও খারিজীগণের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণ
সমাজ পরিবর্তনে সাহাবী ও পরবর্তীদের কর্মধারা
জিহাদ বনাম সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা

পঞ্চম অধ্যায়

জিহাদের নামে বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মানুষ ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে। তাই ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের জন্মগত, একে নির্মূল বা নির্মূলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। একে সঠিক ও স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত করতে না পারলে তা কখনো কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ বা অনৈতিকতার জন্ম দেয়। এগুলোর অপসারণ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রেক্ষাপটগুলি অনুধাবন প্রয়োজন। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন, প্রতিকারের সকল পথ রুদ্ধ হওয়া, হতাশা ও পরিবর্তনের আবেগ অনেক মুসলিমকে উগ্রতার পথ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করছে। কখনো বা মুমিন পারিপার্শ্বিক অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, দমন-পীড়ন, হত্যা, গুম, খুন বা নিধনযজ্ঞের প্রতিকার করার কোনো পথ না পেয়ে উগ্র ও জঙ্গি হয়ে পড়ে এবং উগ্রতা ও জঙ্গিবাদের পক্ষে কিছু দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে। কখনো কখনো একজন মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা নিজের আবেগে পড়াশোনা করতে গিয়ে এরূপ ব্যাখ্যা ও উগ্রতার মধ্যে নিপতিত হয়। এরপর তিনি হয়ত অন্যদেরকেও প্রভাবিত করে। কখনো বা অন্যের মুখে এরূপ ব্যাখ্যা শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। কখনো বা কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ অর্জন করতে ইসলামী শিক্ষার বিকৃত উপস্থাপনের মাধ্যমে এরূপ উগ্রতার প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করে। এছাড়া ইহূদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতগণও কুরআন ও হাদীস ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করে থাকে। তাদের পক্ষেও কুরআনের কিছু আয়াত, হাদীস বা কিছু ফিকহী মতামত বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে অজ্ঞ আবেগী যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। আরো দেখা যায় যে, মুসলিম দেশগুলিকে অশান্ত করে তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রবৃদ্ধি থামিয়ে দেওয়া, সভ্যতার সংঘাতের থিওরির সত্যতা প্রমাণ করা, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জঙ্গিবাদ দমনের নামে মুসলিম দেশগুলিকে দখল করা বা অধীনত রাখা, মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামী মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন ও ইসলামী শিক্ষা সংকোচন করা, ধার্মিক মুসলিম ও আলিমগণের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা ইত্যাদি বহুবিধ উদ্দেশ্যে

ইহূদী-খ্রিস্টান ও ইসলাম-বিদ্বেষী পণ্ডিতগণ বা সংস্থা ইসলামের ছদ্মাবরণে এরূপ বিভ্রান্তি ছড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে।[৯৯২]

ইসলামী শিক্ষার এ ধরণের বিকৃতি রোধে বিকৃতি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণ ও তাঁদের পরের সকল যুগের আলিমগণের মতামত ও কর্মধারার আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমকালীন আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ, গবেষক ও সমাজসেবকদের সামষ্টিক প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। দ্বীন বিজয়ের ভুল ব্যাখ্যার কারণেও জঙ্গিবাদের উৎপত্তি হয়। দ্বীনের বিজয় ইসলামের একটি গুরূত্বপূর্ণ পরিভাষা। তবে এ বিজয়ের অর্থ ও পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীগণের মাধ্যমে জানতে হবে।[৯৯৩] এখানে লক্ষণীয় যে, বিকৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি একবারেই আধুনিক। এ সকল বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও পূর্ববর্তী উলামা-মাশায়েখগণের সুস্পষ্ট মতামত পাওয়া যায় না। যেমন, উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির বিধান, সমকালীন প্রেক্ষাপটে দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয়, ধর্মনিরপেক্ষ অমুসলিম দেশগুলির বিধান, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, পার্লামেন্ট, সার্বভৌমত্ব, ভোট ব্যবস্থা, এগুলিতে অংশ গ্রহণ বা বর্জন, সমকালীন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের নেতৃত্বে জিহাদের বিধান, বিদেশী আগ্রাসনের শিকার মুসলিম দেশগুলির আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলনের বিধান, এরূপ ক্ষেত্রে সশস্ত্র প্রতিরোধের বিধান ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক সমাধান দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতভেদ বা ভুল সিদ্ধান্ত অনেক মানুষকে কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত করতে পারে এবং উম্মাতের জন্য ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

এ সকল বিষয়ে সমাজের প্রাজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ পীর-মাশাইখ, আলিম ও মুফতীগণের মতামত কম পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে চিন্তাবিদ ও আবেগী মুজতাহিদগণ এ সকল বিষয়ে অতিদ্রুত অনেক সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করে। অনেকেই গতানুগতিক বা ট্র্যাডিশনাল আলিম ও বুজুর্গদের দুর্বলতা বা অজ্ঞতাকে এর কারণ হিসেবে মনে করেন। অনেকে মনে করেন যে, সমাজের সব অন্যায় মেনে নেওয়ার মানসিকতাই এর জন্য দায়ী। এরূপ মতামত নিঃসন্দেহে অজ্ঞতা ও আবেগপ্রসূত। বিগত দেড় হাজার বৎসর দীনের ঝাণ্ডাকে ধরে রেখেছেন আলিমগণ। তাঁদেরই মাধ্যমে আমরা দীন পেয়েছি। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার ছিলেন। বস্তুত এ সকল আধুনিক বিষয়ে ট্র্যাডিশনাল আলিম ও মুফতীগণের সুস্পষ্ট মতামত না থাকার কারণ আধুনিক হওয়াতে এগুলির বিষয়ে কুরআন-হাদীস ও পূর্ববর্তী আলিমগণের সুস্পষ্ট মতামত পাওয়া যায় না। আর প্রাজ্ঞ আলিমগণ এরূপ সুস্পষ্ট মতামতের বাইরে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত দিতে দ্বিধা করেন। পক্ষান্তরে একজন চিন্তাবিদ বা আবেগী মানুষ সাধারণত কুরআন-হাদীসের দু একটি সাধারণ বক্তব্যকেই তার মত প্রকাশের জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য করেন; কাজেই সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত বা পূর্ববর্তী ফকীহগণের মতামতের জন্য তিনি অপেক্ষা করেন না। এমনকি আয়াত বা হাদীসটি কতখানি প্রাসঙ্গিক বা তার বিপরীতে অন্য কোনো আয়াত বা হাদীস রয়েছে কিনা তাও তারা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন না। আলিমগণের মতামত ধীর হলেও তাতে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে। আর চিন্তাবিদ বা আবেগী মানুষের মতামত খুবই দ্রুত ও সুস্পষ্ট হলেও তাদের ভুলের সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।[৯৯৪]

এ ছাড়া সমাজ সংস্কারে পূর্ববতী আলিম-উলামা ও পীর-মাশাইখের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা সর্বদা বিনম্রতা, ওয়ায-নসীহত ও জনমত তৈরির মাধ্যমে তা করতে চেষ্টা করেছেন, কখনোই দ্রুত ফল লাভের জন্য ব্যস্ত হননি। তাদের কর্মধারার আলোকেই সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিমগণ মতামত ব্যক্ত করেন। আর রাসূল (সা.) এর পূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণ এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, " আল্লাহতা'য়ালা বলেন : "তিনিই প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে সঠিক পথের নির্দেশনা ও সত্য দ্বীন-সহ; যেন তিনি তাকে প্রকাশ করেন সকল দ্বীনের উপর; যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ

---

[৯৯২]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৮৫

[৯৯৩]. দৈনিক ইনকিলাব, ১০ আগস্ট ২০১৬, জঙ্গিবাদের কারণ এবং তার প্রতিকার (https://www.dailyinqilab.com/article/32173)

[৯৯৪]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৮৬-৮৭

করে।"[৯৯৫] দ্রুত ফল লাভে আগ্রহী আবেগী মানুষদের কাছে মনে হয়, এরূপ মতামত সবকিছু মেনে নেওয়ার শামিল। এভাবে কি আর কিছু পরিবর্তন করা যাবে? তাদের কাছে চিন্তাবিদ ও আবেগী তরুণ মুফতীদের মতামত বেশি পছন্দনীয় বলে মনে হয়। সকল আবেগ ও চাপের বাইরে থেকে কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণের ও তৎপরবর্তী যুগের আলিমগণের কর্মধারার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। দ্রুত ফললাভ, প্রতিশোধ বা অন্য কোনো আবেগের অধীনে অথবা দেশ, দল, গোষ্ঠী বা কারো চাপের অধীনে কুরআন হাদীসের একপেশে সিদ্ধান্ত নিলে তা সঠিক হবে না এবং সংশ্লিষ্ট মানুষদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। উপরন্তু সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রাসঙ্গিক তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে। এ ছাড়া যে সকল আয়াত ও হাদীসকে বিকৃতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলির বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে এককভাবে গ্রহণযোগ্য ও ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন আলিমের অভাব রয়েছে। এজন্য এ সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতবিনিময় ও সমবেত ইজতিহাদ প্রয়োজন। সমাজের গতানুগতিক অনেক বিষয়ের পাশাপাশি এ সকল বিষয়ে প্রাজ্ঞ আলিমগণের মতপ্রকাশ খুবই জরুরী। উম্মাতের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও দরদ নিয়ে আলিমগণকে একত্রে বসে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। সমবেত মতবিনিময়ে নিজের মত, অভিরুচী, প্রয়োজন ও স্বার্থের ঊর্ধ্বে উম্মাতের বৃহত্তর কল্যাণে পূর্ববর্তী ইমাম ও আলিমগণের কর্মধারার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম চার প্রজন্মের এবং বিশেষ করে তিন প্রজন্মের নির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ দিয়েছেন। তাঁরা হলেন সাহাবীগণ, তাঁদের ছাত্রগণ (তাবিয়ীগণ), তাঁদের ছাত্রগণ (তাবি-তাবিয়ীগণ) ও তাদের ছাত্রগণ (আতবা আতবায়িত তাবিয়ীন)। দীনের সকল বিষয়ে, বিশেষত মতভেদীয় ও জটিল বিষয়ে এ তিন ও চার প্রজন্মের আলিম, ফকীহ, ইমাম ও বুজুর্গগণের মতামত ও কর্মধারার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে উগ্রতার আর্বিভাবের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের সালাতের পাশে তোমাদের সালাত তোমাদের কাছেই নগণ্য মনে হবে, যাদের সিয়ামের পাশে তোমাদের সিয়াম তোমাদের কাছেই নগণ্য বলে মনে হবে, যাদের নেক কর্মের পাশে তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যারা কুরআন পাঠেরত থাকবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় (তীরের দেহে শিকারকৃত প্রাণীর কোনো মাংশ লেগে থাকে না) তেমনিভাবে তারা দীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাবে (তাদের মধ্যে দীনের কিছুই থাকবে না।)[৯৯৬] বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধার্মিকতা, সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বহু হাদিস থেকে তাদের বিভ্রান্তির কারণ ও বৈশিষ্ট্য জানা যায়। আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, ইয়ামান থেকে আলী (রা.) মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত স্বর্ণ ৪ জন নওমুসলিম আরবীয় নেতার মধ্যে বন্টন দেন। তখন বসা চক্ষু, উঁচু গাল, বড় কপাল ও মুণ্ডিত চুল, যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি তো বে-ইনসাফি করলেন! তিনি বলেন, দুর্ভোগ তোমার! পৃথিবীর বুকে আল্লাহকে ভয় করার সবচেয়ে বড় অধিকার কি আমার নয়? আমি যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি বা বে-ইনসাফি করি তবে আল্লাহর আনুগত্য এবং ন্যায় বিচার আর কে করবে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর বিষয়ে বিশ্বস্তবলে গণ্য করলেন, আর তোমরা আমার বিশ্বস্ততায় আস্থা রাখতে পারছ না! এরপর রোকটি চলে গেল। তখন খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি লোকটিকে (রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে ধর্মত্যাগ ও কুফরি করার অপরাধে) মৃত্যুদণ্ড প্রদান করব না? তিনি বলেন, না। হয়তবা লোকটি সালাত আদায় করে। খালিদ (রা.) বলেন, কত মুসল্লীই তো আছে যে মুখে যা বলে তার অন্তরে তা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, আমি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখব বা তার পেট ফেড়ে দেখব। অতৎপর তিনি গমনরত উক্ত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, এ ব্যক্তির অনুগামীদের মধ্যে এমন এক দল লোক বের হবে যারা

---

[৯৯৫] . আল-কুরআন, ৯: ৩৩

[৯৯৬] . সহীহুল বুখারী, **প্রাগুক্ত,** ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৬, পৃ. ১৯৭; সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ২, পৃ. ৭৪৮,

সদাসর্বদা সুন্দর হৃদয়গ্রাহীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করবে, অথচ কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। গুলি যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে চলে যায়, তারাও তেমনি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে চলে যাবে। তারা ইসলামের অনুসারীদের হত্যা করবে এবং প্রতিমা-পাথরের অনুসারীদের ছেড়ে দেবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে সামূদ জাতি সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মূল করা হয়েছিল সেভাবেই আমি তাদেরকে হত্যা করে নির্মূল করব।"[৯৯৭]

ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, যুল খুওয়াইসিরা বা হুরকুস নামক ব্যক্তি খারিজীদের গুরুজনদের একজন ছিল।[৯৯৮] এখানে এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীদের বিভ্রান্তির মূল কারণটি প্রতিভাত হয়েছে। তা ছিল ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে নিজের বুঝকে একমাত্র সঠিক বলে মনে করা এবং এ বুঝের বিপরীত সকলকেই অন্যায়কারী মনে করা। এখানে রাসূললুল্লাহ (সা.) রাষ্ট্রীয় সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন। তিনি সকল যোদ্ধাদের মধ্যে তা বন্টন না করে অল্প কয়েকজনকে তা দিয়েছেন। এতে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে মুমিন সহজেই বুঝতে পারেন যে, নিশ্চয় কোনো বিশেষ কারণে আল্লাহর বিশেষ নির্দেশেই রাসূলুল্লাহ (সা.) তা করেছেন। অথবা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অন্যায়কারী বলে কল্পনা করতে পারেন না বা তাঁকে 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ' করতে পারে না। কিন্তু এ ব্যক্তি দীন বুঝার ক্ষেত্রে নিজের জ্ঞানকেই চূড়ান্ত বলে মনে করেছে। সে তার জ্ঞান দিয়ে অনুভব করেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন এবং তৎক্ষানাৎ সে 'সত্য ও দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আল্লাহকে ভয় করতে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছে!

এখানে ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো তারা তাদের সন্ত্রাসী কর্ম মূলত মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। মুরতাদ, কাফির ইত্যাদি অভিযোগে তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করে। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন, কাফিরদের বিষয়ে যে সকল আয়াত নাযিল হয়েছে তারা সেগুলিকে নিয়ে মুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করে। "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এ উম্মতের মধ্যে (তোমাদের মধ্যে, শেষ যুগে) এমন একটি সম্প্রদায় আগমণ করবে যারা বয়সে তরুন এবং তাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান অপরিপক্কতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তম্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।"[৯৯৯] এখানে ইসলামের নামে বা সত্য, ন্যায় ও হক্ক প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীকর্মে লিপ্ত মানুষদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত : তারা অপেক্ষাকৃত তরুন বয়সের। যুল খুওয়াইসিরা এর মত দু'চার জন বয়স্ক মানুষ তাদের মধ্যে থাকলেও তাদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সবই যুবক বা তরুনদের হাতে। সমাজের বয়স্ক অভিজ্ঞ আলিম ও নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বা পরামর্শ তারা মূল্যায়ন করে না। দ্বিতীয়ত : তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অপরিপক্কতায় পূর্ণ। এখানে দেখানো হয়েছে যে, সকল সন্ত্রাসই মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আর রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অস্থিরতা ও অদূরদর্শিতা সন্ত্রাসী কর্মের অন্যতম কারণ। অপরিপক্ক বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও দুরদর্শিতার অভাবের সাথে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার এ সকল সত্যান্বেষী ও ধার্মিক যুবককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছিল।

বিভ্রান্তির সমকালীন প্রেক্ষাপট

খারিজী ও বাতিনীগণ কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করলেও সাধারণ মানুষদের মধ্যে তাদের বিভ্রান্তি প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু বর্তমানে একদিকে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন, মুসলিম দেশগুলিতে ধার্মিক মানুষদের প্রতি

[৯৯৭]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ১৩৭; সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ৭৪১-৭৪৪

[৯৯৮]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ২০০,

[৯৯৯]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ২০০; সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ৭৪৬,

বৈষম্য, হয়রানি ও জুলুম, ইসলামী অনুশাসন বিষয়ক দাবিদাওয়াকে গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে দমন করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে তেমনি ইসলাম সম্পর্কে আবেগ ও ভালবাসার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের ব্যবহারিক সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে তাদের উগ্র মতামত সমাজের অনেক ধার্মিক মানুষকে প্রভাবিত করছে। নিঃসন্দেহে কুরআন ও হাদীস ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস এবং প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব নিজে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। সকল মুসলিম কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করবেন, কিন্তু সকল মুসলিমই বিশেষজ্ঞ হবেন না। আরবী ভাষার গভীর জ্ঞান, কুরআনের পরিপূর্ণ অধ্যয়ন, বিশাল হাদীস ভা-ারের সকল হাদীস অধ্যয়ন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীগণের কর্ম, চিন্তা, মতামত ও কুরআন-হাদীস ব্যাখ্যার প্রক্রিয়া অধ্যয়ন ও সমস্যা সমাধানে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মতামত ও কর্মধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভের পরেই একজন মানুষ প্রকৃত আলিম ও ফকীহ্ বলে গণ্য হন এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রিয় সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামী ফাতওয়া বা সিদ্ধান্তদানের যোগ্যতা অর্জন করেন। স্বভাবতই এরূপ আলিমদের সংখ্যা সমাজে কম থাকে। এজন্য মুসলিম উম্মাহর আলিমগণের রীতি হলো, জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে সমকালীন প্রাজ্ঞ আলিমগণের মতামত গ্রহণের পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রখ্যাত আলিম, ফকীহ ও ইমামদের মতামতের অনুসন্ধান ও তাদের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান। এক্ষেত্রে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণ ও তাঁদের পরবর্তী দুই প্রজন্মের আলিমদের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[১০০০]

এ মূলনীতি লঙ্ঘন করার কারণেই এ সকল উগ্র মতের জন্ম হয়। প্রাচীন ও নব্য খারিজীগণ[১০০১] সাহাবীগণের এবং তাঁদের পরে সমাজের মূলধারার আলিমগণের মতামত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। নিজেদের মতামতকেই তারা চূড়ান্ত বলে মনে করে। তবে তারা এরূপ মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতা বা আল্লাহর সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক, কাশফ, ইলহাম, গোপন জ্ঞান ইত্যাদির কোনো দাবি করেনি। বাতিনী ও শীয়াগণও সর্বদা সাহাবী, তাবিয়ী ও সমাজের মূলধারার মুসলিম আলিমগণকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেছে এবং কুরআন বা ইসলাম সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে চূড়ান্ত বলে মনে করেছে। পাশাপাশি তারা বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ গোপন জ্ঞান, কাশফ, ইলহাম, ইলকা, ইলম-লাদুন্নী, আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক বা বিশেষ পদাধিকার দাবি করেছে। ফলে এ সকল কল্পিত নেতা বা নেতাদের নামে অন্য কেউ তাদের কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করেছে।[১০০২] উভয় পদ্ধতিতেই তাদের মধ্যে ধার্মিকতা, ধর্মপালন ও ধর্মজ্ঞান সম্পর্কে অপ্রতিরোধ্য অহঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তারা ইসলাম সম্পর্কে তাদের বা তাদের নেতৃবৃন্দের ব্যাখ্যা বা মতকেই চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। বর্তমানে সঠিক ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতি, বিশেষত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাদির বিষয়ে সঠিক ধারণার অনুপস্থিতিতে আবেগতাড়িত ধ্যানধারণার প্রসারের বিশেষ প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে-

ক) গত প্রায় অর্ধ-সহস্র বছর যাবৎ সকল মুসলিম দেশেই ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে মানগত ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। বিশেষত উপনিবেশাধীন সমাজে এবং এর পরে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মাদ্রাসগুলির শিক্ষার মান কমেছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমর্থনের অভাব, মেধাবী শিক্ষার্থীর অভাব, গবেষণা উপকরণ ও পরিবেশের অভাব ইত্যাদি কারণে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া অধিকাংশেরই ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা কম। সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক সমর্থন ও মূল্যায়নের অভাবে গবেষণার সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন সেগুলি পাঠ ও মুখস্থ করা হলেও, আধুনিক সমস্যাবলিতে ইজতিহাদ ও সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা গড়ে তোলার মত কোনো পরিবেশ বা ব্যবস্থা এ সকল প্রতিষ্ঠানে নেই বললেই চলে।

খ) এ সকল ট্রেডিশনাল আলিমের পাশাপাশি বর্তমান যুগে আরেক শ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ রয়েছেন। তারা হচ্ছেন সে সকল সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক,

---

[১০০০]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৮৮

[১০০১]. মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০১৭, খারেজীদের আক্বীদা ও ইতিহাস (https://at-tahreek.com/site/show/1030)

[১০০২]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৮৮-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৌশলী বা সাধারণ মানুষ জীবনের মাঝপথে এসে ধর্ম বিমুখতা থেকে ধার্মিকতার দিকে ফিরে আসেন। এ পর্যায়ে তাঁরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস চর্চা শুরু করেন। তাঁরা মূলত মেধাবী। এক সময়ে তাঁদের অনেকে মেধা, মনন ও বুদ্ধি দিয়ে কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও ফাতওয়া দিতে শুরু করেন। স্বভাবতই তাঁরা বিশাল হাদীস ভা-ার, সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি ও পূর্ববর্তী আলিমগণের মতামত কিছুই জানেন না এবং জানার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুভব করেন না। এ সকল চিন্তাবিদদের মধ্যে যারা আরব তারা সমকালীন আরবী ভাষা জানলেও কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিকহের পরিভাষার সাথে ততটা পরিচিত নন। বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস, ও ফিকহের বিশাল ভা-ার তাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। আর তাদের মধ্যে যারা অনারব তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। কুরআন-হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে তাঁরা মূলত অনুবাদ বা অনুবাদকের বুঝ এর ওপরেই নির্ভর করেন। তাঁদের জানা কুরআনের আয়াত এবং সীমিত কিছু হাদীসের শাব্দিক অর্থের সাথে নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও মননশীলতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে থাকেন। তাঁদের বাগ্মিতা, আধুনিক জগত ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের গভীর জ্ঞান সাধারণ মুসলিমদেরকে আকৃষ্ট করে। আধুনিক বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ও পাশ্চাত্য অনেক হলেও আরবী ভাষা, কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণের কর্মধারা ও প্রাচীন ইমামগণের মতামতের বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের দৈন্যতা সুস্পষ্ট।

গ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর আলিম ও গবেষক একে অপরকে ভাল চোখে দেখেন না। এছাড়া সাধারণভাবে আলিম-উলামা ও গবেষকদের মধ্যে মতবিনিময়, গবেষণা, আলোচনা ইত্যাদির সুযোগ ও আগ্রহ নেই বললেই চলে। ফলে আধুনিক রাষ্টব্যবস্থা, গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, নির্বাচন, উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির ইসলামী অবস্থান, এগুলিতে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি, এ সকল রাষ্ট্রের প্রতি মুসলিম নাগরিকের সম্পর্ক, রাষ্ট্র বা সরকারের দীন বিরোধী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও ইসলামী সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। প্রত্যেকেই কুরআন ও হাদীস থেকে অল্প বা বেশি উদ্ধৃতি প্রদান করে একটি মত প্রকাশ করছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রে দলিল প্রদান প্রক্রিয়া খারিজীগণের মত হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ কিছু আয়াত ও হাদীসের আলোকে মতামত প্রকাশ করা হলেও, যে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হচ্ছে, অনুরূপ কোনো বিষয় বা অবস্থা রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবীগণ বা তাবিয়ীগণের সময়ে ছিল কিনা এবং সেক্ষেত্রে তারা কি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সেগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে না। এভাবে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন বিকৃত ধারণা জন্ম নিচ্ছে, যা ইসলামের নামে উগ্রতা সৃষ্টিতে সহায়তা করছে।[১০০৩]

ঘ) ওপরের বিষয়গুলির পাশাপাশি রাষ্ট্র, প্রশাসন ও সমাজের অনাচার, পাপাচার, দুর্নীতি, নগ্নতা, অশ্লীলতা, জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক আলিমের নীরবতা ও আলিম-উলামা ও পীর-মাশাইখের পারস্পারিক
মতভেদ, দলাদলি, সমালোচনা ও গালমন্দ সমাজের আবেগী যুবকদের হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এ অবস্থায় উগ্রতার আহ্বানকারীদের নিষ্ঠা, সততা ও নির্ভীকতা তাদেরকে আকৃষ্ট করে। খারিজী, বাতিনী শিয়াগণ ও জামাআতুল মুসলিমীন-এর বিভ্রান্তি কুরআন কারীম, সুন্নাতে নববী, সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি এবং পূর্ববর্তী ইমাম, আলিম ও পীর-মাশাইখের কর্মধারার আলোকে পর্যালোচনা করতে হবে। কারণ ইসলামের নামে উগ্রতায় লিপ্ত মানুষগুলোর তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিগুলি প্রায় সব একই প্রকৃতির। বিভ্রান্ত গোষ্ঠীগুলোর মতামত ও দাবি-দাওয়া পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় দেখা যায়-

(১) নিজের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া,

(২) করণীয় ও বর্জনীয়ের মধ্যে পার্থক্য না বুঝা,

(৩) ইসলামী শিক্ষার বিকৃত অনুধাবন ও উপস্থাপন।

প্রথমত : ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতার পিছনে অন্যতম যে বিষয়টি দেখা যায় তা হলো, নিজের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা। এটি আবেগপ্রসূত বিভ্রান্তিগুলির অন্যতম। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) বলেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা

[১০০৩] . ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৯০

হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, ওহে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ, আর অসৎ কাজে বাধা দান করতে?' সে বলবে, অবশ্যই। আমি (তোমাদেরকে) সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম; অথচ আমি নিজেই তা করতাম!"[১০০৪]

দ্বীন প্রতিষ্ঠার দুটি পর্যায় রয়েছে-

ক) নিজের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠা করা।

খ) অন্যের জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করা।

মুমিনের মূল দায়িত্ব নিজের জীবনে ও নিজের দায়িত্বাধীনদের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামে নিজের জীবনে পালনীয় ইবাদতগুলিকে আরকানে ইসলাম, ফরয আইন বা সুন্নাত আইন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ, জিহাদ ইত্যাদি অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বিষয়ক ইবাদতগুলিকে মূলত 'ফরয কিফায়া' বা সামষ্টিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং সুযোগ ও সাধ্যের আলোকে কম বেশি পালনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায়িত্ব দাওয়াত দেওয়া। কেউ বা সকলে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে বা অন্যায় পরিত্যাগ না করলে মুমিনের কোনোরূপ দায়বদ্ধতা থাকে না। কিন্তু উগ্রতায় লিপ্ত মানুষদেরকে এর উল্টো পথে চলতে দেখা যায়। তারা মূলত অন্যের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠাকে ফরয আইন ও বড় ফরয এবং নিজের জীবনে দীন পালনকে ছোট ফরয বা গুরুত্বহীন বলে মনে করেন। তারা অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগতভাবে হারাম-মাকরূহ কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন এবং এরূপ হারাম-মাকরূহ কর্মে লিপ্ত হওয়াকে নানাভাবে বৈধ, বরং জরুরী বা ফরয বলে দাবি করছেন। তাদের মনের একই চিন্তা, সমাজে বা দুনিয়ায় অমুক অন্যায় হচ্ছে, আল্লাহর আইনের বিরোধিতা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করা হচ্ছে, কিভাবে নীরব থাকবে মুমিন। কাজেই যেভাবে পার ঝাঁপিয়ে পড়ে সব অন্যায় মিটিয়ে দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র সকলের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা।

বস্তুত এরূপ ভাল চিন্তার সাথে খারাপ চিন্তার সমন্বয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ মুমিনের মনে অবশ্যই থাকবে এবং মুমিন সাধ্যমত ইসলাম নির্দেশিত পথে তা প্রতিকারের চেষ্টা করবে বা দাওয়াত দিবে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ মুমিনকে তাঁর নিজের ও নিজের দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাস করবেন, দুনিয়ার অন্য মানুষদের পাচাচার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। সাধ্যমত দাওয়াতের পরেও যদি মানুষ তা গ্রহণ না করে সে জন্য মুমিনের কোনোরূপ অপরাধ থাকে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমাদের উপরে শুধু তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।"[১০০৫] বস্তুত সমাজ, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে অন্যায়, পাপাচার ও অপরাধ কম-বেশী থাকবেই। মুমিনের দায়িত্ব দাওয়াত দেওয়া, হিদায়াত করে ফেলা বা ভাল করে ফেলা নয়। আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.) কে সম্বোধন বলেন, "তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন।"[১০০৬] আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "আর তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসী হবার নয়।"[১০০৭] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনত; তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষদের উপর জবরদস্তি করবে?"[১০০৮] অনেক সময় আবেগী মুমিন সমাজের পাপাচারে বেদনাগ্রস্ত হয়ে দ্রুত সবকিছু ঠিক করে ফেলতে আগ্রহী হন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ ও মানবজাতির পরিচালনায় আল্লাহর সুন্নাতের কথা ভুলে যান। দ্রুত ফলাফল লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে যান। তিনি ভাবেন: ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে বা ইসলামের বিজয় আনতে হবে। অমুক বা তমুক পদ্ধতিতে তা আসবে না,

---

[১০০৪]. সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ২২৯০

[১০০৫]. আল-কুরআন, ৫: ১০৫

[১০০৬]. আল কুরআন, ২৮: ৫৬

[১০০৭]. আল কুরআন, ১২: ১০৩

[১০০৮]. আল কুরআন, ১০: ৯৯

বরং আমাদের এ পদ্ধতিতেই বিজয় দ্রুত হাতের মুঠোয় এসে যাবে। অমুক পদ্ধতিতে শত বৎসর বা হাজার বৎসর কাজ করলেও ইসলামের বিজয় আসবে না, কিন্তু আমাদের পদ্ধতিতে কাজ করলে অল্প সময়েই তা এসে যাবে। মনে হয় কে কত তাড়াতাড়ি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারল এর ওপরেই আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল ও মুসলমানদের হিসাব নিবেন! ফলাফল লাভের উন্মাদনা আবেগী মুমিনকে বিপথগামী করে। মুমিন চায় যে, সমাজ থেকে ইসলাম বিরোধী ও মানবতা বিরোধী সকল অন্যায় ও পাপ দূরীভুত হোক। কোনো মুমিনের মনে হতে পারে যে, এত ওয়ায, বক্তৃতা, বইপত্র, আদেশ নিষেধ ইত্যাদিতে কিছুই হলো না, কাজেই জোর-জবরদস্তি ও শক্তি প্রয়োগ করে সব অন্যায় দূর করতে হবে। তখন তিনি দাওয়াতের শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি ও শরীয়ত নিষিদ্ধ পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য না করে ফলাফলের উন্মাদনায় শরীয়ত নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে চেষ্টা করেন।

এ জাতীয় চিন্তভাবনা সবই কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। মুমিনের দায়িত্ব নিজের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনের দাওয়াত। দাওয়াতের দ্রুত ফলাফলের চিন্তা তো দূরের কথা, কোনো ফলাফলের চিন্তাই মুমিনের দায়িত্ব নয়। অগণিত নবী-রাসূল আজীবন দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু অতি অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। এতে তাঁদের দীন প্রতিষ্ঠার বা দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের কোনো ঘাটতি হয়নি। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, দ্রুত সকল অন্যায় মিটিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব মানুষেরা কখনই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, বরং সুন্নাত পদ্ধতিতে ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ বা দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজ সংস্কারের কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। কাজেই মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজের জীবনে দীন পালনের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পন্থায় দীনের দাওয়াত দেওয়া। দাওয়াতের দায়িত্ব দু'ভাবে সম্পন্ন করা হয়-

১) অরাষ্ট্রীয়, অর্থাৎ ব্যক্তিগত, দলগত বা গোষ্ঠীগতভাবে,
২) রাষ্ট্রীয়ভাবে।
ক) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও

অরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার একটিমাত্রই মাধ্যম, তা হলো দাওয়াত বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দাওয়াতের পাশাপাশি আরো দুটি মাধ্যম রয়েছে-

খ) প্রয়োজনে শত্রুরাষ্ট্রের কবল থেকে দীন, রাষ্ট্র, জনগণ, দুর্বল মুসলিম বা অমুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরতে জিহাদ বা কিতাল অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ করা। সকল পর্যায় ও ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ হলো সহিংসতা ও সীমালঙ্ঘন পরিহার করা। শুধু সহিংসতা বর্জনই নয়, দাওয়াত, প্রচার, সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ ইত্যাদি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল কর্মে অহিংসতা দ্বারা সহিংসতার প্রতিরোধ করতে এবং সহিংসতার প্রতিবাদে উত্তম আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

سَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। (মন্দ) প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর (আচরণ) দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।"[১০০৯]

অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মন্দের মুকাবিলা করুন যা উৎকৃষ্টতর তা দিয়ে, তারা যা বলে আমি সে সম্পর্কে বিশেষ অবহিত।"[১০১০] বর্তমান বিশ্বে ইসলামী দা'ওয়াত বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অনেক সময় ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিরোধ, অত্যাচার বা সহিংস আচরণের সম্মুখীন হয়। এতে দাওয়াতে লিপ্ত মুসলিমের মধ্যে প্রতিক্রিয়ামূলক সহিংসতার আবেগ তৈরি হয়। এর সাথে দ্রুত ফললাভে চিন্তা দাওয়াত বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা এর কর্মে রত ব্যক্তিকে ইসলাম নির্দেশিত এ অহিংস পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আবেগ নির্দেশিত সহিংস পথে যাওয়ার প্ররোচনা দেয়। তিনি ভাবতে থাকেন সহিংসতা বা কল্পিত জিহাদ-ই দ্রুত ফললাভের বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ, যদিও প্রকৃত সত্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের ইতিহাসে

[১০০৯]. আল কুরআন, ৪১: ৩৩-৩৫
[১০১০]. আল কুরআন, ২৩: ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সহিংসতা, তথাকথিত জিহাদ ও শাহাদতের অনেক ঘটনা আছে। তারা সকলেই দ্রুত ফললাভের আবেগ নিয়ে বৈধ বা কল্পিত 'জিহাদে' ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ হয়েছেন, কিন্তু কেউই দ্রুত বিজয় তো দূরের কথা কোনো স্থায়ী বিজয়ই অর্জন করতে পারেননি। বস্তুত ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, অহিংস ও মন্দের মুকাবিলায় উৎকৃষ্টতর আচরণই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিজয়ের একমাত্র পথ। এ পদ্ধতিতেই রাসূলুল্লাহ (সা.) আরবের কঠোর হৃদয়ের অধিকারী যাযাবরদের হৃদয় জয় করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী সকল যুগে এ পদ্ধতির অনুসরণকারী আলিম ও দাঈ'গণই ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছেন।

দ্বিতীয়ত : মুমিন অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের চেষ্টা করেন বা দাওয়াত দেন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের জন্য, জাগতিক ফলাফল বা নিজের স্বার্থের জন্য নয়। কাজেই এক্ষেত্রে শরীয়ত সম্মত সুন্নাত পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতে হবে, দাওয়াতের জন্য কোনো হারাম বা মাকরুহ কর্ম করা তো দূরের কথা, দাওয়াতের জন্য কোনো মুস্তাহাব কর্ম বর্জন করাও সুন্নাত বিরোধী। কিন্তু এ সকল আবেগতাড়িত মানুষ অন্যের জীবনে বা সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনে পাপ প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের মূলনীতি, পূন্য অর্জনের চেয়ে পাপ বর্জন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি যদি কোনো কর্ম ফরয হওয়া বা হারাম হওয়ার দ্বিবিধ সম্ভাবনা থাকে তবে তা বর্জন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কর্মের নির্দেশ প্রদান করি তখন তোমরা সে কর্মের যতটুকু পার পালন করবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কর্ম থেকে নিষেধ করি তখন তোমরা সে কর্ম সর্বোতভাবে বর্জন করবে।"[১০১১]

খারিজীগণের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অনেক সময় শয়তান আবেগের মাধ্যমে মুমিনকে এ মূলনীতি থেকে সরিয়ে নিয়ে সাওয়াবের নামে পাপাচারে লিপ্ত করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো দাওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার নামে কোনো মানুষের অধিকার নষ্ট করা বা কারো সম্পদ, সম্ভ্রম বা প্রাণের সামান্যতম ক্ষতি করা। এভাবে মুমিন ইবাদত পালনের নামে কঠিনতম হারাম কর্মে লিপ্ত হন। ইবাদতটি যদি ফরযও হয় তাহলেও তা বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করলে শুধু আল্লাহর হক্ক নষ্ট হয়, যা আল্লাহর নিকট তাওবা করলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এ ইবাদত পালনের নামে মানুষের অধিকার নষ্ট করলে বা ক্ষতি করলে তা কঠিন হারাম হওয়া ছাড়াও বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তাওবা করলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না। ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু মানব জীবন ও মানুষের অধিকার। মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। শুধুমাত্র আইনানুগ বিচার অথবা যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা, সন্ত্রস্ত করা, আঘাত করা, কষ্ট দেওয়া বা কোনোভাবে কারো ক্ষতি করা, কারো সম্পদ বা সম্ভ্রমের সামান্যতম ক্ষতি করা কঠিনতম হারাম কর্ম।

এ বিধান সর্বজনীন। কোনো ধর্মের কোনো মানুষকেই ওপরের দুটি অবস্থা ছাড়া হত্যা করা, আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়া যাবে না। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব রক্ত কঠিনতম হারাম। একমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে 'মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই একজন মানুষের হত্যা বৈধ করা হয়েছে শুধু এ দুটি ক্ষেত্রে। এ দুটি বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। খুব সহজেই বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচার, জিহাদ বা হত্যার অনুমতি থাকলে পৃথিবীর বুকে কোনো মানুষই বেঁচে থাকতে পারবে না। কারণ পৃথিবীর বুকে প্রায় প্রতিটি মানুষ অন্য কোনো না কোনো মানুষের দৃষ্টিতে জালিম, অনাচারী বা কাফির। কাজেই জুলম, অনাচার বা কুফরের কারণে যদি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত স্বচ্ছ বিচারপদ্ধতি বা জিহাদের মাধ্যম ছাড়া ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে বিচার ও জিহাদের ক্ষমতা বা অধিকার ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে দুনিয়াতে কেউই বেঁচে থাকতে পারবে না। বিচার ও জিহাদের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড বা হত্যার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি যে, বিচারকের ভুলে নিরপরাধীর সাজা হওয়ার চেয়ে অপরাধীর জীবন বেঁচে যাওয়া বা সাজা কম হওয়া ভাল। অনুরূপভাবে জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করার চেয়ে জিহাদ না করা অনেক ভাল। জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করলে শত পুন্য করেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। পক্ষান্তরে সাধারণভাবে আজীবন জিহাদ না করলেও এরূপ শাস্তি লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই।

১০১১. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৯, পৃ. ৯৪; সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ৯৭৫

বিশেষত জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা সত্ত্বেও জিহাদের শর্ত না পাওয়ায় জিহাদ বর্জন করলে কোনোরূপ গোনাহ হবে বলে কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।[১০১২] বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাকে যদি নিহত হতে হয় সেও ভাল, তবে হত্যাকারী হয়ো না। মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ, সন্ত্রাস বা হানাহানির সময়ে করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন, "এরূপ পরিস্থিতিতে মুমিন নিহত হোক, কিন্তু সে যেন হত্যাকারী না হয়।" "সে যেন আদমের দু সন্তানের মধ্যে (হাবিল ও কাবিল) উত্তম জনের (হাবিলের) মত হয়।"[১০১৩] এ সকল নির্দেশনার কারণে সাহাবীগণ হত্যাকে ভয়ঙ্করভাবে ভয় পেতেন। খলীফা উসমান ইবনু আফ্ফান (রা.) বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলে সেনাবাহিনী এবং সমাজের নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের ও অস্ত্রধারণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইসলামী শরীয়তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ। কিন্তু উসমান (রা.) বিদ্রোহীদের বুঝানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন, আর বিদ্রোহীরা সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে। উসমান (রা.)-এর মূলনীতি ছিল, আমি নিহত হতে রাজি, কিন্তু কারো রক্তের দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহর কাছে যেতে রাজি নই।

তৃতীয়ত : ইসলম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এ জন্য কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান। কোনো বিধান ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি রয়েছে। কুরআনে সালাত প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার কুরআনে চোরের হাত কাটার, ব্যভিচারীর বেত্রাঘাতের ও জিহাদ বা কিতালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ইবাদতটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। অন্য কেউ পালন না করলেও মুমিনকে ব্যক্তিগভাবে পালন করতেই হবে। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশটি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। কখনোই একজন মুমিন তা ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে পালন করতে পারেন না। এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো ইবাদতের শর্তাবলি কুরআনে একত্রে বা একস্থানে উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া অধিকাংশ ইবাদতের সকল শর্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক বিধান বা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামগ্রিক জীবনও এ সকল নির্দেশ পালনে তাঁর রীতি-পদ্ধতি থেকেই সেগুলির শর্ত ও পদ্ধতি বুঝতে হবে। তা নাহলে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।"[১০১৪] এ নির্দেশের ওপর নির্ভর করে যদি কেউ সূর্যাস্তের সময় সালাতে রত হন তবে তিনি নিজে যতই দাবি করুন, মূলত তা ইসলামে ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীস শরীফে সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাত্রি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের বৈধ ও অবৈধ সময় চিহ্নিত করেছেন এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় অবৈধ করেছেন। এভাবে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে কুরআন কারীমের অর্থ বা ব্যাখ্যা করা আমাদেরকে ইবাদতের নামে পাপের মধ্যে লিপ্ত করে।

অনুরূপভাবে কুরআনে শাস্তি ও কিতালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন-হাদীসে এ ইবাদত পালনের অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি সেগুলি পূরণ না করে হত্যা, রক্তপাত ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়ে এগুলি জিহাদ বলে দাবি করেন, তবে তা কখনোই ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা হবে কঠিন পাপ ও হারাম কর্ম। শর্ত পূরণ ছাড়া সালাত পালনের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর পাপ শর্ত পূরণ ছাড়া শাস্তি, বিচার বা হত্যায় লিপ্ত হওয়া। সালাত ও বিচার-হত্যার মধ্যে পার্থক্য হলো, সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করলে উক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হলেও, তাতে কোনো বান্দার অধিকার নষ্ট হবে না। কিন্তু বিচার, শাস্তি ও কিতালের সাথে বান্দার অধিকার জড়িত। কারো ভীতি প্রদর্শন, রক্তপাত বা সম্পদ নষ্ট করা কঠিনতম কবীরা গোনাহ, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা ছাড়া আল্লাহ ক্ষমা করেন না। কোনো মানুষকে হত্যার বিষয়ে সামান্য সহযোগিতা বা চোখের ইশারাও ভয়ঙ্কর পাপ বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই রাষ্ট্রীয়

[১০১২]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৮, পৃ. ১৮৪, ৩১০; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ৩৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ৪২৬; শাওকানী, নাইলুল আউতার (মিসর: ইদারাততু তাবা'আতিল মুনীরিয়্যাহ, তা.বি.) খ. ৭, পৃ. ২৭১-২৭২; আল-আমিদী, আল-ইহকাম (বৈরুত, দারুল কিতাব আল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৪ হি.) খ. ২, পৃ. ১৩০, খ. ৪, পৃ. ৬৫

[১০১৩]. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ১০০; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ১৩১০

[১০১৪]. আল কুরআন, ১৭: ৭৮

অবকাঠামোর মধ্যে আইনানুগ বিচারের বাইরে বা রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে শত্রুবাহিনীর যোদ্ধাদের সাথে ঘোষিত ও আইনানুগ যুদ্ধের বাইরে যদি কেউ হত্যা, আঘাত, ভয় প্রদর্শন, সম্পদ-ধ্বংস ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হন, তবে ইবাদত কবুল না হওয়া এবং গোনাহগার হওয়া ছাড়াও তিনি বান্দার অধিকার নষ্ট করার ভয়ঙ্করতম পাপে লিপ্ত হবেন।

জিহাদ বা কিতাল বিষয়ক অপপ্রচার

ইসলাম বিষয়ক বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের মূলে রয়েছে জিহাদ। অনেক সময় বলা হয়, ধর্মই সকল হানাহানির মূল, ধর্মের নামেই রক্তপাত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বাস্তবে এ এক জঘন্য মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। এ কথা সত্য যে, অনেক সময় ধর্মকে হানাহানির হাতিয়ার বানানো হয়, আবার অনেক সময় ধর্ম সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে যুদ্ধের অনুমতি দেয়। কিন্তু কখনোই ধর্মের নামে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কম্যুনিষ্ট চীনের সাথে কম্যুনিষ্ট ভিয়েতনামের যুদ্ধ, আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধ ইত্যাদি যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ মরেছে। কম্পুচীয়ায় কম্যুনিষ্ট খেমার রুজের হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভয়ঙ্কর মৃত্যু, জোসেফ স্টালিনের নির্দেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের হত্যা, মাওসেতুং-এর চীনে প্রায় দু'কোটি মানুষের হত্যা, মুসোলিনির নির্দেশে ইটালির ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও এরূপ অগণিত মানুষের হত্যা সবই কি ধর্মের নামে হয়েছে? কখনো বলা হয়, ইসলামই ধর্মের নামে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ বৈধ করেছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যাচার আর কিছুই হতে পারে না। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মহাভারত ও রামায়ণ পুরোটায় যুদ্ধ ও হানাহানি নিয়ে। গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধের নির্দেশ রয়েছে।[১০১৫] বাইবেলে বারংবার যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিম্নে বাইবেলীয় জিহাদ ও ইসালমের জিহাদ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হলো-

জিহাদ বিষয়ক আরেকটি বিভ্রান্তি জিহাদকে পবিত্র যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা। জিহাদ অর্থ কখনোই পবিত্র যুদ্ধ (holywar) বা ধর্মযুদ্ধ (relegious war/crusade) নয়। পবিত্র যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ, ক্রুসেড ইত্যাদি সবই খ্রিস্টান চার্চ ও যাজকদের আবিষ্কৃত পরিভাষা। ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকে ইসলামের জিহাদ বলা হয়েছে। সাধারণভাবে কাফির বা অমুসলিম রাষ্ট্রই মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুরাষ্ট্র; এজন্য জিহাদের ক্ষেত্রে শত্রুদেরকে কাফির, মুশরিক বা অমুসলিম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জিহাদ বিষয়ে আরেকটি বিভ্রান্তি হলো, মুসলিমরা ধর্মপ্রচার বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে বা ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে বলে দাবি করা। এটি শুধু জঘন্য মিথ্যাই নয়, বরং প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য। বাইবেলে ধর্মের কারণে মানুষ হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বারংবার বিধর্মীদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলার, দেশের বিধর্মী নাগরিকদের উৎসবে ডেকে এনে ঠা-া মাথায় হত্যা করার ও নিরিহ বির্ধমীদের ধরে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১০১৬]

৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন। সেদিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত খ্রিস্টান চার্চ, পোপ, প্রচারক ও রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস হলো রক্তের ইতিহাস। অধার্মিকতা দমনের নামে অথবা ধর্ম প্রচারের নামে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা, নির্যাতন বা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা খ্রিস্টান ধর্মের সুপরিচিত ইতিহাস। পক্ষান্তরে ইসলামে শুধু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্যই যুদ্ধ বৈধ করা হয়েছে, ধর্ম প্রচারের জন্য নয়। ইসলামে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনোই অমুসলিম হওয়ার কারণে কাউকে হত্যা করা হয়নি বা জোরপূর্বক মুসলিম বানানো হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মদীনায় আগমণের পূর্বে তথাকার অনেকের সন্তান ইহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারা ইসলাম গ্রহণের পরে তাদের সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে এরূপ চাপ প্রয়োগ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে তাদের পছন্দের ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন।[১০১৭] দীন প্রতিষ্ঠা বা দীন প্রচারের জন্য হত্যা, জিহাদ বা যুদ্ধ তো দূরের কথা কোনোরূপ শক্তিপ্রয়োগও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[১০১৫]. বাইবেল, ১ রাজাবলি ১৮/৪০; ২ রাজাবলি ১০/১৮-২৮

[১০১৬]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১০১

[১০১৭]. আবূ দাউদ, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ৫৮

اهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ لْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"দীনে কোনো জবরদস্তি নেই। ভ্রান্তি থেকে সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূতকে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।"[১০১৮] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"[১০১৯] বিধর্মীকে হত্যা তো দূরের কথা, বিধর্মীর সাথে অভদ্র আচরণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ধর্মবিশ্বাস বা উপাস্যদেরকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম তাঁর নিজের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন, তবে কারো গালি দিবেন না বা কারো অনুভূতিতে আঘাত বা আহত করবেন না। কারণ এতে পারস্পারিক গালাগালিই বাড়বে। প্রত্যেকেই তো তার ধর্মকে ভালবাসে। আল্লাহ মানব প্রকৃতি এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আর কারো ভক্তি ও ভালবাসা আহত করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না; কারণ এতে তারাও সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে। এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি; অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।"[১০২০] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা উত্তম পন্থায় ছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তারা ব্যতিক্রম।"[১০২১] জুইশ এনসাইক্লোপিডীয়া, অন্যান্য বিশ্বকোষ ও ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বিগত দেড় হাজার বছরে ইউরোপের সকল খ্রিস্টান দেশে ইহূদীদের ওপর বর্বর অত্যাচার করা হয়েছে, জোরপূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, তাদেরকে গণহারে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে গণ-আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে এবং নানভাবে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ এ সময়ে মুসলিম দেশগুলিতে ইহূদীরা পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন। প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিমগণ আরব বিশ্ব শাসন করেছেন। সেখানে দেড় কোটিরও বেশি খৃস্টান ও কয়েক লক্ষ ইহূদী এখন পর্যন্ত বংশপরম্পরায় বসবাস করছে। ভারতে মুসলিমগণ প্রায় একহাজার বছর শাসন করেছেন, সেখানে প্রায় শতকরা ৮০% লোক হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিল। অথচ খ্রিস্টানগণ যে দেশই দখল করেছেন, জোরযবরদস্তি বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেদেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছেন অথবা হত্যা ও বিতাড়ন করেছেন। ইসলাম যদি তরবারীর জোরেই প্রচারিত হতো তাহলে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী দেশ হওয়ার সুযোগ ছিল না। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন্স, ব্রুনাই ও অন্যান্য দেশে তো কোনো মুসলিম বাহিনী কখনোই যায়নি। বিগত অর্ধ শতাব্দি যাবৎ ইসলাম The firstest growing religion বা সর্বাধিক বর্ধনশীল ধর্ম। ইউরোপ ও আমেরিকা, ভারত-সহ সকল দেশের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। কোন্ তরবারীর ভয়ে নয় বরং ইসলামের নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছেন। বর্তমানেও অনেক দেশে বহুলোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন।

জিহাদের নামে কাফির ও মুশরিক হত্যায় বিভ্রান্তি

কুরআনে যেমন কোথাও কোথাও কাফিরদের বা মুশরিকদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যত্র শুধু যুদ্ধরতদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আল্লাহর রাস্তায়

[১০১৮]. আল কুরআন, ২: ২৫৬

[১০১৯]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১১৫৫; সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ২২৭৮

[১০২০]. আল কুরআন, ৬: ১০৮

[১০২১]. আল কুরআন, ২৯: ৪৬

যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে এবং সীমালঙ্ঘন করো না।"[১০২২] অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে তাদের প্রতি। সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর চার মাস, আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের অপদস্থকারী। আর মহান হজ্জের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদেরকে দেওয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো (ঘোষিত ৪ মাস) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাম। আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দাও। তা এজন্য যে তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়। কীভাবে মুশরিকদের জন্য চুক্তি-অঙ্গীকার থাকবে আল্লাহর কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে? অবশ্য মসজিদে হারামের কাছে যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছো তাদের কথা আলাদা। যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য ঠিক থাকে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য ঠিক থাক। নি-য়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।"[১০২৩] এখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো (ঘোষিত ৪ মাস) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর ..." অনেক সময় অমুসলিম লেখকগণ এবং কখনো আবেগী মুজতাহিদগণ কুরআনের অন্যান্য আয়াত বাদ দিয়ে এবং এ আয়াতগুলি আগের ও পরের বক্তব্য বাদ দিয়ে শুধু এ কথাগুলি উদ্ধৃত করে দাবি করেন যে, ইসলামে সকল কাফির বা অমুসলিমকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্যান্য আয়াত বাদ দিলেও এখানের আয়াতগুলি খুবই স্পষ্ট। এখানে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে, যে সকল কাফির জনগোষ্ঠীর সাথে- তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যে সকল কবীলা বা গ্রাম রাষ্টের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা চুক্তি ভঙ্গ করে নি তাদের চুক্তি বহাল থাকবে। আর যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে তাদেরকে তোমাদের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দাও। এ সময়ের মধ্যে তারা যদি দীন গ্রহণ করে বা বশ্যতা গ্রহণ করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঘোষিত চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। তাদের বাহিনীকে যেখানে পাওয়া যাবে আক্রমণ করা হবে এবং হত্যা বা বন্দী করা হবে।[১০২৪]

এখানে অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এ আয়াতের নির্দেশ পালনে কখনোই রাসূলুল্লাহ (সা.) অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে পথে প্রান্তরে ধরে হত্যা করতে নির্দেশ দেন নি। এখানে মুশরিকগণ বলতে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হলো সে সকল চুক্তিভঙ্গকারী মুশরিক জনগোষ্ঠী বা কবীরা রাষ্ট্রের যোদ্ধাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে প্রথমে, শেষে ও মাঝে বারংবার চুক্তিরক্ষাকারীদের চুক্তি রক্ষা করতে ও নিরাপত্তাপ্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাকি সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতর্কিত বা গোপন আক্রমন না করে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দেওয়া হয়েছে। এ ঘোষণার উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বেশি জিহাদ করে বেশি মুশরিক হত্যা করা নয়, বরং এ ঘোষণার উদ্দেশ্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সীমিত করা এবং যত বেশি সম্ভব মানুষকে বাঁচানো। আধুনিক যুগেও আগ্রহী অযোদ্ধাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য বা যুদ্ধরত রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর মনোবল দুর্বল

[১০২২]. আল-কুরআন, ২: ১৯০

[১০২৩]. আল কুরআন, ৯: ১-৭

[১০২৪]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

করে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য এরূপ ঘোষণা দেওয়া হয়। যে কোনো আন্তর্জাতিক ও মানবিক বিচারে যুদ্ধের জন্য এর চেয়ে মানবিক ও যৌক্তিক ঘোষণা হতে পারে না। এখানে দেখা যায় যে, বাইবেলীয় জিহাদের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো নৈতিকতা রক্ষা করা হয় নি; বরং যে কোনোভাবে প্রতারণার মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব শত্রু হত্যাই সেখানে মূল লক্ষ বলে গণ্য করা হয়েছে।এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত থেকে নি-তিরূপে বুঝা যায় যে, কাফির-মুশরিককে হত্যার নির্দেশের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে কাফির যোদ্ধা হত্যা। রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনোই বিচারে মৃত্যুদ-প্রাপ্ত বা যুদ্ধরত কাফির ছাড়া অন্যদেরকে হত্যা করেননি। তার রাষ্ট্রে অগণিত কাফির সকল নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন। তিনি কখনোই তাদের হত্যা করেন নি বা হত্যার অনুমতি দেন নি।

রাসূল (সা.) বলেন,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَو انْتَقَصَهُ، أَو كَلَّفَهُ فَوقَ طَاقَتِهِ، أَو أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ.

'সাবধান! যদি কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেয় এবং তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।'[১০২৫]

ঈমানের দাবিদার মুনাফিকগণকে তিনি চিনতেন। তাদেরকেও হত্যার অনুমতি তিনি দেননি। উপরন্তু তিনি অযোদ্ধা সাধারণ অমুসলিম নাগরিককে হত্যা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) খারিজীদেরকে যখন যেখানে পাওয়া যায় হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে সাহাবীগণ কখনোই ঢালাওভাবে খারিজী মতাবলম্বীদের যেখানে পাওয়া যায় হত্যা করার অনুমতি বুঝেননি বরং এ থেকে তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে খারিজী যোদ্ধাদেরকে হত্যার নির্দেশনা বুঝেছেন। খারিজীগণ অযোদ্ধা সাহাবী-তাবিয়ীগণ বা সাধারণ মুসলিমদের হত্যা করলেও সাহাবীগণ কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোনোভাবে খারিজীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি বা তাদেরকে হত্যা করেন নি। সমাজে তারা খারিজীদের সাথে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছেন।[১০২৬] উল্লিখিত আলোচনা থেকেই শরয়ী জিহাদ ও অন্যদের যুদ্ধের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়-

প্রথমত : অন্যান্য যুদ্ধ তাগুতের পথে হয় পক্ষান্তরে জিহাদ হয় আল্লাহর পথে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! "আল্লাহর পথে লড়াইয়ের পরিচয় কী? আমরা কেউ ক্রোধান্বিত হওয়ায় লড়াই করি, কেউ জাত্যাভিমানের বশবর্তী হয়ে লড়াই করি? রাসূলুল্লাহ (সা.) তার প্রতি মুখ তুলে তাকালেন অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করে সে আল্লাহর পথে।[১০২৭] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি গনীমতের সম্পদের জন্য লড়াই করে, এক ব্যক্তি খ্যাতির জন্য লড়াই করে এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, এদের মধ্যে কে আল্লাহ পথে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে সে আল্লাহর পথে।[১০২৮]

দ্বিতীয়ত : অন্যান্য যুদ্ধ হয় মানুষের উপর নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালাবার জন্য এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য। পূর্বের ইতিহাস ও আজকের বাস্তবতা এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অপরদিকে জিহাদ হয়ে থাকে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য। জিহাদ ও মুজাহিদগণের সোনালী ইতিহাস এরই সাক্ষ্য দেয়।

তৃতীয়ত : জিহাদের উদ্দেশ্য-যা ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে- তা হলো, মানুষকে মুক্ত করা মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের প্রতি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে এর প্রশস্ততার প্রতি, অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর প্রতি এবং সকল মত ও ধর্মের নিপীড়ন থেকে ইসলামের ইনসাফের প্রতি।[১০২৯] অথচ অন্যান্য যুদ্ধের

[১০২৫]. সুনানু আবি দাউদ, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১৭০

[১০২৬]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ৫৮২

[১০২৭]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১, পৃ. ২৩; সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১, পৃ. ১৪০

[১০২৮]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১, পৃ. ৩৯৪; সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১, পৃ. ১৩৯

[১০২৯]. ইবনে আসীর, আল-কামিল, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ২, পৃ. ১৭৮

উদ্দেশ্যই হল, মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অত্যাচার ও অনাচারের পুঞ্জিভূত অন্ধকারে পৃথিবীকে নিমজ্জিত করা।

চতুর্থত : অন্যান্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল, সাম্রাজ্য বিস্তার করা অপর দিকে জিহাদের উদ্দেশ্য হল, ভূমিকে তার হক্বদারের নিকট প্রত্যার্পণ করা। ভূমির মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি নেককার মুমিনগণকেই এর হক্বদার সাব্যস্ত করেছেন। যারা এতে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, আমর বিল মা'রুফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করবেন।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে বাণী সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা ইবাদাত করে। আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।[১০৩০] অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "ফিরাউন সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বর্জন করতে দেবেন?' সে বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব আর আমরা তো তাদের চেয়ে শক্তিশালী। মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর; যমীন তো আল্লাহ্‌রই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে ওটার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।"[১০৩১] অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদাত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, তারপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।"[১০৩২]

পঞ্চমত : অন্যান্য যুদ্ধ হল, বিনা উদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে নিরপরাধ মানুষের জান-মান, ইজ্জত আব্রুর ওপর আঘাত হানার নাম পক্ষান্তরে জিহাদে ইসলামী শুধু তাদের সাথেই হয়ে থাকে যারা নিজেদের অপরাধের কারণে হত্যাযোগ্য হয়ে গিয়েছে।

ষষ্ঠত : অন্যান্য যুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মৃত্যু বিভীষিকার নামান্তর পক্ষান্তরে জিহাদে ইসলামী সমাজকে দান করে নবজীবন, কিসাসযোগ্য ব্যক্তির উপর কিসাস কার্যকর করা সমাজকে নবজীবন দানেরই নামান্তর। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন।"[১০৩৩]

সপ্তমত : অন্যান্য যুদ্ধ লাগামহীন হত্যাযজ্ঞের নাম, অপরদিকে জিহাদে ইসলামীর জন্য রয়েছে বহু শর্ত, বহু বিধি-নিষেধ এবং নির্ধারিত সীমা-রেখা। এজন্য জিহাদে ইসলামী কর্মপন্থার দিক দিয়েও অন্যান্য যুদ্ধের চেয়ে ভিন্নতর। কেননা জিহাদে ইসলামীর উদ্দেশ্যই হল পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা এবং অত্যাচার ও অনাচারের মূলোৎপাটন করা। মোট কথা শুধু ইসলামী যুদ্ধকেই জিহাদ বলা হয়, যা উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা উভয় দিক দিয়ে অন্যান্য যুদ্ধ থেকে পুরোপুরি ভিন্নতর। এবং শুধু মুত্তাকী মুমিনই একাজের উপযুক্ত কেননা ইনসাফ ও ইসলাহের ঝান্ডা বহনের অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে এবং একমাত্র তারাই পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী। মানব সমাজের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা এবং মানবতার শিক্ষক হবার গৌরবও শুধু তাঁদেরই প্রাপ্য।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় খারিজীগণের বিভ্রান্তি

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি দিক রাষ্ট্র। ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখা মুসলিমদের জন্য ফরয কিফায়া। তবে এ বিষয়ে খারিজীগণ, বিশেষত আধুনিক খারিজীগণ কিছু বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হন। তারা দাবি করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বড় ফরয। তাদের দাবীর দুটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়-

---

[১০৩০]. আল কুরআন, ২১: ১০৫-১০৭

[১০৩১]. আল কুরআন, ৭: ১২৭-১২৮

[১০৩২]. আল কুরআন, ২৪: ৫৫

[১০৩৩]. আল কুরআন, ২: ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত: বিশ্বে কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র নেই, বরং সকল মুসলিম রাষ্ট্রই কাফির রাষ্ট্র এবং
দ্বিতীয়ত: ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে বড় ফরয। মূলধারার আলিমদের সাথে তাদের দাবির পার্থক্য দুটি-

প্রথমত: মূলধারার আলিমগণের মতানুসারে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলি বিচ্যুতি ও পাপাচার সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্র বা দারুল ইসলাম; কাজেই মুমিনের দায়িত্ব শূন্য থেকে প্রতিষ্ঠা নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে সংস্কার ও সংশোধন করা। সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব রাষ্ট্র সংস্কার ও সংশোধন। আর রাষ্ট্র প্রশাসন ও সরকারের দায়িত্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রাখা, শরীয়তের বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় জিহাদ পরিচালনা করা।

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, সংশোধন ইত্যাদির দায়িত্ব সাধারণভাবে ফরয কিফায়া, কখনো ফরয আইন, তবে কখনোই বড় ফরয নয়। এখানে লক্ষণীয় যে, সমকালীন প্রাজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ কোনো কোনো আলিম ও গবেষকের কিছু কিছু বক্তব্য জামাআতুল মুসলিমীন তাদের মতামতের দলিল হিসেবে পেশ করতেন। এ সকল বক্তব্য থেকে তারা যা প্রমাণ করতেন এ সকল আলিম সে অর্থে তাঁদের কথা বলেন নি। ইসলামী দাওয়াত, আন্দোলন, সমাজ পরিবর্তন, দীনের বিজয়, দীন প্রতিষ্ঠা, জাহিলী সমাজ বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব বুঝাতে তারা যে সকল কথা বলেছেন এ সকল আবেগী যুবক সেগুলিকে বেদবাক্যের মত আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে তাদের আবেগকে আরো বেশি শানিত করেছেন। এভাবে আবেগতাড়িত উগ্রতায় নিপতিত হয়েছে। কখনো বা এভাবে তাদের আবেগ উজ্জীবিত করে তাদেরকে বিপথগামী করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। খারিজীগণের প্রমাণাদির মধ্যে ছিল-

প্রথমত : তারা দাবি করতেন যে, জিহাদ বড় ফরয। আর জিহাদের উদ্দেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু করা হয় তা জিহাদ বলে গণ্য। কাজেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই জিহাদ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই বড় ফরয। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বড় ফরয পরিভাষাটিই কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত নয়। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়া কোনো ইবাদতকে বড় ফরয বলা যায় না। আরকানে ইসলামের পরে আর কোনো ইবাদতকে ঢালাওভাবে বড় ফরয বলার সুযোগ নেই। আমরা দেখেছি যে, জিহাদ সাধারণত ফরয কিফায়া এবং কখনো বা ফরয আইন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় দাওয়াতের মাধ্যমে, জিহাদের মাধ্যমে নয়। রাষ্ট্র সংস্কারও হয় দাওয়াতের মাধ্যমে, জিহাদের মাধ্যমে নয়।[১০৩৪]

দ্বিতীয়ত : মহান আল্লাহ বলেন,"যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন স্থলাভিষিক্ত সৃষ্টি করছি।"[১০৩৫] রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করে তারা বলেন যে, মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর রুবূবিয়্যাত বা প্রতিপালনের খিলাফাত বা প্রতিনিধির দায়িত্ব প্রদান করেছেন। রুবূবিয়্যাতের এ দায়িত্ব পালনই মুমিনের বড় ফরয। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা অপরিহার্য। বস্তুত তাদের এ দলীল-টি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত। তবে এ আয়াতটির সাথে এ দায়িত্বের কোনো সম্পর্কই নেই।

তৃতীয়ত : আল্লাহ কুরআন কারীমে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি দীনকে প্রকাশ বা বিজয় দান করবেন। এ সকল আয়াত থেকে তারা দাবি করেন যে, দীনকে বিজয় করার দায়িত্ব উম্মাতের বড় ফরয। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত ও ব্যাখ্যা বর্জন করে, শুধু নিজের মন ও মনন দিয়ে কুরআনের অর্থ নির্ধারণ করা এবং এ অর্থের ভিত্তিতে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা খারিজীগণের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ ছিল। নিঃসন্দেহে দীনের বিজয় ইসলামের নির্দেশনা। তবে বিজয়ের অর্থ ও পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের মাধ্যমে জানতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ الْمُشْرِكُون.

"তিনিই প্রেরণ করেছেন তার রাসূলকে সঠিক পথের নির্দেশনা ও সত্য দীন-সহ; যেন তিনি তাকে প্রকাশ করেন সকল দীনের উপর; যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।"[১০৩৬] কুরআনে আরো দু স্থানে আল্লাহ অনুরূপ কথা বলেছেন।[১০৩৭] এ সকল স্থানে আল্লাহ তাকে সকল দীনের ওপর ইযহার করবেন বলে উল্লেখ

[১০৩৪]. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ২০৮-২০৯
[১০৩৫]. আল কুরআন, ২: ৩০
[১০৩৬]. আল কুরআন, ৯: ৩৩
[১০৩৭]. আল কুরআন, ৪৮: ২৮; ৬১: ৯

করেছেন। ইযহার অর্থ প্রকাশ করা। বিজয় করা অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়। ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতের অর্থ "আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.) কে সকল ধর্মের সকল তথ্য প্রকাশ করবেন বা জানিয়ে দিবেন; যদিও ইহূদী-খ্রিস্টান ও অন্যন্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের এ সকল বিষয় প্রকাশ পাওয়া অপছন্দ করত।" অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন যে, এখানে প্রকাশ বা বিজয় বলতে তাত্ত্বিক প্রকাশ বা বিজয় বুঝানো হয়েছে। সকল দীনের উপর প্রকাশ বা বিজয় বলতে সকল দীনের অনুসারীদের এ দীন গ্রহণ করা বা সকল সমাজ ও রাষ্ট্রের উপরে মুসলিম রাষ্ট্রের বিজয় বুঝানো হয় নি। বরং তত্ত্বে, তথ্যে, প্রমাণে ও যুক্তিতে সকল দীনের উপর এ দিনকে আল্লাহ প্রকাশিত ও বিজয়ী করবেন বলে বুঝানো হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা.) ও অন্যান্য মুফাস্সির থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ যুগে ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এ দীনকে চূড়ান্ত বিজয় ও প্রকাশদান করবেন। সে সময়ে বিশ্বের সকল মানুষ এ দীন গ্রহণ করবে এবং দীন একমাত্র আল্লাহরই হবে।[১০৩৮]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম উম্মাহর ক্রমপ্রসারিত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, "আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করেন, তখন আমি পৃথিবীর পূর্ব-প-ি্ম দেখলাম। আর পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল তার তাবৎ স্থানে আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌঁছে যাবে।"[১০৩৯] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,"দিবারাত্র যেখানে পৌঁছে সেখানেই এ দীন পৌঁছাবে। এ ধরাপৃষ্ঠে এমন একটি বাড়ি বা তাবুও অবশিষ্ঠ থাকবে না যেখানে এ দীন পৌঁছাবে না। প্রতিটি বাড়িতেই আল্লাহ এ দীন পৌঁছাবেন, কারো সম্মানের সাথে কারো লাঞ্ছনার সাথে। কাউকে আল্লাহ দীনের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিয়ে সম্মানিত করবেন। আর কেউ এর বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত হবে।[১০৪০] বস্তুত আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর মহান রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে দীনকে প্রকাশিত ও বিজয়ী করেছেন। যুক্তি ও প্রমাণে তাঁর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দীনকে প্রকাশিত ও বিজয়ী করেছেন। আর এ বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে। এমন নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর মাধ্যমে অর্জিত বিজয় কোনো এক সময় একেবারে হারিয়ে যাবে এবং এরপর আমাদেরকে নতুন করে বিজয়ের যাত্রা শুরু করতে হবে। বরং বিজয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং সাহাবীগণ ও পূর্ববর্তীগণের কর্মধারার আলোকে আমাদের দায়িত্ব হলো, প্রত্যেকের নিজের জীবনে দীন পালন, নিজের সাধ্যমত দীনের দাওয়াত, দীনের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচন, ইসলাম বিরোধী প্রচারণার মিথ্যাচার উন্মোচন, ইসলামের সঠিক চিত্র বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরা ইত্যাদি। পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আদর্শিক ও দীনী সংস্কার ইত্যাদির জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া। কিন্তু বিজয় অর্জনের নামে ইসলাম নিষিদ্ধ কোনো কর্ম বা সুন্নাত-বহির্ভুত কোনো পদ্ধতির অনুসরণ আমাদের দায়িত্ব নয়। অনুরূপভাবে ফলাফলের চিন্তা আমাদের দায়িত্ব নয়। **চতুর্থত :** রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করার জন্য তারা দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশকে দলিল হিসেবে পেশ করতেন। তাদের মতে, দীন অর্থই রাষ্ট্র এবং দীন প্রতিষ্ঠা-র অর্থই দীনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। আর এ দায়িত্ব হলো সবচেয়ে বড় ফরয। কারণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে দীনের অন্যান্য অনেক দায়িত্ব পালন করা যায় না বা দীনের অন্যান্য অনেক বিষয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বস্তুত মহান আল্লাহ দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা দীনের অংশ। দীনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সুন্নাত নির্দেশিত পথে আমাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وصَّى بِهِ نُوحا والَّذِي أوحيْنَا إِلَيْكَ ومَا وصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تتفرَّقُوا فِيهِ.

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন

[১০৩৮]. তাবারী, তাফসীর, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৪, পৃ. ২১৫-২১৬; কুরতুবী, আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন, *প্রাগুক্ত,* খ. ৮, পৃ. ১২১; ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ১৭০

[১০৩৯]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ২২১৫

[১০৪০]. আহমদ, আল-মুসনাদ, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ১০৩; খ. ৬, পৃ. ৪

প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না।”[১০৪১] এখানে আল্লাহ এ সকল নবী-রাসূলকে দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। অধিকাংশ মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন যে, এখানে দীন বলতে তাওহীদ বুঝানো হয়েছে; কারণ সকল নবীর মূল দীন ছিল তাওহীদ। শরীয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কুরআন কারীমে নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকেও বিষয়টি বুঝা যায়। কুরআন কারীমে ২৫ জন নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া নাম উল্লেখ না করে অন্য নবীদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সকলের ক্ষেত্রেই তাওহীদকেই তাদের দাওয়াতের মূল বিষয়ই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জামাআতুল মুসলিমীন বা তাকফীর[১০৪২] ওয়াল হিজরা সংগঠন উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলিকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করে। এ বিষয়ে তাদের বিভ্রান্তি নিম্নরূপ-

(১) আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলি কাফির রাষ্ট্র।

(২) কাফির রাষ্ট্র উৎখাত করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বড় ফরয।

(৩) এ ফরয পালনের জন্য জিহাদই একমাত্র পথ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু করা হয় সবই জিহাদ বলে গণ্য।

(৪) এ জিহাদ পালনে রাষ্ট্রের নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করা বৈধ।

এভাবে তারা ইসলামী শিক্ষার বিকৃতি সাধন করেছেন। অজ্ঞতা, আক্রোশ ও আবেগ তাদেরকে এ পথে পরিচালিত করে। অথবা ইসলামকে কলঙ্কিত করতে এবং ইসলামী জাগরণকে থামিয়ে দিতে কৌশলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এ সকল কথা বলানো হয়েছে। জিহাদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ নয়, জিহাদ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার পথ। আর জিহাদ শুধু শত্রু বাহিনীর সশস্ত্র যোদ্ধাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে। পারিভাষিক জিহাদ বা রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের বাইরে রাষ্ট্র সংস্কার বা রাষ্ট্রে ইসলামী মূল্যবোধ ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার কর্ম ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ নয়, তা হলো আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ। একে পারিভাষিক জিহাদ বলে মনে করা বা এজন্য অস্ত্রধারণ ও হত্যা বৈধ মনে করা ইসলামী শিক্ষার কঠিনতম বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়। সাধারণ খুটিনাটি বিষয়ে প্রশস্ততা দেওয়ার জন্য মুআমালাত বিষয়ে ইসলামে অনেক বিষয় উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তারই একটি প্রকাশ হলো দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র ও দারুল কুফর বা কুফরী রাষ্ট্র বিষয়ক কোনো সুনির্ধারিত সংজ্ঞা কুরআন-হাদীসে প্রদান করা হয় নি। এখন যদি কাউকে ইসলামী বিবাহ ও কুফরী বিবাহ অথবা ইসলামী পরিবার ও কুফরী পরিবারের সুনির্ধারিত সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, বিষয়টি বেশ প্রশস্ত। পরিপূর্ণ ইসলামী বিবাহের বা পরিবারের যে ধারণা রয়েছে তার কিছু বিচ্যুতি হলেই সে বিবাহ বা পরিবারকে কুফরী বলে গণ্য করতে পারছি না। বরং কুফরী বিবাহ বা পরিবারের উর্ধ্বে উঠলেই তাকে ইসলামী বলে মানতে বাধ্য হচ্ছে, যদিও পুরোপুরি ইসলামী নয় বলে বুঝা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের বিষয়টিও অনুরূপ। কুরআন ও হাদীসে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন যেমন তিনি স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই সত্যত্যাগী।”[১০৪৩]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, “যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতাবান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, ন্যায়ের আদেশ করে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করে। আর কর্মসমূহের পরিণাম আল্লাহরই অধীনে।”[১০৪৪] এ আয়াতদ্বয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে

[১০৪১]. আল কুরআন, ৪২: ১৩

[১০৪২]. তাক্‌ফীর অর্থ কাউকে অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী বলে আখ্যায়িত করা। যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করেন তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করাকে তাক্‌ফীর বলা হয়

[১০৪৩]. আল কুরআন, ২৪: ৫৫

[১০৪৪]. আল কুরআন, ২২: ৪১

দীনের সুদৃঢ়তা, শান্তি-নিরাপত্তায় দীন পালনের স্বাধীনতা এবং নির্ভয়ে আল্লাহর শিরকমুক্ত ইবাদত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে সালাত, যাকাত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের বিদ্যমানতা ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল আয়াতের আলোকে ফকীহগণ দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেউ কেউ মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্যকে মূল বলে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন যে, দাওআত, যুদ্ধ, সন্ধি, স্বাধীনতা বা অন্য যে কোনোভাবে কোনো দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলিমদের হাতে আসলে সে দেশ দারুল ইসলাম।[১০৪৫] অন্যান্য ফকীহ ইসলামী বিধি বিধানের প্রকাশকে মানদ- বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের ভাষ্যমতে যে কোনো দেশ, রাষ্ট্র বা জনপদে ইসলামের বিধিবিধান প্রকাশিত থাকলে তা দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র বলে গণ্য।[১০৪৬] এখানে লক্ষণীয় যে, ব্যক্তি মুমিনের ক্ষেত্রে যেমন পরিপূর্ণ ও আদর্শ মুমিনের পাশাপাশি কম বা বেশি পাপে লিপ্ত পাপী মুমিনদেরকেও মুসলিম বলে গণ্য করা হয়েছে, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী দেশের ইসলামের দাবি গ্রহণে প্রশস্ততা অবলম্বন করা হয়েছে। পাপের প্রকাশ, ইসলামী বিধিবিধানের অবমাননা, ইসলামী বিধান লঙ্ঘন, কুরআন বিরোধী বিধিবিধান বা আকীদা বিশ্বাসের প্রকাশের কারণে রাষ্ট্রকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করা হয় নি। মুসলিম উম্মাহর ফকীহ ও ইমামগণ বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, কোনো দেশ বা রাষ্ট্র মুসলিম শাসনাধীন হয়ে দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার পর শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন, অমুসলিমদের প্রাধান্য বা অন্য কোনো কারণে পুনরায় দারুল কুফর বা দারুল হরব অর্থাৎ অনৈসলামিক রাষ্ট্র বা শত্রু রাষ্ট্র বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ বিষয়ে ফকীহগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, তিনটি শর্ত পূরণ হলে ইসলামী রাষ্ট্রকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করা যাবে-

১. কুফরের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া,

২. কাফির রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং

৩. উক্ত রাষ্ট্রের মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের মুসলিমগণ প্রদত্ত নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা বাতিল হওয়া।[১০৪৭] ইসলামের ইতিহাসে শীয়াগণ সর্বদা শীয়া রাষ্ট্র ছাড়া সকল সরকার ও রাষ্ট্রকে তাগূতী রাষ্ট্র বলে বিশ্বাস করেছেন। পক্ষান্তরে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ কখনোই এ ধরনের মতামত পোষণ করেন নি। এমনকি বাতিনী শিয়া, কারামিতা, ফাতিমী শিয়া ও অন্যান্য গোষ্ঠী যারা প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন-হাদীসের বিধানাবালি ব্যাখ্যা করে অস্বীকার ও অমান্য করত এবং এর ব্যতিক্রম বিধান প্রদান করত তাদের রাষ্ট্রকেও তাগূতী, জাহিলী বা কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করেন নি। বরং এগুলিকে ইসলামী রাষ্ট্র বলেই গণ্য করেছেন।

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কুরআনের বিধিবিধানের ব্যতিক্রম চলা বা আল্লাহর আইনের ব্যতিক্রম বিধান প্রচলন উমাইয়া যুগেই শুরু হয়েছে। বিশেষত আব্বাসী, ফাতিমী, বাতিনী, মোগল ইত্যাদি রাজ্যে ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক সুস্পষ্ট কুফরী বিশ্বাস ও মতবাদকে রাষ্ট্রীয় মতবাদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, ইসলামের আইন বিচার অনেকাংশেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এমনকি ইসলামের হারাম অনেক বিষয় বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বৈধ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ইহূদী, খ্রিস্টান, অগ্নিউপাসক বা পৌত্তলিকদের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আলিমগণ সাধ্যমত এগুলির কঠোর প্রতিবাদ করেছেন, অনেকে সরকারের বিরাগভাজন হয়েছেন, শাস্তিভোগ করেছেন, কিন্তু কখনোই রাষ্ট্র প্রশাসনের এ সকল বিচ্যুতির কারণে এ সকল রাষ্ট্র বা সমাজকে কাফির রাষ্ট্র বা সমাজ বলে গণ্য করেন নি, রাষ্ট্র, সরকার বা তাদের অনুগতদের বা নাগরিকদের কাফির বলে গণ্য করেন নি বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা যুদ্ধে লিপ্ত হন নি। বরং এরূপ রাষ্ট্রের আনুগত্য করেছেন, আইন মেনেছেন এবং এদের নেতৃত্বে কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হয়েছেন। উমাইয়া, আব্বাসী, স্পেনীয়, খারিজীয়, ফাতেমীয়, কারামিতীয়, বাতিনী, তাতার, মুগল ইত্যাদি সকল যুগের সকল রাষ্ট্রকেই মুসলিম আলিম ও ফকীহগণ দারুল ইসলাম

[১০৪৫]. ইমাম শাফিয়ী, আল-উম্ম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ১৯১; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১১, পৃ. ২০০

[১০৪৬]. সারাখসী, আল-মাবসূত, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১০, পৃ. ১৪৪; কাসানী, বাদাইউস সানাইয়, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৭, পৃ. ১৩০

[১০৪৭]. কাসানী, বাদাইউস সানাইয়, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৭, পৃ. ১৩০-১৩১; ইবনু আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ২৫৩; আল-মাওসূআ আল-ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত, খ. ২০, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

বলে গণ্য করেছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বিধান সেখানে প্রয়োগ করেছেন। জুমুআ, জামাত, রাষ্ট্রের আনুগত্য, রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বে শত্রুদেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ ইত্যাদি সকল বিধান এ সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলির অবস্থা উমাইয়া যুগ ও পরবর্তী যুগের মুসলিম দেশগুলি থেকে মোটেও ভিন্ন নয়, বরং কিছুটা ভালই বলতে হয়।

শাসক নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরা, নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগ ইত্যাদি ইসলামী নির্দেশনা পালনের ক্ষেত্রে এ সকল রাষ্ট্র পূর্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি থেকে কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছে। এ সকল দেশের অধিকাংশ আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা থেকে গৃহীত। ইসলামী বিধানের পরিপন্থী কিছু আইন-কানুনও বিদ্যমান, যেগুলির অপসারণ ও সংশোধনের জন্য মুমিন চেষ্টা ও দাওয়াত অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু শাসকদের পাপ, রাষ্ট্র ব্যবস্থার পাপ বা কিছু ইসলাম-বিরোধী আইন-কানুনের জন্য কোনো রাষ্ট্রকে দারুল কুফর বা কাফির রাষ্ট্র মনে করার কোনোরূপ ভিত্তি নেই। উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির স্বৈরাচার, ইসলাম বিরোধী আচরণ ও বিধিবিধান, ধার্মিক মানুষদের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে অনেক আবেগী মুসলিমই অনুভব করেন যে, তার দেশটি একটি অনৈসলামিক দেশ এবং এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি। আবেগ-তাড়িত মতামত বা কর্ম জাগতিক ফল বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সহায়ক নয়। আবেগ যাই বলুক না কেন, সকলকে আবেগমুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কুরআন-হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশনা, ইসলামের ইতিহাসের সকল যুগের রাষ্ট্রগুলির অবস্থা, সেগুলির সংস্কারে আলিম, উলামা, পীর, মাশাইখ ও বুজুর্গগণের কর্মধারার ভিত্তিতে আবেগমুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কুরআন-হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশনা, উমাইয়া যুগ ও পরবর্তী যুগগুলির বিষয়ে সাহাবী, তাবিয়ী ও তৎপরবর্তী আলিমগণের মতামতের আলোকে সুনিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, সমকালীন মুসলিম দেশগুলিকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করার কোনো সুযোগ নেই। সমকালীন কোনো কোনো গবেষক মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এ পার্থক্য একান্তই গবেষণা। ইসলামী শরীয়তের বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যের কোনো গুরুত্ব নেই। শরীয়তের বিধানের আলোকে এগুলি সবই দারুল ইসলাম। আল্লাহর পথে দাওয়াত বা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের অংশ হিসেবে মুমিন এ সকল রাষ্ট্রের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন, সংশোধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন, কিন্তু কখনোই রাষ্ট্রীয় আনুগত্য পরিত্যাগ করবেন না বা রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হবেন না।[১০৪৮]

ইসলামী শরীয়তে প্রকৃত জিহাদ

জিহাদের শাব্দিক অর্থ:

জিহাদ অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম ইত্যাদি।[১০৪৯] আল্লামা ইবনুল মানযুর বলেন- জিহাদ **(الْجِهَادُ)** শব্দটি **(جَاهَدَ)** শব্দের মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এটি **(الْجَهْدُ)** শব্দ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ সক্ষম হওয়া, ক্ষমতা রাখা, পরিশ্রম করা। বলা হয়- (الْجَهْدُ) শব্দটির জীম বর্ণ যবরযোগে পড়া হলে অর্থ হবে কষ্ট করা, পরিশ্রম করা। আর পেশযোগে পড়া হলে অর্থ হবে সক্ষম হওয়া।[১০৫০]

আল্লামা রাগেব আল ইস্পাহানী বলেন- হাত, মুখ অথবা সম্ভাব্য অন্য যে কোন কিছু দিয়ে শত্রু দমনে পূর্ণ ও সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। এটা তিন প্রকার। যথা-

ক) প্রকাশ্য শত্রুর মোকাবেলা করা,

খ) শয়তান মোকাবেলা,

গ) নফসের মোকাবেলা করা।

এই তিন প্রকার শত্রুর মোকাবেলাই আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

جَاهِدُوا فِي اللهِ حقّ جِهَادِهِ.

১০৪৮. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১০১

১০৪৯. কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন (কায়রো, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, তা.বি.) খ. ৩, পৃ. ৫০

১০৫০. ইবনুল মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ- الجَهْدِ; ফাইরুযআবাদী, আল কামুসুল মুহীত, মাদ্দাহ- الجَهْدِ।

Dhaka University Institutional Repository

"জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত"।[১০৫১] ড. ইব্রাহীম মুস্তফা বলেন, শরী'আতে জিহাদ শব্দের অর্থ হলো- কাফিরদের মধ্যে যারা মুসলিমদের তত্ত্বাবধানে নেই তাদের সাথে যুদ্ধ করা।[১০৫২] আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রচারের সকল শ্রম বা প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদীসে কখনো কখনো জিহাদ বলা হয়েছে। যেমন, কাফির-মুনাফিকদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদকে জিহাদ বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে নবী! মুনাফিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং তাদের প্রতি কঠোরাচরণ কর। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা নিকৃষ্ট ঠিকানা।"[১০৫৩] অপর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "অতএব, তুমি আনুগত্য করো না কাফিরদের এবং তাদের বিরুদ্ধে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করো।"[১০৫৪] অপর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে নবী! মুনাফিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং তাদের প্রতি কঠোরাচরণ কর। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা নিকৃষ্ট ঠিকানা।"[১০৫৫] আল কুরআনের অপর এক আয়াতে জিহাদ শব্দের অর্থ বলা হয়েছে, "শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা।" আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর যেমনভাবে তার জন্য যুদ্ধ করা উচিত।"[১০৫৬] বিভিন্ন হাদীসেও এই অর্থে জিহাদ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের অবকাশ নেই। তবে জিহাদ (আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা) ও নিয়ত রয়েছে।"[১০৫৭]

যালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "সর্বোত্তম জিহাদ হলো যালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলা।"[১০৫৮] হজ্জকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো জিহাদকে সর্বোত্তম ইবাদত মনে করি। আমরা কি জিহাদ করব না? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- না, বরং সর্বোত্তম জিহাদ হলো কবুল হজ্জ।[১০৫৯] আল্লাহর আনুগত্য বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে।[১০৬০] মোটকথা সাধারণ অর্থে জিহাদ হল, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শরীয়তের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট সহ্য করা হয় তাই জিহাদ, তা যে কোন পথেই হোক বা যে কোন পন্থায়ই হোক না কেন। আল্লামা ইবন তাইমিয়া বলেন, জিহাদ হৃদয় দিয়ে করা যায়। আর তা হলো জিহাদের ইচ্ছা করা। অথবা ইসলাম ও তার আইন কানুনের দাওয়াতের মাধ্যমে অথবা বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে অথবা সত্য প্রকাশ করত সন্দেহ-সংশয় দূর করার মাধ্যমে অথবা মুসলমানদের জন্য উপকারী মতামত ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অথবা স্বয়ং নিজে যুদ্ধ করার মাধ্যমে জিহাদ করা যায়। প্রত্যেকের সক্ষমতা অনুযায়ী জিহাদ ওয়াজিব হবে।

জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা

জিহাদ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা, তার অর্থ হল, আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠা করা, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা। ইসলামী পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্‌হে জিহাদ বলতে কিতাল বা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। ফিকহের পরিভাষায় সর্বদা জিহাদ অর্থ কিতাল বলা হয়েছে।[১০৬১] ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার লক্ষ্যে

[১০৫১]. আল কুরআন, ২২: ৬৮

[১০৫২]. ড. ইবরাহীম মুস্তফা, আল মু'জামুল ওয়াসীত, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪২

[১০৫৩]. আল কুরআন, ৯: ৭৩; তাবারী, জামিউল বায়ান, *প্রাগুক্ত,* খ. ১০, পৃ. ১৮৩; কুরতুবী, আল-জামি, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৩, পৃ. ৫

[১০৫৪]. আল কুরআন, ২৫: ৫২; তাবারী, জামিউল বায়ান, *প্রাগুক্ত,* খ. ১০, পৃ. ১৮৩; কুরতুবী, আল-জামি, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৩, পৃ. ৫৮

[১০৫৫]. আল কুরআন, ৬৬: ৯; তাবারী, জামিউল বায়ান, *প্রাগুক্ত,* খ. ১০, পৃ. ১৮৩; কুরতুবী, আল-জামি, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৩, পৃ. ৫৮

[১০৫৬]. আল কুরআন, ২২: ৬৮

[১০৫৭]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ১৪৮৭

[১০৫৮]. সুনান আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত,খ. ৪, পৃ. ৪৭১; সুনান আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ১২৪; হাকিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ৫৫১

[১০৫৯]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ৫৫৩, খ. ৩, পৃ. ১০২৬

[১০৬০]. সুনান আত-তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ১৬৫; ইবনু হিব্বান, *প্রাগুক্ত,* খ. ১১, পৃ. ২০৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ৫৪

[১০৬১]. ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৬, পৃ. ৩; যারকানী, শারহুল মুয়াত্তা, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৩; মুহাম্মাদ

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা চুক্তি নেই এমন কাফিরকে ইসলামের দাওয়াত করার পর সে অস্বীকার করলে তার সাথে যুদ্ধ করা।[১০৬২] কতল অর্থ হত্যা করা। আর কিতাল অর্থ পরস্পরে যুদ্ধ। এ জন্য জিহাদ বা কিতালের মূল শর্ত হলো সামনা-সামনি যুদ্ধ। পিছন থেকে হত্যা করা, না জানিয়ে হত্যা করা, গুপ্ত হত্যা করা এগুলি কখনোই ইসলামী কিতাল বা জিহাদ নয়। মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক কিতাল করেছেন। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফিরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নি সংযোগ, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি কখনোই তিনি করেননি বা করার অনুমতি প্রদান করে ননি। দুই-একটি ক্ষেত্রে যুদ্ধরত সামরিক নেতা বা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীকে যথাসম্ভব কম রক্তপাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গোপন কমান্ডো অভিযান পারিচালনা করার অনুমতি দেন তিনি। কাব ইবনু আশরাফ ও আবূ রাফি সাল্লাম ইবনু আবিল হুকাইক-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে কমান্ডো অভিযান ছিল এ পর্যায়ের। এরূপ অভিযানের মাধ্যমে তিনি মুসলিম বাহিনী ও শত্রু বাহিনী উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা প্রায় শূন্যে আনতে সক্ষম হয়েছেন।[১০৬৩] রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এরূপ কমাণ্ডো হামলা ছাড়া অন্য কোনোভাবে যুদ্ধের ময়দান ও বিচার ছাড়া তিনি হত্যার অনুমতি দেননি। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও অযোদ্ধাকে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্যাবলী

প্রকৃত জিহাদ বা কিতাল অত্যাবশ্যক হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ-

ক) যুল্‌ম ও অত্যাচারের প্রতিউত্তর দেওয়া।

খ) অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহায্য করা।

গ) অঙ্গিকার ভঙ্গের শাস্তি প্রদান করা।

ঘ) ফিত্‌না-ফাসাদ নির্মূল করা এবং ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ) কুফরের কর্তৃত্ব নির্মূল করা ও আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠা করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের ওপর থেকে (কাফিরদের কর্তৃত্ব ও কষ্ট দেওয়ার

ক্ষমতা) হটিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। তাদেরকে কাফেরদের সাথে লড়াই করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কেননা তারা নির্যাতিত হয়েছে। এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজীয় করার ব্যাপারে সামর্থবান। তাদের অন্যায়ভাবে নিজ নিজ গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে, 'আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। যদি আল্লাহ একের মাধ্যমে অপরের শক্তি খর্ব না করতেন তবে স্ব স্ব যুগে (খ্রীস্টানদের) গির্জা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, সব গুড়িয়ে দেওয়া হত। অবশ্যই আল্লাহ তার সাহায্য করবেন যে আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করবে (অর্থাৎ আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠা করার বিশুদ্ধ নিয়তে জিহাদ করবে) নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী। এরা এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে কতৃত্ব দান করি তবে তারা নিজেরাও নামাযের পাবন্দী করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং (অন্যকে) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এবং সকল কাজের পরিণতি আল্লাহরই আয়ত্বাধীন।[১০৬৪] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "সুতরাং যারা আল্লাহর কাছে আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয় তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুক এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে অতঃপর নিহত হোক বা বিজয়ী হোক আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব। তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুদের জন্য, যারা

কামসুল হক্ক আযীমআবাদী, আওনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫ হি.) খ. ৭, পৃ. ১১১; আব্দুর রাউফ মুনাবী (১০৩১ হি), ফাইদুল কাদীর (মিসর, আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৬ হি.) খ. ২, পৃ. ৩০; মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল সানআনী (৮৫২ হি), সুবুলুস সালাম (হালব, মুস্তফা আল বাবী আল হালাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৭৯ হি.) খ. ৪, পৃ. ৪১; মুহাম্মাদ ইবনু আলী শাওকানী (১২৫৫হি), নাইলুল আওতার *প্রাগুক্ত,* খ. ৮, পৃ. ২৫

১০৬২. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ২৭৭; আল ফাতাওয়া আলহিন্দিয়্যাহ, খ. ২, পৃ. ১৮৮; শারহুল মুয়াত্তা, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৩

১০৬৩. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত,খ. ৪, পৃ. ১৪৮১-১৪৮২; সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ১৪২৫

১০৬৪. আল কুরআন, ২২: ৩৮-৪১

Dhaka University Institutional Repository

বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ---যার অধিবাসী যালিম, তা থেকে আমাদেরকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও; তোমাদের কাছ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার কাছ থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর। যারা মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল"।[১০৬৫]
শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, দুই কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা তোমাদের কর্তব্য-
এক, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা।
দুই, কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে মুক্ত করা।
মক্কাতে অনেক লোক এমন ছিল যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে হিজরত করতে পারেননি। তাঁদের আত্মীয় স্বজন তাদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন করত, যাতে তাঁরা পুনরায় কাফির হয়ে যান তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বললেন, 'তোমাদের দুই কারণে যুদ্ধ করা উচিৎ। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং মক্কার কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্য।' "তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসূলকে বের করে দেয়ার জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে বেশী সমীচীন যদি তোমরা মু'মিন হও। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্তি করবেন এবং তিনি ওদের অন্তরের ক্ষোভ দুর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে যখন পর্যন্ত আল্লাহ্ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং কারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি? তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।"[১০৬৬] হযরত উসমানী (রহ.) বলেন, জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার মূল হিকমত এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতের কাফির ব্যক্তিদের ঔদ্ধত্য যখন সীমা অতিক্রম করত তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ব্যাপক আযাব দিয়ে সমুলে ধ্বংস করে দিতেন কিন্তু এই উম্মতের কাফেরদের জন্য জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে। এর মাধ্যমে খোদাদ্রোহী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার অনুগত বান্দাদের হাতে শাস্তি প্রদান করেন। এতে একদিকে যেমন কাফেরদের লাঞ্ছনা হয় অপরদিকে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে এবং তাদের বিজয়ও কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়। এবং মুমিনদের অন্তর এই বেবে প্রশান্ত হয় যে, গতকাল পর্যন্ত যেসব কাফের তাদের উপর নির্যাতন করত আজ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারাই তাদের অনুকম্পা বা ইনসাফের মুখাপেক্ষী হয়েছে। অপর দিকে কাফেরদের জন্যও এই শাস্তি বিধানের মধ্যে একটি উপকারী দিক এই রয়েছে যে, এতে করে শাস্তিলাভের পর ও তাদের জন্য তাবার দরজা খোলা থাকে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকে। এসব আয়াতে জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার আরো একটি হিকমত এই উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জিহাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান কারা শুধু মৌখিক বন্দেগীর দাবীদার এবং কারা প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর জন্য জান মাল বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত এবং সাথে সাথে কারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নেক আমল করে আল্লাহ পাক তাও জানেন।[১০৬৭]
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যারা কুফরী করে এবং অন্যকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দেন। ... অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; তারপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না যুদ্ধ এর অস্ত্র নামিয়ে না ফেলে। এটাই বিধান। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদেরকে শাস্ʅ দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কাজ বিনষ্ট

১০৬৫. আল কুরআন, ৪: ৭৪-৭৬
১০৬৬. আল কুরআন, ৯: ১৩-১৬
১০৬৭. শাব্বীর আহমাদ উসমানী, তাফসীরে উসমানী (ঢাকা, সম্পাদনা পরিষদ, ই.ফা.বা) ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ২৪৪-২৪৫

হতে দেন না। তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দেবেন।"[১০৬৮]
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যাবৎ না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে।তরা যা করে আল্লাহ তা সম্যক দ্রষ্টা। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।"[১০৬৯] মুফতী মুহম্মাদ শফী (রহ.) বলেন, 'দ্বীন অর্থ বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসীর এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত লড়াই জারী রাখা উচিৎ যতক্ষণ না মুসলমানরা তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায় এবং দ্বীন ইসলামের বিজয় অর্জিত হয় যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।' তিনি আরও বলেন, মুসলমানদের উপরে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের সাথে জিহাদ ও ক্বিতাল জারী রাখা ওয়াজিব যতক্ষণ না মুসলমানদের উপরে তাদের অত্যাচারের ফিৎনা বন্ধ হয় এবং ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয়। এই অবস্থা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে তাই জিহাদের বিধানও ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।[১০৭০]
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যাদের প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্তে ঈমান আনে না এবং শেষ দিনেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া দেয়।"[১০৭১]
শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.) বলেন, মুশরিকদের বিষয় খতম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কিছুটা শৃঙ্খল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসল, আহলে কিতাবের শক্তি ও দর্প চূর্ণ কর। মুশরিকদের তো অস্তিত্ব হতেই আরবকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ইয়াহুদী নাসারার ক্ষেত্রে তখন পর্যন্ত কেবল এতটুকুই লক্ষ্য ছিল, প্রচার-প্রসার ও উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে না থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া হয় যে, তারা যদি অধিনস্ত প্রজা হয়ে জিযইয়া দিতে রাযী থাকে, তবে কোন অসুবিধা নেই প্রজা করে নাও। তারপর ইসলামী সরকারের দায়িত্ব তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা। পক্ষান্তরে তারা যদি জিযইয়া দিতে সম্মত না হয়, তবে মুশরিকদের অনুরূপ ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধেও নেওয়া হবে।[১০৭২]

জিহাদ বা কিতাল ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

জিহাদ বা কিতাল বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ শর্তারোপ করেছে। সেগুলির অন্যতম হল-
(১) রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি,
(২) রাষ্ট্র বা মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া,
(৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগকে প্রাধান্য দেওয়া ও
(৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষবস্তুতে আঘাত করা।

(১) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন

ইসলামে জিহাদের বৈধতার সর্বপ্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিতাল বা জিহাদ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম দা'ওয়াত বা প্রচার। কিতাল হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। দাওয়াতের বিরুদ্ধে অমানবিক বর্বরতা ও সহিংস প্রতিরোধকে তিনি পরিপূর্ণ অহিংস উত্তম আচরণ দিয়ে মুকাবিলা করেছেন। আবূ বাকর (রা.), উমার (রা.), উসমান (রা.), আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা.) ও মক্কার আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় সামাজিক নেতা

[১০৬৮]. আল কুরআন, ৪৭: ১, ৪-৫
[১০৬৯]. আল কুরআন, ৮: ৩৯-৪০
[১০৭০]. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪ পৃ. ২৩৩
[১০৭১]. আল কুরআন, ৯: ২৯
[১০৭২]. মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের সাথে সাধারণ অনেক মুসলিম ছিলেন। তাঁরা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে অনুমতি চেয়েছেন কাফিরদের সহিংস আচরণকে প্রতিরোধ করতে বা তাদের বর্বরতার প্রতিবাদে অস্ত্র তুলে নিতে। কিন্তু কখনোই সে অনুমতি দেওয়া হয়নি। এক পর্যায়ে দাওয়াতের ভিত্তিতে মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুশরিকগণ এ নতুন রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করে। তখন রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি বা নির্দেশ জিহাদের বৈধতার শর্ত বলে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "রাষ্ট্রপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"[১০৭৩] এজন্য দেখা যায় যে, সাহাবীগণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে জিহাদ বা কিতালে লিপ্ত হননি। আলী (রা.)-এর সাথে মু'আবিয়া (রা.)-এর যুদ্ধ ছিল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। ইয়াযিদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের যুদ্ধ ও উমাইয়া শাসকদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের যুদ্ধ ছিল একান্তই রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। মুআবিয়ার (রা.) মৃত্যুর পরে কূফাবাসীগণ ইমাম হুসাইনকে (রা.) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাইয়াত করে পত্র লিখেন। তারা ইমাম হুসাইনকেই বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইয়াযিদের রাষ্ট্রক্ষমতার দাবি অস্বীকার করেন। এভাবে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা.) ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ ছিল। এ সকল বৈধ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধও যেহেতু মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতো, সেজন্য সাহাবীগণ সাধারণত এগুলিতে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন, যদিও তাঁরা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা স্বীকার করতেন। এখানে দেখা যায় যে, আলী (রা.)-এর সময়ের যুদ্ধে ৩০ জনেরও কম সাহাবী অংশ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু সিরীন (রহ.), যদিও তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন।

৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ যখন মক্কা অবরোধ করে ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাতে থাকে, তখন দুই ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.)-এর নিকট এসে বলেন, "মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবী, আপনাকে বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে কিসে? তিনি বলেন, "আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন, এ-ই আমাকে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে।" অন্য বর্ণনায় তারা বলেন, "কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন?" তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেন, "ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপরঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লায় হজ্জ।"[১০৭৪]

এখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করেছেন। ইসলামের মূলনীতি, আদেশ পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জন অগ্রগণ্য।[১০৭৫] বিশেষত এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্মটি কুরআন-হাদীসে বারংবার ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া জিহাদ আরকানে ইসলামের মত মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বা উদ্দিষ্ট (Aimed at; intended) ইবাদত নয়; বরং তা উদ্দিষ্ট ইবাদতগুলি পালনের উপকরণ (accessory; equipment; apparatus) মাত্র। জিহাদের মাধ্যমে মূল ইবাদগুলি পালনের পরিবেশ রক্ষা করা হয়। পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে আর জিহাদের প্রয়োজন থাকে না। উদ্দিষ্ট ইবাদত কখনো স্থগিত হয় না; উপকরণ স্থগিত হতে পারে। সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদত সর্বদা সর্বাবস্থায় পালনীয়। পক্ষান্তরে জিহাদ কেবলমাত্র এ সকল ইবাদত পালনের বিঘ্ন ঘটলেই পালনীয়। সালাত, সিয়াম, তিলাওয়াত, যিক্‌র ইত্যাদি কর্ম সরাসরি ইবাদত। মুমিন যত বেশি পালন করবেন ততবেশি সাওয়াব লাভ করবেন। পক্ষান্তরে জিহাদ হলো অপরাধীর শাস্তি দেওয়ার মত ইবাদত। এক্ষেত্রে যত বেশি

[১০৭৩]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১০৮০; সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১৪৭১

[১০৭৪]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৮, পৃ. ১৮৪, ৩১০

[১০৭৫]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৬, পৃ. ২৬৫৮; সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ১৮৩০

অপরাধীর শাস্তি দেওয়া হবে তত বেশি সাওয়াব হবে বলে মনে করার কোনো সুযোগ নেই। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে শরীয়ত অনুসারে শাস্তি প্রদান ইবাদত বা দায়িত্বে পরিণত হয়। এ জন্য ইসলামে শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া কঠিন করা হয়েছে এবং সামান্যতম সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রদান থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর এজন্যই জিহাদ এড়ানোর জন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, জিহাদ মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও ইসলামী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার উপকরণ মাত্র। প্রয়োজনে তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় চেষ্টা করতে হবে এ ব্যবস্থা এড়িয়ে সন্ধি বা শান্তির মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য সাধান করার। জিহাদের বারংবার আদেশ করা হলেও তার জন্য অনেক শর্তারোপ করা হয়েছে, তাকে ফরযে আইন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এবং তা পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি কম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না। এক্ষেত্রে তাঁদের মূলনীতি ছিল যে, ভুল জিহাদের মানুষ হত্যা বা মানুষের ক্ষতি করার চেয়ে সঠিক জিহাদ বর্জন করা অনেক শ্রেয়। এভাবে দেখা যায় যে, সাহাবীগণ সন্দেহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বৈধ জিহাদেও অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে কখনোই কোনো যুদ্ধ তারা বৈধ বলে মনে করেননি। খারিজীগণের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক হাদীসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) খারিজীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে পাবে তারা যেন তাদেরকে হত্যা করে।" সাহাবীগণ এ থেকে কখনোই বুঝেননি যে, খারিজীদেরকে পেলেই হত্যা করতে হবে। তাঁরা কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র কোনো সুপরিচিত খারিজী নেতাকেও হত্যা করেননি।[১০৭৬]

(২) রাষ্ট্র বা মুসলিমের নিরাপত্তা

কিতালের অন্যতম শর্ত, শত্রুপক্ষ রাষ্ট্র আক্রমণ করবে বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[১০৭৭] মুসলিম রাষ্ট্রের ও নাগরিকগণের নিরাপত্তা ছাড়াও অন্যদেশের নির্যাতিত মুসলিম নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ানো মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও জিহাদের প্রয়োজনে হতে পারে। যদি অন্য দেশের মুসলিম নাগরিকগণ কোনো মুসলিম দেশের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সে দেশের সাথে মুসলিম দেশের কোনো চুক্তি বা কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকে তাহলে মুসলিম রাষ্ট্র প্রয়োজনে সে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে বা তাদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"নি-য়ই যারা ঈমন এনেছে, হিজরত করেছে (অমুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে) এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা একে অপরের অভিভাবক-বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের অভিভাবকত্বের (সাহায্যের) কোনোরূপ দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দীনের বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনো সাহায্য চায় তবে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এরূপ জাতির বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের পারস্পরিক চুক্তি রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।"[১০৭৮]

(৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগ গ্রহণ

জিহাদ উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়, উদ্দিষ্ট ইবাদত পালনের পরিবেশ রক্ষার উপকরণ। জিহাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্র, নাগরিক ও ইসলামী দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য যদি জিহাদ ছাড়া অর্জিত হয় তবে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ জন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তির সুযোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর

[১০৭৬]. ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪৭-৫৭

[১০৭৭]. আল কুরআন, ২২: ৩৯

[১০৭৮]. আল কুরআন, ৮: ৭২

আল্লাহর ওপর নির্ভর কর, নি-য়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”[১০৭৯] হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, দাওয়াতের প্রসার ও দীনের বিজয়ে জিহাদের চেয়েও সন্ধির অবদান অনেক বেশি ছিল। জাগতিক বিচারে এ সন্ধি ছিল অপমানজনক, অবমাননাকর এবং কাফিরদেরকে সকল ছাড় দেওয়া। যে কোনো আবেগী বিচারে এ ছিল সব কিছু মেনে নেওয়া। উমার (রা.) ও অধিকাংশ সাহাবীই এরূপ ভেবেছেন। এ সময়ে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সকল অধিকার তাদের ছিল এবং যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং কাফিরদের সকল দাবি মেনে নিয়ে সন্ধি করেছেন। আর ইসলামের কোনো জিহাদ, যুদ্ধ, অভিযান বা বিজয়কে ফাতহ মুবীন বা সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয়নি। কিন্তু এ সব কিছু মেনে নেওয়ার সন্ধিকে কুরআনে ফাতহুল মুবীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্ধি ও শান্তি রক্ষায় রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এর একটি প্রকাশ হুদায়বিয়ার সন্ধি রক্ষার্থে নির্যাতিত মুসলিমদেরকে কাফিরদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। এ ছিল এমন একটি সিদ্ধান্ত যা প্রায় সকল সাহাবীকে বিক্ষুব্ধ করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এ চুক্তি রক্ষায় অনড় ছিলেন। সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে হুদাইবিয়ার ময়দানেই আবূ জানদাল (রা.) নামক একজন নির্যাতিত মুসলিম শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই মক্কা থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) শর্ত মেতাবেক তাকে মক্কাবাসীদের হাতে সমর্পন করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ এ বিষয়ে খুবই আবেগী হয়ে উঠেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এরপর আরেক নির্যাতিত মুসলিম আবূ বাসীর (রা.) মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকেও ফিরিয়ে দেন।

একপর্যায়ে আবূ বাসীর (রা.), আবূ জানদাল (রা.) ও আরো অনেক নির্যাতিত মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে সিরিয়ার পথে ঈস নামক স্থানে সমবেত হন। সন্ধিচুক্তির কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে মদীনার নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। আর মদীনা রাষ্টের সাথে মক্কাবাসীদের সন্ধি থাকলেও এ নতুন জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সন্ধি ছিল না; বরং তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় তাঁরা সিরিয়াগামী কুরাইশ কাফিলাগুলির ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। মক্কাবাসীরা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে মদীনা রাষ্টের নাগরিক মেনে সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাই তাদের জন্য নিরাপদ। তাদেরই অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্ধিচুক্তির সংশ্লিষ্ট শর্তটি বাতিল করে তাঁদেরকে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।[১০৮০] এভাবে সকল প্রকার আবেগ ও বেদনা নিয়ন্ত্রণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্ধি ও শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধ বা হত্যা এড়িয়ে শান্তির লক্ষ অর্জনের জন্য ইসলামে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ শুরুর পূর্বে শান্তির সুযোগ দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শত্রুবাহিনীকে সন্ধি, আত্মসমর্পন, ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া বা কর প্রদান ইত্যাদির সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে, যুদ্ধ চলাকালে একেবারে অস্ত্রাঘাতের সময়ও যদি কোনো শত্রু সৈন্য নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে তবে তাকে আর আঘাত করা যাবে না। বস্তুত একজন ডাক্তার যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা করেন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করে চিকিৎসা করার-একান্ত বাধ্য হলেই কেবল তার কোনো অঙ্গ কেটে প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করেন; তেমনি ইসলামে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করার।

(৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষবস্তুতে আঘাত

কিতালের অন্য শর্ত, শুধু যারা যুদ্ধ করতে অস্ত্রধারণ করে সামনে এসেছে তাদেরই সাথে যুদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

“তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।”[১০৮১] এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষবস্তুতে আঘাত করা, অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাসের পথ রোধ

[১০৭৯]. আল কুরআন, ৮: ৬২

[১০৮০]. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত,খ. ২, পৃ. ৯৭৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৩১১-৩১২

[১০৮১]. আল কুরআন, ২: ১৯০

করেছে। যোদ্ধা ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশ, "যুদ্ধে তোমরা প্রতারণা বা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো গীর্জাবাসী, সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো বাড়িঘর ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না...। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী- কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।[১০৮২] রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনের সকল যুদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি কমাতে চেয়েছেন। বস্তুত ইসলাম যুদ্ধকে যে মানবিক রূপ প্রদান করেছে তা অন্য কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না। উপর্যুক্ত শর্তাবলির বিদ্যমানতায় জিহাদ শরীয়ত সম্মত ইবাদতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে জিহাদ আত্মরক্ষামূলক (defensive) হতে পারে। আবার তা আক্রমনাত্মক বা নিবৃত্তিমূলক (offensive/preemptive) হতে পারে। রাষ্ট্র প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

জিহাদের ফযীলত ও বিধান

নিঃসন্দেহে জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদ কুরবানী দেওয়া অত্যন্ত বড় ত্যাগ এবং মানবীয় প্রকৃতির জন্য খুবই কষ্টকর। এজন্য এ ইবাদতের সাওয়াব ও পুরস্কারও অভাবনীয়। কুরআন ও হাদীসে জিহাদের অফুরন্ত সাওয়াব ও পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং জিহাদের ইবাদত পালনের জন্য বিশেষ উৎসাহ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের অর্থ জিহাদ যখন বৈধ বা শরীয়ত সম্মত হবে তখন যে ব্যক্তি মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠে জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে তখন সে এ অভাবনীয় পুরস্কার লাভ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আল্লাহ মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে প্রদত্ত এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে তিনি অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে কে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী? সুতরাং তোমরা তাঁর সাথে কৃত লেনদেনের ওপর আনন্দিত হও। আর এটিই মহা সাফল্য।"[১০৮৩] জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

সবার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব কোনো একটি জামায়াতের একার নয়। এ কর্তব্য সকলকে সমবেত করে। এ দায়িত্ব থেকে পালানোর কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারো।"[১০৮৪] এছাড়া জিহাদের আবেগ ও আগ্রহ মুমিনের হৃদয়ে থাকবে। জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের কুরবানীর প্রতি অনীহা ঈমানের দুর্বলতা প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

"যদি কেউ এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এবং যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণের কোনো কথাও নিজের মনকে কখনো বলেনি, তবে সে ব্যক্তি মুনাফিকীর একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করল।"[১০৮৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নি-য়ই জান্নাতে একশটি মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এসব মর্যাদা মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। একটি মর্যাদা থেকে আরেকটি মর্যাদার পার্থক্য হচ্ছে আকাশ-জমিন সমান।"[১০৮৬] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, "আল্লাহর পথে আহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন

[১০৮২]. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা (ভারত, হায়দারাবাদ, মাজলিসু দায়িরাতুল মা'আরিফ আননিজামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৪ হি.) খ. ৯, পৃ. ৯০

[১০৮৩]. আল-কুরআন, ৯: ১১১

[১০৮৪]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ১৬

[১০৮৫]. সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১৫১৭

[১০৮৬]. সীহহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৭, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরছে, যার রং তো হবে রক্তের কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিশকের।"[১০৮৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় তথা জিহাদের ময়দানে এক সকাল ও এক বিকাল কাটানো দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ থেকে উত্তম।"[১০৮৮] এখানে দেখা যায় যে, সাধারণভাবে জিহাদ ফরযে কিফায়া এবং রাষ্ট্র শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ফরযে আইন। ফরযে কিফায়া অবস্থায় যদি সকল মুসলিম তা পরিত্যাগ করে এবং ফরযে আইন অবস্থায় যদি মুসলিমগণ তা পরিত্যাগ করে তবে তা তাদের জাগতিক লাঞ্ছনা বয়ে আনবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যখন তোমরা অবৈধ ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হবে, গবাদিপশুর লেজ ধারণ করবে, চাষাবাদেই তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, দীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত যা তিনি অপসারণ করবেন না।"[১০৮৯] এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে অনেক সময় আবেগী মুমিন ভুল বুঝে থাকেন যে, জিহাদের বিষয়ে যেহেতু বেশি বেশি নির্দেশ, উৎসাহ, গুরুত্ব ও পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেহেতু জিহাদ সালাত-সিয়ামের মতই ইবাদত অথবা সালাত সিয়ামের চেয়েও বড় ইবাদত। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা সালাত ও সিয়াম ফরয করেছেন এবং তিনিই জিহাদ ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেছেন (**كُتِبَ عليكم الصيام**) তোমাদের উপর সিয়াম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে"[১০৯০] এবং তিনিই বলেছেন (**كُتِبَ عليكم القِتَال**) তোমাদের উপর কিতাল বা যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে"।[১০৯১] কাজেই সালাত, সিয়াম ও জিহাদ-কিতালের মধ্যে পার্থক্য করলে বা সালাত পালন করে জিহাদ-কিতাল পালন না করলে ইসলাম পালন করা হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের সাথে খারিজীগণের কথোপকথনে এ কথাই স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়। কুরআনে কোনো ইবাদতেরই বিস্তারিত বিধান ও শর্তাবলি উল্লেখ করা হয়নি। কুরআন ও সুন্নাহর সামগ্রিক নির্দেশনার আলোকে তা জানতে হয়। কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে জানা যায় যে, জিহাদ সালাত-সিয়াম ইত্যাদির মত ফরয আইন নয়, বরং তা ফরয কিফায়া ইবাদত। জিহাদের শর্তগুলি পূরণ সাপেক্ষে জিহাদ বৈধ বা ফরয হলে উম্মাতের কিছু সদস্য তা পালন করবেন। এতে উম্মাতের সকলের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে। অন্যরা পাপমুক্ত হবেন, তবে এ ইবাদত পালনের সাওয়াব তারা পাবেন না। যারা এ ইবাদত পালন করবেন তারা এ ইবাদত পরিত্যাগকরীদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করবেন, তবে পরিত্যাগকারীরা পাপী হবেন না। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মুমিনদের মধ্যে যারা কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও (জিহাদ না করে) ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মুমিনকেই আল্লাহ কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[১০৯২] এখানে আল্লাহ তা'য়ালা সুস্পষ্টতই জানিয়েছেন যে, কোনোরূপ ওজর ও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদ পরিত্যাগ করে তবে সে পাপী হবে না, শুধু অতিরিক্ত সাওয়াব ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে। এ অর্থে এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, "একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আগমণ করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বলেন: যে মুমিন নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। লোকটি বলেন, এরপর সর্বোত্তম কে? তিনি বলেন: যে মুমিন মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী নির্জন উপত্যাকায় থেকে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: এভাবে নির্জনে একাকী সে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, মৃত্যু আগমণ পর্যন্ত তার প্রতিপালকের ইবাদত করে) এবং মানুষের কোনো ক্ষতি করে না।"[১০৯৩] এভাবে সমাজ ও জিহাদ পরিত্যাগ করে নির্জনে একাকী বসবাস করে দীনের আরকান ও আহকাম পালনের কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি মর্যাদায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন, তবে পাপী বলে গণ্য হলেন না।

[১০৮৭]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ১৬

[১০৮৮]. সহীহুল বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১৬

[১০৮৯]. সুনান আবূ দাউদ, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ২৭৪

[১০৯০]. আল কুরআন, ২: ১৮৩

[১০৯১]. আল কুরআন, ২: ২১৬, আল-কুরআন, ৯: ৪১

[১০৯২]. আল কুরআন, ৪: ৯৫

[১০৯৩]. সহীহ মুসলিম ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১৫০৩

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

"মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। তাদের প্রতিটি দল থেকে একাংশ বের হয় না কেন? যাতে তারা দীনের জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যেন তারা সতর্ক হয়।"[১০৯৪] বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) পিতামাতার খেদমত বা অনুরূপ দায়িত্বের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, "একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি বলেন: তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? সে বলে : হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন : তোমার পিতামাতাকে নিয়ে তুমি জিহাদ কর। (অন্য বর্ণনায়: তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং সুন্দরভাবে তাঁদের খেদমত ও সাহচার্যে জীবন কাটাও।"[১০৯৫] এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ ফকীহগণ একমত যে, জিহাদ ফরয কিফায়া বা সামষ্টিক ফরয, কিছু মুসলিম তা পালন করলে অন্যদের ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে যারা পালন করবেন তারাই শুধু সাওয়াব লাভ করবেন, অন্যরা গোনাহ থেকে মুক্ত হবেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে শত্রুবাহিনী যদি রাষ্ট্র দখল করে নেয়, বা রাষ্ট্র যদি বহির্শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেনাবাহিনীর পক্ষে আগ্রাসন রোধ সম্ভব না হয়, এবং রাষ্ট্রপ্রধান সকল নাগরিককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন তবে এ অবস্থায় জিহাদ ফরয আইনে পরিণত হয়। আল্লামা কুরতুবী বলেন, "যে বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকলের ওপর জিহাদ ফরয কিফায়া। যখন কিছু মানুষ তা পালন করবে তখন অন্য সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হবে। তবে যখন শত্রুগণ ইসলামী রাষ্ট্রে আক্রমণ করে তখন তা ফরয আইন হয়ে যায়।"[১০৯৬] তাফসীর, হাদীস-ব্যাখ্যা ও ফিকহের প্রায় সকল গ্রন্থেই বিভিন্ন শব্দে ও বাক্যে এ কথাই বলা হয়েছে।

জিহাদ বা কিতাল সম্পর্কে আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের কতিপয় বিভ্রান্তির অপনোদন

জিহাদ বা কিতাল সম্পর্কে আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবিগণ যে সমস্ত বিভ্রান্তিতে আছেন, তাদের এসব বিভ্রান্তির অপনোদন নিম্মোক্তভাবে করা হয়েছে

প্রথমত: কিছু গবেষক মনে করেন যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে যে কোন কর্মকাণ্ড প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য জিহাদ আভিধানিক অর্থে শরীয়ত সম্মত সকল দ্বীনি প্রচেষ্টাকেই বুঝায় এবং শরয়ী বিধানসমূহের (কুরআন হাদীসের ভাষা) কোথাও কোথাও এই শব্দ জিহাদ ছাড়া অন্যান্য দ্বীনি মিহনতের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু জিহাদ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা এবং যার অপর নাম ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ তা কখনো এই সাধারণ কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয় বরং এই অর্থে জিহাদ হল, আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ইসলামের হিফাজত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, কুফরের শক্তিকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।" ফিকহের কিতাবসমূহে এই জিহাদের বিধি-বিধানই উল্লেখিত হয়েছে। সীরাত গ্রন্থসমূহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে, কুরআন হাদীসে জিহাদের ব্যাপারে যে বড় বড় ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে এবং এই জিহাদে শাহাদাতের মর্যাদায় বিভূষিত ব্যক্তিই হলেন প্রকৃত শহীদ।

শরয়ী বিধান এবং শরয়ী পরিভাষাসমুহের উপর নেহায়েত জুল্ম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযাইল দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরনের অর্থগত বিকৃতি সাধন, যা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। তা'লীম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়ায-নসহিত বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিকভাবে কোন কর্ম প্রচেষ্টা

১০৯৪. আল কুরআন, ৯: ১২২

১০৯৫. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১০৯৪; সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ১৯৭৫

১০৯৬. কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ৩৮

(যদি শরয়ী নীতিমালা ও ইসলামী নির্দেশনা মোতাবেক হয় তবে তা আমল বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকারের একটি নতুন পদ্ধতি) এসবই স্ব স্ব স্থানে কাম্য এবং এসব কর্মপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটাই খিদমতে দ্বীনের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এসবের ভিন্ন ফযিলত, ভিন্ন আহকাম এবং ভিন্ন মাসয়ালা-মাসাইল রয়েছে এবং কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই কিন্তু এসবের কোনটাই এমন নয় যাকে পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং যার ব্যাপারে জিহাদের গুরুত্ব ও আহকাম আরোপ করা যায়। এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা অতীব জরুরী, কেননা আজকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক বিকৃতি বা পরিবর্তন সাধন প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ তাবলীগের কাজকে জিহাদ বলে দিচ্ছেন, কেউ তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, আবার কেউ রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা এবং ইলেকশনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছেন। কারো কারো কথা থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণ ও জিহাদের শামিল। এ সব কিছুই বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত: উপরোক্ত আলোচনা থেকে নি-য়ই ঐসব লোকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা জিহাদ মাআল কুফফার ও ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ এর গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ) ও জিহাদে আসগরের (ছোট জিহাদ) দর্শন ব্যবহার করেন। তাদের বক্তব্য হল, নফসের (প্রবৃত্তির) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ হল ছোট জিহাদ! এই ভূল ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, "আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে। এই ধারণা ঠিক নয় বরং বাস্তব কথা হল, কাফেরদের সাথে লড়াই করা ইখলাস শূন্য হয়ে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নস্তরের কাজ। এ ধরণের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং এর বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের সাথে লড়াই যদি একনিষ্ঠ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাকক্বিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী) সুফীদের বাড়াবাড়ি বরং এই লড়াই অবশ্যই জিহাদে আকবর এবং তা নিভৃতে নফসে মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রিত হচ্ছে।[১০৯৭]

তৃতীয়ত: বর্তমান সময়ের কোন কোন লেখকের রচনা থেকে, যা তারা জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং জিহাদের তাৎপর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার জন্য লিখেছেন, এই ধারণা জন্মায় যে, ইসলামে শুধু প্রতিরোধমূলক জিহাদ অনুমোদিত, আক্রমণাত্মক জিহাদ অনুমোদন ইসলামে নেই। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার কারণ হয়ত জিহাদ সম্পর্কীয় কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বরকতময় জীবনচরিত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তিসমূহের কারণে ভীত কম্পিত মানসিকতা। বাস্তবতা হল, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংশ করা। এতদুদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক জিহাদ শুধু অনুমোদিতই নয় বরং কখনো কখনো তা ফরয ও প্রভূত সওয়াবের কারণও বটে। কুরআন সুন্নাহর দলীলসমূহের পাশাপাশি পুরো ইসলামই এ ধরণের জিহাদের ঘটনায় পরিপূর্ণ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তক্বী উসমানী এর ভাষায়-"অমুসলিমদের আপত্তিতে ভীত হয়ে এসব বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা বা এতে দায়সাড়া উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা একটি অর্থহীন কাজ। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তিকেও জবরদস্তি করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়নি এবং এর অনুমোদনও শরীয়তে নেই, অন্যথায় জিযিয়ার পুরো ব্যবস্থাপনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই তরবারী ওঠানো হয়েছে, কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চায় থাকুক কিন্তু আল্লাহর বানানো এই পৃথিবীতে বিধান আল্লাহরই চলা উচিত এবং মুসলমান আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং আল্লাহদ্রোহীদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে ধ্বংশ করার জন্য জিহাদ করে। এই বাস্তব প্রভাব প্রতিপত্তিকে ধ্বংশ

[১০৯৭]. আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খ. ৪, হিস্সা : ৫ পৃ. ৮২, মালফূয, ১০৪১

করার জন্যই জিহাদ করে। আর এই বাস্তব সত্য প্রকাশে ঐসব লোকের সামনে কেন লজ্জাবনত হতে হবে অথচ যাদের পুরো ইতিহাস সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মত্ত নেশায় হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের ইতিহাস এবং যারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করেছে। যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ আজও রক্তাক্ত![১০৯৮]

চতুর্থত: কোন কোন গবেষকের এই ভুল ধারণাও আছে যে, কোন অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি দিলে তাদের সাথে আক্রমণাত্মক জিহাদ ঠিক নয়। এ জাতীয় ভুল ধারণার শিকার এক ব্যক্তি হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তক্বী উসমানী (দা: বা:)-কে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেন। হযরত মাওলানা পত্র লিখকের ভ্রান্তি দূর করেন এবং এ বিষয়ে শরয়ী নির্দেশনার ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন। উত্তরের নির্বাচিত অংশ হল, "আপনি জিহাদের ব্যাপারে যা লিখেছেন তার সারাংশ আমি এই বুঝি যে, কোন অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করলে অতঃপর তার সাথে আর জিহাদ জায়েয থাকে না। যদি এই আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে আমি আপনার সাথে একমত নই। ইসলাম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতা শুধু এই নয় যে, সরকার ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আইনী নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং মুসলামানদের বিপরীতে কোন অমুসলিম রাষ্ট অধিক প্রতিপত্তির মালিক হওয়াও দ্বীনে হক্ব এর প্রচারে অনেক বড় বাধা। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে তাবলীগের ব্যাপারে কোন আইনী নিষেধাজ্ঞা নেই কিন্তু পৃথিবীতে তাদের বর্তমান প্রতিপত্তির কারণে বিশ্বব্যাপী সাধারণভাবে এমন একটি মানসিকতা তৈরী হয়ে গেছে যা সত্য প্রচারের ব্যাপারে কোন আইনী নিষেধাজ্ঞার চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং বেশী। এজন্য কাফেরদের প্রতিপত্তি চুরমার করা জিহাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম। যাতে তাদের বিদ্যমান এই প্রতিপত্তির কারণে যে মানসিক ভীতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভূত হয় এবং সত্য গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়। যতদিন পর্যন্ত তাদের এই প্রতিপত্তি বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের মনে এই ভীতিও অটুট থাকবে এবং দ্বীনে হক্ব কবুল করার জন্য পুরোপুরি অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না।[১০৯৯] অতএব জিহাদ জারী থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اذلَوا الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَومِ الآخِرِ وَلَا يُحرّمُونَ مَا حرّمَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحقّ مِنَ الّذِينَ أُوذوا الْكِذابَ حذى يُعْطُوا الْجزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ.

"যাদের প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনে না এবং শেষ দিনেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিয্‌য়া দেয়।"[১১০০] উপরোক্ত আয়াতে ততদিন পর্যন্ত ক্বিতাল জারী রাখার আদেশ করা হয়েছে যতদিন না কাফেররা অবনত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে। যদি ক্বিতালের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনী অনুমতি অর্জনই হত তবে বলা হত, "যাবত না তারা তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে"। কিন্তু জিযিয়া ওয়াজিব করা এবং এর পাশাপাশি তাদের অবনত হওয়ার উল্লেখ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তাদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করাই আসল উদ্দেশ্য যাতে কুফরের রাজনৈতিক প্রভূত্বের ভীতির যে পর্দায় মনমানস আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা উন্মোচিত হয় অতঃপর মানুষের পক্ষে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি স্বাধীন ও মুক্ত মনে চিন্তা করার সুযোগ ঘটে। ইমাম রাযী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলে. 'জিযিয়ার উদ্দেশ্য কাফেরকে কুফরীর হালতে বাকী রাখা নয় বরং উদ্দেশ্য হল তাকে বাঁচিয়ে রেখে কিছু দিন সময় দেওয়া, যে সময়ের মধ্যে তার ব্যাপারে এই আশা হবে যে, সে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করে কুফর থেকে ইসলামের দিকে আসবে---। অতএব যখন কাফেরকে কিছু দিন সময় দেওয়া হবে এবং সে ইসলামের প্রভাব দেখবে, তার সত্যতার দলীলসমূহ শুনবে এবং কুফরের লাঞ্ছনা দেখবে তখন এইসব বিষয় তাকে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। বস্তুত জিযিয়া বিধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এই।'[১১০১]

[১০৯৮]. মাওলানা তাকী উসমানী, ফিকহী মাকালাত, জিহাদ ইক্বদামী ইয়া দিফায়ী? (ঢাকা, মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৪ খ্রি.) খ. ৩ পৃ. ২৮৮-২৮৯, ৩০৩

[১০৯৯]. মাওলানা তাকী উসমানী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ.২৮৭-৩০৪

[১১০০]. আল কুরআন, ৯:২৯

[১১০১]. ইমাম রাযী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১৬, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় যে বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে তা হল, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে বা সাহাবায়ে কিরামের যুগে কোথাও কি একটি নযীরও এমন পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বা সাহাবায়ে কিরাম কোন রাষ্ট্রে জিহাদের পূর্বে কোন তাবলীগী মিশন পাঠিয়েছেন এবং অপেক্ষা করে দেখেছেন যে, তারা তাবলীগী কাজ কর্মের অনুমতি দেয় কি না? অতঃপর তাবলীগী কাজের অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানানোর ক্ষেত্রেই শুধু জিহাদ করেছেন? বলা বাহুল্য এমন কখনো হয়নি। এছাড়া শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভ করাই উদ্দেশ্য ছিলনা। অন্যথায় বহু রক্তক্ষয়ী লড়াই শুধু এই এক শর্ত দিয়েই বন্ধ করা সম্ভবপর হত যে, মুসলমানদের তাবলীগের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু অন্তত অধমের সীমাবদ্ধ অধ্যয়নে পুরো ইসলামী ইতিহাসের কোথাও এমন একটি ঘটনাও নেই যাতে এটুকু সুযোগ চেয়ে লড়াই বন্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ এর পরিবর্তে কাদেসিয়্যার যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ নিজেদের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন তা এই ছিল, 'মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করা।[১১০২]
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وقاذلوهُمْ حذى لَا ذكُونَ فِذنَة ويَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لِلّه
"তাদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত লড়াই কর যখন আর ফিৎনা বিদ্যমান না থাকে এবং যে সময় বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়।"[১১০৩] এই আয়াতের তাফসীরে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) লিখেন, 'দ্বীন অর্থ বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসীর এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত লড়াই জারী রাখা উচিৎ যতক্ষণ না মুসলমানগণ তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায় এবং দ্বীনে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়, যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে পারে।' এই তাফসীরের সারকথা হল, মুসলমানদের ওপর যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনের সাথে জিহাদ ও ক্বিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ না মুসলমানদের উপরে তাদের অত্যাচারের ফিৎনা বন্ধ হয় এবং ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয় এবং এই অবস্থা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে তাই জিহাদের বিধান ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।[১১০৪] মোটকথা, জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনগত অনুমতি লাভ করা নয় বরং কাফেরদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করে মুসলমানদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা, যাতে একদিকে কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস তাদের না হয় এবং অন্যদিকে কাফেরদের প্রতিপত্তিতে ভীত সন্তস্ত্র মানুষ এই মানসিক ভীতি থেকে মুক্ত মনে ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে আগ্রহী হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে এই বিষয়টিও ইসলামের হেফাজতের উদ্দেশ্যই পূর্ণ করে। এ জন্য উলামায়ে কেরাম জিহাদের জন্য হেফাজত এর শব্দ অবলম্বন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যও তাই। মনে রাখতে হবে কুফরের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করা ও ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা হেফাজতে ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ। অতএব এই মৌলিক স্তম্ভ টিকে রাখতে হিফাযত এর আওতা থেকে কোনভাবেই বের করা যায় না।
সর্বজন স্বীকৃত যে, সকল বড় বড় আলেম জিহাদের উদ্দেশ্য এই বিষয়টিকেই সাব্যস্থ করেছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলবী (রহ.) লিখেন, "জিহাদের আদেশ প্রদান করার পিছনে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক মুহুর্তে সকল কাফেরের প্রাণ সংহার করা হবে রবং উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে কর্তৃত্ববান হবে, মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে এবং নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর ইবাদতে সক্ষম হবে। কাফেরদের ব্যাপারে এই আশংকা থাকবে না যে তা দ্বীনের ব্যাপারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। ইসলাম তার দুশমনদের অস্তিত্বের দুশমন নয় বরং তাদের এমন প্রতিপত্তির দুশমন যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য হুমকির কারণ হয়।"[১১০৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وقاذلوهُمْ حذى لَا ذكُونَ فِذنَة ويَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لِلّه.
এ আয়াতে এই ধরণের জিহাদই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে মুসলমানজাতি! তোমরা কাফেরদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই কর, যখন আর কুফরের ফিৎনা বিদ্যমান না থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আয়াতে ফিৎনা বলতে কুফরের শক্তি ও প্রতিপত্তির ফিৎনা উদ্দেশ্য এবং ويَكُونَ الدّينُ لِلّه থেকে

[১১০২]. ইবনে আসীর, কামিল, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ২, পৃ. ১৭৮
[১১০৩]. আল কুরআন, ৮: ৩৯
[১১০৪]. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ২৩৩
[১১০৫]. আল্লামা ইদরীস কান্দলভী, সীরাতে মুস্তফা (ঢাকা, সম্পাদনা পরিষদ, ইফাবা, ২০১০ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৩৮৮

দ্বীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে এসেছে لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ অর্থাৎ দ্বীনের এ পরিমাণ শক্তি ও কর্তৃত্ব অর্জিত হবে যে, কুফরী শক্তির সামনে তার আর পরাস্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকবে না এবং দ্বীন ইসলাম কুফরের ফিৎনা থেকে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে যাবে।[১১০৬] যদি শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভের পর জিহাদের প্রয়োজন বাকী না থাকে তবে তো আজ দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই তাবলীগের অনুমতি আছে। অতএব বলতে হবে এখন আর মুসলমানদের জন্য অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন নেই। বিশ্ববাসীর মন মগজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বসতে থাকুক, তাদেরই নীতিমালা প্রচলিত হতে থাকুক, বিধি-বিধানও তাদের চলুক, তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও মতবাদই প্রচারিত হোক আর
মুসলমানগণ শুধু এই নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকুক যে, ঐসব অমুসলিম দেশে আমাদের মুবাল্লিগগণের প্রবেশাধিকারতো আর বন্ধ হয়নি! এখন প্রশ্ন হয়, যে পৃথিবীতে কুফর তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জয়ভেড়ী বাজিয়ে চলছে সেখানে যদি তাবলীগের অনুমতি প্রদান করা হয় তবে এমন লোক পাওয়া কঠিন হবে, যারা এই তাবলীকেই স্থীর চিত্তে শোনবে এবং এতে চিন্তা ফিকির করবে। যে পরিবেশে রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতার সাহায্যে ইসলাম ও তার শিক্ষার পুরো বিপরীত চিন্তা ভাবনা পূর্ণ শক্তিতে প্রচারিত হচ্ছে এবং এসবের প্রচারের জন্য এমন সব মাধ্যমও ব্যবহৃত হচ্ছে যা মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেখানে তাবলীগের অনুমতি লাভ হলেও তা কোনো ফলদায়ক হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি ইসলাম ও মুসলমানদের এমন শক্তি সামর্থ অর্জিত হয়ে যায় যার মোকাবেলায় কাফেরের শক্তিমত্তা পরাস্ত হয় বা অন্তত তারা ঐ ফিৎনা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয় যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তো সেক্ষেত্রে অমুসলিম রাষ্ট্রসমুহের সাথে নিরাপদ চুক্তি মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখা জিহাদের বিধানের পরিপন্থি নয়। অনুরূপ যে পর্যন্ত কুফরের প্রতিপত্তি নির্মূল শক্তি অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নিরাপদ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াও নিঃসন্দেহে বৈধ। মোটকথা অমুসলিমদের সাথে শান্তি চুক্তি দুই অবস্থায় হতে পারে-
ক. যে সব রাষ্ট্রের শক্তি মুসলমানদের শক্তির জন্য বিপজ্জনক নয় তাদের সাথে সন্ধিমূলক ও নিরাপত্তা চুক্তি করা যেতে পারে যাবৎ না তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়ায়।
খ. মুসলমনাদের কাছে সশস্ত্র জিহাদের সামর্থ না থাকলে সামর্থ অর্জিত হওয়া পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ থাকা যেতে পারে।[১১০৭]

পঞ্চমত : জিহাদের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও এর বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সংশয়মুক্ত হওয়া। এ জন্য যে, জিহাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলমী ইসলাহী আন্তর্জাতিক সংশোধনমূলক দায়িত্ব। জিহাদের ফরযিয়্যাত এখনও বাকী আছে, কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে এবং তা আল্লাহ ও তার রাসুলের নিকটে অতি পছন্দনীয় আমল সমূহের অন্যতম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "বলুন, 'তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আপনগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না।[১১০৮] অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে ? আর তাহলো তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে! আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য। এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ ! আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন।[১১০৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أَحيَا، ثُمَّ أَقْتَلُ، ثُمَّ أَحيَا، ثُمَّ أَقْتَلُ .

১১০৬. আল্লামা ইদরীস কান্দলভী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৮৬

১১০৭. আল্লামা তাকী উসমানী, ফিকহী মাক্বালাত (ঢাকা, মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৪ খ্রি.) খ. ৩ পৃ. ৩৫১

১১০৮. আল কুরআন, ৯: ২৪

১১০৯. আল কুরআন, ৬১: ১০-১৩

"আমার পছন্দ যে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হব পুনরায় জীবিত হব ও পুনরায় নিহত হব এবং পুনরায় জীবিত হয়ে নিহত হব।[১১১০] মোট কথা, জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত বহু আয়াত এবং সহীহ হাদীসে এর ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকে দুরত্বের কারণে অথবা অন্য কারণে কোন কোন লোককে বলতে শোনা যায় যে, 'যেহেতু তখন ক্বিতাল ছাড়া ক্ষমতার পট পরিবর্তনের অন্য কোন মাধ্যম ছিল না তাই ইসলাম এই পন্থাটিকেই বহাল রেখেছে কিন্তু বর্তমান অবস্থা ভিন্ন' অর্থাৎ এখন রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করে পৃথিবতে ইসলামের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব স্থাপন সম্ভব। অতএব এখন জিহাদের প্রয়োজন নেই। জিহাদের বিধান রহিত হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। এ কথা বলা সমীচীন নয়। কেই তো এই ধারণাও প্রকাশ করছে যে, "যে সরকার তার নিজেদের দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে তাদের সাথে আক্রমণাত্মক জিহাদ করা উচিৎ নয়। বিশেষত বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে, যখন সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়, কিন্তু যখন রাজ্যজয়ের সাধারণ প্রচলন ছিল এবং এ বিষয়টি রাজ রাজাধিরাজের কীর্তি ও গুণাবলীর মধ্যে পরিগণিত হত তখনকার কথা ভিন্ন। যেসব আক্রমণাত্মক জিহাদের ঘটনাবলীতে ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ তা সবই ঐ সময়কার।"

এই দুইটি মত যে ভ্রান্ত এবং কুরআন ও সুন্নাহর জিহাদ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী এবং শরীয়তের বিধানাবলীর পরিপন্থি তা একেবারেই স্পষ্ট কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, এই দুই মতের মধ্যে অজান্তেই ইসলামী শরীয়তের প্রতি কত বড় অপবাদ আরোপ করা হল যে, একটি সাময়িক বা পারিপার্শিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট বিধানকে ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য চলমান একটি বিধান বানিয়ে দিয়েছে এবং তার এত গুরুত্ব বর্ণনা করেছে এবং এর প্রতি এত বেশী উদ্বুদ্ধ করেছে যদ্দরুন তা একটি সাময়িক বিধান নয় বরং চিরন্তন বিধান হওয়া সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয় মতটিতো আরো বেশী ভয়াবহ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাক্বী উসমানী এর ভাষায়, "যদি এই মতটি ঠিক করে নেওয়া হয় তবে এর অর্থ এই হবে যে, কোন বস্তু ভালো বা মন্দ হওয়ার জন্য ইসলামের নিজস্ব কোন মাপকাঠি নেই। যদি কোন যুগে কোন একটি মন্দ বিষয়কেও ভালো ও কীর্তিমুলক গণনা করা হয় তবে ইসলাম ও তার অনুসরণ করে এবং যুগে মানুষ একে মন্দ মনে করে ইসলামও সেখানে থেকে যায়।

এখন প্রশ্ন হল, আক্রমণাত্মক জিহাদ যদি ভালো হয় তবে মুসলমান এ থেকে কেন বিরত থাকবে, আজকাল সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়? আর যদি বিষয়টি আসলেই ভালো না হয় তবে বিগত সময়ে ইসলাম কেন এ কাজ থেকে বাধা প্রদান করেনি! ইসলাম কি শুধু এজন্যই একে অবলম্বন করেছিল যে, তা রাজা বাদশার কীর্তির মধ্যে পরিগণিত হত? তবে না, ইসলামের ইতিহাসে আক্রমণাত্মক জিহাদসমূহের এই ব্যাখা নিতান্তই ভুল ও বাস্তববিরোধী। বাস্তব কথা হল, কুফরের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য ঐ যুগেও জিহাদ করা হয়েছে যখন তা রাজাধিরাজের কীর্তি হিসেবে পরিগণিত হত কিন্তু তা এজন্য হয়নি যে, ঐ যুগে তার ব্যাপক প্রচলন ছিল বরং এ জন্য ছিল যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষেই উপযোগী ও ভালো। অন্যথায় রাজা বাদশার বীরত্ব প্রদর্শনের মধ্যে তো এও পরিগণিত হত যে, তারা জয়ের নেশায় চোর হয়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরও রেহাই দিত না কিন্তু ব্যাপক প্রচলনের কারণে এসব বিষয়কে ইসলাম কখনো সমর্থন করেনি বরং লড়াইয়ের এমন সব বিধি-নিষেধ ও সীমা- রেখা নির্ধারণ করেছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তা অনুসরণ করে দেখিয়েছে যা তখনকার রাজা বাদশার কল্পনারও অতীত ছিল বরং তা ঐসব নিপীড়িত মানবশ্রেণীর জন্যও অকল্পনীয় ছিল যারা শুধু রাজা বাদশার এ জাতীয় জুলুম অত্যাচারের কেবল অভ্যস্তই ছিল না বরং এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। যে উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক জিহাদ অতীতে জায়েয ছিল ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে আজও তা জায়েয এবং শুধু এজন্য এই বৈধতাকে আড়াল করার কোন অর্থ নেই যে, এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার ও উৎপাদনকারী শান্তি প্রিয় ? ব্যক্তিবর্গ একে নিতান্তই অপছন্দ করেন এবং এতে ঐসব মহান ব্যক্তিবর্গের নাক মুখ কুঁচকে যায় তাঁদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির শরীর রক্তে রঞ্জিত। মূলতঃ এই বিষয়টিও কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তিরই অবাঞ্চিত ফলাফল যে, মানুষ ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠি ও এই বিশ্বব্যাপী প্রচারণাকেই বানিয়ে নিয়েছে যা দিনকে রাত ও রাতকে দিন করে মানুষের মন মগজে স্থাপন করছে এবং

[১১১০]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ১০, সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ১৩৩

শুধু অমুসলিমই নয় খোদ মুসলমানরাও এই প্রচারণায় নতজানু হয়ে নিজেদের দ্বীন ও ধর্মের বিধানাবলীর ব্যাপারে ওজর-আপত্তির পথ অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছে। যদি অন্যায় অসত্যের এই প্রতিপত্তিকে ধ্বংশ করা সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞায় আসে তবে এ জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা পেতে গ্রহণ করা উচিৎ। এমন হওয়া উচিতৎ নয় যে, ঐসব অভিযোগকারীদের সামনে হাত জোড় করে দাড়িয়ে থাকতে হবে এবং বলতে হবে, জি হ্যাঁ জনাব! যখন ব্যক্তি আক্রমণাত্মক জিহাদকে নন্দিত মনে করতো তখন সবাইতো ভালো মনে করতো এবং তা কর্মে রূপায়িত হতো এবং যখন ব্যক্তির লিখনীতে একে মন্দ বলছে এবং শুধুই বলছে তখন সবাই একে নিন্দিত মনে করছে এবং নিজেদের জন্য একে হারাম করে নিচ্ছে। এ জাতীয় চিন্তারীতির সাথে একমত হওয়া কখনো সম্ভব নয়।[১১১১] মোটকথা, জিহাদের উভয় প্রকার, ইক্বদামী ও দিফায়ী ইসলামের চিরন্তন ফরযসমূহের অন্যতম। যতদিন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কুফর ও শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তির ফিৎনা বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত সত্য-ন্যায়ের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের দায়িত্বও অবশ্যপালনীয় থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলে, "আমার প্রেরিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে আমার উম্মতের শেষ ভাগ দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা এবং কোন জালেমের জুলম একে রহিত করবে না।"[১১১২] এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য।

أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে এটা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না"।[১১১৩] মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী শুধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার জন্যই নয় বরং ইসলাম ও ইসলামী নিদর্শনাবলী সংরক্ষণ করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি নির্মূল করাও তাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

প্রত্যেক মুসলিম দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রসংঘকে জিহাদের বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা অপরিহার্য যদি তারা নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আগ্রহী হয় এবং দুনিয়া থেকে জুলুম অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার আশা হৃদয়ে ধারণ করে। এ জাতীয় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা সংঘসমূহকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়েই শেষ নয়। কেননা যদি তাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া না হয় এবং জিহাদের সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা না হয় তবে তাদের আরো কিছু দায়িত্ব বাকী থেকে যায়।

বাতিল দল-উপদলসমূহের জিহাদ বা কিতাল বিষয়ক বিভ্রান্তি

খারিজী, বাতিনী ও অন্যান্যদের ভুলভ্রান্তির একটি মৌলিক বিষয় জিহাদ। জিহাদ বিষয়ক ভুলভ্রান্তিগুলির কয়েকটি দিক রয়েছে-

জিহাদ শব্দের অতি-ব্যবহার

জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম। আর ইসলামী শরীয়তের পারিভাষায় জিহাদ অর্থ কিতাল বা রাষ্ট্র ও ইসলামী দাওয়াতের নিরাপত্তার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। আল্লাহর নির্দেশ ও হুকুম-আহকাম পালনের সকল প্রচেষ্টাকেই শাব্দিক অর্থে জিহাদ বলা যায়, কিন্তু আভিধানিক অর্থের অতিব্যবহার পারিভাষিক অর্থের বিকৃতির সুযোগ করে দেয়। যেমন সালাত এর আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা। যে কোনো প্রার্থনাকেই সালাত বলা যায় এবং কুরাআন-হাদীসে কখনো কখনো তা বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় সালাত একটি নির্দিষ্ট ইবাদাতের নাম। সকল প্রার্থনাকেই সালাত বলে নামকরণ করলে তা দ্বিমুখি বিভ্রান্তির জন্ম দিতে

[১১১১]. আল্লামা তাকী উসমানী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩ পৃ. ৩০২-৩০৫

[১১১২]. সুনান আবু দাউদ, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১, পৃ. ৩৪৩

[১১১৩]. আল কুরআন, ৮: ৬০

পারে। প্রথমত কেউ হয়ত যে কোনোভাবে প্রার্থনা করেই সালাত কায়েম হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করবেন। দ্বিতীয়ত, কেউ সালাতের ফযীলত বা আহকামের আয়াত ও হাদীসগুলি সকল প্রার্থনার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করবেন। কেউ যদি নিজের জীবনে দীন পালন, আত্মশুদ্ধির চেষ্টা, ইলম শিক্ষা, হালাল উপার্জন, আল্লাহর পথে দাওয়াত, অত্যাচারীর সামনে সত্য-ভাষণ, হজ্জ পালন বা দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলেন তবে তা দূষণীয় নয়, বরং তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এগুলিকে পারিভাষিক জিহাদ মনে করা হলে তা বহুমুখি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে জিহাদের ফযীলত ও আহকামসমূহ এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রবণতা দেখা দেবে।

কোনো কোনো আধুনিক গবেষক ও চিন্তাবিদ ইসলামী রাজনীতি বা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব বুঝাতে জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। জামাআতুল মুসলিমীন এরূপ ব্যবহারকে তাদের বিভ্রান্তির সমর্থনে ব্যবহার করেছে। ইসলামী রাজনীতি বা ইসলামী আন্দোলন এর মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠা নামে মুমিন যে ইবাদতটি পালন করেন সে ইবাদতটির পারিভাষিক নাম হলো আল্লাহর পথে দাওয়াত বা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ। এ কর্মকে জিহাদ বলায় অসুবিধা নেই। তবে এ কর্মই কুরআন-হাদীস নির্দেশিত পারিভাষিক জিহাদ বলে মনে করার মধ্যে রয়েছে সমূহ বিপদ। ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অর্থই কিতাল বা যুদ্ধ। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইমামগণের ব্যবহারে এবং ফিকহ, তাফসীর বা ইসলামী জ্ঞানের যে কোনো প্রাচীন গ্রন্থে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ শব্দের পারিভাষিক অর্থ আল্লাহর পথে জিহাদ। বর্তমানে অনেক আধুনিক গবেষক ইসলামী রাজনীতি বা ইসলামী আন্দোলন কে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করেন এবং একেই ইসলামী শরীয়তের পারিভাষিক জিহাদ বলে গণ্য করেন। অনেকে পারিভাষিকভাবে জিহাদ ও কিতাল এর মধ্যে পার্থক্য করেন। কিতালকে যুদ্ধ এবং জিহাদকে আন্দোলন বলে মনে করেন। এরূপ মতামত গবেষণা বা ব্যাখ্যা হিসেবে কেউ পেশ করতে পারেন। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের পারিভাষা বলে গণ্য করার কারণে এবং রাজনীতি, দাওয়াত, আন্দোলন ইত্যাদিকে সদা-সর্বদা জিহাদ বলে আখ্যায়িত করার কারণে ত্রিমুখি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে-

প্রথমত: দাওয়াত, রাজনীতি, আন্দোলন ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত মানুষ শরীয়ত নিদের্শিত জিহাদ ইবাদতটি পালন করছেন বলে ধারণা করছেন এবং হাদীসে ও ফিকহে জিহাদের যে সকল বিধান, সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করা হয়েছে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও পালনীয় বলে মনে করছেন।

দ্বিতীয়ত: প্রচলিত রাজনীতি, আন্দোলন বা দলবদ্ধ দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে যারা ব্যক্তিগতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে ওয়ায, লিখনী, শিক্ষাদান ইত্যাদি পদ্ধতিতে আল্লাহর পথে দাওয়াত বা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের ইবাদতটি পালন করছেন তারা শরীয়তের পারিভাষিক জিহাদ নামক ইবাদতটি পালন করছেন না বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃতীয়ত: প্রচলিত রাজনীতি, আন্দোলন বা দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে শরীয়তের পারিভাষিক জিহাদ বলে বিশ্বাস করে এ জন্য বলপ্রয়োগ, অস্ত্রধারণ ও অনুরূপ বিধানকে বৈধ বলে মনে করা হচ্ছে।[১১১৪] বিশেষত তৃতীয় বিভ্রান্তিটি উগ্রতার জন্ম দিচ্ছে। যে সকল আলিম বা গবেষক এ সকল কর্মকে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করছেন তাঁরা মূলত এগুলির গুরুত্ব বুঝাতে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আভিধানিক অর্থে তা করছেন। কোনো আলিম যখন দাওয়াত, দ্বীন প্রতিষ্ঠা, আন্দোলন, রাজনীতি, মিছিল ইত্যাদিকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেন, তখন তিনি বুঝাতে দেন না যে, এ কর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ করতে হবে, অথবা এর বিরোধীদেরকে আঘাত করতে হবে। কিন্তু তিনি না বুঝালেও শ্রোতা বা সংশ্লিষ্ট অনেকেই তা বুঝে ফেলেন। জামাআতুল মুসলিমীন ও উগ্রতায় লিপ্ত অন্যান্য মানুষের লিখনি ও বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সমকালীন আলিম ও গবেষকদের এ সকল বক্তব্য থেকে তারা এরূপই বুঝেছেন। এ সকল বক্তব্য থেকে তারা বুঝেছেন যে, মানুষদেরকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসার ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো জিহাদ। আর জিহাদ হলে তো মারামারি, অস্ত্রধারণ, যুদ্ধ ও হত্যা হবেই। বস্তুত, উগ্রতার ভিত্তি দুটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত-

প্রথমত: জিহাদই ইসলাম প্রচার বা প্রতিষ্ঠার পথ বলে দাবি করা।

[১১১৪] . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান (ঝিনাইদহ, আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০১১ খ্রি.) পৃ. ৪৬০-৪৭৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ জিহাদের জন্য অস্ত্রধারণ, হত্যা, মৃত্যুবরণ ইত্যাদিকে বৈধ বা আবশ্যকীয় বলে দাবি করা। কুরআন-হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রমাণ করা তাঁদের জন্য খুবই সহজ বিষয়। এজন্য তাঁদের বিভ্রান্তির মূল উৎস প্রথম বিষয়ের মধ্যে নিহিত। এখানে দেখা যায় যে, পারিভাষিক জিহাদ কখনোই ইসলাম, ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। জিহাদ প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র, নাগরিক ও দীনী দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষার মাধ্যম। কিন্তু জিহাদ শব্দের অতি-ব্যবহারে ফলে অনেকের মনেই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, জিহাদই দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ বা একমাত্র পথ এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা সকলের জন্য ফরয। জঙ্গিদের প্রচারকর্ম এতে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তারা কিছু সরলপ্রাণ আবেগী যুবককে সহজেই একথা বুঝাতে পারছে যে, জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম ফরয, জিহাদ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না। আর জিহাদ মানেই তো অস্ত্র, যুদ্ধ ও হত্যা, কাজেই এখনই আমাদের সে কাজে নেমে পড়তে হবে। এভাবেই গুরুত্বারোপের জন্য একটি পরিভাষার আভিধানিক অর্থের অতিব্যহার বিভিন্ন বিভ্রান্তির পথ উন্মুক্ত করছে। পক্ষান্তরে দীন প্রতিষ্ঠার এ সকল কর্মকে আল্লাহর পথে দাওয়াত নামে আখ্যায়িত করলে একদিকে যেমন সঠিক ইসলামী পরিভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে উপর্যুক্ত ত্রিবিধ অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তির পথ রুদ্ধ হবে, তেমনি অন্যদিকে এ সকল ইবাদত পালনের সঠিক সুন্নাত ও ইসলামী আদব জানা সহজ হবে। কারণ দীন প্রতিষ্ঠার এ সকল কর্মকে সর্বদা জিহাদ বলে আখ্যায়িত করার ফলে আগ্রহী মুমিন এ সকল কর্মের ইসলামী নির্দেশনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের সুন্নাত ও ইসলামী আদব জানার জন্য হাদীস ও ফিকহের জিহাদ অধ্যায় অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেন, আল্লাহর পথে দাওয়াত বা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ অধ্যায় অধ্যয়নের কথা তার মনে আসে না।

দীনী দাওয়াতের এ সকল ক্ষেত্রে যারা কর্মরত এবং এ সকল বিষয়ে যারা গবেষণা করছেন, তারা এ সকল কর্মকা-ের পারিভাষিক পরিচয় নিশ্চিতকরবেন। এগুলিকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বা আল্লাহর পথে দাওয়াত নামে আখ্যায়িত করলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী দাওয়াতের আবেগ ও অনুপ্রেরণাকে বিপথগামী বা সহিংসতায় পর্যবসিত করার একটি বড় পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বস্তুত নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার আবেগে প্রাচীন ও আধুনিক খারিজীগণ জিহাদ নামক ইবাদতকে ফরযে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয বলে দাবি করেছেন। উপরন্তু তারা জিহাদ কে মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় ফরয বলে দাবি করেছে। প্রাচীন খারিজীগণের মতামত বর্ণনায় একজন গবেষক লিখেছেন-

"The second principle that flowed from their aggressive idealism was militancy, or jihād, which the Khawārij considered to be among the cardinal principles, or pillars, of Islām. Contrary to the orthodox view, they interpreted the Qurānic command about 'enjoining good and forbidding evil' to mean the vindication of truth through the sword"... "To these five, the Khawārij sect added a sixth pillar, the jihād". "খারিজীদের আগ্রাসী আদর্শবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল জিহাদ। খারিজীগণ জিহাদকে ইসলামের মূল ভিত্তি বলে মনে করে। সাধারণ মুসলিমদের মতের বিপরীতে খারিজীগণ কুরআন নির্দেশিত সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ বলতে তরবারীর জোরে সত্য প্রতিষ্ঠা বুঝাতো।... তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সাথে জিহাদকে ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে যুক্ত করে...।"[১১১৫]

আবেগী খারিজীগণ সর্বদা জিহাদের অতুলনীয় সাওয়াব ও গুরুত্ব বিষয়ক আয়াতগুলিকে তাদের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করত। তাদের উদ্ধৃত আয়াত ও হাদীস জিহাদের গুরুত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু কখনোই তাকে সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয বলে প্রমাণ করে না। প্রকৃত কথা হল, ইসলামে মুসলিমের উপর অনেক কর্ম ফরয করা হয়েছে। সকল ফরয কর্মই গুরত্বপূর্ণ। তবে সেগুলির মধ্যে কোনোটির চেয়ে কোনোটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গুরুত্বের কম বেশি সাধারণভাবে সকলের জন্য হতে পারে আবার ব্যক্তিগত অবস্থার কারণে হতে পারে। সর্বাবস্থায় গুরুত্বের কমবেশি আবেগ বা যুক্তি দিয়ে নয়, বরং সুন্নাতের আলোকে বা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আজীবনের কর্ম, শিক্ষা ও আচরণের মধ্য থেকে বুঝতে হবে। আর কুরআন, হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের আচরিত প্রায়োগিক সুন্নাতের আলোকে জানা

[১১১৫]. Encyclopaedia Britannica, Article: Islam-Khawarij.

যায় যে, জিহাদ সবচেয়ে ফরয নয়, দীনের রুকনও নয় এবং ফরয আইনও নয়। বরং জিহাদ ফরয কিফায়া ইবাদত।

বাতিল ও খারিজীগণের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণ

হাদীসের গ্রন্থগুলিতে সাহাবী-তাবিয়ীগণের সাথে খারিজীগণের বিভিন্ন সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এগুলি থেকে খারিজীগণের মতামত ও তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে নিম্নের বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়-

(১) আরকানে ইসলাম ও এ জাতীয় ইবাদতই মুমিনের মূল দায়িত্ব। এগুলি উদ্দিষ্ট ইবাদত বা এগুলি পালন করাই মুমিন জীবনের উদ্দেশ্য। এগুলি পালনের আবশ্যকতা কখনোই কমে না বা থামে না। পক্ষান্তরে জিহাদ উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়; বরং উদ্দিষ্ট ইবাদত পালনের অধিকার রক্ষার জন্যই জিহাদ। এ অধিকার বিদ্যমান থাকলে জিহাদের আবশ্যকতা থাকে না।

(২) ফিতনা দূরীকরণ জিহাদের উদ্দেশ্য। তবে ফিতনা দূরীকরণ বলতে সমাজের সকল অন্যায়, অনাচার, কুফর, শিরক ইত্যাদি দূর করা নয়, বরং মুমিনকে জোরপূর্বক কুফরে লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি দূরীকরণ বা দীনপালন ও দীনী দাওয়াতের স্বাধীনতা রক্ষা করা। এরূপ পরিস্থিতি ছাড়া জিহাদ মূলত ফিতনা দূর করে না, বরং ফিতনা সৃষ্টি করে।

(৩) জিহাদ করা আল্লাহর নির্দেশ এবং মানুষ হত্যা করা আল্লাহর নিষেধ। নিষেধের পাল্লাকে ভারী রাখতে হবে এবং হারামে নিপতিত হওয়ার ভয় থাকলে জিহাদ পরিত্যাগ করতে হবে।

(৪) কাফির রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র, নাগরিক ও দীনী দাওয়াতের স্বাধীনতা ও বিজয় সংরক্ষণই মূলত জিহাদ। মুসলিম ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা হত্যা জিহাদ নয়। যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখে স্বীকার করে তাকে জিহাদের নামে হত্যা করা পারলৌকিক ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এ প্রসঙ্গে খারিজীদের সাথে ইবনু উমার (রা.) এর কিছু কথোপকথন বাস্তব প্রমাণ। খারিজীগণের দাবি ছিল, মানুষ যখন অন্যায় অনাচারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন জিহাদ বাদ দিয়ে হজ্জ-উমরায় রত থাকা আপত্তিকর। এর উত্তরে ইবনু উমার (রা,) বলেন যে, ফযীলত, পুরস্কার ইত্যাদি কখনোই কোনো ইবাদতের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করে না, বরং এ জন্য কুরআন বা হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রয়োজন। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে জানা যায় যে, জিহাদ আরকানে ইসলামের মত কোনো ফরয ইবাদত নয়। যেখানে জিহাদের নামে মুসলিম হত্যা বা ভাতৃহত্যার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে ফযীলত অর্জনের চেয়ে হারাম বর্জন মুমিনের দায়িত্ব। পক্ষান্তরে হজ্জ ইসলামের পাঁচ রুকনের একটি, কাজেই সর্বাবস্থায় এ ইবাদত মুমিন পালন করতে পারে।

অন্য হাদীসে দু'ব্যক্তি ইবনু উমার (রা.) এর কাছে এসে বলেন, মানুষেরা (অন্যায় অনাচার ও পাপে) ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সাহাবী, আপনি কেন বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন না? তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন এ-ই আমাকে যুদ্ধে বেরোতে নিষেধ করছে। তারা বলল, আল্লাহ কি বলেননি, এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয় ? তখন তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম এবং ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যেন ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয়।"[১১১৬] এখানেও আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্টভাবে জানা যায়-

---

[১১১৬]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৮, পৃ. ১৮৪, ৩১০

প্রথমত : জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করেছেন। জিহাদের আদেশ করা হলেও তার পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষের রক্তপাত ভয়ঙ্করতম হারাম। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি দায়িত্ব পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না।
দ্বিতীয়ত : তিনি জিহাদ-কিতাল ও ফিতনা বা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সাহাবীগণ যে কিতাল করেছিলেন তা ছিল ফিতনারোধ করতে, আর খারিজীগণ যে কিতাল করছে তা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ উল্লেখ করেননি। তবে এখানে দেখা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও ফিতনা বা সন্ত্রাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল, জিহাদ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ যা শুধু শত্রুরা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং ফিতনা-সন্ত্রাস ব্যক্তি বা গোষ্ঠি পরিচালিত যুদ্ধ যা সাধারণত যোদ্ধা-অযোদ্ধা সকলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বেই জিহাদ-কিতাল পরিচালিত হবে। খারিজীগণ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পর্যায়ে নিয়ে এসে সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। বস্তুত, হত্যা, বিচার, শক্তিপ্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় যদি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তা ফিতনার মহাদ্বার উন্মোচন করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই অন্য কোনো না কোনো মানুষের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী ও অপরাধী। প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি নিজের মত অনুসারে বিচার, যুদ্ধ ও শক্তিপ্রয়োগ করতে থাকে তবে তার চেয়ে বড় ফিতনা আর কিছুই হতে পারে না।
তাবিয়ী নাফি বলেন, এক খারিজী নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) নিকট এসে বলেন, হে আবূ আব্দুর রাহমান, কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন? তখন ইবনু উমার (রা.) বলেন, ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল **(সা.) এর** প্রতি ঈমান, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত ও বাইতুল্লাহর হজ্জ। উক্ত ব্যক্তি বলেন, হে আবূ আব্দুর রাহমান, আল্লাহ তাঁর কিতাবে কী বলেছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বলেছেন: 'মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর সীমলজ্ঘন করলে তোমরা সীমালজ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।' (তিনি আরো বলেছেন): 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়।'[১১১৭] তখন ইবনু উমার (রা.) বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর যুগে তা করেছিলাম। ইসলাম দুর্বল ও স্বল্প ছিল, ফলে মুসলিম ব্যক্তি তার দীনের কারণে ফিতনাগ্রস্থ হতেন। কাফিররা তাকে হত্যা করত অথবা তার উপর অত্যাচার করত। যখন ইসলাম বিস্তৃত হয়ে গেল তখন তো আর ফিতনা থাকল না।"[১১১৮] এখানেও খারিজীগণ কুরআনের দু-একটি আয়াতের ওপর ভিত্তি করে ইবনু উমার (রা.) এর জিহাদ পরিত্যাগ করে হজ্জ উমরা পালনকে আপত্তিকর বলে দাবি করছে। ইবনু উমার (রা.) তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝা যায়-
প্রথমত : শুধু ফযীলত, নির্দেশনা বা প্রেরণামূলক আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে কোনো ইবাদতের গুরুত্ব নির্ধারণ করা যায় না। কুরআন কারীম ও রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সামগ্রিক শিক্ষার আলোকেই তা নির্ধারণ করতে হবে।
দ্বিতীয়ত : কুরআন কারীমে সালাত, সিয়াম, যাকাত, জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি অনেক ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এগুলির মধ্যে কোন্‌টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি ব্যক্তিগত এবং কোনটি কোনটি সামষ্টিক, কোনটি রাষ্ট্রীয়, কোন্‌টি সকলের জন্য সার্বক্ষণিক পালনীয়, কোন্‌টি বিশেষ অবস্থায় পালনীয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। এ সকল কুরআনী নিদেশ যিনি গ্রহন করেছেন, তাঁর বাস্তব প্রয়োগ ও নির্দেশনা থেকেই এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ থেকে জানা যায় যে, কুরআনে

[১১১৭]. আল কুরআন, ২: ১৯৩
[১১১৮]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৮, পৃ. ১৮৪, ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত সকল নির্দেশের মধ্যে এ পাঁচটি কর্ম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপর্ণ এবং এগুলির ওপরেই দীনের ভিত্তি। জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইবাদতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে সেগুলির পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থার আলোকে যে ছাড় বা সুযোগ আছে তা আরকানে ইসলামের ক্ষেত্রে নেই। তাঁরা বুঝতেন যে, জিহাদ আরকানে ইসলামের মত ব্যক্তিগত ফরয ইবাদত নয় যে, তা পরিত্যগ করলে গোনাহ হবে। বরং বিভিন্ন হাদীসে শুধুমাত্র আরকানে ইসলাম পালনকারীকে পূর্ণ মুসলিম ও জান্নাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১১৯] অন্যান্য হাদীসে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে জিহাদ পরিত্যাগকারী আরকান পালনকারী মুমিনেরও প্রশংসা করা হয়েছে।[১১২০]। অনেক হাদীসে বিশৃঙ্খলা, ফিতনা বা হানাহানির সময়ে, আদেশ, নিষেধ, দাওয়াত ও জিহাদ পরিত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[১১২১] অন্যত্র পিতামাতার খেদমত বা আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১১২২] ইবনু উমার (রা.) নিজেও কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। তবে জিহাদের অনেক শর্ত রয়েছে, সেগুলির অন্যতম হল, জিহাদ শুধু যুদ্ধরত কাফিরের বিরুদ্ধেই হবে। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মুসলিম বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যদিও বৈধ করা হয়েছে, কিন্তু ইবনু উমার (রা.) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবী এক্ষেত্রে দূরে থাকাই পছন্দ করতেন, কারণ ভুল জিহাদে কোনো মুসলিমকে হত্যা করার চেয়ে, সঠিক জিহাদ থেকে বিরত থাকা উত্তম।

তৃতীয়ত : তাঁরা ফিতনা দূরীকরণ ও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মুসলিমের দীন পালনের নিরাপত্তাটিই মূল বলে মনে করছেন। মুসলিম যতক্ষণ দীন পালনের নিরাপত্তা ভোগ করছেন ততক্ষণ ফিতনা দূরীভূত করার নামে যুদ্ধ করার সুযোগ নেই। বরং দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

চতুর্থত, তিনি আদেশ ও নিষেধের মধ্যে তুলনা করেছেন। খারিজীদের দাবি ছিল, আল্লাহ ফিতনা দূর করার জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষত মুমিনদের পারস্পারিক যুদ্ধের সময় জালিম মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। এরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশের পরেও যুদ্ধ না করে বসে থাকা কোনো মুমিনের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হয়? ইবনু উমার (রা.) বুঝালেন যে, এখানে আদেশের বিপরীতে নিষেধ রয়েছে, আর এক্ষেত্রে নিষেধের পাল্লাই ভারী থাকবে। এ সকল আয়াতে যেমন কিতালের নির্দেশ দেওয়া তেমনি অন্য আয়াতে হত্যার বিষয়ে কঠিনবাভে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

"যে ব্যক্তি কোনো একজন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার প্রতিফল জাহান্নাম, তথায় সে চিরস্থায়ী থাকবে এবং আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভয়ঙ্কর আযাব প্রস্তুত করেছেন।"[১১২৩] বস্তুত কুরআন কারীমে এর চেয়ে কঠিনতর ভাষায় কোনো পাপের শাস্তি বর্ণনা করা হয়নি। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো একজন মুমিনকে হত্যা করার জন্য ৫ পর্যায়ের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যার একটি আরেকটির চেয়ে ভয়ঙ্করতর জাহান্নাম, তথায় চিরস্থায়িত্ব, আল্লাহর ক্রোধ, আল্লাহর অভিশাপ এবং ভয়ঙ্কর শাস্তি। এর বিপরীতে শতভাগ নিশ্চিত ফরয জিহাদ পরিত্যাগ করলে এরূপ বা এর কাছাকাছি কোনো শাস্তির কথা বলা হয়নি। মুমিন হত্যা তো দূরের কথা মুসলিম সমাজে বসবাসরত কোনো অমুসলিম নাগরিক, অথবা শত্রু রাষ্ট্র থেকে আইনানুগ নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিম দেশে আগত অমুসলিম নাগরিককে হত্যা

১১১৯. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১, পৃ. ২৫, ২৭, খ. ২, পৃ. ৫০৬, ৯৫১, খ. ৪, পৃ. ১৭৯৩; সহীহ মুসলিম ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১, পৃ. ৩৯-৪৪

১১২০. সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১৫০৩

১১২১. হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ৩১৫; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহুহ (বৈরূত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.) খ. ২, পৃ. ১০৮; মুহাম্মদ ইবন ঈসা, সুনান আত-তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৫, পৃ. ২৫৭; সুনান আবূ দাউদ, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ১২৪; আবূ আমর উসমান ইবনু সাঈদ দানী (৪৪৪ হি), আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান (রিয়াদ: দারুল 'আসিমাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি.) খ. ২, পৃ. ৩৬৩-৩৭০; মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি.) খ. ৩, পৃ. ২৯৫-২৯৯; ইবনু রাজাব, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫ হি.), জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি.) পৃ. ৩২৩-২৩৪

১১২২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১০৯৪, খ. ৫, পৃ. ২২২৮, সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ১৯৭৫; মুনযিরী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ২১৫-২১৮

১১২৩. আল কুরআন, ৪: ৯৩

করলেও সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করতে পারবে না বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই কোনো মুমিনই জিহাদ, কিতাল বা যুদ্ধের নামে এরূপ কঠিন পাপের মধ্যে নিজেকে নিপতিত করতে পারে না। সাহাবী জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ (৬০ হি.)। একবার খারিজীদের কতিপয় নেতাকে ডেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

يُشَاقِقْ يَشْقُقْ اللهُ عَلَيْهِ يَومَ الْقِيَامَةِ ... ومَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يُحالَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ (كَأَنَّمَا يَذْبَحِ دَجَاجَةً، كُلَّمَا تَقَدَّمَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوابِ الْجَنَّةِ حالَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ)

"যে ব্যক্তি কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করবে আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার জন্য কাঠিন্যের পথ অবলম্বন করবেন। কেউ যদি কোনো মানুষের হাতের তালুতে রাখার মত সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে (যেন যে মুরগী জবাই করছে) তবে সে রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধা হবে। (যখনই সে জান্নাতের কোনো দরজার দিকে অগ্রসর হবে, তখনই ঐ রক্ত তার জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে)। কাজেই যদি কেউ পারে তবে সে যেন এরূপ রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষা করে।"এ কথা শুনে উপস্থিত লোকগুলি খুব ক্রন্দন করতে লাগল। তখন জুনদুব (রা.) বলেন, তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তারা মুক্তি পেয়ে যাবে।.. কিন্তু পরে আবার তারা উগ্রতার পথে ফিরে যায়।[১১২৪] জুনদুব (রা.) দুটি বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন-

ক) উগ্রতার ভয়াবহতা। উগ্রতার দুটি দিক রয়েছে। প্রথম দিক, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে দীন পালনের জন্য নফল-মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ে অতি কষ্টদায়ক রীতি অনুসরণ করা। দ্বিতীয় দিক, অন্য মানুষদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনকে নিজের অন্যতম বোঝা বলে গ্রহণ করা এবং সে জন্য উগ্রতার পথ অবলম্বন করা। দুটি বিষয়ই সুন্নাতের পরিপন্থী কর্ম যা মুমিনের জীবনে দীন পালনকে কঠিন করে তোলে।

খ) তিনি জিহাদের নামে হত্যা বা রক্তপাতের ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সালাত, সিয়াম, যিক্র ইত্যাদি ইবাদতের মত ইবাদত নয় জিহাদ। এ সকল ইবাদত যদি কোনো কারণে ভুল হয় তবে তাতে ইবাদতকারী কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হয় না। পক্ষান্তরে জিহাদ বিচারের মত বান্দার হক জড়িত ইবাদত। এখানে দেখা যায় যে, বিচারকের ভুলে নিরপরাধীর সাজা হওয়ার চেয়ে অপরাধীর বেঁচে যাওয়া বা সাজা কম হওয়া ভাল। অনুরূপভাবে জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করার চেয়ে জিহাদ না করা অনেক ভাল। জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করলে শত পুন্য করেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। পক্ষান্তরে জিহাদ বর্জনের কারণে এরূপ শাস্তি লাভের সম্ভাবনা নেই। এখানে লক্ষণীয় যে, জ্ঞান ও অনুভূতি আসার পরেও তারা উগ্রতা পরিত্যাগ করতে পারল না। এর কারণ সম্ভবত এদের মধ্যে সকলেই সৎ ও আন্তরিক ছিল না। এ সকল সন্ত্রাসী কর্মের মাধ্যমে ক্ষমতা, সম্পদ ও অন্যান্য জাগতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যও অনেকের ছিল। অথবা উগ্রতার উন্মাদনা ও সঙ্গীসাথীদের অপপ্রচার তাদেরকে আবারো বিপথগামী করে। খারিজীগণের বিভ্রান্তি অন্যতম ছিল ঈমানের দাবিদারকে বিভিন্ন যুক্তিতে কাফির বলে গণ্য করে তাকে হত্যা করা। তাদের এ বিষয়ক বিভ্রান্তি অপনোদনের জন্য সাহাবীগণ বিভিন্নভাবে তাদেরকে হত্যার ভয়াবহতা বুঝাতেন। তাঁরা তাদেরকে বুঝাতেন যে, জিহাদের বা যুদ্ধের সকল শর্ত পূরণ হলেও যদি কেউ যুদ্ধের ময়দানে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ।

এ বিষয়ে এক হাদীসে তাবিয়ী সাফওয়ান ইবনু মুহরিয বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের ফিতনার সময়ে সাহাবী জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) এ সকল সংঘাতের বিষয়ে আগ্রহী কতিপয় ব্যক্তিকে ডেকে একত্রিত করে তাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠকারী ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিণতি থেকে সাবধান করার জন্য বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধের মাঠে একজন কাফির সৈনিক দুর্দমনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং মুসলিম বাহিনীর অনেক সৈনিককে হত্যা করে। এক পর্যায়ে উসামা ইবনু যাইদ (রা.) উক্ত কাফির সৈনিককে আক্রমন করেন। তিনি যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন তখন উক্ত কাফির সৈনিক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। উসামা সে অবস্থাতেই তাকে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উসামাকে বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরেও তুমি তাকে কেন হত্যা করলে? তিনি বলেন, লোকটি মুসলিম বাহিনীকে

[১১২৪]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৬, পৃ. ২৬১৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৩, পৃ. ১২৯-১৩০

অনেক কষ্ট দিয়েছে অমুক, অমুককে হত্যা করেছে, আমি যখন তরবারী উঠালাম সে তরবারীর ভয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তুমি তার হৃদয় চিরে দেখে নিলে না কেন, সে ভয়ে বলেছে না স্বেচ্ছায় বলেছে! কেয়ামতের দিন যখন এ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে? কেয়ামতের দিন যখন এ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে? এভাবে তিনি বারবারই বলতে লাগলেন, কেয়ামতের দিন যখন এ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে?[১১২৫] এভাবে বিভিন্ন হাদীসে দেখা যায় যে, সাহাবীগণ ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা ও তাকে হত্যা করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে কঠোরভাবে সাবধান করছেন।

সমাজ পরিবর্তনে সাহাবী ও পরবর্তীদের কর্মধারা

সমাজ-পরিবর্তন, সংস্কার, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ক সমকালীন গবেষণার ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই একটি বিশেষ ভ্রান্ত ও ভুলের মধ্যে নিপতিত হন। তা হলো, তারা শূন্য থেকে শুরুর বিষয়ে চিন্তা করেন। তারা ধারণা করেন যে, ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র বলতে কিছুই বিদ্যমান নেই; কাজেই আমাদেরকে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেমন একটি কাফির সমাজে দাওয়াত দিয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আমাদেরকেও তেমনি একটি কাফির সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে। এ সকল চিন্তার ভিত্তি আরেকটি ভুলের ওপর, তা হলো পাপের কারণে মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ রাষ্ট্রকে অমুসলিম বলে গণ্য করা। জেনে বা না-জেনে অসতর্কভাবে এ ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামী দীন, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিতরূপে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন হাদীসে বারংবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এ ব্যবস্থায় বিচ্যুতি আসবে, আবার কিছু ভাল হবে, আবার বিচ্যুতি আসবে। আবার কিছু ভাল হবে। কখনো হবে স্বৈরতান্ত্রিক রাজত্ব এবং কখনো হবে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে জনগণতান্ত্রিক খিলাফাত। এভাবেই চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এ ব্যবস্থা একেবারে বিলীন হবে না, আবার খিলাফাতে রাশেদার মত পরিপূর্ণ ব্যবস্থাও আর আসবে না।

কাজেই বর্তমান সমাজগুলিকে মক্কার কাফির সমাজের মত কল্পনা করার কোনো সুযোগ নেই। বরং এ সকল সমাজ উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতিমী, বাতিনী, কারামিতী, মোগল, তাতার ও অন্যান্য রাষ্ট্র ও সমাজের মত। এক্ষেত্রে দীনী দাওয়াত, পরিবর্তন বা সংস্কারের জন্য আমাদেরকে পূর্ববর্তী সমাজ ও রাষ্ট্রগুলিতে সাহাবী-তাবিয়ী ও পরবর্তী আলিমগণের কর্মধারা পর্যালোচনা করতে হবে। কুরআন-হাদীসের নির্দেশনার আলোকে এবং তাঁদের কর্মধারার ভিত্তিতে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। খিলাফতে রাশিদার পর থেকে সকল ইসলামী রাষ্ট্রেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী বিধিবিধানের কমবেশি লঙ্ঘন ঘটেছে। শাসক নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, মানবাধিকার, আমানত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরা, নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগ ইত্যাদি অগণিত ইসলামী নির্দেশনা কম বা বেশি লঙ্ঘিত হয়েছে এসকল রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকগণ নিজেদেরকেই আইন বা আইনদাতা বলে মনে করেছেন। কুরআনী বিধিবিধান ও আইনকে বেপরোয়াভাবে অবহেলা করেছেন। এমনকি সালাতের সময়ও পদ্ধতিও পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ সকল পরিস্থিতিতে সাহাবীগণ কিভাবে সংস্কার, প্রতিবাদ ও দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেছেন তা আমাদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কারণ কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুধাবনে ও পালনে তাঁরা উম্মাতের অনুকরণীয় আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন:

والسّابِقُونَ الأوَلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ والّذِينَ عُوهُمْ بِإحسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ وأَعَدّ لَهُمْ جَنّاذ ذجْرِي ذحذهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ.

"মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এ মহাসাফল্য।"[১১২৬]

[১১২৫]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৬-৯৭; নাবাবী, শারহু সাহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১০১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ১৯৬, ২০১

[১১২৬]. আল কুরআন, ৯: ১০০

এখানে মুমিনগণকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরগণ ও আনসারগণ এবং (২) তাঁদের পরবর্তীগণ। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, প্রথম ভাগের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেছেন। আর দ্বিতীয় ভাগের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের পূর্বশর্ত প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা। এভাবে আমরা দেখছি যে, অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারগণের অনুসরণ সফলতার মাপকাঠি। তাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিলেন তাদের সমসাময়িক অন্যান্য সাহাবী। এরপর তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মাতকে তাঁর সাহাবীদের জীবন পদ্ধতি ও মতামতের উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

فَإِنّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنّتِي وسُنّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيّينَ الرّاشِدِينَ تَمَسّكُوا بِهَا وعَضّوا عَلَيْهَا بِالنّواجِذِ وإِيّاكُمْ ومُحدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنّ كُلّ مُحدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

‘‘তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের দায়িত্ব আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে, কোনো প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ‘আত এবং সকল বিদ‘আতই বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা।’’[১১২৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে সতর্ক করেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, এক্ষেত্রে কোন্ দল সঠিক বলে গণ্য হবে? তিনি বলেন, ‘‘আমি এবং আমার সাহাবী-সঙ্গীরা বর্তমানে যে মত ও পথের ওপর আছি সেই মত ও পথের ওপর যারা থাকবে তারাই সুপথপ্রাপ্ত।’’[১১২৮] সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী- এ তিন প্রজন্মের মানুষদের ধার্মিকতার প্রশংসা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.) । ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

خَيْرُ أُمّتِي قَرْنِي (الّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ) ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ".

‘‘আমার উম্মতের সবচেয়ে ভালো যুগ আমার যুগ, যে যুগের মানুষের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবীগণ), আর তাদের পরে সবচেয়ে ভালো তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবিয়ীগন), আর এর পর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবি তাবিয়ীগণ)’’ ।[১১২৯]

এ অর্থে আবূ হুরাইরা, বুরাইদা আসলামী, নু’মান ইবনু বাশীর (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে পৃথক পৃথক সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে সাহাবীগণের পরে তিন প্রজন্মের কথা বলা হয়েছে।[১১৩০] এজন্য কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা সঠিক অনুধাবন ও বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে সাহাবীগণের কর্মধারা এবং তৎপরবর্তী তিন প্রজন্মের কর্মধারা বিবেচনা করতে হবে।

উমাইয়া যুগে সাহাবীগণ রাষ্ট্র ও সরকারের এরূপ বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু কখনোই তারা এ কারণে ‘রাষ্ট্র’ বা সরকারকে কাফির বা অনৈসলামিক বলে গণ্য করেন নি। বরং তাঁরা সাধ্যমত এদের অন্যায়ের আপত্তি জ্ঞাপন-সহ এদের আনুগত্য বহাল রেখেছেন। এদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং এদের নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন।

পরবর্তীকালেও কোনো ইমাম, ফকীহ বা আলিম এ কারণে এ সকল রাষ্ট্রকে ‘দারুল হরব’ বা ‘কাফির রাষ্ট্র’ বলে মনে করেন নি। তারা সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও সংহতি বজায় রেখেছেন।[১১৩১] তাঁরা সর্বদা শান্তিপূর্ণ পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে উৎসাহ দিতেন

[১১২৭]. সুনান আত-তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৫, পৃ. ৪৪; সুনান নআবূ দাউদ, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৪, পৃ. ২০০; সুনান ইবনু মাজাহ, ***প্রাগুক্ত,*** খ, ১, পৃ. ১৫ ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি সহীহুহ হাসান

[১১২৮]. সুনান আত- তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৫, পৃ. ২৬; হাকিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১, পৃ. ২১৮; মাকদিসী, আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৭, পৃ. ২৭৮

[১১২৯]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৩, পৃ. ১৩৩৫

[১১৩০]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস, পৃ. ৩০-৩২

[১১৩১]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৬, পৃ. ২৬৩৪, ২৬৫৪; মুসলিম, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ১, পৃ. ৬৯; ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৩৭৯-৩৮৮

এবং জিহাদ বা আদেশ-নিষেধের নামে অস্ত্রধারণ, আইন-লঙ্ঘন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার উস্কানি ইত্যাদি নিষেধ করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের অগণিত নির্দেশনা হাদীসগ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে।[১১৩২]

সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগে কখনো কখনো তাঁদের কেউ কেউ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তবে তা রাষ্ট্রকে কাফির মনে করে বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নয় বরং অন্যান্য পারিপার্শিক কারণে তা ঘটেছে।

জিহাদ বনাম সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা

কুরআন-হাদীসের ওপরে আলোচিত নির্দেশাবলির আলোকে সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও তৎপরবর্তী যুগের আলিমগণ সরকার পরিবর্তনের নামে বিদ্রোহ, আইন অমান্য, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বর্জন নিষিদ্ধ বলে গণ্য করতেন। সাধারণভাবে এ মূলনীতির বিষয়ে সকলে একমত হলেও, প্রথম যুগের কয়েকটি যুদ্ধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এগুলি হলো, সাহাবীগণের যুগে আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে তালহা, যুবাইর, আয়েশা ও মুআবিয়া (রা.)-এর যুদ্ধ, ইয়াযিদের বিরুদ্ধে হুসাইন (রা.)-এর যুদ্ধ এবং মারওয়ান ও আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)–এর যুদ্ধ। তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে আব্দুল মালিকের (খিলাফাত ৬৫-৮৬ হি.) বিরুদ্ধে আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মদ ইবনুল আস'আসের (৮৫ হি.) বিদ্রোহে তাবিয়ী সাঈদ ইবনু জুবাইর (৯৪হি.) ও অন্যান্য কতিপয় তাবিয়ীর অংশগ্রহণ, উমাইয়া খলীফাদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের পৌত্র যাইদ ইবনু আলীর (১২২ হি) যুদ্ধ, এবং আব্বাসী খলীফা মানসূরের বিরুদ্ধে আলী (রা.)-এর বংশধর, নাফস যাকিয়্যাহ নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৯২-১৪৭ হি.)-এর বিদ্রোহ।

লক্ষণীয় যে, সাহাবীগণের যুগের যুদ্ধগুলি কোনোটিই সরকার পরিবর্তনের জন্য বিদ্রোহ ছিল না এবং তারা সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বা কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার পরে সরকার পরিবর্তনের জন্য বিদ্রোহ বা যুদ্ধ করেন নি। মূলত এগুলি ছিল সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকারের আগে তার কাছে শরীয়ত নির্দেশিত দাবি-দাওয়া পেশ করতে যেয়ে অনিচ্ছাকৃত যুদ্ধ, অথবা দুপক্ষেরই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের দাবির কারণে।

আলী (রা.)-এর সাথে তালহা, যুবাইর, আয়েশা ও মুআবিয়া (রা.)-এর যুদ্ধ ছিল উসমান (রা.)–এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। হাদীস ও ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, আলীর বিরোধীরা সরকার অপসারণ বা ক্ষমতা দখলের জন্য যুদ্ধ করেন নি। উপরন্তু উভয় পক্ষ যুদ্ধ বর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল যুদ্ধের সময়ে বিবাদমান পক্ষলি শান্তি আলোচনা করে তা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অতর্কিতে উভয় শিবিরের ওপর হামলা শুরু হয়। উভয় পক্ষই মনে করেন যে, অপরপক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করে আক্রমণ করেছে। এতে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ঐতিহাসিকগণ এ সকল যুদ্ধের মধ্যে ইহূদীদের ষড়যন্ত্র ও দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদের আবেগ ও হটকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সকল কারণে তৎকালীন পরিবেশে তারা যুদ্ধ এড়াতে সক্ষম হন নি।

ইয়াযিদের বিরুদ্ধে হুসাইন (রা.) যুদ্ধাভিযান চালান নি। মুআবিয়া (রা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনয়ন দেন। ৬০ হিজরী সালে তাঁর মৃত্যুর পরে ইয়াযিদ খিলাফতের দাবি করলে তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের অধিকাংশ এলাকার মানুষ তা মেনে নেন। পক্ষান্তরে মদীনার অনেক মানুষ, ইরাকের মানুষ এবং বিশেষত কুফার মানুষেরা তা মানতে অস্বীকার করেন। কুফার মানুষেরা ইমাম হুসাইনকে (রা.) খলীফা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময়ে ইমাম হুসাইন (রা.) মদীনায় অবস্থান করছিলেন। এরপর তিনি মদীনা থেকে মক্কায় আগমন করেন। কুফার লক্ষাধিক মানুষ তাঁকে খলীফা হিসাবে বাইয়াত করে পত্র প্রেরণ করে। তারা দাবি করে যে, সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করতে ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অবিলম্বে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। মদীনা ও মক্কায় অবস্থানরত সাহাবীগণ ও ইমাম হুসাইনের প্রিয়জনেরা তাকে কুফায় যেতে নিষেধ করেন। তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন যে, ইয়াযিদের পক্ষ থেকে বাধা আসলে ইরাকবাসীরা হুসাইনের পিছন থেকে সরে যাবে। সবশেষে হুসাইন (রা.) কুফা গমণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কোনো সেনাবাহিনী

[১১৩২]. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুছান্নাফ, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ৭, পৃ. ৫০৮; দানী, আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু, ***প্রাগুক্ত,*** খ. ২, পৃ. ৩৮৮-৪০৫

নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন নি। তিনি তাঁর পরিবারের ১৯ জন সদস্যসহ প্রায় ৫০ জন সঙ্গী নিয়ে কুফায় রওয়ানা হন। তিনি কুফাবাসীর বাইয়াতের ভিত্তিতে বৈধ শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে কুফা যাচ্ছিলেন।

ইমাম হুসাইনের আগমণের আগেই ইয়াযিদের বাহিনী কুফায় আগমন করে এবং কুফাবাসী হুসাইনের সমর্থন থেকে পিছিয়ে যায়। কুফার একটি বাহিনী কারবালার প্রান্তরে হুসাইনকে (রা.) অবরোধ করে। হুসাইন (রা.) তাদেরকে বলেন, আমি তো যুদ্ধ করতে আসি নি। তোমরা আমাকে ডেকেছ বলেই আমি এসেছি। এখন তোমরা কুফাবাসীরাই তোমাদের বাইয়াত ও প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেছ। তাহলে আমাদেরকে ছেড়ে দাও আমরা মদীনায় ফিরে যাই, অথবা সীমান্তে যেয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, অথবা সরাসরি ইয়াযিদের কাছে যেয়ে তার সাথে বুঝাপড়া করি। কিন্তু কুফার বাহিনী এতে সম্মত না হয়ে তারা হুসাইনের পরিবার ও সাথীদের ওপর হামলা চালায় ও তাঁকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। ৬৪ হিজরী সালে ইয়াযিদের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পরে মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেন। অধিকাংশ মুসলিম তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেন। ৭৩ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ১০ বৎসর তিনি এভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময়ে ইয়াযিদের পরে তার পুত্র মুআবিয়া কয়েক দিনের জন্য এবং তারপর মারওয়ান ইবনু হাকাম এক বৎসর সিরিয়ায় শাসক হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ৬৫ সালে মারওয়ানের মৃত্যুর পরে তার পুত্র আব্দুল মালিক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এ সময়ে ক্ষমতার উভয় দাবিদারের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। একপর্যায়ে ৭৩ হিজরীতে আব্দুল মালিকের বাহিনী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে পরাজিত ও নিহত করতে সক্ষম হয়। এভাবে দেখা যায় যে, ইমাম হুসাইন (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-এর সময়ে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়।

তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগের যুদ্ধগুলিও কোনো সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ বা ধর্মদ্রোহিতার প্রতিবাদে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল না। কখনো পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে, কখনো শাসকের অত্যাচারে হয়ে বাধ্য হয়ে এবং কখনো রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজের অধিকারকে বৈধ মনে করে এ সকল যুদ্ধ হয়েছে। এগুলিতে অতি সামান্য সংখ্যক প্রসিদ্ধ আলিম জড়িত হয়েছেন বা সমর্থন করেছেন। তারা তা করেছেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আন্তরিকতা বা ব্যক্তিগত ইজতিহাদের কারণে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও অধিকাংশ সাহাবী-তাবিয়ীর মত ও কর্মের বিপরীতে এগুলিকে দীনের প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়-

প্রথমত, মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলে সে বিষয়ে কোনো আলিম বা বুজুর্গের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা ইজতিহাদ আর প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গণ্য হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে আলিম-বুজুর্গের কর্ম তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য হয়, ভুল হলে তা অনিচ্ছাকৃত ইজতিহাদী ভুল বলে গণ্য হয় এবং কুরআন বা হাদীসের মূল নির্দেশনার ওপর নির্ভর করতে হয়।[১১৩৩]

দ্বিতীয়ত, সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্মের ক্ষেত্রে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোনো মত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে তার বিপরীতে কতিপয় ব্যক্তির মত বা সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরোধিতার কারণে তাঁদেরকে দায়ী করা হয় না, কারণ মুজতাহিদের অধিকার আছে নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে কর্ম করার। কিন্তু পরবর্তীগণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতটিই প্রামাণ্য বলে গণ্য।

তৃতীয়ত, কোনো বিষয়ে যদি বৈধতা ও নিষিদ্ধতা দুটি বিষয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহলে নিষিদ্ধতার পাল্লাকে ভারি করা হয়। কারণ ইসলামের মূলনীতি অনুসারে বৈধ বা জায়েয কর্ম পালন করার চেয়ে নিষিদ্ধ বা হারাম কর্ম বর্জন করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের প্রতিবাদে আবেগী হয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বর্জন, আইন অমান্য বা বিদ্রোহ একদিকে যেমন কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ, তেমনি তাতে অকারণ রক্তপাত ও উম্মাতের জানমালের ক্ষতি ছাড়া দীনের কোনোরূপ লাভ হয় না। এজন্য তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিষয়টিকে ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম আবূ

[১১৩৩]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯৪-১০৮

হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ (রহ.) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার মূলনীতি ব্যাখ্যা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (৩২১ হি.) বলেন, "আমরা কেবলাপন্থী সকল নেককার ও বদকার মুসলিমের পিছনে সালাত আদায় করা এবং তাদের মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার সালাত আদায় করা বৈধ মনে করি। আমরা তাদের কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে নিশ্চিতসাক্ষ প্রদান করি না। তাদের কারো ওপর কুফরী, শিরক বা নিফাকের সাক্ষ প্রদান করি না, যতক্ষণ না এরূপ কিছু তাদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিবে। তাদের আভ্যন্তরীন বিষয়াদি আমরা আল্লাহ তা'আলার ওপর ছেড়ে দিই। উম্মতে মুহাম্মদ (সা.) -এর কোনো লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ (জিহাদ, হত্যা বা শক্তিপ্রয়োগ) আমরা বৈধ মনে করি না, তবে যদি (রাষ্ট্রীয় বিচার বা জিহাদের মাধ্যমে) কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্তগণ অত্যাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করি না। আমরা তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া বা অভিশাপ প্রদান করি না এবং তাদের আনুগত্যও বর্জন করি না। আমরা তাদের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরয মনে করি যতক্ষণ না তারা কোনো পাপ কর্মের নির্দেশ দেয়। আর তাদের সংশোধন ও সংরক্ষণের জন্য দু'আ করি। মুসলিম শাসক- সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক- তার অধীনে হজ্জ এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটিকে বাতিল বা ব্যাহত করবে না।"[১১৩৪]

কুরআন-সুন্নাহর উপর্যুক্ত নির্দেশাবলির আলোকে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার আলিমগণ মূলত সরকার পরিবর্তনের চেয়ে সরকার সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। সরকারের বা প্রশাসনের অন্যায়, অনাচার, কুরআন-সুন্নাহের বিরোধিতা বা ইসলাম বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস ও আইন-কানুনের প্রতিবাদে তাঁরা রাষ্ট্রের আনুগত্য বজায় রেখে সরকারকে নসীহত, ওয়ায ও দাওয়াত দিতেন এবং জনগণকেও সচেতন করতেন। তবে বিদ্রোহ, হটকারিতা, বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। উমাইয়া যুগ থেকেই বিচ্যুতি শুরু হয়। আর কখনো কখনো এ বিচ্যুতি ছিল ভয়াবহ। ইয়াযিদের যুগ বা ৬০ হিজরী থেকে পরবর্তী প্রায় ৫০ বৎসর বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁরা এ সকল বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করেছেন। সাধ্য ও সুযোগমত প্রতিবাদ করেছেন, নসীহত করেছেন, কিন্তু আবেগতাড়িত হননি।

তারিক ইবনু শিহাব বলেন, "প্রথম যে ব্যক্তি সালাতুল ঈদের খুতবা সালাতের আগে নিয়ে আসে সে মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তখন এক ব্যক্তি তার দিকে দাঁড়িয়ে বলে, খুতবার আগে সালাত। মারওয়ান বলেন: তৎকালীন নিয়ম পরিত্যক্ত হয়েছে। তখন আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এ ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি: 'তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখতে পায় তবে সে যেন তা তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে যেন তার বক্তব্য দিয়ে তা পবিবর্তন করে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন (কামনা) করে, আর এ হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।"'[১১৩৫] উমাইয়া প্রশাসক ওয়ালীদ ইবনু উকবা মদপান করতেন। তিনি একদিন মাতাল অবস্থায় ফজরের সালাতে ইমামতি করেন। তার পিছনে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) জামাতে শরীক ছিলেন। ওয়ালীদ মাতাল অবস্থায় থাকার কারণে ফজরের সালাত চার রাকআত আদায় করেন এবং সালাম ফিরিয়ে বলেন: কম হলো কি? আরও লাগবে? তখন মুসল্লীগণ বলেন আজ সকালে তো আপনি বেশি বেশিই দিচ্ছেন (আপনি ইতোমধ্যেই দু রাকআত বেশি দিয়েছেন! আর লাগবে না!!)।"[১১৩৬] উমাইয়া যুগের এক বিদ্রোহী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন মুখতার সাকাফী (১-৬৭ হি)। ৬৪ হিজরীতে ইয়াযিদের মৃত্যুর পরে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের পক্ষ থেকে তিনি কুফার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কুফায় প্রবেশের পর তিনি নিজেকে আলী (রা.)-এর পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যার খলীফা বলে দাবি করেন এবং ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হন। হুসাইনের হত্যায় জড়িত সকলকেই তিনি হত্যা করেন। এভাবে তিনি কূফা ও পার্শবতী এলাকার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, জিবরাঈল (আ.) তার কাছে ওহী নিয়ে আগমন করেন। তিনি ধর্মদ্রোহিতা, বিভ্রান্তি ও কুফরী মতামতের

[১১৩৪]. আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৫-১৬
[১১৩৫]. সহীহ মুসলিম, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ৬৯
[১১৩৬]. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা (শামিলা), খ. ৩, পৃ. ৪১৪

অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। ৬৭ হিজরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের বাহিনী তাকে পরাজিত ও হত্যা করে। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) এ ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের সাধারণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।[১১৩৭] ইমাম বুখারী বিশিষ্ট তাবিয়ী আব্দুল কারীম বাক্কা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, "আমি দশজন সাহাবীর সঙ্গ পেয়েছি যারা পাপী-জালিম শাসক-প্রশাসকদের পিছনে সালাত আদায় করতেন।"[১১৩৮] সাহাবীগণের পরবর্তী যুগগুলির মধ্যে সরকারের ইসলাম বিরোধিতার সবচেয়ে খারাপ অবস্থাগুলির অন্যতম-
১) আব্বাসী খলীফা মামুন, মু'তাসিম ও ওয়াসিকের সময়ে কুরআনের কিছু বিষয় অস্বীকার করার ও কুরআনকে মাখলূক বলার কুফরী মতবাদ প্রতিষ্ঠা এবং
২) মোগল বাদশাহ আকবারের সময়ে দীন-ই- ইলাহী প্রতিষ্ঠা।
প্রথমত : তৃতীয় হিজরী শতকের শুরুতে আব্বাসী খলীফা মামুন (রাজত্ব ১৯৮-২১৮ হি.) মুতাযিলী ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। গ্রীক দর্শনের ভিত্তিকে কুরআনের নির্দেশনা ব্যাখ্যা করে এ মতবাদ তৈরি করা হয়। এ মতবাদে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন বিশ্বাস কয়েছে। এ সকল বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বা মাখলূক। এছাড়া এ মতবাদে জান্নাতে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করা হয়, যদিও কুরআনে সুস্পষ্টত বলা হয়েছে যে, জান্নাতে মুমিনগণ আল্লাহর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করবেন। খলীফা মামুন রাষ্ট্রের সকলকে এ বিশ্বাস গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। ইমাম আহমদ ও আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ ঘোষণা দেন যে, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তাঁরই সিফাতের অংশ। আল্লাহর কোনো সিফাত বা বিশেষণ সৃষ্ট হতে পারে না। কাজেই কুরআনকে মাখলূক বা সৃষ্টবস্তু বলে বিশ্বাস করা কুফরী। অনুরূপভাবে জান্নাতে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করলে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত অস্বীকার করা হয়, এজন্য এরূপ বিশ্বাস কুফ্রী। এ মত প্রতিষ্ঠায় মামুন ছিলেন অনমনীয়। এ মত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী আলিমদেরকে গ্রেফতার করে তিনি অবর্ণনীয় অত্যাচার করতে থাকেন। অত্যাচারের মুখে যারা মুতাযিলী মতবাদ মেনে নিত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হতো। অন্যদেরকে আটক রেখে অত্যাচার চালানো হতো এবং কাউকে কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হতো। মামুনের পরে পরবর্তী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ (২১৮-২২৭ হি.) ও ওয়াসিক বিল্লাহ (২২৮-২৩২ হি.) এভাবে এমত প্রতিষ্ঠর জন্য এরূপ অত্যাচার অব্যাহত রাখেন। পরবর্তী শাসক মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হি.) এ অত্যাচারের অবসান ঘটান।

সুদীর্ঘ প্রায় ৩০ বৎসরের এ কুফরী মতাদর্শের শাসন ও অত্যাচারের সময়ে মূলধারার আলিমগণের অন্যতম নেতা ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি.)। তিনি মু'তাযিলী মতবাদের কুফ্রী ও বিভ্রান্তি প্রকাশ করেন, শত অত্যাচারেও এ মতবাদের স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকেন এবং দীর্ঘ সময় কারাগারের অন্তরালে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রেখেছেন, জুমুআর খুতবায় খলীফা ও প্রশাসনের জন্য দুআ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি কখনোই বিদ্রোহ, আইন অমান্য বা সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেন নি। সরকারের জুলুম ও সরকার পক্ষের আলিমগণের প্রচারণায় সাধারণ মানুষ ও সাধারণ আলিমগণ এ কুফরী মত গ্রহণ করতে থাকেন। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত বা মূলধারার আলিমগণ ও তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলিমগণ অত্যাচারিত হওয়া ছাড়াও সাধারণের মধ্যে এরূপ কুফরী মতবাদের দ্রুত প্রসারে বিচলিত হয়ে পড়েন। অনেকেই সরকারের নির্দেশ অমান্য করে সমাজে হক্ক কথা দ্রুত প্রচারের বা সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে অস্ত্র ধারণের চিন্তা করেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল তাদেরকে বিশেষভাবে নিষেধ করেন। তিনি বারবারই বলতেন, "এখন তো ফিতনা ও অত্যাচারের শিকার অল্প কিছু মানুষ। আর যদি অস্ত্রধারণ করা হয় এবং রক্তপাত করা হয় তবে তা সাধারণ ফিতনা-ফাসাদে পরিণত হবে এবং সাধারণ জনগণ কষ্ট ও অত্যাচারের শিকার হবে। খবরদার! তোমরা রক্তপাত থেকে দূরে থাক! খবরদার! তোমরা রক্তপাত থেকে দূরে থাক! খবরদার! তোমরা রক্তপাত থেকে দূরে থাক!"[১১৩৯]

[১১৩৭]. আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ আল-হাম্বালী (১৩৯২ হি); হাশিয়তুর রাওদিল মুরবি' শরাহু যাদিল মুসতানকী খ. ২, পৃ. ৩০৭
[১১৩৮]. আত-তারীখুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ৯০
[১১৩৯]. সালিহ আল-শাইখ, শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ৩২১

Dhaka University Institutional Repository

এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম আহমদ ও অন্যান্য আলিম মামুনের এ মতবাদকে কুফর বলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু কখনোই মামুনকে বা যারা এ মত গ্রহণ করছিল তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে কাফির বলে গণ্য করেন নি, বরং তাদের আনুগত্য ও তাদের পিছনে সালাত আদায় অব্যাহত রেখেছেন। মুতাযিলী মতের বিভিন্ন আকীদা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। এ বিশ্বাস পোষণের মাধ্যমে এ সকল আয়াতকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু মুতাযিলীগণ এ সকল আয়াতকে সরাসরি অস্বীকার করত না; বরং বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার অর্থ পরিবর্তন করে তারা তাদের এ মতকে কুরআন-সম্মত বলে দাবি করত। তারা বলত না যে, আমরা কুরআন বা হাদীস অস্বীকার করি। বরং তারা বলত যে, কুরআনের এ কথাটি অমুক বা তমুক অর্থে আমরা গ্রহণ করি। আর এক্ষেত্রে ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা হয় না। বরং তাকে সন্দেহের সুযোগ প্রদান করা হয় এবং মনে করা হয় যে, সে হয়ত সত্যিই না বুঝে এরূপ কুফরী মত গ্রহণ করেছে।

এর অর্থ এ নয় যে, তার মত বা ব্যাখ্যা সঠিক বলে মেনে নেওয়া হলো। বরং তাকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত মুসলিম বলে গণ্য করা হলো। আর এজন্যই ইমাম আহমদ ও অন্যান্য আলিম অনমনীয় দৃঢ়তার সাথে সঠিক মতটি বর্ণনা করেছেন এবং কোনো অত্যাচারেই রাষ্ট্রীয় মতবাদকে কুরআন-সুন্নাহ সম্মত বলে স্বীকৃতি দেন নি।

ইমাম আহমদ ও তাঁর সাথীরা এরূপ অনমনীয়তার পাশাপাশি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং দ্রুত অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করেন নি। বরং অত্যাচার ও কষ্ট নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সাধারণ জনগণকে রক্তারক্তি ও হানাহানি থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন। এ সময়ে যারা কুফরী মতের প্রসার রোধে আইন ভঙ্গ করেছিলেন বা দ্রুত ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন তারা কেউ সফল হন নি। বরং তাদের কারণে অনেকেই কষ্টে নিপতিত হয়েছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ও তাঁর সাথীদের ধৈর্যসহ সত্যকথন এক সময় ফল প্রসব করে। দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বৎসর পর খলীফা মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হি.) মূলধারার আলিমদের মত গ্রহণ করেন। মুতাযিলী ও অন্যান্যদেরও তাদের মতবাদ চর্চার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এ বিষয়ক সকল রাষ্ট্রীয় জবরদস্তি থামিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্র কখনো ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নি। সকল ধর্মের অনুসারীরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সাথে তাদের ধর্মপালন করেছেন এবং নাগরিক অধিকার ভোগ করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন মুসলিম ফিরকা তাদের মতামত অনুসরণ করেছেন। তারা পারস্পরিক দলাদলি করলেও রাষ্ট্রপ্রশাসন সাধারণত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নি। ইউরোপের খৃস্টান দেশগুলির মত ধর্মদ্রোহিতা নির্মূলের নামে ভিন্নধর্ম বা ভিন্নমতের অনুসারীদের নির্মুল করা হয় নি। মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিকের গ্রীক দর্শন ভিত্তিক এ মুতাযিলী শাসনামল ছিল ব্যতিক্রম। মোগল সম্রাট আকবরের (রাজত্ব ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) দীনে ইলাহীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কুফরী প্রতিষ্ঠার মত এমন ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। সম্রাট আকবরের সময়ে সামগ্রিকভাবে ভারতের মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবক্ষয় বিরাজ করছিল। আকবরের দীন-ই-ইলাহী-র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে অবক্ষয় চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। খ্রিস্টীয় ১২শ-১৩শ শতাব্দী বা হিজরী পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীতে দুশতাব্দীরও অধিককালব্যাপী পশ্চিম থেকে ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণের একের পর এক বর্বর ক্রুসেড আক্রমণে ছিন্নভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের দুর্বল অবস্থার মধ্যেই খ্রিস্টীয় ১৩শ শতকে বা হিজরী ৭ম শতকে মুসলিম দেশগুলির উপর পূর্ব থেকে তাতার ও মোঙ্গলদের বর্বর হামলা শুরু হয়। একপর্যায়ে ১২৫৮ খ্রি./৬৫৬ হিজরী সালে বাগদাদের পতন ঘটে। এভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

এ সময়ে কেন্দ্রীয় শাসন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। মূলত সুফীয়ায়ে কেরাম, সূফী দরবার ও খানকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দীনী শিক্ষার ধারা টিমটিম করে অব্যাহত থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে তাসাউফ ও তরীকতের নামে অগণিত ভণ্ড দরবার, খানকা ও তরীকার সৃষ্টি হয়। তরীকতের নামে মুসলমানদেরকে ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী আকীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে বিভিন্ন পাপ, কুফর ও শিরকী বিশ্বাসে নিমজ্জিত করা হয়। এ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ-সহ সমগ্র ইসলামী জগতের অবস্থা।

এ সময়ে ইরানে ও ভারতে অনেকে প্রচার করতে থাকে যে, এক হাজার বৎসরের মাথায় ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মাদী নবুওয়াতের যুগ শেষ হয়ে যাবে এবং নতুন মিলেনিয়ামে বা সহস্রাব্দে নতুন দীনের আবির্ভাব

Dhaka University Institutional Repository

ঘটবে। এ মতবাদের ভিত্তিতে সে সময়ে নতুন নতুন নবুওয়াতের দাবিদারের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। ৯১০ হিজরীতে জৌনপুরের সায়্যিদ মুহাম্মদ নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহদী বলে দাবি করে এবং দ্রুত সারা ভারতে তার মত ছড়িয়ে পড়ে। ৯৭৭ হিজরীতে মুল্লা মুহাম্মদ ও তার যিক্‌রী দলের আবির্ভাব হয় এবং দ্রুত তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করে। ভারতের সর্বত্র অনেক মুসলিম তার দীন গ্রহণ করে। এ সময়ের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মত ছিল ইরানের নুকতাবী মতবাদ। এ মতবাদের মূল কথা ছিল-

ক) হাশর-নশর বলে কিছু নেই;
খ) কুফরী-নাস্তিকতা বৈধ বিষয়;
গ) সব কিছ বৈধ;
ঘ) জান্নাত-জাহান্নাম এ দুনিয়ারই উন্নতি অবনতি;
ঙ) বিবর্তনবাদ;
চ) আরবী নবুওয়াতের যুগ শেষ এখন আজমী নবুওয়াতের যুগ শুরু হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত : সম্রাট আকবর নিজে ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। তিনি শাইখ মুবারক নাগুরী নামক একজন কথিত সুফীর ভক্ত ছিলেন। ইসলামী বিশ্বকোষে শাইখ মুবারক নাগুরীকে আকবারের দরবারে সুফীবাদের প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১৪০] শাইখ মুবারক নামক এ সূফী ছিলেন উপর্যুক্ত নুকতাবী মতবাদের অনুসারী। শাইখ মুবারাকের দু-পুত্র, আকবরের নবরত্নসভার অন্যতম সদস্য আবুল ফযল ও ফৈযীও এ মতের অনুসারী ছিলেন।

এ সকল মানুষ নতুন একটি বিশ্বজনীন অনারব ধর্ম প্রবর্তন করতে এবং এ মহান ধর্মের প্রবর্তকের মর্যাদায় আসীন হতে আকবরকে প্ররোচিত করতে সক্ষম হন। তাদের প্ররোচনায় রাজত্ব গ্রহণের (১৫৫৬খ্রি./৯৬৩হি.) প্রায় ৩০ বৎসর পরে ১৫৮খ্রি./৯৯০ হিজরীতে আকবর দ্বীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন। এ ধর্মের মূল দাবি ছিল হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান, পার্সিয়ান ইত্যাদি সকল ধর্মের মূল শিক্ষা নিয়ে একটি ধর্ম প্রবর্তন করা। এ ধর্মের উপাস্যের প্রতীক ছিল সূর্য ও আগুন। এ ধর্মের প্রবর্তনের মাধ্যমে সালাত, সিয়াম, যাকাত ও ইসলামের সকল বিধান রহিত ও নিষিদ্ধ করা হয়, উপাস্যের প্রতীক সূর্য ও আগুনের পূজা চালু করা হয়। আর আল্লাহর প্রতিনিধি ও ধর্মের প্রবর্তক বাদশাহকে সাজদা করার নিয়ম চালু করা হয়।

এ নতুন রাষ্ট্র ধর্মের মুল বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে ছিল:
(১) অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা
(২) গঙ্গা নদীর পানিকে পবিত্র জ্ঞানে পান করা।
(৩) ছবি, মুর্তি, প্রতিকৃতি ইত্যাদির বৈধতা ঘোষণা।
(৪) সাজদায়ে তাহিয়্যাহ বা সালাম জ্ঞাপক সাজদাকে বৈধ বলে দাবি করে সম্রাটকে সাজদা করার আইন জারি করা।
(৫) ইসলামের ঈদ পরিত্যাগ করে নতুন নতুন বিভিন্ন পার্বন প্রচলন করা।
(৬) সালাত আদায় নিষিদ্ধ করা। রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রকাশ্যে কেউ সালাত আদায় করতে পারত না।
(৭) যাকাত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফরমান জারি করা।
(৮) ইসলামের ঈমান, ইবাদত ও রীতিনীতি নিয়ে উপহাস করা।
(৯) ইসলামী আইন ও বিচারব্যস্থা বাতিল করে বিভিন্ন ধর্মের আইনের সংমিশ্রণে নতুন আইন চালু করা।

এ ধর্ম চালু করার প্রায় ১৫ বৎসর পরে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে (১০১৪ হিজরীতে) আকবর মৃত্যুবরণ করেন। তার পর তার পুত্র নুরুদ্দীন জাহাঙ্গীর (রাজত্ব ১৬০৫-১৬২৭ খ্রি./ ১০১৪-১০৩৬ হি.) রাজ্যভার গ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীরও পিতার ধর্মমত অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

স্বভাবতই রাষ্ট্রের ধার্মিক মুসলিমগণ এ অবস্থাতে বিক্ষুব্ধ হন। এ সময়ে দীনের ঝাণ্ডা গ্রহণ করেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী শাইখ আহমদ ইবনু আব্দুল আহাদ সিরহিন্দী (১৫৬৪-১৬২৪খ্রি./৯৭১-১০৩৪ হি.)। তাসাউফের সঠিক ব্যাখ্যা, পরিপূর্ণ শরীয়ত অনুসরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ তরীকত অর্জন, বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়্যেআহ- অর্থাৎ ভাল বিদআত ও খারাপ বিদআতের পার্থক্য অস্বীকার করে ভাল ও খারাপ

[১১৪০]. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্বকোষ খ. পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

উভয় প্রকারের বিদআতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিশুদ্ধ সুন্নাত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, দীন-ই-ইলাহীর প্রতিবাদ ও ইসলামের পুর্নপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাওয়াত দিতে শুরু করেন।

ক্রমান্বয়ে সমগ্র ভারতে তার দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর মধ্যেও তার দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারী আলিমগণ তাঁর বিরুদ্ধে ফাতওয়াবাজি শুরু করেন। সম্রাট তাঁকে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী করেন। এক পর্যায়ে সেনাপতি ও অন্যান্য প্রভাবশালী তাকে বলেন যে, তারা সম্রাটকে হত্যা করে তাঁকে (শাইখ আহমদকে) ক্ষমতায় বসাবেন। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি কারাগারের অভ্যন্তরেও তাঁর শান্তিপূর্ণ দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। পরে সম্রাট তাকে মুক্ত করেন এবং তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে দীন-ই-ইলাহী পরিত্যাগ করে ইসলামী আকীদা ও শরীয়ত গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। রাষ্ট্র প্রশাসন ছাড়াও সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে শাইখ আহমদের দাওয়াত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।[1141]

ইসলামের ইতিহাসে এরূপ আরো অনেক সংস্কার কার্যক্রম দেখা যায়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়-

(১) কুফর, ইলহাদ ও অনাচারের বিরুদ্ধে দাওয়াতে সোচ্চার হওয়া।

(২) ধৈর্য ও বিনম্রতার সাথে দাওয়াতের কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া।

(৩) ফলাফলের চিন্তা না করে দায়িত্ব পালনের অনুভুতিতে কর্ম করা।

(৪) সকল প্রকার উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা বর্জন করা। বিরোধীদের অসহিষ্ণুতা, অত্যাচার ও উগ্রতা উত্তম আচরণ ও ধৈর্য দিয়ে মুকাবিলা করা।

(৫) রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখা। পাপ নয় এমন রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মান্য করা। এমনকি গৃহবন্দী করলে বা কথা বলতে বাধানিষেধ আরোপ করলে তা মেনে নিয়ে প্রদত্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই দাওয়াত অব্যাহত রাখা।

(৬) শাসকদের পরিবর্তনের চেয়ে সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(৭) অন্যায়কে অন্যায় বলার পাশাপাশি ভাল ও কল্যাণের কাজে শাসক বা প্রশাসকদের প্রশংসা করা, সহযোগিতা করা এবং তাদের থেকে যতটুকু সম্ভব দীনের স্বার্থ উদ্ধার ও রক্ষা করা।

ইসলামের ইতিহাসের এ সকল রাষ্ট্র-সংস্কার আন্দোলনের একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলির নেতৃবৃন্দ নিজেরা ক্ষমতা গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন নি, উপরন্তু ক্ষমতা বা দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব বা সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা ক্ষমতাসীন বা দায়িত্বে রত সাধারণ মুসলিম বা ফাসিক মানুষদের মাধ্যমে যথাসম্ভব সংশোধন ও উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। কোনো আলিম বা নেককার মানুষের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ বা আপত্তিকর নয়, বরং জরুরী ও কল্যাণকর হতে পারে। আফ্রিকার- বর্তমান নাইজেরিয়ার- প্রসিদ্ধ আলিম, পীর ও সফল সংস্কারক উসমান দান ফুদিও (১৭৫৪-১৮১৭)-র সংস্কার আন্দোলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কারকগণের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতির এ দিকটির কারণ ও প্রেক্ষাপট হিসেবে নিম্মের বিষয়গুলি বিবেচ্য-

(১) তাঁরা অনুভব করতেন যে, ক্ষমতার সংশোধনের চেয়ে পরিবর্তন কঠিনতর। কোনো দেশেই ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা ছাড়তে চান না। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও বিভিন্নভাবে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা আকড়ে ধরতে চান। আর তৎকালীন পরিবেশে হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া ক্ষমতার পরিবর্তন খুবই কঠিন ছিল। ক্ষমতার পরিবর্তন করতে রক্তারক্তির যে সম্ভাবনা সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে এর সম্ভাবন ততটা নয়। এক্ষেত্রে আলিম বা সংস্কারক নির্যাতিত হলেও সাধারণ অনুসারী ও নাগরিকগণ নির্যাতন ও রক্তপাত থেকে রক্ষা পান। এজন্য তারা ক্ষমতার পরিবর্তন না করে সংস্কার চেষ্টাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, উদ্দেশ্য তো যতটুকু সম্ভব পাপ অন্যায় দূর করা এবং দীনী দাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করা।

(২) তারা ক্ষমতাসীনদেরকে বার্তা দিয়েছেন যে, আমরা আপনাদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী নই। আমরা আপনাদের কল্যাণকামী মাত্র। আপনাদের ক্ষমতার স্থায়িত্ব, দুনিয়ার সফলতা ও আখিরাতের মুক্তির জন্য আপনাদেরকে অমুক বা তমুক কাজগুলি করতে বা বর্জন করতে হবে। এ বার্তা-সহ সংস্কার ও পরিবর্তনের দাওয়াত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের মনে প্রভাব ফেলে এবং পরিবর্তন সহজ হয়। পক্ষান্তরে কাউকে

[1141]. আবুল হাসান নদবী, রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াত, ৩য় খ-; গোলাম আহমদ মোর্তাজা; **ইতিহাসের ইতিহাস**, পৃ. ১০২-১০৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামী বিশ্বকোষ ১/৭০-৭১; ৩/২৩৬-২৩৮; ১৯/৫৮৬-৫৮৭; ৬৯১-৬৯৪

ক্ষমতার প্রতিদ্বন্ধী মনে করলে ক্ষমতাসীনরা তার ভাল কথাও শুনতে রাজি হন না, বরং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্ধী অতি আপনজনকেও আঘাত, হত্যা বা নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর হন।

(৩) ক্ষমতার পরিবর্তনে একজন বা একদল মানুষের পরিবর্তে অন্য মানুষ বা মানুষদের ক্ষমতায় বসাতে হয়। এক্ষেত্রে পরের মানুষগুলি ক্ষমতা গ্রহণের পরে পূর্ববর্তীদের চেয়ে অনেক ভাল বা পরিপূর্ণ ভাল হবেন বলে আশা করা কঠিন। কাজেই ক্ষমতা পরিবর্তন ছাড়াই যদি দাওয়তের উদ্দেশ্য আংশিক বা অনেকাংশে পূরণ হয় তাহলে তা মেনে নেওয়াই উত্তম।

(৪) আখিরাতমুখী আলিমগণ নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করতে ভয় পেতেন। দায়িত্ব গ্রহণ করে বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার, সকল নাগরিকের অধিকার আদায়, সম্পদের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিতকরার ক্ষেত্রে ভুলক্রুটি হয়ে গোনাহের মধ্যে নিপতিত হবেন বলে তারা ভীত হতেন। তারা ভাবতেন যে, মূল উদ্দেশ্য কুফর, ইলহাদ ও অনাচার দূর করা এবং দীন ও দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষা করা। তা যখন অন্যের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে তখন নিজের আখিরাতকে ঝুঁকিপূর্ণ করার দরকার মনে করেন নি।

(৫) রাষ্ট্রের সাথে অগণিত মানুষের অধিকার ও স্বার্থ জড়িত। এখানে সাধারণত কেউই সকল নাগরিকের কাছে বা সকল ধার্মিকের কাছে ভাল বা যোগ্য বলে গণ্য হতে পারেন না। বরং সকলেই বিতর্কিত হন এবং অনেকেই ব্যর্থ বলে গণ্য হন। সাধারণ বা ফাসিক ব্যক্তি যদি রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যর্থতার দায়ভার তার নিজের ঘাড়ে পড়ে। আর যদি আলিম, ইমাম বা সংস্কারক ব্যর্থ হন তাহলে তার দায়ভার দীনের ওপরেই পড়ে। এতে দীনী দাওয়াত বিতর্কিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
ইসলামী আইনে ধর্মান্ধতা, সহিংসতা ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান

ইসলামে শাস্তির অর্থ
ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিচয়
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উদ্দেশ্যে
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মূলনীতি
ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বৈশিষ্ট্য
শাস্তির প্রকারভেদ
সহিংসতা ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি
সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের কতিপয় প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী আইনে ধর্মান্ধতা, সহিংসতা ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ একটি রাষ্ট্রীয় অপরাধ। ইহা সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। মানব জীবন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অশান্তি ও অকল্যাণে ভরে ওঠে। অপরাধ এবং অপরাধ প্রবণতা থেকে মানুষকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।[১১৪২] ইসলামী আইনে এ ধরণের শাস্তির বিধান চালুর মূল উদ্দেশ্য কাউকে শাস্তি দেয়া নয়; বরং অপরাধ সংঘটনের সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করা। এ কারণে মানব রচিত আইনে যেখানে অপরাধ সংঘটনের পরেই কেবল শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই এর সকল উপায়-উপকরণ ও পন্থা রোধ করে দেয়ার প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাছাড়া ইসলাম শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহভীতি ও পরকালের চেতনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গোনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। জনমনে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ভয় সৃষ্টি ব্যতীত জগতের কোনও আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। ইসলামের এই বিজ্ঞজনোচিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাদের সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর নিকটস্থ অনেক ফেরেশতাদের চেয়েও অধিকতর সম্মানের অধিকারী।'[১১৪৩] শাস্তি প্রদান করলে আল্লাহ্ তা'আলার কোন ধরনের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পায় না। আবার তাঁর কথা পৃথিবীর কেউ অমান্য করলেও মহান সত্ত্বার মর্যাদার কোন কমতি হয় না। তিনি শুধু ব্যক্তির সংশোধন ও মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।[১১৪৪] যাতে জনগণ এ শাস্তি অবলোকন করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে থাকে। সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঐসব অপরাধীর লাগাম টেনে ধরতে এবং জনগণের মাঝে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহ তা'আলা ইসলামী আইনে শাস্তির বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছেন। অপরাধভেদে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি রয়েছে তম্মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অন্যতম। আর কিছু কিছু শাস্তি রয়েছে যা নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালকদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যাতে তারা স্থান-কাল পাত্রভেদে শাস্তির পরিমাণ কমবেশি করতে পারেন।

ইসলামে শাস্তির অর্থ

আরবীতে শাস্তিকে **العقوبة** বলা হয়। শাস্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "শরী'আত প্রবর্তক (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল) এর নির্দেশ অমান্য করার জন্য জনগণের কল্যাণে বিধিবদ্ধ প্রতিফল।"[১১৪৫] শাব্দিক অর্থে শাস্তি বলতে কৃত অপরাধের জন্য অপরাধীকে কষ্ট দেয়া বুঝায়। এ কষ্ট অবশ্য শারীরিক বা মানসিক বা উভয় প্রকার হতে পারে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও মানুষের জান, মালের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন-

---

[১১৪২]. ড. আহমাদ আলী, ***ইসলামের শাস্তি আইন*** (ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৩

[১১৪৩]. সুনান ইবন মাজাহ, (কিতাবুল ফিতান) ***প্রাগুক্ত***, খ. ৫, পৃ. ৯৪

[১১৪৪]. আবদুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরী আল-জিনাঈ* (লেবানন, মুআসসাতুর রিসালাহ, সংস্ক. ১৪, ১৪১৯ হি.) খ. ১, পৃ. ৬০৯

[১১৪৫]. **هى الجزاء المقرر المصلحة الجماعة على عصيان امر الشرع-** (আব্দুল কাদের আওদাহ, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ১০৯

কানুন তৈরী করে অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে শাস্তি নিশ্চিত করা হয়।[১১৪৬] অপরাধ শব্দটি হল কারণ এবং উক্ত কারণের

ফল হচ্ছে শাস্তি। অতএব শাস্তি হবে রাষ্ট্রের আদেশ নিষেধ অপ্রতিপালনের জন্য প্রতিশোধ স্বরূপ ব্যবস্থা। অন্যথায়, আভিধানিক অর্থে শাস্তি বলতে সংঘটিত অপরাধের জন্য অপরাধীকে কষ্ট দেয়া বোঝায়। এই অর্থে শাস্তি হল ক্লেশ। যারা দেশের আইন ভঙ্গ করেন তারাই এ ক্লেশ ভোগ করতে বাধ্য হন। সুতরাং কৃত অপরাধের জন্য অপরাধীকে যে শারীরিক ও মানসিক যাতনা বা পীড়ন করা হয় ইহার নামই শাস্তি।[১১৪৭] অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য যে শারীরিক বা মানসিক যাতনা কিংবা পীড়ন করা হয় তার নাম শাস্তি। অপরাধের জন্য এ ধরনের যাতনা বা কষ্ট-ক্লেশ আরোপ করা সরকারের নৈতিক কর্তব্য। কারণ অপরাধীর প্রায়শ্চিত্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহা তার সংশোধন ও নব জন্ম লাভের উপায়। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গের জন্য আইনানুগ অপরাধী প্রমাণিত হলে, শাস্তির পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, আসামীকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে।[১১৪৮]

ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিচয়

ইসলামের পরিভাষায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে এমন এক প্রকারের শাস্তি যার প্রচন্ডতা ও তীব্রতা দেখে অপরাধীর হৃদয় ও মন ভয়ে কেপে উঠে এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রবণতা দূর হয়ে যায়। যদি কোন অপরাধী তার সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্য নিশ্চিত শাস্তির সম্মুখীন হয় তাহলে সে আর অপরাধ সংঘটিত করবে না।[১১৪৯] দৃষ্টান্তমূলক বা নিবৃত্তিমূলক শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১। (ক) দৃষ্টান্ত স্থাপন : অপরাধীর শাস্তি বিধান করে সমাজে অনুরূপ ধরনের অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য অনুরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা; এবং

(খ) পুনরাবৃত্তি রোধে : শারীরিক দণ্ডদান করে অপরাধীকে ভবিষ্যতে উক্ত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করা হতে বিরত রাখা। সাধারণ অর্থে এ মতবাদের লক্ষ সমাজ সংরক্ষণের জন্য অপরাধীর প্রতি এরূপ দৃষ্টান্তমূলক আচরণ করতে হবে যেন আইনভঙ্গ করার ভয়াবহ পরিণতির বিষয় অনুধাবন করে অন্যান্য ব্যক্তিরাও অনুরূপ অপরাধ করা হতে বিরত থাকে।

২। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হল অপরাধ বিজ্ঞানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন বা চরমতম শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা। অপরাধীকে তার কৃতকর্মের জন্য এরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে অন্য কেহ অনুরূপ অপরাধ না করে এটাই এই মতবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মতবাদটি যে দু'টি বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহৃত হয় তা হল-

(ক) অপরাধীকে চরমতম শাস্তি প্রদান করে এমনই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সমাজের অন্য কেউ অনুরূপ অপরাধ সংঘটন করতে পুনর্বার সাহস না পায়।

(খ) চূড়ান্ত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে নজীর স্থাপন করা হলে কোন অপরাধী ভবিষ্যতে উক্ত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করা হতে নিবৃত্ত থাকবে। অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করাই হল দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মূল উদ্দেশ্য।[১১৫০]

৩। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে 'নিবৃত্তমূলক' অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ভবিষতে অন্যান্য মানুষকে অপরাধ করা হতে নিবৃত্ত করাই এ শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য। এ মতবাদের অনুসারীগণ মনে করেন যে, অপরাধীকে দেয় শাস্তি অন্যান্য সম্ভাব্য অপরাধীর নিকট এবং অপরাধ প্রবণশীল মানুষের নিকট দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অপরাধীকে এরূপ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা

১১৪৬. অধ্যক্ষ এ.এ. এম মনিরুজ্জামান; মোহাম্মদ হায়দার আলী, ***জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লিগ্যাল থিওরী*** (ঢাকা: ন্যাশনাল ল' পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ. ৬, ২০১২) পৃ. ২৯৩

১১৪৭. অধ্যক্ষ মো: আলতাফ হোসেন, ***জুরিস্প্রুডেন্স*** (হিরা পাবলিকেশন্স, সংস্ক. ১, জুলাই ২০১১), পৃ. ২১৮

১১৪৮. জাকিয়া সুলতানা জলি; মো: শাহিনুর রহমান, ***জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লীগ্যাল থিওরী*** (সম্পাদনায় : এম জগলুল কবির, পাইভ জুয়েল পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩), পৃ. ৩৪৫

১১৪৯. ড. মোঃ মাহবুবুল আলম, ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : ***অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের অনন্য উপায়,*** পিএইচ.ডি থিসিস (ঢাবি, মে ২০১৫, পৃ. ০৭

১১৫০. অধ্যক্ষ এ.এ.এম মনরিুজ্জামান; মো: হায়দার আলী, জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লিগ্যাল থিওরী, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ২৯৫

হবে যা প্রত্যক্ষ বা দর্শন করে সমাজের অন্যান্য অপরাধী পুনরায় অপরাধ করতে ভয় পাবে। কারণ পুনরায় অপরাধ করলে তাকে ঐ একই ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

শাস্তি অপরাধ সংঘটন নিবারণ করে। প্রত্যেক মানুষের একইভাবে ন্যায় কাজ করার অভিপ্রায় থাকে না বলে কিছু কিছু মানুষ অন্যায় কাজ করে। এজন্য ফৌজদারী বিচারে শাস্তির লক্ষ হওয়া উচিত, সম্ভাব্য অপরাধীদের মনে অপরাধের জন্য শাস্তির ভীতি সঞ্চার করা এবং তাদের মনে অপরাধ করা হতে বিরত থাকার মানসিকতা সৃষ্টি করা।[১১৫১] দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সম্পর্কে Salmond বলেন, „Punishment is before all things deterrent and the chief and of the law of crime is to make the evil-doer on example and a warning to all that are like-minded with him."সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ ধরনের শাস্তি সমাজের সকল প্রকার অপরাধী, সন্ত্রাস ও জঙ্গিদের প্রতি সতর্কতামূলক পূর্ব সংকেত। সে মতে সকল সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে পর্যাপ্ত শাস্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল দেশ, জাতি, সমাজ সংরক্ষণের জন্য সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের প্রতি এমন দৃষ্টান্তমূলক আচরণ করতে হবে, যাতে আইন ভঙ্গ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্যক অনুধাবন করে সমাজের অপরাপর সদস্যগণও একই ধরণের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সংঘটন করা হতে বিরত থাকে।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উদ্দেশ্যে

ইসলামী শরীয়ত ফৌজদারী দন্ডবিধিগুলোকে কঠোর করেছে। মূলতঃ তিনটি বিষয় নিশ্চিত করেছে। যেমন-

(১) জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা

(২) শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা

(৩) নাগরিকদেরকে সচ্চরিত্রবান ও বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করা।

কোনো রাষ্ট্র বা অঞ্চলে যদি মানুষের বসবাস. চলাচল নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হয়, সে এলাকার শাসনব্যবস্থা নিরপেক্ষ ও সুদৃঢ় হয় এবং নাগরিকগণ বেড়ে উঠে সচ্চরিত্রবান হয়ে তবে এ রাষ্ট্র এবং সে জাতির উন্নতি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আল্লাহ সে জন্যেই কুরআন মাজীদে 'আলহিরাবাহ' তথা সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার কঠোর শাস্তি বিধান ঘোষণার পূর্বে মানব জাতিকে এর তাৎপর্য বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো একটি মানব প্রাণকে কোনো হত্যার বিনিময় বা সন্ত্রাসের অপরাধ ছাড়া হত্যা করল, সে যেন পুরো মানব জাতিকেই হত্যা করে দিল। পক্ষান্তরে যে কোনো একজন মানবের প্রাণ রক্ষা করল সে যেন পুরো মানব সম্প্রদায়কেই বাঁচিয়ে রাখল।"[১১৫২] কুরআনে نفسا (নাফসান) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ যে কোনো প্রাণ। এখানে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-নিরক্ষর, ক্ষমতাবান-সাধারণ লোক এমনকি মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যেও পার্থক্য করা হয়নি। সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা। তাদের সকলের শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহর দুনিয়ায় বসবাসের অধিকার রয়েছে। এই দৃষ্টিতে সকল মানুষের জান-মাল ও ইজ্জতের মূল্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে সমান। দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকের হত্যার শাস্তিও দেশের সবচেয়ে বেশিগুরুত্বপূর্ণ একজন নাগরিকের হত্যার শাস্তির সমপর্যায়ের, তাতে এতটুকুও অবহেলা করা যাবে না বা কম গুরুত্ব দেওয়া যাবেনা। কারণ এমনটি করার অর্থই হবে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, ভয়-ভীতি ও অসহায়ত্ব সৃষ্টি করা। যা একসময় আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে। সমাজ ও জনপদে বিস্তার করে নিরাপত্তারহীনতার পরিস্থিতি এবং শাসকদের উপর সৃষ্টি হয় চরম অবিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীদের মৃত্যুদন্ড-কে 'জীবন' বলে আখ্যা দিয়েছেন, "হে জ্ঞানী! ব্যক্তিরা তোমাদের জন্য কিসাস (হত্যার মোকাবিলায় হত্যা) এ রয়েছে জীবন। যেন তোমরা মুত্তাকী হতেপার (সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পার)।"[১১৫৩]

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

[১১৫১]. অধ্যক্ষ অলতাফ হোসেন, জুরিস্প্রুডেন্স, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ২২৬

[১১৫২]. আল কুরআন, ৫: ৩২

[১১৫৩]. আল কুরআন, ২: ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মাইলফলক। এ শাস্তির বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি (সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ) কে সংশোধন করা হয়। সমাজের অন্যান্য মানুষকে এ ধরণের অপরাধ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পুনরাবৃত্তি রোধ, সাধারণ জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। তাই এ শাস্তির যথার্থ প্রয়োগে একটি দেশ বা পৃথিবী হতে পারে শান্তির নীড়। নিম্নে এ শাস্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল-

প্রথমত : সমাজ ও রাষ্ট্রে অন্যায়, অপরাধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সংঘটিত হবার পূর্বে সাধারণ মানুষকে তা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে। এরপরও যদি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সংঘটিত হয়, তবে সন্ত্রাসী ও জঙ্গীকে এমনভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে সে ভবিষ্যতে আর কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয়। আর অন্যান্য সাধারণ মানুষকে অন্যায়, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে লিপ্ত হতে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে।[১১৫৪] দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সমাজ সংস্কারের একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এই নীতি অনুসরণ করে একজন বিজ্ঞ ইংরেজ বিচারক আসামীকে লক্ষ করে তাঁর রায়ে বলেন যে, „I don't punish you for stealing the sheep but so that sheep may not be stolen." অর্থাৎ দেখ, একটি ঘোড়া চুরি করার দায়ে তোমাকে ফাঁসি দেয়া হবে না, কিন্তু আর যেন ঘোড়া চুরি না হয়, সেই জন্যই আমি তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি।

দ্বিতীয়ত : দেশের জনগণের কল্যাণ ও প্রয়োজনেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই শাস্তি কঠিন করলে যদি জনগণের অধিক কল্যাণ হয় তবে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। আর যদি শাস্তি সহজ ও হালকা করলেও জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত করতে অসুবিধা না হয়, তবে তা সহজ হালকাভাবে করা যেতে পারে।[১১৫৫] তবে অপরাধের শাস্তি কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক করা হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ হ্রাস পায় এবং মানুষ নিরাপদ ও স্বস্তিতে দিনাতিপাত করতে পারে। অন্যথায় শান্তি,শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে পারে।[১১৫৬]

তৃতীয়ত : সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের অপরাধের মাত্রা যদি এতটা বেড়ে যায় যে, তাকে সমাজ থেকে সরিয়ে না দিলে কিংবা দূরে না রাখলে সমাজের মানুষের শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব নয়, তবে শান্তি রক্ষার্থে তাকে বিচারের মাধ্যমে হত্যা করা কিংবা আমৃত্যু জেলে পুরে রাখা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়।[১১৫৭] যেমন হত্যার শাস্তি কিসাস হিসেবে হত্যা না হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে হত্যাজনিত অপরাধ বৃদ্ধি পাবে। আইনের ফাঁকে জঘন্যতম অপরাধ ও দুর্নীতি করেও বেঁচে যাওয়ার প্রবণতাই এসব সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বৃদ্ধি পায়। তাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান প্রবর্তিত হলে অনেকাংশে এধরণের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

চতুর্থত : সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করার জন্য সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা। আর এ ধরনের শাস্তি ব্যক্তিকে সংশোধন করা এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য প্রদান করা হয়, তা সবই শরী'আত সম্মত। অতএব শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ও নির্ধারিত শাস্তিকে দৃষ্টান্তমূণক শাস্তি মনে করার কোন কারণ নেই। এর বাইরেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে পারে।[১১৫৮] সরকার প্রয়োজন মনে করলে এ ধরনের অপরাধ নিবারনে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির বিধান সংবিধানে সংযোজন ও প্রয়োগ করে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। আর এ ধরনের শাস্তির দৃশ্য অবলোকন করে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা অপরাধ ত্যাগে অনুপ্রাণিত হবে।

[১১৫৪]. ইবনুল হুমাম, ***শরহে ফাতহুল কাদির মাআ তাকমিলাতি নাতাইজিল অফকার ফী কাশফির রুমুযি ওয়াল হিদায়া*** (মাকতবাআ আমিরিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ১১২

[১১৫৫]. আল মাওয়ারদী, ***আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ওয়াল ওলায়াত*** (বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ) পৃ. ২০৬; ইবনে ফারহুন আল-মালিকী, ***তাবসিরাতুল হুকাম ফী উসূলীল আকাদিয়া ওয়া মানাহিজিল আহকাম*** (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি, খ.২), পৃ. ২৭১,২৭২

[১১৫৬]. ড. মোঃ মাহবুবুল আলম, ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : অপরাধ ও দুর্নীতি ধমনের অনন্য উপায়, পিএইচ.ডি থিসিস (ঢাবি: ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ০৯

[১১৫৭]. মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবেদীন, ***হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন*** (বৈরুত: মাতবাআ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১ম সংস্করণ, ১৯১৫খ্রি.), খ. ৫, পৃ.৪৮০

[১১৫৮]. ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৫, পৃ.৪৮০

পঞ্চমত : সন্ত্রাসী ও জঙ্গিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার অর্থ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা নয়। এ শাস্তি দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হল তাকে সংশোধন করা এব সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে বিরত রাখা। শাস্তির ভয়াবহতা এমনভাবে প্রদর্শন করা যাতে সে যেন পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে বারণ করে। তাই যে বিচারক অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নির্দেশ দিবেন তার উচিত তাদের প্রতি ইহসান ও দয়া করা। একজন পিতা যেমন তার সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানোর জন্য শাস্তি দেন কিংবা একজন ডাক্তার রোগীকে আরোগ্য করার উদ্দেশ্যে কষ্ট দেন, তেমনি একজন বিচারক অপরাধীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যেই এ শাস্তির নির্দেশ করবেন।[১১৫৯] একইভাবে, হিন্দু শাস্ত্রকার Monu বলেন, "Penalty keeps the people under control, penalty protects them, penalty remains awake when people are asleep, so the wise have regarded punishment (Danda) as source of righteousness."

ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মূলনীতি

ইসলামী আইনে শাস্তির ভিত্তি বান্দার প্রতি রহমত ও দয়া প্রদর্শন, তাদের কল্যাণ সাধন এবং তাদের থেকে যাবতীয় অকল্যাণ দূরীকরণ। তাই এ ভিত্তি থেকে স্বাভাবিকভাবেই কতিপয় মূলনীতি বেরিয়ে আসে ইসলাম শাস্তির বিধান প্রবর্তনে যেগুলো বিবেচনা করা হয়েছে। যাতে এ ভিত্তির সাথে শাস্তির সামঞ্জস্য থাকে এবং শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়। কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রবিদদের উক্তি থেকে সেসব মূলনীতি জানা যায়। বিচারের ক্ষেত্রে এগুলো বিবেচনায় রাখা জরুরী। নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি আলোচনা করা হলো-

প্রথমত : অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা রক্ষা করা

এ মূলনীতিটি মূলত: বান্দার প্রতি আল্লাহর ন্যায় বিচারের একটি নমুনা। কারণ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। আর প্রয়োজন অনুপাতেই তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া শাস্তি সংশোধন ও মানব কল্যাণ সংরক্ষণের জন্য মূল বিষয় নয়; বরং ব্যতিক্রমী বিষয়। আর যা ব্যতিক্রম তা সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী। শাস্তি হলো রোগীর ঔষধস্বরূপ। রোগের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী ঔষুধের মাত্রা ততটুকুই দিতে হয়, অনুমান করে দেওয়া যায় না। যেমন দেওয়া যায় সুস্থ্য ব্যক্তিকে তার খাদ্য। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে"।[১১৬০]

এখানে **سيئة** বা মন্দ বলতে তাই বুঝায় যা মানুষ অপছন্দ করে। এ হিসেবে শাস্তিও **سيئة** বা মন্দের অন্তর্ভূক্ত। তাই ইসলামী শরী'আতে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী। ইচ্ছাকৃত হত্যা ও জখম করার শাস্তি হিসেবে কিসাসের ক্ষেত্রে এ সমতা স্পষ্ট। তাই এসব অপরাধে কিসাসই উপযুক্ত শাস্তি। আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা যেরূপ আচরণ করে অনুরূপ আচরণ তার ওপর করাকে কিসাস বলে। অন্যান্য অপরাধের **ذعزي ر** বা অনির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রেও সমতার এ নীতি বিদ্যমান। কেননা **ذعزي ر** বা অনির্ধারিত শাস্তির অপরাধ বিভিন্ন রকম হওয়ায় শাস্তির (**ذعزير**) ধরণও বিভিন্ন রকম হয়। একইভাবে হুদুদ বা নির্ধারিত দণ্ডের অপরাধ ও তার শাস্তির মধ্যে সমতা উপস্থিত। এতদসত্ত্বেও কেউ কেউ ভিন্ন কথা বলে থাকেন। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে এসব অপরাধ ও তার দণ্ডের মধ্যে সমতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা এখানকার সমতা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে পণ্য মাপার সমতার মত ইন্দ্রিয় বা বস্তুগত নয়; বরং অপরাধের পঙ্কিলতা ও ক্ষতির পরিমাণ এবং নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে যে অবস্তুগত সমতা এখানে তা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। শরী'আত প্রণেতা আল্লাহ নিজেই এখানে এসব অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন- যাকে হদ বা দণ্ড বলে অভিহিত করা হয়। সুতরাং আমাদেরকে নিশ্চিত ও প্রশান্তচিত্তে মেনে নিতে হবে যে, এ জাতীয় অপরাধ ও শরী'আত নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে যথাযথ সমতা বিদ্যমান আছে।

দ্বিতীয়ত: নিবৃত্তি

[১১৫৯]. আহমদ ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইখতিয়ারাত আল ইলমিয়্যাহ*** (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), পৃ.১৭১

[১১৬০]. আল কুরআন, ৪২: ৪০

এ মূলনীতির উদ্দেশ্য হল শাস্তির পরিমাণ এতটুকু হওয়া আবশ্যক যাতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রবণতা নিবৃত্ত হয় এবং সমাজের সবাই অন্যায়, সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে থাকে। এ জাতীয় কোনো অপরাধ যদি সংঘটিত হয় তাহলে তার শাস্তি এমন হতে হবে, যেন সন্ত্রাসী ও জঙ্গি উচিত শিক্ষা পায় ও একই অপরাধ পুনরায় করতে সাহস না পায় এবং অন্য কেউ অনুরূপ কাজে উদ্বুদ্ধ না হয়। শাস্তি ব্যবস্থায় এতটুকু দুঃখ-যাতনা থাকা দরকার, যাতে জনমনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং শাস্তি পাওয়ার ভয়ে অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকে। কেননা প্রতিটি লোকই স্বভাবগতভাবে নিজের প্রাণকে ভালোবাসে ও দুঃখ-কষ্টকে ভয় করে। সে যখন জানবে যে, এ অপরাধ করলে তার প্রাণ যাবে কিংবা ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ পাবে অথবা দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হবে বা অঙ্গচ্ছেদ হবে। তখন শাস্তির ভয়ে শঙ্কিত হয়ে সে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। কেউ যদি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে জড়িত হয়ে পড়ে এবং তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করে, তবে শাস্তির দুঃখ-বেদনা স্মরণ করে সে পুনরায় ঐ কাজ করা থেকে ক্ষান্ত থাকবে এবং অন্যরাও সংযত হবে। তাই জনৈক ফকীহ শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন, অপরাধ ঘটার পূর্বে এটা থাকে নিবৃত্তকারী আর ঘটে যাওয়ার পরে হয় সতর্ককারী।

তৃতীয়ত: সন্ত্রাসী ও জঙ্গির ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণসহ সমাজকে অপরাধের ক্ষতি থেকে রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ

এ মূলনীতিটি শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটো দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে সমন্বয় করেছে। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হলো সন্ত্রাসী ও জঙ্গির ব্যক্তিত্ব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে সমাজকে অপরাধের কবল থেকে সুরক্ষা করাকে গুরুত্ব দেওয়া। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সন্ত্রাসী ও জঙ্গির ব্যক্তিত্ব ও সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং শাস্তি দানের ক্ষেত্রে তার সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে শাস্তি নির্ধারণ করা, যদিও তা সামজের স্বার্থ রক্ষায় যথেষ্ট বলে বিবেচিত না হয়। কেননা, এখানে সমাজকে অপরাধের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার গুরুত্বের চেয়ে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব ও সংশোধনের গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ দু'ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে শরী'আত শাস্তির বিধান-প্রণয়নকালে উভয় প্রকারের জন্য সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করেছে। যাতে সমাজের স্বার্থ এবং সন্ত্রাসী ও জঙ্গির কল্যাণ উভয়টা বহাল থাকে। এ বিভাজন পদ্ধতির আলোকে ইসলামী শরী'আত হদ বা নির্ধারিত দণ্ডের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ও জঙ্গির ব্যক্তিত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং দণ্ড দানের পূর্বে অপরাধ করার সময় তার বালেগ হওয়া, জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন থাকা, ইচ্ছাকৃত করা, নিরুপায় হয়ে করেছে কি-না বা কেউ তাকে বাধ্য করেছে কি-না অথবা অজ্ঞতাবশত[১১৬১] করেছে কি-না তা বিবেচনা করার প্রতি জোর দিয়েছে। কিন্তু যদি কোনো বালেগ লোক স্বজ্ঞানে, ইচ্ছাকৃতভাবে, নিরুপায় না হয়ে ও অন্যের চাপে বাধ্য না হয়ে দণ্ড জাতীয় অপরাধ করে যেমন, ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপান, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ইত্যাদি, তাহলে সকল ফিকহ শাস্ত্রবিদদের মতে উপরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সে নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে। তার পরিবেশ, অবস্থান, চরিত্র, শিক্ষা-সভ্যতার মান ও মানসিক অস্থিরতার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। কেননা, অপরাধের জঘন্যতা ও ভয়াবহতার মোকাবেলায় তার এ সবের কোনোটিই তার প্রাপ্য শাস্তি লাঘব কিংবা অন্য কিছুর মাধ্যমে তা বদলিয়ে দেওয়ার সমর্থন যোগ্য বলে বিবেচনা করে না। যেহেতু সে যখন এ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তখন সে প্রাপ্ত বয়স্ক ও পূর্ণ বিবেকবান। স্বেচ্ছায় বুঝে-শুনে এবং কোনো কারণে বাধ্য না হয়ে সে এহেন কাজ করেছে। উচিত ছিল, তার বিবেক এ অপরাধ করতে তাকে বাধা দিয়ে বিরত রাখবে কিন্তু যখন সে ক্ষান্ত হলো না তখন শাস্তি তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

বিচারক ব্যতীত অন্য কেউ শাস্তি কার্যকর করার অধিকার রাখে না। সমাজকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের কল্যাণ সুরক্ষার এটাই সঠিক পথ। সমাজের যাবতীয় কল্যাণ সুনিশ্চিত করা সকলেরই দাবি। কারণ সমাজ একটি বিশাল-বিস্তৃত ঘর সদৃশ। আর জনগণ সে ঘরের বাসিন্দা। তাদের সমাজ নামক ঘরটি সকল প্রকার হুমকি অরাজকতা, জঙ্গিবাদ ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকলেই তাদের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরেক দিকে লক্ষ্য করলে দণ্ড কার্যকর করা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। তা হচ্ছে, দণ্ডযোগ্য অপরাধীকে তার সামাজিক

[১১৬১]. যেমন, কেউ যদি আংগুরের জুস মদ নয় ভেবে পান করে তবে তার শাস্তি হবে না। অনুরুপভাবে যদি কোনো নারী কোনো পুরুষকে জড়িয়ে ধরে এবং সে তাকে স্বীয় স্ত্রী মনে করে মিলিত হয়, তবে তার ওপরও কোনো শাস্তি আসবে না।

মর্যাদা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে দণ্ড না দিয়ে যদি বিশেষ প্রকারের লঘু শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে সমাজে ঐরূপ অপরাধ করার প্রবণতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং এ জাতীয় অপরাধীরা সেই শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে, যা তাদেরকে অপরাধ করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত। কারণ এ অবস্থায় তখন অপরাধকারীর পারিপার্শ্বিতাকে বিবেচনায় নিতে হবে এবং এ অসংবিধিবদ্ধ স্বতন্ত্র শাস্তি তখন এমন একটি ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে যার কোনো স্পষ্ট সীমারেখা নেই। ফলে এ প্রক্রিয়ার মধ্যে হীন মানসিকতা ও নিকৃষ্ট ভাবনা প্রবেশ করার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। পরিণামে শাস্তি নির্ধারণে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যা সমাজে বড় ধরণের অশান্তি বয়ে আনবে। অথচ শাস্তির উদ্দেশ্য ছিল সমাজ থেকে অশান্তি ও অকল্যাণ দূর করা। কিন্তু এ অশান্তি দূর হবে না এ জাতীয় সকল অপরাধীর ওপর উক্ত দ- কার্যকর করতে হবে। অবশ্য রায় দেওয়ার পূর্বে উত্তমরূপে দেখতে হবে তার প্রাপ্ত বয়ষ্ক হওয়া, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় করা, অনন্যোপায় হয়ে করা, অন্যের চাপে করা এবং অজ্ঞাতবশত: করা হয়েছে ।

সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা ইচ্ছাকৃত হত্যা বা আহত করলে শাস্তি হবে কিসাস, যদি এর শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব বিবেচনা করা যাবে না। তবে দেখতে হবে অপরাধী পূর্ণ বয়ষ্ক কি-না, তার বিবেক বুদ্ধি আছে কি-না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে কি-না। তার ব্যক্তিগত বিষয়ে কেবল এ দিকগুলোই বিবেচনা করা হয়েছে। অবশ্য আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার ওয়ারিশগণের জন্য শরী'আত অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার দিয়েছে। তারা ক্ষমা করে দিলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য আদালত তখনও তাকে শিক্ষামূলক অন্য শাস্তি তা'যীর **(تعزيز)** দেওয়ার অধিকার রাখে। অন্যান্য অপরাধে অর্থাৎ যেসব অপরাধে লঘু শাস্তি দেওয়া হয় এবং শরী'আত কোনো শাস্তি নির্ধারণ করে নি, সেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, তার মর্যাদা, গতি-প্রকৃতি ও পূর্বের কৃত্তি বিবেচনা করা আবশ্যক। কারণ, এসব অপরাধে ক্ষতির দিক হদ ও কিসাসের অপরাধের ন্যায় চরম পর্যায়ের নয়। সে জন্য এ জাতীয় অপরাধের বিশাল ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র শাস্তি বিবেচনা করার সুযোগ যথেষ্ট আছে এবং তার সংখ্যা অনেক।

ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বৈশিষ্ট্য

ইসলাম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান প্রবর্তন করে তার কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেছে। তা নিম্মরূপ-

১. শাস্তির আইন বিধিবদ্ধ

ইসলামী শরী'আতে অপরাধ হলো, শরী'আতের সে সব নিষিদ্ধ বিষয় যেগুলোর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হদ বা তা'যীর দ্বারা সতর্ক করেছেন।"[১১৬২] শরী'আতের নিষিদ্ধ বিষয়াদি বলতে সে সব কাজ বুঝায় যা করতে বা ছাড়তে শরী'আত নিষেধ করেছে। এক কথায়, করণীয় কাজ না করা অথবা নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার নামই অপরাধ। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কর্ম সম্পাদন কিংবা বর্জন এ দ্বিবিধ বিষয়ই অপরাধ। কেননা ইসলামী শরী'আত একে নিষিদ্ধ বা অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। অনুরূপ শাস্তির উৎসও শরী'আত। শরী'আত বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য বিশেষ বিশেষ শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়ে বলে দিয়েছে যে, এই অপরাধের এই শাস্তি। ইসলামী শরী'আতে এ শাস্তি দু প্রকার-

প্রথম প্রকার : নির্ধারিত শাস্তিসমূহ, যা প্রথম থেকেই শরী'আত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে, হদ, কিসাস ও দিয়াত।

দ্বিতীয় প্রকার : ঐসব শাস্তি যার প্রকার বা স্বরূপ শরী'আত বর্ণনা করেছে; কিন্তু তার পরিমাণ ধার্য করার দায়িত্ব বিচারকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক অপরাধের সাথে শাস্তির প্রকারগুলোর মধ্য থেকে যেটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি নির্বাচন করবেন এবং শাস্তির মাত্রাও নির্ধারণ করবেন। এই শ্রেণির শাস্তিকে বলা হয় তা'যীর (তিরস্কারমূলক শাস্তি)। শরী'আত তা'যীরের প্রকার বর্ণনা করে দিয়েছে। যেমন, বেত্রাঘাত, জেল, ভৎর্সনা ইত্যাদি। বিচারক এগুলোর মধ্য থেকে একটিকে নির্বাচন করে মাত্রা বা পরিমাণ ঠিক করে দিবেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি যদি কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত নির্বাচন করেন, তা হলে সে বেত্রাঘাত

[১১৬২]. আল-মাওয়ারদী, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ২১১

দশটি হবে না-কি বেশি হবে, তার পরিমাণও বলে দিবেন। তবে শাস্তির ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ বিচারকের ইখতিয়ার তার খেয়াল-খুশীমত হবে না; বরং তা হবে বিধিবদ্ধ নিয়মের সাথে সঙ্গতি রেখে। বিচারকের কর্তব্য সে সব নিয়ম রক্ষা করা। ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তা'যীর শাস্তির ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ করার দায়িত্ব বিচারক বা নির্বাহী প্রধানের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলেও ইসলামী শরী'আতই এর মূল উৎস। শাস্তি আইনের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এমন কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না, যা ইসলাম উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণে নির্ধারিত হয়নি। সুতরাং শাস্তির আইন বিধিবদ্ধ থাকাই ইসলামী শরী'আতে শাস্তির প্রথম বৈশিষ্ট্য।

২. শাস্তির স্বাতন্ত্র্য

ইসলামে শাস্তির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য শাস্তির স্বাতন্ত্র্য। এর অর্থ, শাস্তির মূলে বা অপরাধের সাথে জড়িত নয় এমন ব্যক্তির ওপর শাস্তি প্রয়োগ না হওয়া। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।"[১১৬৩] আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণেই তা করে। আর যে মন্দ কাজ করে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে।"[১১৬৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "কোনো লোককে তার পিতার পাপে বা ভাইয়ের পাপে অভিযুক্ত করা যাবে না।" বস্তুতঃ শাস্তির স্বাতন্ত্র্যসত্তার দাবী হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং স্বজনের পাপে স্বজনকে এবং বন্ধুর পাপে বন্ধুকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ও যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের প্রথম যুগের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অকথ্য নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে। সে কারণে তাদের অপরাধে তাদের স্বজনদেরকে মুসলিমরা অভিযুক্ত করেনি। ভুলবশতঃ হত্যায় অপরাধীর স্বজনদের ওপর দিয়াত (রক্তমূল্য) আরোপ করায় এ স্বাতন্ত্র্য লোপ পায় না বা ক্ষুন্ন হয় না। কেননা, স্বজনদের ওপর দিয়াত আরোপে অপরাধীর শাস্তি প্রত্যাহার হয়ে স্বজনদের ওপর চলে যায় না কিংবা তাদেরকে দিয়াতের শাস্তিতে শরীকও গণ্য করা হয় না। বস্তুত স্বজনদের ওপর দিয়াত আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে অপরাধীর প্রতি সহানুভুতি ও সহযোগিতা প্রকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ স্বজনদের পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার অপরাধীর রয়েছে। তাই বলে বলা যাবে না যে, সাহায্য-সহানুভুতি দেখানো স্বজনদের ওপর ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব বলা হলে তা আর সহানুভুতির পর্যায়ে থাকে না; বরং এটা হয়ে যাবে অপরাধীর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করে নিরপরাধীর ওপর আরোপ করার শামিল। এ দ্বারা শাস্তির স্বাতন্ত্র্য ভুলুণ্ঠিত হয়; কিন্তু এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শরী'আত এমন ব্যক্তির ওপর সহমর্মিতা দেখানো ওয়াজিব করে দেয়, যে আদৌ পাপ করে নি। যেমন দরিদ্র অভাবী প্রতিবেশীকে সাহায্য করা ধনীর ওপর ওয়াজিব করা হয়েছে। এখানে সাহায্যের ভিত্তি হচ্ছে সহানুভুতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন। শরী'আত একে দরিদ্র প্রতিবেশীর পক্ষে ধনীর ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছে। এমন কি সে যদি তা স্বেচ্ছায় দিতে অস্বীকার করে তাহলে আদালত তাকে বাধ্য করবে। তারপরে আরও বলা যায় যে, স্বজনদের ওপর দিয়াত ওয়াজিব হওয়ার পুরস্কার অনুপাতে দণ্ড নীতির বাস্তবায়ন। স্বজনদের সকল সদস্য উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মিরাছ হলো পুরস্কার। ওয়ারিসসূত্রে প্রাপ্ত এ পুরস্কার তারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিবে। তেমনিভাবেই তারা ঋণের ভারও নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিবে। সেই ঋণ হলো দিয়াত। কিছু সংখ্যক ফকীহ স্বজনদের ওপর দিয়াত ধার্যের ভিন্ন এক ব্যাখ্যা দেন। তার সার সংক্ষেপ হলো, স্বজন বা নিকটাত্মীয়দের অন্যতম দায়িত্ব হলো তাদের অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। যাতে তারা নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বল্গাহীনভাবে না বেড়ায় এবং কোনো প্রকার অপরাধে লিপ্ত না হয়। যদি তাদের মধ্যে কেউ ভুলক্রমে হত্যা করার ঘটনা ঘটায় তা হলে বুঝা যাবে তার স্বজনরা এই অপরাধীর বেলায় দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে। ফলে নিয়ন্ত্রণহীন, উদাসীন ও অদূরদর্শী হয়ে সে ভুল হত্যার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে, যা একটি বড় ধরনের অপরাধ। সুতরাং আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনে ক্রটি করায় এই অপরাধীর সাথে স্বজনদের ওপরও দিয়াত ওয়াজিব হবে।

[১১৬৩]. আল-কুরআন, ৩৫: ১৮
[১১৬৪]. আল-কুরআন, ৪৫: ১৫

উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বয়ের যে কোনোটি গ্রহণ করা হোক না কেন স্বজনদের ওপর দিয়াত ওয়াজিব হওয়ায় শাস্তির স্বতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয় না।

৩. সার্বজনীনতা

ইসলামে শাস্তির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য শাস্তির সর্বজনীনতা। অপরাধী যেই হোক ইসলামের শাস্তি বিধান তার ওপর কার্যকর হবে। কেউ এর থেকে রেহাই পাবে না। এখানে শাসক-শাসিত, শরীফ-ইতর, উচ্চ শ্রেণি-নিম্ন শ্রেণি, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ ও সবল-দুর্বলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করতে শরী'আত কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দণ্ডবিধি সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকরি না করা গোটা জাতি ধ্বংসের কারণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হয়েছে; কারণ তাদের মধ্যে অভিজাত শ্রেণির কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। পক্ষান্তরে কোনো দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে দণ্ডিত করা হত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে দিব।"[১১৬৫] হযরত উসামা (রা.) যখন মাখযুম গোত্রের জনৈকা মহিলা চোরের ব্যপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে সুপারিশ নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি রাগত স্বরে বলেছিলেন, "তুমি কি আল্লাহর একটি হদ্দের প্রসঙ্গে আমাকে সুপারি করছো।"[১১৬৬] বস্তুত ইসলামে শাস্তি প্রয়োগের এ সমতা নীতিই সমাজের সেসব প্রভাবশালী লোকদেরকে দমিয়ে দিতে সক্ষম যারা তাদের শক্তির জোরে অপরাধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মে আকৃষ্ট হয়। তাদের মনে যদি এই ধারণা থাকে এবং আশা পোষণ করে যে, সামাজিক প্রভাবের কারণে তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবে তা হলে তো তারা শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি তারা এ শাস্তিকে পূর্ণ সমতার সাথে কঠোরভাবে প্রয়োগ হতে দেখে তা হলে তারা দমে যাবে। তাদের বাতিল ধান্দা আর সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। তারা যত বড় ক্ষমতাধর হোক না কেন শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। কেননা রাষ্ট্রের শক্তি তাদের শক্তি থেকে অনেক বড়। ফলে সমাজের দুর্বল লোক স্বস্তি লাভ করবে এবং তাদের জান, মাল ও সম্মান প্রভাবশীলদের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ মনে করবে। এ অবস্থায় সে যে কোনো প্রভাবশালী লোকের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কারণ রাষ্ট্র তার পক্ষে আছে। আইনের দৃষ্টিতে শাস্তির সমতা রক্ষা করা যখন ওয়াজিব তখন তা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। সুপারিশ বা অন্য কোনো পন্থায় অপরাধীর শাস্তি প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে।"[১১৬৭] যে ব্যক্তি অপরাধীর শাস্তি রহিত করার সুপারিশ করবে তার সুপারিশ নিঃসন্দেহে একটি মন্দ সুপারিশ বলে বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর বিধান কার্যকর করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, সে মূলত: আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে।"শরয়ী শাস্তি মওকুফ করার জন্য সুপারিশ করা যেমন অবৈধ, তেমন অপরাধির কৃত অপরাধ ও শরী'আতের বিরোধিতার কারণে প্রাপ্ত শাস্তি বাতিল করা কিংবা ক্ষমা করে দিতে অপরাধীর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করা কর্তৃপক্ষের জন্য অবৈধ। চাই সে অর্থ বায়তুল মালে (রাজকোষে) জমা হোক বা অন্য কেউ ভোগ করুক। এ অর্থ ঘৃণিত অপবিত্র এবং ঘুষ। এ শাস্তিগুলো হলো তা শরী'আতের স্থিরকৃত সিদ্ধান্ত। তবে দু'টি বিষয়ে ইমামদের মধ্যে কিছু ভিন্নমত রয়েছে।

প্রথমত : রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিজের বিরুদ্ধে হদ জারি বিষয়ে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিজের বিরুদ্ধে হদ জারি বিষয়ে মতভেদ এ কারণে নয় যে, শরী'আতের শাস্তি বিধানে অসমতা আছে। এর কারণ অন্য কিছু। বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা এই, হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিজের বিরুদ্ধে হদ জারি করা ওয়াজিব মনে করেন না। কিন্তু জমহুর ফকীহগণের মতে, ইসলামের হদ জারি করা নিজের বিরুদ্ধে হলেও রাষ্ট্র প্রধানের ওপর বর্তায়। হানাফীগণের যুক্তি হলো, রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিজের ওপর হদ বাস্তবায়ন বা কার্যকর করা সম্ভব নয়। কেননা রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য নাগরিকদের ওপর যেহেতু হদ জারি করেন

[১১৬৫]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৭৫
[১১৬৬]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৭৫
[১১৬৭]. আল-কুরআন, ৪: ৮৫

তিনিই। তাই নিজের ওপর হদ জারি করতে তিনি অপারগ। কেননা হদ জারি করা হয় লাঞ্ছনাসহ শিক্ষামূলক শাস্তি হিসেবে। এই জিনিস কেউ নিজের ওপর প্রয়োগ করতে পারে না। যখন শাস্তি বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে গেল, তখন শাস্তির হুকুম দেওয়ার অপরিহার্যতা আর থাকল না। তবে রাষ্ট্র প্রধান ব্যতীত আর যত আমলা ও প্রশাসক আছেন, তাদের ওপর হদ জারির ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই, যদি তারা হদের উপযুক্ত অপরাধ করেন। আর জমহুরদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, হদ জারির ক্ষেত্রে নাগরিক ও রাষ্ট্র প্রধান সবাই সমান। কোনো ভেদাভেদ নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গি অতি উত্তম। এ রকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর নীতি ছিল, যদি কিসাসের উপযোগী কোনো কাজ তাঁর থেকে প্রকাশ পেত তাহলে তার থেকে কিসাস (অনুরূপ বদলা) নেওয়ার আহ্বান জানাতেন। হদ যেহেতু আল্লাহর হক তাই একে কার্যকরী করার প্রতি মনোযোগী হওয়া অধিক প্রয়োজন। কারণ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অশান্তির মূলোচ্ছেদের মধ্যেই নিহিত। জমহুরদের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে যুক্তি হচ্ছে, শরী'আতের শাস্তির নির্দেশ একটি 'আম বা সাধারণ নির্দেশ। শাসক-শাসিত সবাই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। অন্য দিকে অন্যায় অপরাধ করা সকলের জন্য হারাম নিষিদ্ধ। যার মধ্যে রাষ্ট্র প্রধানও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অন্যরা অপরাধ করলে যে শাস্তি পাবে, রাষ্ট্র প্রধান অপরাধ করলেও একই শাস্তি পাবে। বাকী থেকে শাস্তি বাস্তবায়ন করার বিষয়। এ ব্যাপারে জমহুর ফকীহগণ বলেন, রাষ্ট্র প্রধানের ওপর শাস্তি জারি করবে তার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি। কেননা এটা করা হবে তার কল্যাণ ও জনগণের কল্যাণে।

দ্বিতীয়ত : ইসলামের দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্থান বিবেচনা বিষয়ে। ইসলামে শাস্তির সার্বজনীনতা স্থানকাল নির্বিশেষে সর্বত্র প্রযোজ্য। তবে এই সার্বজনীনতার বাস্তব প্রয়োগ ইসলামী রাষ্ট্রেই (দারুল ইসলাম) সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে অবস্থানকারী সকলের ওপর এ নির্দেশ কার্যকর হবে। ইসলামী শরী'আত মূলতঃ একটি বিশ্ব ব্যবস্থা। তাই এর শাস্তি বিধান মূলগতভাবে সকল মানুষের জন্য প্রণীত। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব না থাকায় কেবল ইসলামী রাষ্ট্রেই এর প্রয়োগ সীমিত। অন্য দেশে নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, শরী'আতের মূল দাবী হচ্ছে তার বিধান সকল মানুষের জন্য সর্বব্যাপী। কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্রে (দারুল হারব) কর্তৃত্ব না থাকায় তথায় জারি করা সম্ভ নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে সম্ভব বিধায় এখানে জারি করা অপরিহার্য।'[১১৬৮] এ নিয়মের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত সকল অপরাধে শর'ঈ শাস্তি প্রয়োগ হবে। অপরাধ কে করল তার জাত বা ধর্মের দিকে তাকাবার কোনোই প্রয়োজন নেই। মুসলিম, জিম্মি, আশ্রয় গ্রহণকারী সবার ওপর এ শাস্তি কার্যকর হবে। রাষ্ট্র ক্ষমতার ব্যাপকতার এটাই সাধারণ নিয়ম। তদুপরি মুসলিম ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী বিধান নিজের ওপর বাধ্য করে নেয়। জিম্মি চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় এ বিধানকে মেনে নেয়। অনুরূপ আশ্রয়প্রার্থী ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করায় যতদিন থাকবে ততদিন এ বিধান শিরোধার্য করে নেয়। অথবা সে যদি এ আইন না মেনে আশ্রয় গ্রহণ করে তবুও তার ওপর এ আইন স্বাভাবিকভাবে কার্যকর হবে, যেহেতু রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী ক্ষমতা দেশের সকল জনগোষ্ঠীর ওপর সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত। তবে শাখা মাসয়ালায় ফকীহগণের মধ্যে জিম্মিদের ব্যাপারে অল্প এবং আশ্রয় প্রার্থীদের ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা ও তদীয় শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে আশ্রয় গ্রহণকারীদের ওপর হদ প্রয়োগ করা যাবে না, যা কেবল আল্লাহর হক; বরং তাদেরকে তা'যীর বা লঘু দণ্ড দেওয়া যাবে। জমহুরের মতের, তাদের ওপর হদ জারি করতে হবে। অনুরূপভাবে জমহুর ফকীহগণ জিম্মি ও আশ্রয় গ্রহণকারীগণকে মদপানের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার কথা বলেন। কেননা অমুসলিমরা তাদের ধর্মমতে মদ্যপানকে হারাম জানে না। জমহুরদের মতে মদখোর শাস্তি পাবে। চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক।

শাস্তির প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। যেমন-

ক) একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক থাকার দৃষ্টিতে শাস্তি চার প্রকার-

[১১৬৮]. আল্লামা কাসানী, বাদাইয়ুস সানাঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩১১

Dhaka University Institutional Repository

১. মৌলিক বা প্রকৃত শাস্তি : কোন নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য শরী'আত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে মূলত যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন- হত্যার জন্য কিসাস, চুরির জন্য হস্ত কর্তন ইত্যাদি।

২. বিকল্প শাস্তি : শরয়ী কোন কারণে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি যদি প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় তবে মূল শাস্তির পরিবর্তে যে শাস্তি প্রদান করা হয় তাই বিকল্প শাস্তি। যেমন কিসাস-এর বিকল্প দিয়াত, হদ্দ এর বিকল্প তা'যীর।

বিকল্প শাস্তি হিসেবে যা উল্লেখ করা হল বিকল্প শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তা প্রকৃত অর্থে মৌলিক ও প্রকৃত শাস্তি। যখন কঠিনতর শাস্তি প্রয়োগ করা সম্ভব না হয়, তখন তার পরিবর্তে বিকল্প শাস্তিই অন্য শাস্তির তুলনায় কঠিন। যেমন সাদৃশ ইচ্ছেকৃত হত্যার প্রকৃত শাস্তি হল দিয়াত। কিন্তু কিসাস-এর বিপরীতে এ শাস্তিকে বিকল্প শাস্তি হিসেবে মনে করা হয়। এমনিভাবে তা'যীর মূলত প্রকৃত শাস্তি। কিন্তু শরয়ী কোন কারণে যদি কিসাস বা হদ কায়েম করা না যায়, তখন তা'যীর হিসেবে যখন হত্যার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তা হবে বিকল্প শাস্তি।

৩. অনুগামী শাস্তি : এমন শাস্তি যার জন্য কোন ধরনের নির্দেশনা বিচারকের পক্ষ থেকে দেয়ার প্রয়োজন নেই। বিচারক অপরাধ সাব্যস্ত হলে শরী'আত নির্ধারিত মৌলিক শাস্তি নির্ধারণ করলেই তার অনুগামী হিসেবে আপনা আপনিই সে শাস্তি অপরাধীর উপর বর্তাবে। যেমন: হত্যাকরীর মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া। অর্থাৎ কোন হত্যাকারীর হত্যা প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক এই মর্মে রায় দিলেন যে, তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। তিনি রায়ে একথা উল্লেখ করেননি যে, হত্যাকারী মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। এমতবস্থায়ও হত্যাকারী মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ, মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া মূল শাস্তি নয়, অনুগামী শাস্তি। এমনভিাবে কোন ব্যক্তি অপবাদের শাস্তিতে দন্ডিত হলে সে অনুগামী শাস্তি হিসেবে সাক্ষানের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। বিচারকের পক্ষ থেকে সাক্ষানের অযোগ্য হিসেবে কোন রায় ঘোষণার প্রয়োজন নেই।

৪. পরিপূরক শাস্তি : বিচারক কোন অপরাধীর জন্য নির্ধারিত মূল শাস্তির পরিপূরক হিসেবে যে শাস্তির নির্দেশ দেন, তা হলো পরিপূরক শাস্তি। যেমন বিচারক কোন চোরের চুরি সাব্যস্ত হওয়ায় তার হাত কর্তনের রায়-এর সাথে আরো নির্দেশ দিলেন যে, হাত কর্তনের পর তা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। গলায় ঝুলিয়ে রাখার কাজটি মূল শাস্তির বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত। মূল শাস্তি বাস্তবায়নের পূর্বে এককভাবে এটি করার সুযোগ নেই। অনুগামী শাস্তি ও পরিপূরক শাস্তির দুটোই মূল শাস্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে। পার্থক্য হচ্ছে, অনুগামী শাস্তির বিষয়টি বিচারকের রায়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই কিন্তু পরিপূরক শাস্তির ক্ষেত্রে তা বিচারকের রায়ে উল্লেখ করার আবশ্যকতা রয়েছে।[১১৬৯]

খ) প্রয়োগের স্থানভেদে শাস্তি তিন প্রকার-

১. শারীরিক শাস্তি : এমন শাস্তি যা মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হয়। যেমন মৃত্যুদন্ড, বেত্রাঘাত ও জেল ইত্যাদি।

২. মানসিক শাস্তি : এমন শাস্তি যা মানুষের মনে দাগ কাটে, শরীরের উপর বর্তায় না। যেমন উপদেশ, ধমক, ভর্ৎসনা ইত্যাদি।

৩. অর্থনৈতিক শাস্তি বা অর্থদন্ড : এমন শাস্তি যা অপরাধীর মালের উপর বর্তায়। ফলে সে কষ্ট পায়। যেমন দিয়াত, জরিমানা ইত্যাদি।

গ) বিচারকের রায় বাধ্যতামূলক হবার দিক থেকে শাস্তি দুই প্রকার-

১. নির্ধারিত শাস্তি : ঐসব শাস্তি শরী'আত প্রণেতা যার ধরণ ও প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর তিনি বিচারককে তাতে কম-বেশিকরণ ছাড়াই প্রয়োগের জন্য বাধ্য করেছেন, যার কোন বিকল্প বিধান করার সুযোগ নেই। যা ক্ষমা করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানকেও দেয়া হয়নি। যেমন ব্যভিচারের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত। হত্যার শাস্তি কিসাস বা দিয়াত।

২. অনির্ধারিত শাস্তি : আইনে বিভিন্ন ধরণের শাস্তির উল্লেখ থাকে। তা থেকে অপরাধেরও অপরাধীর ধরণ ও অবস্থা বুঝে বিচারক যে কোন একটি বা একাধিক শাস্তি অপরাধীর জন্য নির্ধারণ করে দিবেন।

[১১৬৯]. আব্দুল কাদের আওদাহ, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ.৬৩২-৬৩৩

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধ মানব সমাজের মতোই আদি একটি সামাজিক প্রপঞ্চ। মূলত অপরাধ মানুষের অন্তর্নিহিত দুস্প্রবৃত্তির এক চিরন্তন কদর্য অভিব্যক্তি। মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে অনেক মহৎ গুনাবলীর অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন, যুগপৎভাবে মানুষ ষড়রিপুর দ্বারাও তাড়িত। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ নিজের অন্তনির্হিত দুস্প্রবৃত্তির তাড়নায় নানারূপ অন্যায় ও অবৈধ কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে হযরত আদম (আ.) কে প্রথম মানুষ হিসেবে প্রেরণ করেন এবং মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে গন্ধম ফল খাওয়ার অপরাধে তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম অপরাধ সংঘটিত হয় যখন কাবিল হযরত হাবিলকে হত্যা করে। সে রক্তপাত হতে শুরু করে অদ্যবধি পর্যন্ত পৃথিবীতে নানা ধরনের অপরাধ যেমন-হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বিরাজমান। সুতরাং, এ কথা সহজেই অনুমেয়, অপরাধ সমাজের মধ্যে আদি ও চিরন্তন।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজ বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার ও বর্বরতায় নিমজ্জিত ছিল। তাদের মধ্যে কুসংস্কার এতবেশি প্রবল ছিল যে, দেব-দেবীর অলীক ইচ্ছা না জেনে তারা কোন কাজ করত না। তীর নিক্ষেপ করে দেবতার মনোভাব নির্ণয় করত। দেবতার সন্তুষ্টির জন্য প্রায়শই নরবলি দেয়া হত। সমাজে নারীদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। নারীর কোন অধিকার বা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। সমাজে বহুপত্নী ও বহুপতি প্রথা ছিল। সমাজে ক্রীতদাস প্রথাও চালু ছিল। সামাজিক অনাচার, অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ অসাম্য, মদ্যপান, জুয়াখেলা প্রচলিত ছিল। হত্যা, লুটতরাজ, রাহাজানি, ছিনতাই ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। একটি গোত্র অপর গোত্রের উপর বিনা কারণে ঝাঁপিয়ে পড়ত, এমন কি বংশ পরম্পরায় দীর্ঘ যুদ্ধাবগ্রহ লেগে থাকত। কথিত আছে, সামান্য ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা নিয়ে বংশ পরিক্রমায় শতশত বৎসর যুদ্ধ চলেছিল। তাদের মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রু, জান-মালও হরণ করা হত। তাদের অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছে ছিল যে, ঐশী হস্তক্ষেপ ছাড়া এগুলো প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। ঠিক এমনই এক প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা মানবতার মুক্তির জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি মানব সমাজে তাঁর দেওয়া বিধান প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাজকে অন্যায় ও অপরাধের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করেন।

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত আসমানী কিতাবগুলোতে (তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল) যেসব মৌলিক ধর্মীয় ভাবধারা প্রচলিত হয়ে আসছিল, রাসূলুল্লাহ (স.) সেই ধারাকেই আরো গতিশীল, বেগবান, সংযোজিত ও শক্তিশালী করে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আগমণের পূর্বে প-িমে যে বিশাল রোমান সাম্রাজ্য এবং পূর্বে যে বিস্তৃত পারস্য সাম্রাজ্য ছিল, তার অধিকাংশ অধিবাসীই আসমানী কিতাবের বিধান পরিহার করে মানব সভ্যতাকে অপরাধের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছিল। মানুষে মানুষে, ধনী-গরীবে, নর-নারীতে এত বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, মানুষের সাধারণ জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। প্রশংসিত রোমান আইনেও দাসকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হত। সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিল না। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করে ঘোষণা করেন আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, সাদা-কালো, প্রভু-ভৃত্য, সবাই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান। বিনা বিচারে মৃত্যুদন্ড, ব্যভিচার, অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ, কন্যা সন্তান ও দাসদের হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের মধ্যে একই ইসলামী আইন আইন প্রয়োগ করা হয়। এভাবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় ইসলামী আইনের আলোকে দন্ডবিধি ও দেওয়ানী আইন প্রণয়ন করা হয়। মানব সমাজ সততই পরিবর্তনশীল। মানব সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতির সাথে সাথে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু নিয়ম ও বিধি বিরচিত হয়েছে। ইসলামী শরী'আত সতত পরিবর্তনশীল সমাজের সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা অদ্যবধি কার্যকর। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে মানুষকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ নির্দেশ ভঙ্গ করা হলে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং অপরাধ মানব সভ্যতার জন্য হুমকি ও সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। নিম্নে এ অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

ঘ) শরী'আতের বিধি-নিষেধের অবাধ্য ও অমান্যকারী অপরাধীদের শাস্তি দু'ধরণের-

প্রথমত : পরকালীন শাস্তি

সে দিন শাস্তির বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার হাতেই ন্যাস্ত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।"[১১৭০] ইসলামী শরী'আতে পরকালীন এ শাস্তিই আসল শাস্তি। কেননা এ শাস্তি হবে মানুষের পরীক্ষাকাল তথা পার্থিব জীবন শেষ 'আমলনামা গুটিয়ে নেওয়ার পর। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সব 'আমলের মূল্যায়ন করা হবে। এ মূল্যায়নের ভিত্তিতে আল্লাহ আখিরাতে হিসেব গ্রহণ করবেন। এ কারণে আখিরাতকে বলা হয়েছে **يوم الدين** (প্রতিদান দিবস) তথা **يوم الحساب** (হিসেব গ্রহণ দিবস)। পরিশেষে সৎকর্মশীলগণ তাদের উপযুক্ত পুরষ্কার পাবে এবং অপরাধী পাবে তার যথোপযুক্ত শাস্তি। আখিরাতে এ শাস্তি আল্লাহ তা'আলার ন্যায় বিচারেরই দাবী এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের অপরিহার্য পরিণতি।

দ্বিতীয়ত: পার্থিব শাস্তি

এ ধরণের শাস্তি দু' প্রকারের হয়ে থাকে-

প্রথম প্রকার : আল্লাহ তা'আলার পার্থিব নীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি জগতে এ শাস্তি হয়ে থাকে। এর পশ্চাতে থাকে কারণ ও তার প্রতিক্রিয়া এবং কতিপয় পটভূমির মিলিত ফলাফল। আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যাত হলে ব্যক্তি ও সমষ্টির ওপর এ জাতীয় শাস্তি নেমে আসে। এর ধরণ হয় বিভিন্ন রকম। কখনও গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, কখনও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ ও মতভেদ সৃষ্টি করে শত্রুজাতির পরাধীন করে দেওয়া হয়, কখনও তাদের ওপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও কষ্টকর জীবন চাপিয়ে দেওয়া হয় অথবা দারিদ্রতা, ভয়ভীতি ও অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং জনসংখ্যা ও ফসল-ফলাদির উৎপাদন হ্রাস করে দেওয়া হয় কিংবা অন্য কোনো শাস্তির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটাই আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।"[১১৭১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে।"[১১৭২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফেরদের অবস্থা এরূপই হবে।"[১১৭৩] আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তির ব্যাপারে তাঁর নীতির কোনো বদল বা পরিবর্তন হয় না। ধ্বংসই তাদের অনিবার্য পরিণতি। এটা আল্লাহর সেই শাস্তি, যা কারণ, কারণের প্রতিক্রিয়া ও সমন্বিত পটভূমির ফলাফল হিসেবে কোনো জনগোষ্ঠির ওপর তাঁর স্থায়ী নীতির ভিত্তিতে কার্যকর হয়। এ নিয়ম লঙ্ঘন হওয়া বা বাতিল হওয়া অসম্ভব। তবে ভিন্ন কোনো কারণ থাকলে পরিণতি বিলম্বে হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এসব জনপদকেও আমি ধংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম।"[১১৭৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এই তো তাদের বাড়িঘর, তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে।"[১১৭৫] জন সমষ্টির মধ্যে যুলুমের প্রসার হওয়া তাদের ধ্বংসের কারণ। আর ধ্বংস হওয়া পার্থিব শাস্তিসমূহের মধ্যে এক প্রকার শাস্তি, যা আল্লাহ অনুসৃত নীতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে

[১১৭০]. আল-কুরআন, ৩: ৩০
[১১৭১]. আল-কুরআন, ৪৮: ২৩
[১১৭২]. আল-কুরআন, ৩: ১৩৭
[১১৭৩]. আল-কুরআন, ৪৭: ১০
[১১৭৪]. আল-কুরআন, ১৮: ৫৯
[১১৭৫]. আল-কুরআন, ২৭: ৫২

সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”[১১৭৬] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আর আল্লাহ তা’আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না।”[১১৭৭] এখানে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, হীনবল হওয়া ও শক্তিহীন হওয়া পারস্পরিক বিবাদ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হওয়ার পরিণতি। অনুরূপ দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানের ওপর ঐক্যবদ্ধভাবে অটল না থাকার পরিণতি শাস্তির দিকে ধাবিত করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “ঐক্য রহমত আর অনৈক্য আযাব।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।”[১১৭৮] মানুষ যখন আল্লাহর যিকির তথা আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে যায় তখন বস্তুগত বা অবস্তুগত বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন প্রকারের জীবনোপকরণের সংকীর্ণতা ব্যক্তি ও সমষ্টিকে গ্রাস করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তোমাদের পূর্ববতী জাতি ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যকার উচ্চ শ্রেণীর লোক চুরি করলে ছেড়ে দেওয়া হতো আর নিম্ন শ্রেণির লোক চুরি করলে শাস্তি দেওয়া হতো।”[১১৭৯] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, শাস্তিদানে পক্ষপাতিত্ব করা এবং আইনকে সমতার সাথে কার্যকর না করা তাদের ধ্বংসের কারণ। এ জাতীয় শাস্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচ্য থাকে। যথা-

ক) কোনো জনগোষ্ঠির মধ্যে যখন এ জাতীয় শাস্তির কারণ বিরাজমান থাকে এবং সে কারণে তাদের ওপর শাস্তি নেমে আসে তখন সৎ-অসৎ সবাই তাতে নিপতিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।”[১১৮০] ইবনু আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীলে বলেন, “আল্লাহর নির্দেশ দিয়েছেন, মুমিনগণ যেন তাদের সমাজের অন্যায়ের প্রশ্রয় না দেয়। দিলে সবাই শাস্তির আওতায় পড়বে।[১১৮১] সৎ লোকদের ওপর শাস্তি আসার দু’রকম ব্যাখ্যা করা যায়-

এক) এ শাস্তিকে রোগের পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে। রোগ যখন মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সুস্থ লোক তাতে আক্রান্ত হয়।

দুই- যে কারণে শাস্তি এসেছে সে কারণ প্রতিহত করতে সৎ লোকদের চেষ্টার ত্রুটি থাকা।

খ) দুনিয়ার এ প্রকারের শাস্তির কারণে অভিযুক্তরা আখিরাতের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না যদিও তারা দুনিয়ার শাস্তি ভোগ করে থাকে। আখিরাতের শাস্তি পাওনা সত্ত্বেও দুনিয়ায় তাদের শাস্তি ভোগ আল্লাহর চিরন্তন বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত এবং পরবর্তীদের জন্য তা শিক্ষা ও উপদেশ হিসেবে গণ্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়”[১১৮২]

দ্বিতীয় প্রকার

সে সব পার্থিব শাস্তি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে ইসলামী শরী‘আতে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে এবং শাসকগণকে তা কার্যকরী করার নির্দেশ দিয়েছে। যারা শরী‘আতের বিধান লংঘন করে, নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত বা অবশ্য করণীয় কাজ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ সে কাজগুলো শরী‘আতে অপরাধ হিসেবে গণ্য তাতে যারা লিপ্ত হয় তারা এ শাস্তির আওতাভুক্ত। যেমন চুরির ক্ষেত্রে হত কর্তন এবং ইচ্ছাকৃত হত্যায় কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি। প্রথম পরিচ্ছেদ শাস্তির উৎস ও ভিত্তি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শাস্তির সাধারণ নীতিমাল, তৃতীয় পরিচ্ছেদে শাস্তির বৈশিষ্ট্য এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে শাস্তির প্রকারভেদ। এ জাতীয় শাস্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচ্য থাকে। যথা-

---

[১১৭৬]. আল-কুরআন, ৩: ১০৩
[১১৭৭]. আল-কুরআন, ৮: ৪৬
[১১৭৮]. আল-কুরআন, ২০: ১২৪
[১১৭৯]. সহীহুহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১৭৫
[১১৮০]. আল-কুরআন, ৮: ২৫
[১১৮১]. কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৩৯১
[১১৮২]. আল-কুরআন, ১২: ১১১

ক) দুনিয়ার এ শাস্তি ভোগকারী ব্যক্তি আখিরাতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে না। কেননা আখিরাতের শাস্তি মওকুফ হয় একনিষ্ঠ তওবার দ্বারা, দুনিয়ার শাস্তি দ্বারা নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।"[১১৮৩]

খ) শাস্তির এ বিধান জারি করার উদ্দেশ্য ইসলামী শরী'আতের বিরোধিতার পথ বন্ধ করা। এ বিরোধিতা মুসলিমদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। কেননা মানুষের সৃষ্টি উপাদানে সীমালংঘন ও অন্যায় যুলুম করার প্রবণতা নিহিত আছে। এই প্রবণতার মূলোৎপাটন করার লক্ষ্যে দুনিয়ার শাস্তির বিধান রাখা একান্তই জরুরী, যাতে ঝোঁক বশতঃ এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে তাকে নিবৃত্ত করা যায়। সেবনে ডাক্তারের উদ্দেশ্য থাকে রোগীকে আরোগ্য দান করা।"[১১৮৪]

শাফে'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা মাওয়ারদী তা'যীর (তিরস্কার, শিক্ষামূলক শাস্তি) সম্পর্কে বলেন, এটাও এক প্রকার দণ্ড । এটা মানুষকে সংশোধন হওয়ার ও সতর্ক থাকার শিক্ষা দেয়।[১১৮৫] মোটকথা : শাস্তির ভিত্তি হলো মানবতার কল্যাণ সাধন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে। এর দ্বারা অপরাধীকে যদিও কিছুটা দুঃখ-যন্ত্রণা ভেগা করতে হয়; কিন্তু তা শাস্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অন্তরায় নয়। আরো স্পষ্ট কথা এই যে, শাস্তির যন্ত্রণা মানুষকে অপরাধ প্রবণতা থেকে বিরত রাখে। আর অপরাধ থেকে বিরত থাকলেই ব্যক্তি ও সমাজে শান্তি বিরাজ করে। কেউ যদি অন্যায় কাজে জড়িত হয় এবং এ জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে এই শাস্তি দেওয়ার মধ্যে সমাজের কল্যাণ নিহিত থাকে। কেননা এর দ্বারা সমাজে সৃষ্ট অপরাধ অপসারিত হয় এবং এর যে অংশটি নষ্ট হয়েছিল তার মুলোচ্ছেদ হয়ে যায়। আর এটা সবার জন্য কল্যাণকর। এমনকি অপরাধী ব্যক্তির জন্যও। অপরাধীর জন্য কল্যাণ এই যে, শাস্তি ভোগের পরে তার অনুভূতিতে স্বীয় অন্যায়, পাপ ও আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার অনুতাপ উদয় হয় এবং উপদেশ-অনুরোধ কাজে না লাগাবার ত্রুটি বুঝতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পাপের উপলদ্ধি ও অনুভূতি অপরাধীর অন্তরে ঈমান জাগ্রত করে দেয়। ফলে সে তওবায়ে নাসূহা করতে সমর্থ হয় এবং অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটায় না।

অনেক পাপী ব্যক্তিকে দেখা গেছে শাস্তি ভোগের পরে পাপ করার পূর্বে সে যেমন ছিল তার চেয়েও অধিক ভালো হয়ে গেছে। সুতরাং শাস্তি তার জন্য কল্যাণ ও সংশোধনের সফল মাধ্যম হিসেবে গণ্য। শাস্তি ভোগের পরে যদি সে তাওবায়ে নাসূহা করতে সক্ষম না-ও হয়, তবুও অন্তত এতটুকু সাবধান ও সতর্ক হয়ে যায় যে, পুনরায় এ অপরাধ করলে প্রথমবারের মতো আবার শাস্তি ভোগ করতে হবে। দেখা যাচ্ছে অন্তরে শাস্তির ভয় থাকা এবং অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করাও তার জন্য এক প্রকার কল্যাণ এবং এটা তার প্রথম বারের শাস্তিরই সুফল। আর যদি সে এর পুনরাবৃত্তি ঘটায় তাহল তা অন্যদেরকে সে কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং সবার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। ফলে এ ক্ষেত্রেও সামাজিক কল্যাণ সুরক্ষিত হবে। এখানে কল্যাণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি উক্ত অপরাধী অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করলে এবং দ্বিতীয়বার শাস্তি দেওয়া হলে তার যতটুকু ক্ষতি হয় তার চেয়ে অন্যরা যে শিক্ষা পায় তার গুরুত্ব অনেক বেশী। নিয়ম হচ্ছে, কোনো ক্ষেত্রে কল্যাণ ও ক্ষতি একত্রিত হয়ে গেলে বৃহত্তর কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়, যদিও তাতে ক্ষতির কিছু দিকও বিদ্যমান থাকে। এ কারণে ইসলামী শরী'আত শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আসল অপরাধী যাতে শাস্তি পায় সে ব্যাপারে বিচারককে দূরদর্শিতা অবলম্বন করতে অনুকম্পা না দেখাতে কিংবা রহমত ও দয়ার দোহাই দিয়ে শাস্তি মওকূফ না করতে কঠিনভাবে তাকিদ দিয়েছে। রহমতের উদ্দেশ্য কেবল করুণা প্রদর্শন করা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য মানব সম্প্রদায়ের উপকার ও কল্যাণ

[১১৮৩]. আল-কুরআন, ৫: ৩৩

[১১৮৪]. আহমদ ইবনু তাইমিয়্যা, *আল-ইখতিয়ারাত আল ইলমিয়্যাহ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪৩২ হি.), পৃ. ১৭২-৭৩

[১১৮৫]. মাওয়ারদী, *আল আহকাম আস-সুলত্বানিয়া* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪৩২ হি.), পৃ. ২১৩

সাধন করা, যদিও সে পথটি হয় অতি তিক্ত ও বিস্বাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[১১৮৬] ডাক্তার যদি রোগীর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না করে এবং চিকিৎসার জন্য গরম লোহা দ্বারা শরীরে দাগ দেওয়া আবশ্যক হলেও দয়া দেখিয়ে তা থেকে বিরত থাকে, তাহলে এ দয়া রোগীকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিবে। তখন ডাক্তারকে রোগী ও তার পরিবারের জন্য দয়ার্দ্র না বলে বলা হবে নির্দয়-নিষ্ঠুর, চিকিৎসার কাজে চরম অবহেলাকারী।

ঘ) বিচারকের শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণের এখতিয়ার থাকা না থাকার দিক থেকে শাস্তি দুই ধরণের-

১. শরী'আত বা রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি : এক্ষেত্রে বিচারকের কম বা বেশি করার কোন এখতিয়ার নেই। যেমন হদ্দ হিসেবে নির্ধারিত বেত্রাঘাত, ভর্ৎসনা করা কিংবা উপদেশ দেয়া।

২. এমন শাস্তি যার ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ দুটি সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিচারককে সেক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তিনি অবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ শাস্তির কোন একটি কিংবা তার মাঝামাঝি কোন শাস্তির রায় ঘোষণা করতে পারবেন। যেমন জেল, জরিমানা, তা'যীর হিসেবে বেত্রাঘাত ইত্যাদি।

ঙ) যে সব অপরাধের ওপর ভিত্তি করে শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তা চার প্রকার[১১৮৭]

প্রথমত : হদ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি। হুদূদ শব্দটি হদ্দ এর বহু বচন। এর আভিধানিক অর্থ বাধা দান বা বারণ করা। দু বস্তুর মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধককেও হদ্দ বলা হয়। এ অর্থের নিরিখে সীমানা, পরিধি ও প্রান্তভাগ প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহার করা হয়।[১১৮৮] সুতরাং প্রত্যেক জিনিস যা মানুষকে কোন কিছু থেকে মানুষকে বারণ করে রাখে তাকে হদ্দ বলা হয়। এ অর্থের নিরিখে আরবীতে দারোয়ান ও কারারক্ষীকে হাদ্দাদ বলা হয়। কেননা তাদের একজন অপরিচিত কাউকে বাইর থেকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। অপরজন কয়েদীদেরকে ভেতর থেকে বাইর যেতে বারণ করে।আর 'হুদূদুল্লাহ' বলতে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' হল কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ। হানাফীগণের মতে, হদ্দ হল আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রবর্তিত শরী'য়াতের সুনির্ধারিত শাস্তি।[১১৮৯] শাফি'ঈদের মতে, হদ্দ হল যে সব অপরাধের জন্য আল্লাহর কিংবা কোন মানুষের অধিকার অথবা একসাথে আল্লাহ ও মানুষের অধিকার বিঘ্নিত হয়, সে সব অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তি।[১১৯০] এ ধরনের শাস্তিসমূহে বান্দাহর অধিকারের চাইতে আল্লাহর অধিকারের বাস্তবায়নের দিকটি প্রবল ধরা হয়। এ কারণেই কিসাসকে হদ্দ বলা হয় না। কেননা এতে আল্লাহর অধিকারের চাইতে বান্দাহর অধিকার বাস্তবায়নের দিকটি প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। অনুরীপভাবে তা'যীরকেও হদ্দ বলা হয় না। কেননা এটা সুনির্ধারিত নয়। কারো কারো মতে, কিসাস হদ্দের অন্তর্ভূক্ত তাদের মতে, বিভিন্ন অপরাধের জন্য শরী'আতের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহই হল হুদূদ। চাই তা আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার জন্য ফরয করা হোক কিংবা বান্দাহর হক প্রতিষ্ঠার জন্য করা হোক।[১১৯১] কেননা হদ্দের আওতাভূক্ত অপরাধগুলোর দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শাস্তি কার্যকর করলে সমাজ উপকৃত হয়। শরী'আতের হদ্দগুলো হল- চুরি, ডাকাতি,সন্দাস, জঙ্গিবাদ, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ ও মদ্যপানের শাস্তি। তবে কোন কোন ফকীহ ধর্মান্তর ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তিকে হদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, কোন কোন হদ্দ সাধারণত কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইন নির্মম। কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করার অধিকারীও নয়। কিন্তু সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তদুপরি

১১৮৬. আল-কুরআন, ২৪: ২

১১৮৭. আব্দুল কাদের আওদাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৬৩২-৬৩৪

১১৮৮. ইব্রাহীম মুস্তফা গং, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (দেওবন্দ: ইউ. পি : কুতুবখানা হুসাইনিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ১৬০

১১৮৯. আবু বকর মুহাম্মদ সারাখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ, ১ম সংস্করণ: ১৪১৪ হি.), খ. ৯, পৃ. ৩৬

১১৯০. আল-জুমাল, *ফুতুহাতুল ওয়াহহাব* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি), খ. ৫, পৃ. ১৩৬

১১৯১. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ৩৬

অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলেও হদ্দ অকার্যকর হয়ে যাবে। তবে কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তেও অনুপস্থিতির কারণে হদ্দ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এ নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র বা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে সাধারণ দণ্ড দেবেন। যেমন চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ক্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেয়া যাবে না বটে; কিন্তু এমনতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং অবস্থানুযায়ী সাধারণ অন্য কোন দণ্ড দেয়া হবে। হুদুদের বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শাস্তির সাধারণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, সে নীতিটি হচ্ছে, অপরাধের সাথে শাস্তির সমতা ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা। ন্যায়নীতি ও সুবিচারের জন্য এটা অপরিহার্য। এ শাস্তির মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কষ্ট যাতনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা অপরাধ ঘটাবার আগে মানুষকে সতর্ক করে ও পুনরাবৃত্তি করতে বাধা দেয়। এ শাস্তির বিশেষত্ব এই যে, অপরাধী ব্যতীত অন্যের ওপর কখনও আরোপ হয় না। এ কারণে এর নিঁখুত প্রয়োগ সমাজকে ক্ষতি ও বিপর্যয়ের কবল থেকে রক্ষা করে সমাজের কল্যাণ সাধন করে। ফলে অপরাধের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। অন্ততঃপক্ষে বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে সমাজে শান্তি-স্থিতি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে এসব শাস্তি অপরাধ করতে উৎসুক ব্যক্তির সামনে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। তারপরেও যদি সে অপরাধ করে ফেলে তাহলে শাস্তি পাওয়ার পর পুনরায় অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে সে সংশোধন হয় এবং শাস্তি তার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। সন্দেহ নেই, কোনো ব্যক্তিকে অপরাধ থেকে দূরে রাখার মধ্যে তার জন্য বড় ধরণের কল্যাণ নিহিত থাকে। কেননা তখন তাকে শাস্তির কষ্ট ভোগ করতে হয় না। শরী'আত লংঘন করার দায় ঘাড়ে নিতে হয় না এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও পরকালের 'আযাব থেকে সে রক্ষা পেয়ে যায়। আবার অপরাধ করার কারণে শাস্তি দেওয়া হলে তাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। কারণ, তখন সে দুনিয়ায় গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। প্রদত্ত শাস্তি তার সুপ্ত ঈমানকে জাগ্রত করে দেয় এবং আল্লাহর সম্মুখে তার বড় স্খলণের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। ফলে সে তওবায়ে নাসূহা করার সৌভাগ্য লাভ করে। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ইসলামে শাস্তি বিধান প্রবর্তনের পেছনে যে সব মহান লক্ষ্য ও হিকমত নিহিত আছে এগুলো তার সামান্য কয়েকটি দিক মাত্র।

দ্বিতীয়ত : কিসাস ও দিয়াত সংক্রান্ত নির্ধারিত শাস্তি।

তৃতীয়ত: তা'যীর সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি।

চতুর্থত : কিছু কিছু দিয়াত ও তা'যীর সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কাফফারার শাস্তি।

সহিংসতা ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

সহিংসতা ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টিকারীদের বিষয়টি মূলত: আততাশরীউল জিনাইল ইসলামী তথা ইসলামের ফৌজদারী দন্ডবিধির আওতাভুক্ত বিষয়। ইসলামী আইনে এ জাতীয় কর্মকাণ্ডকে **الحرابة** (আলহিরাবাহ) বা **قطع الطريق** (কতউত তরীক) এর অন্তর্ভুক্ত। আলহিরাবাহ বা কতউত তরীক অর্থ হলো প্রকাশ্যে কাউকে হত্যা করা ও তার সম্পদ লুণ্ঠন করা অথবা এর যে কোনোটি সংঘটিত করা। কিংবা সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে এসব কর্মের চেষ্টা করা যদিও জান-মালের ক্ষতি করতে সফল না হোক। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রকাশ্যে সংঘটিত যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকান্ড 'আলহিরাবাহ' এর অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

زَاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(অর্থ) "তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং দেশেহাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলিতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা এলাকাছাড়া করা হবে। এটি হল তাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[১১৯২] উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সমাজে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের জন্য দুনিয়াবী ৪টি শাস্তির ঘোষণা এসেছে-

---

[১১৯২]. আল কুরআন, ৫: ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত : সন্ত্রাসী যদি হত্যা করে ও মাল লুট করে তাহলে তাকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে ও শূলে চড়ান হবে।
দ্বিতীয়ত : যদি হত্যা করে মাল লুট না করে তাহলে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে। শূলে চড়ান হবে না।
তৃতীয়ত : যদি মাল লুণ্ঠন করে হত্যা না করে, তাহলে তার হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে।
চতুর্থত : আর যদি হত্যা ও লুণ্ঠন না করে শুধু পথে ত্রাস সৃষ্টি করে, তবে তাকে নির্বাসনে দিতে হবে।
মালেকী মাযহাব মতে, সন্ত্রাসী যদি শুধু লুণ্ঠন করে, হত্যা না করে তাহলে তাকে হত্যা করা, শূলে চড়ানো ও হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তনের ব্যাপারে আদালতের ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু সন্ত্রাসী যদি কেবল রাস্তায় ত্রাস সৃষ্টি করে, হত্যা ও লুণ্ঠন না করে তাহলে তাকে হত্যা করা, শূলে চড়ানো, হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করা ও নির্বাসিত করার ব্যাপারে বিচারক বা শাসকের ইখতিয়ার থাকবে।[১১৯৩] ইসলামের ফৌজদারী দন্ডবিধিতে হত্যা ও সন্ত্রাস তথা কতল ও আলহিরাবাহকে দু'টি পৃথক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে কাউকে হত্যা করা বা প্রকাশ্যে কারো সম্পদ লুণ্ঠন সাধারণ হত্যা ও চুরি থেকে অনেক বেশি জঘন্য অপরাধ হিসেবে গন্য করা হয়েছে। এ কারণেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ-এর শাস্তি অন্য যে কোনো শাস্তির চেয়ে কঠোর। শুধু তাই নয় বরং ইসলামী দন্ডবিধিতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে প্রাপ্য শাস্তি ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত। সাধারণ হত্যার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় (অর্থের বিনিময়ে বা অর্থ ছাড়াই) তবে হত্যকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না, কিন্তু এই হত্যা যদি সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ এর আওতাভুক্ত হয়, তখন ঐ ব্যক্তির শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা ক্ষমা করে দিলেও সে নিস্তার পাবে না; বরং ঐ দণ্ড তাকে ভোগ করতেই হবে। সন্ত্রাস-এর সর্বনিম্ন শাস্তির কথা বলা হয়েছে এভাবে- তাদেরকে এলাকাছাড়া করা হবে। এটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন কোনো দৃষ্কৃতিকারী কারো জান-মালের ক্ষতি করেনি কিন্তু সে জনগণের মাঝে ভীতির সঞ্চার করছে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিকে নিজ এলাকা থেকে অনেক দূরের কোনো কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হবে। অতঃপর তার আচার-আচরণ ও চারিত্রিক অবস্থা বিবেচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
পঞ্চমত : শিরকের অমার্জনীয় অপরাধের পর ইসলামে মানব হত্যাই সর্বাধিক মারাত্মক অপরাধ। একজন মানুষের জীবন বাঁচানো যেমন গোটা মানব জাতির জীবন বাঁচানোর সমতুল্য; তেমনি একজন মানুষের জীবন সংহার গোটা মানব জাতির জীবন সংহারের সমতুল্য। এজন্যই ইসলামী আইনে হত্যার মত জঘন্যতম অপরাধের জন্য ন্যায়বিচারভিত্তিক কঠিন ও অপমানজনক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। আখিরাতে শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزوه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ীহবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।"[১১৯৪] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কোন মুমিনকে হত্যা করার চেয়ে দুনিয়াটা ধবংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিকতর সহজ।"[১১৯৫] ইসলামী আইনে শরী'আত সম্মত কোন কারণ ছাড়া হত্যা করা হারাম। শত্রুতাবশত কাউকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা মহা অপরাধ। এটা এত বড় অপরাধ যার ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি অবধারিত। আর তা হলো কিসাস ও জান্নামের শাস্তি। কারণ এ ধরণের হত্যাকাণ্ড আল্লাহর সৃষ্টির সাথে শত্রুতা পোষণ ও সীমালংঘন। এর ফলে মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং সুস্থ বিবেক হত্যার মত জঘন্য কাজকে হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা'আলা হত্যা করা হারাম ঘোষণা করে বলেন, "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধীকারিকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।"[১১৯৬] আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

---

[১১৯৩]. আস সিয়াসাতুশ শর'য়িয়্যাহ লি ইবন তাইমিয়্যাহ, পৃ. ৮২-৮৩, আল মুগনী, খ. ৮, পৃ. ২২৮
[১১৯৪]. আল-কুরআন, ৪ : ৯৩
[১১৯৫]. সুনানুত্ তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৬৮
[১১৯৬]. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩

"এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নর হত্যা অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্যহেতু ব্যতীত কেউ কাউকে ও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল"।[১১৯৭] রাসুলূল্লাহ (সা.) হত্যাকে জঘন্য অপরাধ ও হারাম ঘোষণা করে বলেন, "তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলিমের রক্ত কারো জন্য হালাল নয়। বিবাহিত ব্যাভিচারী, হত্যার পরিবর্তে হত্যা এবং ধর্মত্যাগী ব্যক্তি।"[১১৯৮]
তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর নিকট একজন মুমিনকে হত্যা করা গোটা পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেয়েও ভয়াবহ।"[1199] তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জান ও মাল একে অন্যের জন্য এতটা সম্মানিত যেমনটি আজকের দিন, বর্তমান মাস আর এই শহর।"[১২০০] হত্যা করা হারাম কাজ এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত। ইচ্ছা করে হত্যাকারী ফাসিক। আল্লাহর তা'আলা তাকে ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতেও পারেন বা শাস্তি ও দিতে পারেন। অনেকেই মনে করেন হত্যাকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য। অবশ্য ইবন আব্বাস (রা.) মনে করেন হত্যাকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। যারা মনে করেন যে আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; তা ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"[১২০১] তওবা না করলে কিংবা তওবা গ্রহণযোগ্য না হলে হত্যাকারীর শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। যা বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। নিম্মে পার্থিব জগতে তাদের শাস্তির বিবরণ প্রদান করা হল-

প্রথমত : কিসাসের পরিচয়

কিসাসের শব্দটি ক্বাস **قص** শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ কর্তন করা বা সমতা।[১২০২] ইসলামের পরিভাষায় ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানী কিংবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকেও শাস্তি স্বরূপ ক্ষত সৃষ্টি করা,অঙ্গহানি কিংবা হত্যা করা। অথবা, অপরাধী যে পদ্ধতিতে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তদ্রুপ পদ্ধতিতে তাকে শাস্তি বিধান করার নাম কিসাস।[১২০৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"[১২০৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবর্তীণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।"[১২০৫] এ আয়াতটিতে বনী ইসরাঈলের অপরাধের কথা বিধৃত হলেও যেহেতু এ আয়াতটি মানসূখ হবার ব্যাপারে প্রমাণিত কোন দলীল নেই, সেহেতু আয়াতের বিধান মুসলমানদের জন্যও সমভাবে কার্যকর।[১২০৬] কিসাস সাব্যস্ত হবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হলো, তার পরিবার-পরিজন দুটো বিধানের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। হয়তো দিয়াত গ্রহণ করবে কিংবা তার

[১১৯৭]. আল-কুরআন, ৫ : ৩২
[১১৯৮]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৯, পৃ. ৫
[১১৯৯]. সুনান আন নাসায়ী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৭, পৃ. ৮২
[১২০০]. সহীহুল বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ২৪
[১২০১]. আল-কুরআন, ৪: ১১০
[১২০২]. আল-মুজামুল ওয়াসিত, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ৭৪০; ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৮, পৃ. ৩৪১
[১২০৩]. আব্দুল কাদের আওদাহ, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ৬৬৩
[১২০৪]. আল-কুরআন, ২ : ১৭৮-১৭৯
[১২০৫]. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫
[১২০৬]. আলা উদ্দীন আল-কাসানী, ***আল-বদা'ইয়ুস সনা'ই*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), খ. ৭, পৃ. ২৩৩

কিসাস গ্রহণ করা হবে।"[১২০৭] এছাড়াও কিসাস ওয়াজিব হবার ক্ষেত্রে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[১২০৮] ইসলামী আইনে মানুষের জন্য কিসাস বিধিবদ্ধ করে দেয়ার পেছনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যৌক্তিকতা রয়েছে। কিসাস সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ একটি বিধান। এতে হত্যার পরিবর্তে হত্যার এবং আঘাতের বিপরীতে সমপরিমাণ আঘাত দেয়ার অধিকার বিচারককে প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজে অধিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব। কারণ, পাশবিক শক্তি দ্বারা তাড়িত ব্যক্তি কোন স্বার্থ হাসিল করার জন্য কাউকে খুন করলে কিংবা আহত করলে তার উপর কিছুটা দেরীতে হলেও সমপরিমাণ শাস্তি আরোপিত হবে মর্মে যখন সে জানতে পারবে, তখন সে আর হত্যা বা আহত করার পথে পা বাড়বে না। যদি কিসাসের বিধান না থাকত তবে অপরাধী আরো বেপরোয়া হয়ে ব্যাপকভাবে অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ে। আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকালেও দেখতে পাই যে, মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছে হল অন্যের উপর বিজয়ী হওয়া। অন্যের উপর নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করা। অন্যকে দমনের জন্য সকল পথ গ্রহণ করা, প্রয়োজনে হত্যা করা। কিন্তু যখনই সে জানতে পারবে যে, তার এই বিজয় একান্ত সাময়িক। এ অন্যায়ের ফলে কিছু সময় পরই তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে, তবে অপরাধী অপরাধ থেকে বিরত থাকবে এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে। কিসাসের ফলে সমাজে হত্যা, খুন, আহত করার মত ঘটনা হ্রাস পায়। এ ধরনের বিচারের ফলে (কিসাসের মাধ্যমে) কিছু অপরাধীর প্রাণ সংহার হলেও এর মাধ্যমে ঐসব অপরাধীর বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকলেও প্রাণ দিতে হত। তাই কিসাসকে বাহ্যত দৃষ্টিতে কিছুটা অমানবিক ও কঠিন বিচার মনে হলেও প্রকৃত অর্থে এবং ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে অত্যন্ত উপযোগী ও সমাজের কল্যাণকর একটি বিচার। কিসাস ওয়াজিব হবার জন্য হত্যাকারী, নিহত ব্যক্তি, হত্যার কাজ এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। এ শর্তাবলীর কোন একটি যদি পাওয়া না যায়, তবে কিসাস কার্যকর করা যাবে না। তবে যে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে তার মধ্যে চারটি শর্ত পূরণ হতে হবে।

ক. হত্যাকারী প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। তাই শিশু ও পাগল থেকে কিসাস গ্রহণ কর যাবে না। কারণ, কিসাস হলো শাস্তি। শিশু ও পাগল শাস্তির যোগ্য নয়। শাস্তি অপরাধীর উপর কার্যকর হয়। শিশু ও পাগলের কাজকে অপরাধ হিসেবে ধরা হয় না। এমনিভাবে ওজর বশত যিনি হুঁশ হারিয়েছেন, যেমন ঘুমন্ত ও বেহুঁশ ব্যক্তির উপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না। তবে মাতাল ব্যক্তি থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। কারণ, মাতাল ব্যক্তি শরীআতের বিধান মানতে বাধ্য যা পাগল ও শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

খ. হত্যাকারীর নিহত ব্যক্তিকে হত্যার ইচ্ছা থাকতে হবে। তাই হত্যার ইচ্ছা ব্যতীত কেউ যদি নিহত হয় তবে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না।

গ. সন্দেহাতীতভাবে হত্যাকারীর হত্যার ইচ্ছার বিষয়টি প্রমাণিত হতে হবে।

ঘ. হানাফীদের মতে স্বেচ্ছায় হত্যাকারী কিসাস দিতে হবে। জবদস্তিমূলক কারণে হত্যাকারীদের কিসাস দেয়া যাবে না।

অবশ্য ইমাম যুফারের মতে, জোরজবরদস্তির কারণে হত্যাকারীকে কিসাস দেয়া যাবে। হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করার জন্য নিহত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে-

১. নিহত ব্যক্তি পবিত্র ও নিরাপরাধ হতে হবে- যাকে হত্যা করা শরীআত হারাম। তাই কোন মুসলমান যিম্মী, কাফির, মুরতাদ, বিবাহিত ব্যভিচারী, বিদ্রোহী ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময়ে কিসাস দেয়া যাবে না।

২. নিহত ব্যক্তির সাথে হত্যাকারীর পিতৃত্বের সম্পর্ক থাকতে পারবে না। তাই সকল ইসলামী আইনজ্ঞের মতে কোন পিতা, দাদা, নানা, মা, দাদী, ও নানীর কেউ যদি তাদের নিজের সন্তান বা নাতি, নাতনিকে হত্যা করে, তবে তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। অবশ্য মালিকীগণ বলেন, যদি পিতা বা দাদা ইত্যাদি কারো নিজ সন্তানকে হত্যার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার শেখানোর কোন সম্পর্ক না থাকে এবং হত্যা করাই উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রমাণিত হয়, তবে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। আর যদি সন্তান তার মা-বাবা কিংবা তদূর্ধ্ব

[১২০৭]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৬৫; মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৯৮৮-৯৮৯

[১২০৮]. ওয়াহবাহ যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামেশ্‌ক, দারুল ফিকর, সংস্ক. ২, ২০০৯) খ. ৬, পৃ. ২৬২

কাউকে হত্যা করে, তবে এ হত্যাকারী সন্তান থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে মর্মে সকল ইসলামী বিশেষজ্ঞ একমত।[১২০৯]

৩. মালিকী, শাফিঈ এবং হাম্বলী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণের মতে ধর্ম ও স্বাধীনতার দিক থেকে নিহত ও হত্যাকারীর মধ্যে সমতা থাকতে হবে। তাই কোন মুসলিম যদি কাফিরকে হত্যা করে কিংবা কোন স্বাধীন ব্যক্তি যদি কোন দাস বা দাসীকে হত্যা করে, তবে ঐ মুসলিমা ও স্বাধীন হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না; দিয়াত গ্রহণ করতে হবে। তারা তাদের মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কাফির হত্যার বিনিময়ে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।"[১২১০] রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন, "মুসলমানদের রক্তের মর্যাদা পরস্পর সমান। তাদের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন তাদের যিম্মায় থাকে। আর কোন মুসলমানকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।"[১২১১] রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন, "কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।"[১২১২] হানাফী মাযহাবের মতে, কিসাস গ্রহণের জন্য ধর্ম ও স্বাধীনতার সমতার শর্ত করা যাবে না। এখানে মানুষ হিসেবে সমতার বিষয়টি মূখ্য। কারণ, যে আয়াতে কিসাস ওয়াজিব করা হয়েছে, তাতে সাধারণভাবে সকল মানুষ প্রযোজ্য। কারো পার্থক্য করা হয়নি। সেখানে আল্লাহ বলেছেন, "হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারে।"[১২১৩] আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,"আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে যখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম।"[১২১৪] আর হত্যাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ- হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে, হত্যার কাজটি সরাসরি করতে হবে; কোন মাধ্যম গ্রহণ করে হত্যা করা হলে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। যেমন মানুষ চলাচলের রাস্তায় সরকারি অনুমতি ব্যতীত গর্ত করায় তাতে পতিত হয়ে কেউ মারা গেল। অন্যান্য আলিমদের মতে, সরাসরি হত্যা শর্ত নয়। সরাসরি হত্যা না করলেও কিসাস গ্রহণ করা যাবে। অতঃপর নিহতের অভিভাবকের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ- হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবক কারা তা জ্ঞাত থাকতে হবে। যদি তা জানা না থাকে তবে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। অবশ্য অন্য ইমামগণ তাদের সাথে ভিন্নমত পেশ করেছেন।[১২১৫]

বিচারক কিসাসের রায় ঘোষণার ব্যাপারে ৬টি প্রতিবন্ধকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন

ক. সন্তানকে বাবা হত্যা করলে তার পিতৃত্ব তাকে মৃত্যুদন্ড দানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

খ. সমতা না থাকা; তাই কোন মুসলিম কাফিরকে হত্যা করলে কিংবা কোন ক্রীতদাস স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে উভয়ের মধ্যে দীন ও স্বাধীনতার অসমতা কিসাসের জন্য প্রতিবন্ধক।

গ. সরাসরি হত্যা না করে কোন মাধ্যম গ্রহণ করে হত্যা করলে তা কিসাসের জন্য প্রতিবন্ধক।

ঘ. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হত্যাকৃত ব্যক্তির স্বজন কারা তা জানা না গেলেও কিসাস হবে না।

[১২০৯]. আবুল ওয়ালীদ ইবনু রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ: ১৯৮১), খ. ২, পৃ. ৩৮৮

[১২১০]. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৮; সুলায়মান আবি দাঊদ, আস- সুনান, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৮৮

[১২১১]. ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭৯

[১২১২]. আলী দারাকুতনী, আস- সুনান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৩৩

[১২১৩]. আল-কুরআন, ২: ১৭৮-১৭৯

[১২১৪]. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫

[১২১৫]. আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ২৪০

ঙ. হানাফী আইনবিদদের নিকট যদি কাফির রাষ্ট্রে হত্যা করা হয়, তবে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না।

চ. একাধিক ব্যক্তি মিলে হত্যা করার বেলায় তাদের মধ্যে যারা সরাসরি হত্যার কাজে জড়িত নয়, তাদের জন্য কিসাস প্রতিবন্ধক।[১২১৬]

বিচারক স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর কিসাস এর রায় প্রদান করলে কে কার্যকর করবে এ ব্যাপারে আইনজ্ঞদের বক্তব্য হল– যদি কিসাসের হকদার একজন হন এবং তিনি বালেগ ও জ্ঞানী হন তবে তিনিই কিসাস বাস্তবায়নের জন্য হকদার হবেন। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহয্যপ্রাপ্ত হয়েছে।[১২১৭] আর যদি কিসাসের হকদার পাগল কিংবা নাবালক হয়, তবে বিচারক তার পক্ষে কিসাস বাস্তবায়ন করবেন এটাই অধিকাংশ আইন বিশারদের অভিমত।[১২১৮] অনেকে বলেছেন যে, এক্ষেত্রে নাবালকের বালেগ হওয়া এবং পাগলের জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বিচারক তার প্রতিনিধি হিসেবে কিসাস বাস্তবায়ন করতে পারবেন না।[১২১৯] যদি স্বজনদের সংখ্যা একাধিক হয় এবং তারা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানী হয়, তবে তাদের যে কোন একজন কিসাস প্রয়োগের কাজ সম্পন্ন করবেন।

আর যদি ওয়ারিসদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্ত, জ্ঞানী ও পাগল মিশ্রিত থাকে, এমতাবস্থায় নাবালক ওয়ারিসের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং পাগলের জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। বড় ও জ্ঞানীরাই তাদের পক্ষে কিসাস প্রয়োগ করবেন। তবে অনুপস্থিত স্বজনের উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত কিসাস স্থগিত থাকবে। কারণ তার ক্ষমা করার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে সন্দেহের দিকটি স্পষ্ট। সন্দেহ অবস্থায় কিসাস সাব্যস্ত করা যাবে না। এটা হানাফী ও মালিকী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মত। আর হানাফী মাযহাবের একটি অংশ, শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের আলিমদের মতে, স্বজনদের সকলে উপস্থিত না থাকলে অন্যদের পক্ষ থেকে কেউ দায়িত্ব পালন করে কিসাস সাব্যস্ত করা যাবে না। এমনকি বাবা, দাদা বা রাষ্ট্র প্রধান ও ওয়ারিসের প্রতিনিধিত্ব করবে না।[১২২০] কিসাস বাস্তবায়ন পদ্ধতি কী হবে এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ দু'টি মত রয়েছে–

১. হত্যাকারী নিহত ব্যক্তিকে যে পদ্ধতিতে হত্যা করুক না কেন, তার কিসাস হবে ধারালো তলোয়ার দ্বারা। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "একমাত্র তরবারি দ্বারাই কিসাস গ্রহণ করা হবে।" এটি হানাফী ও হাম্বলী বিশুদ্ধমত।[১২২১]

২. যদি কোন হারাম পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, যেমন মদ্যপান করিয়ে বা সমকামের মাধ্যমে, সেক্ষেত্রে ধারালো তরবারি দ্বারা কিসাস গ্রহণ করতে হবে।[১২২২] আর যদি হারাম পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে হত্যা কর হয়, তবে হত্যাকারী যেভাবে হত্যা করেছে, তার বদলা বা কিসাস সে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। তাই খুনী পাথরের আঘাতে খুন করলে তার কিসাস পাথরের সাহায্যে হবে, ভিন্ন কোন পদ্ধতিতে নয়। অবশ্য রাষ্ট্র প্রধান তরবারির মাধ্যম কিসাস গ্রহণ করা যদি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন তবে তা করাই ভাল। মালিকী ও শাফিঈ মাযহাবের আইনজ্ঞগণ এ মত পোষণ করেন।[১২২৩] প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন, আল্লাহর বাণী, "তোমরা যদি শাস্তি দাওই, হবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।"[১২২৪] তিনি আরো বলেন : "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ" ।[১২২৫]

[১২১৬]. ওয়াহবাহ যুহাইলী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ২৭৪; আল-কাসানী, খ. ৭, পৃ. ২৩৭

[১২১৭]. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩

[১২১৮]. আল-কাসানী, **প্রাগুক্ত** খ. ৭, পৃ. ২৪৩

[১২১৯]. ওয়াহবাহ যুহাইলী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ২৮১

[১২২০]. আল-কাসানী, প্রাগুক্ত খ. ৭, পৃ. ২৪৩

[১২২১]. মুয়াফ্ফাকুদ্দীন ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, (বৈরূত: দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল আরবী), খ. ৭, পৃ. ৭৪০

[১২২২]. ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৯৬

[১২২৩]. আল-মুগনী, আল মুহতাজ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪৪

[১২২৪]. আল-কুরআন, ১৬ : ১২৬

[১২২৫]. আল-কুরআন, ৪২: ৪০

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যারা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে, তাদের শাস্তি আগুনে পুড়িয়ে আর যারা পানিতে চুবিয়েছে, তাদের আমরা পানিতে চুবাবো।" তাদের যুক্তি হল, কিসাস মানেই সমতা। তাই যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে, সে পদ্ধতিতেই তার কিসাস হলে সমতা হয়।[১২২৬] যে সব কারণে কিসাস রহিত করা হবে তা হলো:

ক. কোন কারণে আসামীর মৃত্যু হয়ে থাকলে কিসাস রহিত হবে। চাই সে মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হোক কিংবা অন্যায়ভাবে হত্যার শিকার হোক কিংবা ধর্মত্যাগের কারণে হত্যা করা হোক। কারণ, যার উপর কিসাস কার্যকর করা হবে, তিনিই যখন নেই তখন কিসাস রহিত না করার কোন সুযোগ নেই। খুনের আসামী মারা গেলে তার উপর থেকে দিয়াত রহিত হবার ব্যাপারে সকল আইনজ্ঞ একমত। এমতাবস্থায় আসামীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে কিনা সে ব্যাপারে ইসলামী আইনজ্ঞগণ দু'ধরণের মত পেশ করেছেন। হানাফী ও মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞগণের এবং শাফিঈ মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মতে, আসামী মারা যাবার কারণে কিসাস রহিত হয়ে গেলে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে না। কারণ কিসাস হল নির্দিষ্ট করা একটি অবধারিত শাস্তি। আসমীর মৃত্যুর কারণে অবধারিত সে বিষয়টি রহিত হয়ে গিয়েছে। তাকে আর অন্য কোন শাস্তি দেবার সুযোগ নেই। আর আসামীর সন্তুষ্টি ও আগ্রহ ব্যতীত নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের দিয়াত গ্রহণের কোন বিধান হতে পারে না।[১২২৭] আর হাম্বলী ও শাফি'ঈদের একটি মতে, আসামীর মৃত্যুবরণ করার কারণে কিসাস রহিত হলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ইচ্ছে করলে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে। কারণ খুনীর বিচারের ব্যাপারে দুটো বিষয়ের একটি ওয়জিব হবে। হয়তো কিসাস নয়তো দিয়াত। এ ক্ষেত্রে আসামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। তাই তার মৃত্যুবরণ করার কারণে যখন কিসাস রহিত হয়ে গেল তখন তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হতে কোন বাধা নেই।[১২২৮]

খ. যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক খুনী আসামীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে কিসাস রহিত হবে। কিসাস কার্যকর করার চেয়ে ক্ষমা করে দেয়া ইসলামী আইনে উত্তম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"[১২২৯] রাসূলুলুল্লাহ (সা.) বলেন,"কোন ব্যক্তি তার প্রাপ্য যদি ক্ষমা করে দেয়, তবে তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।"[1230] হযরত আনাস (রা.) বলেন,

ما رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

"রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট কিসাস সংক্রান্ত কোন মামলা উত্থাপন হলেই তিনি তা ক্ষমা করে দিতে নির্দেশ দিতেন।"[১২৩১] ক্ষমা করার অর্থ হল কোন ধরনের আর্থিক বিনিময় ছাড়া আসামীকে ক্ষমা করা। যদি দিয়াত গ্রহণ করার বিনিময়ে ক্ষমা করা হয়, তবে তাকে ক্ষমা না বলে সন্ধি বলতে হবে। হানাফী ও মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞগণ এ মত পোষণ করেন। আর শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ বলেন, দিয়াত গ্রহণ করে হোক আর না করে হোক, কিসাস থেকে অব্যাহতি দিলেই তাকে ক্ষমা বলা হবে।[১২৩২] আর ক্ষমা করার জন্য ক্ষমাকারী যে শব্দাবলী ব্যবহার করবে তা হল ক্ষমার রুকন বা ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে সে বলবে:

[১২২৬]. ড. ওয়াহবাহ যুহাইলী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৬, পৃ. ২৮৩-২৮৪

[১২২৭]. আদ-দারদীর, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৩৯; আল-কাসানী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৭, পৃ. ২৮৬

[১২২৮]. মুহাম্মদ আল-খতীব, ***প্রাগুক্ত***, খ.৪, পৃ. ৪৮; মানছুর আল-বাহুতি, ***কাশ্শাফুল কিনা*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ) খ. ৫, পৃ. ৬৩৩

[১২২৯]. আল-কুরআন, ২ : ১৭৮-১৭৯)

[১২৩০]. আবুবকর মুহাম্মদ ইবন আবি ইসহাক, ***বাহরুল ফাউয়ায়েদ/মাআ'নীল আখবার*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩০৭

[১২৩১]. সুনানু ইবনে মাযাহ্, ***প্রাগুক্ত***, খ. ২, পৃ. ৮৯৮

[১২৩২]. ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৪; মুহাম্মদ আল-খতীব, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৪, পৃ. ৪৯

عَفَوْتُ أَوْ أَسْقَطْتُ أَوْ أَبْرَأْتُ أَوْ وَهَبْتُ.

আমি ক্ষমা করলাম, আমি রহিত করলাম, আমি দায়মুক্ত করলাম, আমি হেবা বা দান করলাম ইত্যাদির কোন একটি শব্দ বলা।[১২৩৩] অতঃপর ক্ষমা কার্যকর করার জন্য দুইটি শর্ত পূরণ হতে হবে–

১. ক্ষমাকারীর প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

২. ক্ষমাকারীর ক্ষমা করার অধিকারী হতে হবে। যার ক্ষমা করার মত অধিকারই নেই, সে ক্ষমা করে দিলেও ক্ষমা কার্যকর করা যাবে না।[১২৩৪] আর এ ক্ষমা সংক্রান্ত বিধানাবলী নিম্নরূপ-

ক. হানাফী ও মালিকী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ ক্ষমা করে দিলে তারা হত্যাকারী থেকে কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না। এমনকি দিয়াতও গ্রহণ করতে পারবে না। তাদের নিকট ক্ষমা মানেই হল কোন বিনিময়ে ছাড়া ক্ষমা। যদি দিয়াত কিংবা কোন ধরনের আর্থিক সুবিধা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ হত্যাকারী থেকে গ্রহণ করতে চান তবে তা আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন। তখন আর তাকে ক্ষমা করা হয়েছে বলা যাবে না, বরং সন্ধি হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। আর শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের আইনাজ্ঞদের মতে, যদি দিয়াত গ্রহণ করেও ক্ষমা করা হয়, তাহলে তাকেও ক্ষমা বলা হবে। যদি ক্ষমা করার সময় ক্ষমাকারী দিয়াত দেয়া বা না দেয়া সংক্রান্ত কোন মন্তব্য না করে, তবে শাফি'ঈদের মতে দিয়াত দিতে হবে না। আর হাম্বলীদের মতে দিয়াত দিতে হবে।[১২৩৫]

খ. যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক একজন হন আর তিনি ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে নিঃশর্ত ক্ষমা ঘোষণা করেন, তবে ক্ষমাকৃত ব্যক্তির রক্ত পবিত্র ও নিরাপদ রক্ত বলে পরিগণিত হবে। এমতাবস্থায় যদি ক্ষমাকারী অভিভাবক তার ক্ষমাকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং ক্ষমাকৃত ঐ খুনীকে হত্যা করে, তবে হানাফী ও মালিকীদের মতে হত্যাকারী রাজী হলে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক একাধিক হয় আর তাদের একজন হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেন, তবে হত্যাকারী থেকে কিসাস রহিত হবে। কারণ, কিসাস এমন একটি জিনিস যা বিভক্ত করা যায় না। কিসাসের কোন অংশ পরিমাণ দিয়াত দিতে হবে। মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, একাধিক অভিভাবক থাকা অবস্থায় যদি এমন একজন অভিভাবক ক্ষমা করেন যিনি মর্যাদা ও আত্মীয়তার দিক থেকে অন্যদের তুলনায় উপরে, তবে কিসাস রহিত হবে। যদি ক্ষমাকারীর মর্যাদা অন্যদের চেয়ে নিম্নে হয় তবে কিসাস রহিত হবে না। যদি এমন হয় যে, একাধিক অভিভাবকের মধ্য থেকে একজন ক্ষমা করেছেন বটে কিন্তু অন্য একজন খুনীকে হত্যা করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে, হত্যাকারীকে কিসাস দেয়া যাবে না। কারণ, তার হত্যার বিষয়টি সংশয়পূর্ণ। হতে পারে এই হত্যাকারী তারই নিকটাত্মীয়ের পক্ষ থেকে খুনীকে ক্ষমা করে দেয়ার বিষয়টি জানে না। অথবা ক্ষমার বিষয়টি জানে তবে এই অবস্থায় খুনী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যে হারাম তা জানে না। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতে, ক্ষমার বিষয়টি না জানলে ভিন্ন কথা। জানার পর হত্যা করা হলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে।[১২৩৬]

গ. নিহত ব্যক্তির আইনগত অভিভাবকের পক্ষ থেকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার পর রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে কিসাস ছাড়াও অন্য কোন শাস্তি দিতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে হানাফী ও মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞগণ বলেন : অভিভাবকের ক্ষমা করার পরও রাষ্ট্র প্রধান তা'যীর হিসেবে শাস্তি প্রদান করতে পারবেন। তা'যীর হিসেবে তার জন্য যে কোন ধরণের শাস্তি দেবার অধিকার সংরক্ষণ করেন। কারণ, হত্যাকান্ডের সাথে দু' ধরণের হক জড়িত-

১. আল্লাহর হক (সমাজ ও জনসাধরণের হক) ও

২. নিহত ব্যক্তির হক।

১২৩৩. আবুবকর ইবন মাসউদ আল-কাসানী, ***বাদাইউস্ সানী*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণঃ ১৪০৬ হি.), খ. ৭, পৃ. ২৪৬

১২৩৪. ইবনে রুশদ, ***বিদায়াতুল মুজতাহিদ***, খ. ২, পৃ. ২৯৪

১২৩৫. আদ-দারদীর, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৩৯; আল-কাসানী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৭, পৃ. ২৪৭

১২৩৬. মুহাম্মদ আল-খতীব, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৪, পৃ. ৪৮; মানছুর আল-বাহুতি, ***কাশ্শাফুল কিনা*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), খ. ৫, পৃ. ৬৩৩

ক্ষমা করার মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির হক থেকে হত্যাকারী দায়মুক্ত হলেও আল্লাহর হক থেকে দায়মুক্ত হয়নি। এ ব্যাপারে মালিকীদের বক্তব্য হল, রাষ্ট্র প্রধান তা'যীর হিসেবে যাচ্ছে তাই শাস্তি দিতে পারবেন না। তিনি সীমিত আকারে সর্বোচ্চ ১০০ বেত্রাঘাত বা একবছর কারাদন্ড দিতে পারবেন।[৯৯]আর শাফি'ঈ ও হাম্বলীদের মতে, যদি হত্যাকারীকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেয়া হয়, তবে তার উপর রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে অন্য কোন শাস্তি বিধান করা বাধ্যতামূলক নয়।[১২৩৭] ইমাম মাওয়ারদী বলেন, শাফি'ঈ মাযহাবের প্রণিধানযোগ্য মত হল, কিসাস ক্ষমা করে দেয়ার পরও রাষ্ট্রপ্রধান শাস্তি দিতে পারবেন।[১২৩৮]

ঘ. নিহত ব্যক্তি যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তার হত্যাকারীকে ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে যান, যেমন কোন এক ব্যক্তিকে আহত করা হল। সে বলল, আমি যদি এ আঘাতের কারণে মারা যাই তবে হত্যাকারী দায়মুক্ত হবে। তাকে আমি ক্ষমা করে গেলাম। এমতাবস্থায়, হানাফী, শাফি'ঈ মাযহাবের আইনজ্ঞদের নিকট ঐ হত্যাকারীর কিসাস রহিত হবে। নিহতের ওয়ারিসগণ দিয়াত দাবি করতে পারবেন না। কারণ, নিহত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার হক রহিত করে গিয়েছেন।আর আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করে বলেন,"অতএব কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে।"[১২৩৯] আর মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, যদি নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে সুস্থ থাকা অবস্থায় বলে যে, যদি তুমি আমাকে হত্যা কর তবে তুমি দায়মুক্ত হবে কিংবা তাকে আহত করার পর এবং হত্যার আয়োজন সম্পন্ন করার পূর্বে বলে যে, তোমাকে আমার রক্ত হরণের দায় থেকে মুক্ত করে গেলাম। এমতাবস্থায় হত্যাকারীকে দায়মুক্ত করা যাবে না। নিহতের হকদাররা কিসাস গ্রহণ করবেন। কারণ, এ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি কিসাস ওয়াজিব হবার পূর্বেই হক রহিত করে গিয়েছেন। তবে যদি নিহত ব্যক্তি হত্যাকারী কর্তৃক তাকে হত্যার সকল আয়োজন সম্পন্ন করার পর বলেন যে, আমি মারা গেলে তুমি দায়মুক্ত হবে। তোমাকে আমি দায়মুক্ত করে গেলাম। এমতাবস্থায় কিসাস রহিত হবে। কারণ, সে ওয়াজিব হবার পর তা রহিত করেছে।[১২৪০]

৩. যেসব কারণে কিসাস রহিত হয় তার অন্যতম হল সন্ধি। সকল ইসলামী আইনজ্ঞের ঐকমত্যে সন্ধির মাধ্যমে কিসাস রহিত হবে। কত পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে নিহত ব্যক্তির আইনগত অভিভাবক ও আসামীর মধ্যে সন্ধি হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। সম্পদ দিয়াতের সমপরিমাণ হতে পারে কিংবা কম-বেশি হতে পারে। নগদ কিংবা বাকীও হতে পারে। দিয়াত জাতীয় সম্পদ দ্বারা ও হতে পারে আবার অন্য সম্পদ দ্বারা ও হতে পারে।[১২৪১] ইসলামী আইনে সন্ধির প্রতি ব্যাপক উৎসহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়"।[১২৪২] রাসূলুলুল্লাহ (স.) বলেন, "মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করা বৈধ। তবে হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করার জন্য সন্ধি করা যাবে না।"[১২৪৩] সন্ধির বিধানাবলী ক্ষমার বিধানবলীর অনুরূপ। ক্ষমা করার ফলে কিসাসের ক্ষেত্রে যেসব প্রভাব পড়ে, সন্ধির ক্ষেত্রেও তাই। ইসলামী আইনজ্ঞগণ আর একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যদি নিহত ব্যক্তির আইনগত অভিভাবক নাবালেগ হয় কিংবা পাগল হয় কিংবা রাষ্ট্র নেয়, তবে দিয়াত সমপরিমাণ সম্পদের কমে সন্ধি করা বৈধ হবে না।[১২৪৪]

৪. যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক নিজেই কিসাসের হকের ওয়ারিশ হয়। যেমন : এক ব্যক্তির উপর কিসাস ওয়াজিব হল, তখন যে কিসাসের হকদার সে মারা গেল অমনি হত্যাকারী কিসাসের পূর্ণ উত্তাধিকার কিংবা আংশিক উত্তরাধিকার কিংবা হত্যাকারী থেকে যার কোন কিসাসের হক নেই, তার ওয়ারিস হয় ছেলে। এমন অবস্থায় কিসাস রহিত হয়। কিসাসের ওয়ারিস হবার ক্ষেত্রে দু'টি ধরন হতে পারে।

ক. হত্যাকারীর কিসাসের ওয়ারিস হবার উদাহরণ হল : কোন ছেলে তার বাবাকে হত্যা করল। হত্যাকারী ছেলের একটি ভাই ব্যতীত আর কোন ওয়ারিস নেই। অতঃপর কিসাসের হকদার একমাত্র ভাইটি মারা

১২৩৭. আদ-দারদীয়, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৬১; আল-কাসানী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ২, পৃ. ১৮৮

১২৩৮. ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ৩, পৃ. ২৯৬; মুহাম্মদ আল-খতীব, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৭, পৃ. ৪১

১২৩৯. ইবন কুদামা, আল-মুগনী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৭, পৃ. ৭৪৫

১২৪০. আল-কুরআন, ৫: ৪৫

১২৪১. আল-মাওয়ারদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ২২৯

১২৪২. আদ-দারদীর, আশ-শারহুল কাবীর, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৪, পৃ. ২৪০

১২৪৩. আল-কুরআন, ৪:২২৮

১২৪৪. সুলয়মান আবূ দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩০৪

গেল। এখন মৃত ভাইয়ের একমাত্র ওয়ারিস হিসেবে ঐ ভাই জীবিত আছে, যে বাবার হত্যাকারী। এমতাবস্থায় বাবার হত্যাকারী থেকে কিসাস রহিত হবে। কারণ, কিসাস বিভক্ত করা যায় না। আর এমন ব্যক্তির উপর কিসাস বাস্তবায়ন করা যায় না যে একই সাথে আবার বিবাদী। এমনিভাবে অংশবিশেষ ওয়ারিস হলেও কিসাস বাস্তবায়ন করা যাবে না।

খ. এমন ব্যক্তির কিসাসের ওয়ারিস হওয়া যার হত্যাকারী থেকে কিসাসের হক নেই। এর উদাহরণ হল- পিতামাতার দুইজনের একজন অন্যজনকে হত্যা করল। তাদের একটি মাত্র সন্তান (ছেলে হোক বা মেয়ে হোক)। এমতাবস্থায় কিসাস রহিত হবে। কারণ, একমাত্র সন্তানই হল এ অবস্থায় কিসাসের হকদার। ইসলামী আইনে যদি বাবা সন্তানকে হত্যা করে, তবে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হয় না। রাসূলুল্লহ (স.) বলেছেন, "সন্তানের জন্য পিতার ওপর কিসাস নেয়া হবে না।" এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে সন্তানের জন্য সে পিতা বা মাতাকে কিসাস দেয়া যাবে যে নিজের সন্তানকে নয় বরং অন্য একজনকে হত্যা করেছে।[১২৪৫]

কিসাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কিসাস শাস্তির মধ্যে অপরাধের মূলনীতি-সুবিচার, সমতা, নিবৃত রাখা ও সমাধান করার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তাই কিসাস প্রয়োগের দ্বারা শাস্তি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য এবং নাগরিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতহয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এ শাস্তির মধ্যে সমতা ও সুবিচারের দৃশ্য এতই স্পষ্ট যে, কারো কাছে তা গোপন থাকা অসম্ভব। কেননা অপরাধীর সাথে কেবল সে আচরণই করা হয় যে আচরণ সে করেছে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর। এ কারণে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি সাদৃশ্যতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে যায় এবং সমতার সাথে অনুরূপ আচরণ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে কিসাস রহিত হয়ে যায়। যেসব লোক মানুষের প্রাণ সংহারের সংকল্প করে এ ব্যবস্থা তাদেরকে কিসাসের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দমিয়ে রাখে। তা ছাড়া কিসাস যেহেতু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হক, সুতরাং কিসাসের হাত থেকে হত্যাকারীকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানও তাকে ক্ষমা করতে পারবে না। অনুরূপ এ শাস্তি কার্যকর থাকলে অপরাধের বিভিন্ন পথও রুদ্ধ থাকে। কেননা নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যেহেতু কিসাস নেওয়ার অধিকারী তাই তারা অন্যভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে না, নিরপরাধীকে হত্যা করবে না কিংবা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে নিজেরাই অপরাধীকে হত্যা করবে না।

দ্বিতীয়ত : বিকল্প হিসেবে দিয়াত

দিয়াত শব্দের অর্থ হল রক্তমূল্য। ইসলামী আইনের পরিভাষায় দিয়াত হল, "মানুষের জীবন বা জীবনের আওতায় পড়ে এমন কিছুর বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের জন্য আর্থিক দন্ড।"[১২৪৬] দিয়াত কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দিয়াত ওয়াজিব করে বলেন, "কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিবারবর্গের রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয় যদি না তারা ক্ষমা করে।"[১২৪৭] আয়াতটি শুধুমাত্র ভুলক্রমে হত্যার ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও তা সব ধরনের হত্যার বিচারের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে মর্মে আলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[১২৪৮] কিছু কিছু হত্যার শাস্তি হিসেবে ইসলামী আইনে দিয়াতকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "কোন ব্যক্তি যদি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে বিনা কারণে হত্যা করে আর তা প্রমাণিত হয়, তবে তার শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। তবে নিহত ব্যক্তির স্বজনরা যদি ক্ষমা করে, তবে দিয়াত। আর প্রাণের বিনিময়ে দিয়াতের পরিমাণ হল একশত উট..।[১২৪৯] ইসলামী আইনজ্ঞগণ দিয়াত একটি শরী'আত সম্মত শাস্তি হবার ব্যাপারে

[১২৪৫]. আদ- দারদীর, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৮৫; আল-হাসকীফী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৮২

[১২৪৬]. মুহাম্মদ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৬৬৮

[১২৪৭]. আলাউদ্দিন আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৪০৬

[১২৪৮]. আল-কুরআন, ৪ : ৯২০

[১২৪৯]. ওয়াহবাহ যুহাইলী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ২৯৯

ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১২৫০] দিয়াতের হদ্দ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ। সাধারণভাবে বলা যায়, এর পরিমাণ হল একশত উট। একশত উট হল পূর্ণ দিয়াত। আলোচনার ক্ষেত্রে কোথাও যদি শুধু দিয়াত শব্দ উল্লেখ করা হয়, তবে পূর্ণ দিয়াত বা (১০০) একশত উট বুঝায়। আর দিয়াত দুই ধরনের হতে পারে-

ক. দিয়াত মুগাল্লাজা : ইচ্ছাকৃত হত্যা বা প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য এ দিয়াত প্রযোজ্য।

খ. দিয়াত মুখাফ্ফাফা : ভুলবশত ও কারণবশত হত্যার জন্য এ দিয়াত প্রযোজ্য। দিয়াত মুগাল্লাজা কিংবা মুখাফ্ফাফা হওয়ার বিষয়টি উটের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে উটের বয়স ও মানের উপর। অর্থাৎ বিচারক যদি ইসলামী আইনের ভিত্তিতে কোন হত্যাকারীর শাস্তি হিসেবে দিয়াত মুখাফ্ফাফা ধার্য করে, তবে তাতেও তুলনামূলক নিম্নমানের এবং কম বয়সের একশতটি দিতে হবে।[১২৫১]

ইমাম আবূ হানীফাসহ অধিকাংশ ইসলামী আইনজ্ঞের মতে দিয়াত উট, স্বর্ণ ও রৌপ্য এ তিন প্রকারের যে যে কোন এক প্রকার দ্বারা হতে পারে। উটের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস প্রণিধানযোগ্য "মানুষ হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত হল একশত উট।"[১২৫২] ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে দিয়াত ছয় প্রকারের হতে পারে: মৌলিকভাবে উট, এছাড়াও স্বর্ণ মালিকগণ এক হাজার দীনার, রৌপ্যের মালিক বার হাজার দিরহাম, গরুর মালিক দুইশত গরু, ছাগলের মালিক দুইহাজার ছাগল এবং পোশাকের

১১৩. ওয়াহবাহ যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯৯

১১৪. আবদুল কাদের আওদাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭১

১১৫. - وان فى النفس الدية ماة من الابل

মালিক উন্নতমানের দুইশত পোশাক দিয়াত হিসেবে প্রদান করবে।"[১২৫৩] হানাফী মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, দিয়াত ওয়াজিব হবার দু'টি শর্ত পূরণ করতে হবে–

১. নিহত ব্যক্তি শরীআতের দৃষ্টিতে পবিত্র ও নিরপরাধ হতে হবে। এ শর্তের সাথে অন্যান্য আইনজ্ঞগণ একমত।

২. নিহত ব্যক্তি মূল্যবান হতে হবে। তাই হানাফীদের মতে, যুদ্ধরত কোন কাফির যদি তার দেশে ইসলাম গ্রহণ করে সেখানে থেকে যায়, ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত না করে, আর ভুলক্রমে হত্যাকারী কোন মুসলিম বা যিম্মী হয়, তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে না। ইসলাম, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া দিয়াত ওয়াজিব হবার জন্য কোন শর্ত নয়।[১২৫৪] শিষ্টাচারের উদ্দেশ্যে প্রহার করার ফলে, যেমন পিতা শরীআতসম্মত কোন ব্যাপারে শিষ্টাচারের উদ্দেশ্যে সন্তানকে প্রহার করল কিংবা ইয়াতীমের অভিভাবক ইয়াতীমকে প্রহার করল কিংবা স্বামী তার স্ত্রীকে বেপরোয়া হবার কারণে বা সালাত আদায় না করার কারণে প্রহার করল কিংবা পিতার অনুমতি ছাড়া কোন শিক্ষক ছাত্রকে প্রহার করল আর তাতে কেউ মারা গেল, এমতাবস্থায় তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে আলিমদের দু'ধরনের মত রয়েছে–

ক. হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, এ অবস্থায় দিয়াত ওয়াজিব হবে। কারণ, উদ্দেশ্য হল আদব শেখানো ও ভয় দেখানো, ধ্বংস করা নয়। মারা যাবার কারণে প্রমাণিত হয় যে, শিষ্টাচার শেখানোর জন্য প্রহার করতে গিয়ে সীমালংঘন করা হয়েছে। আর সীমালংঘনের কারণেই দিয়াত ওয়াজিব হবে।

খ. মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের মত অনুযায়ী এ অবস্থায় দিয়াত হবে না। যদি না তদন্তের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, শিষ্টাচার শেখানোর জন্য প্রহার করার সময় এমন বাড়াবাড়ি ছিল যার ফলে মারা যাওয়া সম্ভব। কারণ হল, আদব শেখানোর জন্য প্রহার করা শরীআতসম্মত ও মুবাহ। এ বৈধ কাজটি করতে গিয়ে প্রাণনাশ হওয়ায় দিয়াতের মত শাস্তি দেয়া যাবে না যেমনটি শাস্তি দেয়া যায় না হুদূদ ও তা'যীর বাস্তবায়নকারীকে।[১২৫৫] দিয়াতের ধরণ নির্ধারনে ইসলামী আইনজ্ঞগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

[১২৫০]. ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, আল- মুসনাদ *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪১০

[১২৫১]. ইমাম আবদুল্লাহ যাইলাঈ, *নাসবুর রায়াহ* (মাতবুআতু মাজুলিসুস ইসলামী, সংস্ক. ২), খ. ৪, পৃ. ৩৬১

[১২৫২]. আল-কাসানী, *প্রাগুক্ত*, খ.৭, পৃ. ২৫২

[১২৫৩]. আল-কাসানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২

[১২৫৪]. আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩৭৩

[১২৫৫]. আল-মাওয়ারদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০; মুহাম্মদ আল খতীব, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৯৯

হানাফী, মালিকী ও শাফিঈ মাযহাবের প্রাক্তন মত অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকার দ্বারা দিয়াত আদায় করা যাবে-
ক) উট; খ) স্বর্ণ; গ) রৌপ্য।
তাদের স্বপক্ষে হযরত আমর ইবন হাযম (রা.)এর লিখিত চিঠিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাতে বলেন : "মানুষ হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত দিতে হবে আর তা হল একশত উট।"[১২৫৬] এ ছাড়া হযরত উমর (রা.) স্বর্ণের মালিকদের উপর এক হাজার দীনার এবং রৌপ্যের মালিকদের উপর দশ হাজার দিরহাম দিয়াত হিসেবে ধার্য করেছেন।[১২৫৭] ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) এর মতে নিম্নবর্ণিত ছয় প্রকারের যে কোন এক প্রকার সম্পদ দ্বারা দিয়াত দেয়া যাবে। তা হল : (১) উট, (২) স্বর্ণ, (৩) রৌপ্য, (৪) গরু, (৫) ছাগল ও (৬) পোশাক। এ মতের স্বপক্ষে দলীল হল হযরত উমর (রা.) এর বক্তব্য। তিনি একবার বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন : "জেনে রাখ, উটের দাম বেড়ে গিয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি স্বর্ণের মালিকের উপর একহাজার দীনার, রৌপ্যের মালিকের উপর বার হাজার দিরহাম, গরুর মালিকের উপর দু'শত গরু, ছাগলের মালিকের উপর দু'হাজার ছাগল এবং পোশাকের উপর দু'শত প্রস্থ দিয়াতের পরিমাণ ধার্য করেন।"[১২৫৮]
ইমাম শাফি'ঈর সর্বশেষ মতানুযায়ী, যদি উট পাওয়া যায় তবে একশত উটই হল মূলত দিয়াতের জন্য নির্ধারিত। হত্যাকারী দোষত্রুটি মুক্ত অবস্থায় তা হস্তান্তর করবে। যদি উট পাওয়া না যায় তবে একশত উটের সমপরিমাণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তাদের প্রমাণ হল : হযরত উমর (রা.) এর বক্তব্য। রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে আটশত দীনার এবং আট হাজার দিরহাম দিয়াত হিসেবে দেয়া হত। কিন্তু উমর (রা.) এর সময় উটের দাম বেড়ে যাওয়ার এক হাজার দীনার এবং বার হাজার দিরহামের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, "জেনে রাখ, উটের দাম বেড়ে গিয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি স্বর্ণের মালিকের উপর একহাজার দীনার, রৌপ্যের মালিকের উপর বার হাজার দিরহাম, গরুর মালিকের উপর দু'শত গরু, ছাগলের মালিকের উপর দু'হাজার ছাগল এবং পোশাকের উপর দু'শত গ্রস্থ দিয়াতের পরিমাণ ধার্য করেন।[১২৫৯] উপরোলিখিত বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, ইসলামী আইনজ্ঞগণ শুধুমাত্র রৌপ্যের পরিমাণ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর পরিমাণ নির্ধারণে বিরোধ করেননি। মোটকথা দিয়াতের পরিমাণ হল একশত উট বা একহাজার দীনার বা দশ হাজার দিরহাম (হাম্বলীদের নিকট) আর বার হাজার দিরহাম (জমহূরের নিকট) বা দু'শত গরু বা দু'হাজার ছাগল বা দু'শত ভাল মানের পোশাক (চাদর ও লুঙ্গি)।[১২৬০] এ দিয়াত যখন উট ধারা প্রদান করা হবে, তখন হত্যার প্রকারভেদের উপর ভিত্তি করে তার গুণগত মান কমবেশী হবার বিধান দিয়েছে ইসলাম (যাকে দিয়াতে মুগাল্লাযা ও মুখাফ্ফাফা নামে অবহিত করা হয়)। যদি উট ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা দিয়াত দেয়া হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কম বেশি করার সুযোগ নেই। কেননা শরী'আত তার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। অধিকাংশ আইনজ্ঞের মতে, ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং ইচ্ছা সাদৃশ্য হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত মুগাল্লাযা বা উন্নতমানসম্পন্ন দিতে হবে। আর ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত মুখাফ্ফাফা বা তুলনামূলক কম মানসম্পন্ন উট দিতে হবে।[১২৬১]

তৃতীয়ত : বিকল্প হিসেবে তা'যীর

তৃতীয়ত ঃ তা'যীর সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি। তা'যীর **(التعزير)** এর আভিধানিক অর্থ শিক্ষামূলক শাস্তি **(التأديب)** শরী'আতের পরিভাষায় যে সব অন্যায় ও পাপ কর্মের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়াকে তা'যীর বলে যে ব্যাপারে নির্ধারিত শাস্তি নেই।[১২৬২] তা'যীর শব্দের অর্থ হল, বাধা প্রদান করা, প্রতিরোধ করা। শব্দটি

১২৫৬. যাইলাঈ, মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-হানাফী, নাসবুর রায়াহ লি আহাদিসিল হিদায়াহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩৬১
১২৫৭. যাইলাঈ, মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-হানাফী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩৬৩
১২৫৮. যাইলাঈ, মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-হানাফী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩৬৩
১২৫৯. ওয়াহবাহ যুহাইলী, *প্রাগুক্ত*, খ. পৃ. ৩০৩-৩০৪
১২৬০. আল আহকামুস সুলতানিয়াহ লি ইবন ইয়া'লা আল-হাম্বালী; *তাবসিরাতুল হুক্কাম লি ইবন ফারহুন*, ২য় খ-, পৃ. ২৫৮
১২৬১. আল-কুরআন, ৪৮ : ৯
১২৬২. আল-মুলাখ্খাছ আল-ফিকহী, খ. ২, পৃ. ৫৪৬

সাহায্যার্থেও ব্যবহৃত হয়। তা'যীর মানুষকে শত্রুর অনিষ্টতা থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "আর রাসূলকে শক্তি যোগাও আর তাকে সম্মান কর।" অতঃপর এই তা'যীর শব্দটি হদ ব্যতীত আদব শেখানো ও তিরস্কার অর্থে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কেননা তা'যীর অপরাধীকে পুনরায় অপরাধ করতে বাধা প্রদান করে। ইসলামী আইনে তা'যীর বলতে, যেসব অপরাধের জন্য হদ[১২৬৩] ও কাফফারা[১২৬৪] ওয়াজিব হয়, সেসব ব্যতীত অন্যান্য অপরাধের জন্য শরীআতসম্মত অনির্দিষ্ট শাস্তিকে বুঝায়। চাই উক্ত অপরাধ আল্লাহ তা'আলার অধিকারের ক্ষেত্রে হোক, যেমন রমযান মাসের দিনের বেলায় বিনা ওজরে খাওয়া, সালাত পরিত্যাগ করা, সুদ খাওয়া, মানুষের চলাচলের রাস্তায় ময়লা-আর্বজনা ও কষ্টদায়ক জিনিস ফেলা ইত্যাদি অথবা উক্ত অপরাধ বান্দার অধিকারের ক্ষেত্রে হোক, যেমন স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর লজ্জাস্থান ব্যতীত মিলিত হওয়া, নিসাব হতে কম পরিমাণ মাল চুরি করা, অসংরক্ষিত মাল চুরি করা, আমানতের খেয়ানত করা, ঘুষ খাওয়া, যেনা ব্যতীত অপরাপর ক্ষেত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, গালি-গালাজ করা, কাউকে কাফির, ফাসিক ও ফাজির ইত্যাদি বলা।

যে সব অপরাধে তা'যীর ওয়াজিব হয় সেগুলো হচ্ছে শরী'আত কর্তৃক ঐসব নিষিদ্ধ কাজ যার জন্য ইসলামী শরী'আতের পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি নির্ধারিত নেই। অন্যান্য যে সব কাজ শরী'আত হারাম করেছে তা করা কিংবা শরী'আত যা অবশ্য পালনীয় করেছে তা ত্যাগ করা। কষ্ট ও পীড়াদায়ক যে কোনো কথা, কাজ অথবা বর্জনের মাধ্যমে তা'যীর শাস্তি হয়ে থাকে। কাউকে উপদেশ দিয়ে, কাউকে সতর্ক করে এবং কারো বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। কোনো কোনো অপরাধী তওবা না করা পর্যন্ত কিংবা অপরাধ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার সাথে সালাম-কালাম বন্ধ ও সংশ্রব বর্জন করে তা'যীর দণ্ড দেওয়া হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে তিন ব্যক্তির সাথে এরূপ আচরণ করেন পেশাগত দায়িত্ব বা চাকুরি থেকে অপসরাণের মাধ্যমেও তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আমলে এ রকম শাস্তি দেওয়ার প্রমাণ আছে। কখনও অপরাধী যে শহরে বাস করে সেখান থেকে অন্য শহরে বহিষ্কার করে কিংবা তার মাথার চুল ন্যাড়া করে তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। আবার কখনও প্রহার করে বা চাবুক মেরে বা বন্দী রেখে কিংবা মুখে চুনকালি মাখিয়ে তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। কখনও আর্থিক দণ্ডের মাধ্যমে তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময়ে এরূপ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যেমন, মদ তৈরির মটকা ও মদ রাখার পাত্র তিনি ভেঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপ খায়বর যুদ্ধে গাধার মাংস রান্না করার ডেক উপুড় করে মাংস ফেলে দেওয়ার আদেশ দেন। ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করেও তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নিজেই মসজিদে দ্বিরার ভেঙ্গে দেন এবং উমার (রা.) মদ বিক্রির দোকান গুড়িয়ে দেন। মাল নষ্ট করার দ্বারাও তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়।

[১২৬৩]. হদ হচ্ছে শরী'আত কর্তৃক সু-নির্ধারিত শাস্তি যা নির্দিষ্ট অপরাধীর উপর প্রযোজ্য। হুদুদ শব্দটি হদ এর বহুবচন। হদ এ আভিধানিক অর্থ বাধা দেওয়া, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়, অপরাধের যে সব শাস্তি শরী'আত নির্ধারণ করে দিয়েছে সে সব শাস্তিকে হদ বলে। এ শাস্তি ধার্য করা আল্লাহর হক বা অধিকার। (আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ লিল মাওয়ারদী, পৃ. ২১২) কারণ জনগণের কল্যাণ সাধন ও দুর্ভোগ প্রতিহত করার লক্ষ্যে আল্লাহর এ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং যেসব অপরাধের ক্ষতি ও বিপর্যয় জনগণের ওপর বর্তায় এবং অপরাধীর শাস্তির ফায়দা জনগণ ভোগ করে সেসব শাস্তি আল্লাহর হক হিসেবে বিবেচিত। জনগণের হককেই বলা হয়েছে আল্লাহর হক। এ শাস্তির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হওয়ায় এর গুরুত্ব যেমন অধিক, তেমন একে রহিত করার ক্ষমতাও কারও নেই। কেউ রহিত করলেও এটা রহিত হয়ে যায় না। এ পরিভাষা অনুযায়ী কিসাস হদের আওতায় আসে না। যদিও তা শরী'আতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কারণ কিসাসের মধ্যে বান্দার হক থাকে প্রবল। অনুরূপ তা'যীরও হদের মধ্যে গণ্য হয় না। কারণ তা'যীরের শাস্তি শরী'আতের পরক্ষ থেকে নির্ধারিত নয়। হদের উপরোক্ত পারিভাষিক অর্থ জমহুর ফকীহদের থেকে বর্ণিত। তবে কোনো কোনো ফকীহ হদের ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের মতে, শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিকে হদ বলে। এর সাথে আল্লাহর হক হিসেবে ধার্য হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। তাদের এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কিসাস ও দিয়াত হদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা উভয় শাস্তিই বান্দার হক হিসেবে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের মতে হুদুদ হলো "শরী'আত কর্তৃক সে সব শাস্তি যা কতগুলো নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য প্রবর্তিত।" অপরাধগুলো হচ্ছে, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি (রাহাজানী), বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও ধর্মত্যাগ।

[১২৬৪]. কাফফারা অপরাধ তিন প্রকার: (ক) যাতে শুধু হদ আবশ্যক কিন্তু কোন কাফফারা নেই; (খ) যাতে শুধু কাফফারা আছে, কোন হদ নেই এবং (গ) কাফফারা ও হদ কোনটিই নেই।

যেমন, উমার (রা.) বিক্রি করার জন্য পানি মিশ্রিত দুধ রাস্তায় ঢেলে দেন। কখনও সম্পদে একটি অংশ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েও তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। যেমন, যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর অর্ধেক সম্পত্তি তা'যীরের উদ্দেশ্যে সরকার বাজেয়াপ্ত করে থাকে। তা'যীর শাস্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে। তন্মধ্যে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য সর্বোত্তম মতটি এখানে উল্লেখ করা হলো। তা'যীর নির্ধারণের সময় দেখতে হবে যে, যে জাতীয় অপরাধে তা'যীর দেওয়া হচ্ছে ঐ জাতীয় অপরাধের জন্য শরী'আতে শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে কিনা। থাকলে তা'যীরের শাস্তি ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত উঠানো যাবে না তার চেয়ে নিচে রাখতে হবে। তবে ভিন্ন জাতীয় অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তির চেয়ে অধিক হলেও কোনো দোষ নেই। যেমন, নিসাবের চেয়ে কম পরিমাণ মাল চুরি করলে তাকে তা'যীর শাস্তি হিসেবে হাত কর্তনের শাস্তি দেওয়া যাবে না। অবশ্য বেত্রাঘাতের তা'যীর দিলে তার পরিমাণ হদ্দে কযফ বা অপবাদ দেওয়ার নির্দিষ্ট শাস্তির পরিমাণের চেয়ে অধিক হলেও কোনো আপত্তি নেই। অনুরূপ ব্যভিচার সংঘটিত না হলে অন্য কুকর্মের জন্য তা'যীর হিসেবে হদ্দে যিনা বা ব্যভিচারের নির্ধারিত শাস্তি দেওয়া যাবে না। তবে তা'যীর হিসেবে তাকে বেত্রাঘাত দিলে তার পরিমাণ হদ্দে কযফের পরিমাণের চেয়ে বেশিও থেকে পারে। সহত্যার দ্বারা তা'যীর শাস্তি দেওয়া বৈধ কিনা? ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে বৈধ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর একদল অনুসারী ও ইমাম শাফে'ঈ (রহ.) নীতিগতভাবে এ মত সমর্থন করেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও আছে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতাকারী বিদ'আত প্রথার দিকে আহ্বানকারীকে হত্যা করার ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু মুসলিম গুপ্তচর হত্যার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালিক ও কতিপয় হাম্বলী আলেমের মতে হত্যা করা বৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফে'ঈর মতে অবৈধ। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে হত্যার দ্বারা তা'যীর শাস্তি দেওয়া জায়েয। এরূপ হত্যা হানাফীগণের নিকট রাজনৈতিক হত্যা নামে অভিহিত।[১২৬৫] তা'যীর শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে হত্যা করা যদি অত্যাবশ্যক হয় এবং শাস্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে হত্যা করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় না থাকে, এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ বিবেচনা মতে হত্যা করা বৈধ। সুন্নতে নববী থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أويفرق جاعتكم فاقتلوه .

"কেউ যদি তোমাদের একক নেতৃত্বের ফাটল ধরাতে বা দলের মধ্যে ভাঙ্গণ সৃষ্টি করতে তৎপর হয়, তবে তাকে হত্যা কর।"[১২৬৬] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যার ফিৎনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাকে হত্যা করা ব্যতীত অন্য কোনো পথ না থাকে তাকে হত্যা করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যার মদ্যপান করার অভ্যাস কোনো ক্রমেই বন্ধ করা যায় না। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,"যে ব্যক্তি এমন কাজ থেকে বিরত না হয় তাকে হত্যা করা।" তা'যীর দণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারকের ক্ষমতা ব্যাপক। তিনিই তা'যীর পর্যায়ে অপরাধসমূহের মধ্য থেকে যে কোনো অপরাধের যুক্তিসঙ্গ দণ্ড নির্ধারণ করেন। শরী'আতে তা'যীর জাতীয় যেসব দণ্ডের বর্ণনা দেওয়া আছে-বিচারক তার মধ্যেই ক্ষমতা সীমিত রাখবেন, এর বাইরে যাবেন না। উল্লেখ্য সর্বনিম্ন দণ্ড সতর্ক করা এবং সর্বোচ্চ দণ্ড মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। যে ধরণের দণ্ড তিনি নির্ধারণ করবেন তার পরিমাণও তিনি নির্ধারণ করে দিবেন। যদি বেত্রাঘাতের দণ্ড নির্ধারণ করেন তাহলে বেত্রাঘাতের পরিমাণও ঠিক করে দিবেন। দণ্ড নির্বাচনে ও পরিমাণ নির্ধারণে বিচারক তার প্রবৃত্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, আক্রোশ ও প্রতিশোধস্পৃহা এবং যুক্তিহীন ও তড়িঘড়ি করে অদূরদর্শিতার সাথে রায় দিবেন না। দণ্ড নির্বাচনে তিনি নির্ধারিত বিধিবিধানের আলোকে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। যেসব বিধি-বিধান সামনে রেখে তিনি দণ্ড নির্ণয় করবেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-অপরাধের প্রকৃতি, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রভাব, অপরাধীর অবস্থা-সে কি অপরাধের সহযোগী না সংগঠক। তিনি আরও বিবেচনা করবেন-অপরাধের বিস্তৃতি-ব্যাপকতা কেমন এবং তাতে লোকের সংশ্লিষ্টতার পরিমাণ কত এবং কোনো ধরণের দণ্ড অপরাধীকে সংযত রাখতে ও অন্যদেরকে সতর্ক করতে কতটুকু সহায়ক হবে। অপরাধ যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক সে অপরাধে

[১২৬৫]. আসসিয়াসাতুশ শরয়িয়্যাহ লি ইবনি তাইমিয়্যাহ, পৃ. ৮৫

[১২৬৬]. সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৪৮০

জড়িত তবে বিচারক দণ্ডের মাত্রা বাড়িয়ে দিবেন। অপরাধী যদি ভদ্র, সচ্চরিত্রবান হয় এবং জীবনে প্রথমবারই এ অপরাধে জড়িয়ে থাকে তবে তার লঘু দণ্ড হবে, পুনরাবৃত্তিকারীর হবে গুরুদণ্ড এবং এভাবেই অপরাধ করার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে দণ্ডের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মোটকথা তা'যীরমূলক অপরাধে দণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজে সংঘটিত অধিকাংশ অপরাধ তা'যীর ব্যবস্থার আওতাভুক্ত। কেননা হুদুদ, কিসাস ও দিয়াত ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের শাস্তি শরী'আত নির্ধারণ করে দেয়নি। কিন্তু এসব অপরাধ তা'যীরের অপরাধের তুলনায় অনেক কম। শরী'আত তা'যীর শাস্তি নির্ধারণের দায়িত্ব সরকার তথা বিচারপতিদের ওপর ন্যাস্ত করেছে। তারা শরী'আতের আইন ও মূলনীতির আলোকে সে সব শাস্তি ধার্য করেন যার বিস্তারিত বিবরণ শরী'আতে বিদ্যমান রয়েছে। সন্দেহ নেই, এ ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক ও অপরিসীম। যেহেতু এটা সেই সমুদয় অপরাধের সুষ্ঠ মীমাংসা করে যার নির্ধারিত শাস্তি শরী'আতে নেই। সুতরাং শরী'আত বিরোধী যে কাজই হোক তার ওপর তা'যীর অবধারিত। অনুরূপ যেসব কাজ শরী'আতের মাপকাঠিতে সমাজের জন্য নিশ্চিত ক্ষতিকর সেগুলোও তা'যীরের আওতায় আসবে। যদিও এসব ক্ষতিকর কাজের মধ্য থেকে কিছু কিছু কাজ মূলের দিক থেকে মুবাহ বা নির্দোষ, কিন্তু স্থান কাল ভেদে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে ক্ষতির কোনো অস্তিত্ব নেই, ক্ষতি শরী'আতে নিষিদ্ধ। কারণ ক্ষতি যুলুমের অন্তর্ভুক্ত আর যুলুম হারাম। সুতরাং মুবাহ কাজ যখন কোনো কারণবশতঃ ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়, তখন শরী'আতে তা নিষিদ্ধ হয় এবং তা বর্জন করা হয় ওয়াজিব। সে কাজ যে করে তাকে তা'যীর শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "ক্ষতি করাও অপরাধ, ক্ষতির বিপরীত ক্ষতি করাও অপরাধ।" তবে সমাজের ওপর ক্ষতির প্রভাব কতটুকু, তার সাথে সঙ্গতি রেখে তা'যীর শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং তা করতে হবে সুচিন্তিত ও যুলুমমুক্ত মন নিয়ে। কেননা যালিমের যুলুম হারাম। এছাড়া উক্ত কর্মের ক্ষতি নিরূপণ করতে হবে শরী'আতের নিক্তি দিয়ে, কু-প্রবৃত্তি ও কু-ধারণার বশবতী হয়ে নয়।

চতুর্থত ঃ কিছু কিছু দিয়াত ও তা'যীর সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কাফফারার শাস্তি। কাফফারা হচ্ছে একটি গোলাম আযাদ করা। যদি মালিকানায় গোলাম না থাকে কিংবা ক্রয় করে আযাদ করার মত আর্থিক সামর্থ্য না থাকে অথবা বাস্তবে কোন গোলাম পাওয়া না যায়, তবে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখতে হবে।[১২৬৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়। তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয়, তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রাদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, তবে তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা এবং মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয় এবং যে সংগতিহীন, সে একাদিক্রমে দুইমাস সিয়াম পালন করবে। তওবার জন্য ইহা আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১২৬৮] সুতরাং কাফফারা সংশ্লিষ্ট অর্থ হত্যাকারীর স্বীয় অর্থ থেকে ব্যয় করতে হবে।

[১২৬৭]. আশ-শাওকানী, লাইলুল আওতার, নাসবুর রায়াহ, *প্রাগুক্ত*, খ, ৪, পৃ. ৩৫৬

[১২৬৮]. আল- কুরআন, ৪ : ৯২

সহিংসতা ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের কতিপয় প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা

পৃথিবীতে সকল ধর্ম ও আদর্শের অনুসারীরাই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস বা জাঙ্গিবাদে লিপ্ত হয়েছে ও হচ্ছে। সন্ত্রাস অর্থই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে অস্ত্রধারণ ও শক্তি প্রয়োগ এবং বিশেষত অযোদ্ধা ব্যক্তি বা বস্তুকে আঘাত করা বা হত্যা করা। ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে সামগ্রিকভাবে রুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে মানব জীবনকে সর্বোচ্চ সম্মানিত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং একমাত্র বিচার ও যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচার ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে ইসলামে সন্ত্রাসের পথ পরিপূর্ণভাবে রুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের অস্তিত্ব একেবারেই বিরল। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে উপনিবেশোত্তর বিভিন্ন মুসলিম দেশের দমন-পীড়ন নীতি, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কাশ্মীর, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া ও অন্যান্য স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাঈল ও অন্যান্য বিশ্বশক্তির সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী নীতি, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মুসলিম নিধন ও মুসলিম সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, আবার প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ অপব্যবহার করে মুজাহিদ তৈরির উদ্দেশ্যে বিশেষ মাদরাসা তৈরি করে তাদেরকে জঙ্গিতে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি বিষয় বিভিন্নভাবে উগ্রতা, জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে উগ্রতা, সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপ্রিয়। এ দেশের ইতিহাসে কখনো ধর্মীয় সংঘাত, হানাহানি ও রক্তারক্তি দেখা যায় না। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, কাশ্মীর বা অন্যত্র যেমন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এবং একই ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ ও দলের মধ্যে হানাহানি ও রক্তারক্তির ঘটনা ঘটেছে কিন্তু বাংলাদেশে তা কখনোই ঘটেনি। তবে বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রতা ও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উন্মেষ লক্ষ করা যায়। 'সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে সমাজে রাসূল (সা.) এর আদর্শ বাস্তবায়নই উপযুক্ত উপায় ও মাধ্যম। সমাজে আত্মশুদ্ধি, স্থায়ীত্বশীল দারিদ্র বিমোচন ও ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা নির্মূল বা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব।'[১২৬৯] ইসলামী শরী'আত সকল মানুষের সার্বিক দিক ও বিভাগের সমন্বিত একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে এই জীবন ব্যবস্থা উদাত্ত আহবান জানিয়েছে সকলকে। নিম্নে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের উপায় ও কতিপয় সুপারিশমালা নিম্নে পেশ করা হলো-

১. সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন, আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে। কেননা এসব যতদিন থাকবে ততদিন যে কোনো দেশে কিছু মানুষ অজ্ঞতা ও আবেগের প্রেষণে উগ্রতা ও জঙ্গিবাদে লিপ্ত হবে।

২. যারা চরমপন্থা বা জঙ্গি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তারা আমাদের সমাজের বঞ্চনা ও অবিচারের শিকার। তাদেরকে শত্রু বিবেচনা করে নির্মুল করার চেয়ে নাগরিক ও দেশের সন্তান বিবেচনা করে যথাসম্ভব সংশোধন করে সমাজের মূলধারায় সংযুক্ত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশেষত যারা হত্যা বা অনুরূপ অপরাধে জড়িত হয়নি এরূপ যুবকদের সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

৩. অনুরূপভাবে যে মুসলিম দেশের ভৌগলিক বা অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে সে দেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ বন্ধ করতে হবে। এবং সে দেশের সরকারকে বিদেশী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। জঙ্গি তৈরির সকল পথ রুদ্ধ করে দিতে হবে।

৪. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর দিক হলো নিরপরাধের শাস্তি। জঙ্গিবাদ দমনের নামে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে নিরপরাধ মাদরাসা ছাত্র বা ধার্মিক মানুষদেরকে আটক, জিজ্ঞাসাবাদ, কারাগারে অন্তরীন রাখা, রিমান্ডে নেওয়া ইত্যাদি কর্ম একদিকে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত করবে, অন্যদিকে এ সকল নিরপরাধ মানুষ ও তাদের আপনজনদেরকে জঙ্গিবাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং সর্বোপরি আমাদেরকে আল্লাহর গযব ও শাস্তির মধ্যে নিপতিত করবে। কারণ নিরপরাধের শাস্তি ও বিচারবহির্ভুত হত্যা, শাস্তি ও

[১২৬৯]. প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমান, *সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.)*, রওশন আলী খোন্দকার সংকলিত (ঢাকা: ইফাবা, প্রকাশ: ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৬৪

কষ্টদান যখন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করে তখন আল্লাহর গযব ও জাগতিক শাস্তি সে দেশের ভাল ও মন্দ সকল মানুষকে গ্রাস করে।

সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব পিতৃত্বের বা অভিভাবকের দরদ নিয়ে সকল নাগরিকের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া। প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি প্রদান এবং নিরপরাধকে শাস্তি থেকে রক্ষার পাশাপাশি কম অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া তাদের আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, ইনসাফ, বৈষম্যহীন, ন্যায়বিচার ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট শাসক ও প্রশাসকগণ আল্লাহর সর্বোচ্চ দয়া ও পুরস্কার লাভ করবেন।

৫. মুসলিম দেশে ইসলাম দমন ও ইসলামি আন্দোলন দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে। কেননা এ সুযোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

৬. বেকারত্ব ও হতাশার দূর করতে হবে। কেননা জ্ঞানহীন আবেগ চরমপন্থা ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়। এ জন্য প্রচুর পরিমাণ কর্মসংস্থান সুষ্টি করে বেকারত্ব ও হতাশা দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. সামাজিক অবহেলা, অন্যায়-অবিচার রোধ করতে হবে। কারণ এসব বঞ্চনা ও অজ্ঞতা দূর না করে শক্তি বা আইন দিয়ে কঠোর হস্তে জঙ্গি নির্মূলের চেষ্টা করলে জাতির বিশাল ক্ষতি হবে। এতে এদেশের সন্ত্রাস নির্মূল হলেও জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব হবে না।

৮. ধর্মীয় আবেগের সাথে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের উপস্থিতি ঘটাতে হবে। এ জন্য সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় অধিকতর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সংযোজন অতীব প্রয়োজনীয়। জঙ্গিবাদের অযুহাতে মাদরাসা শিক্ষা সংকোচন এবং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক করার নামে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিমুক্ত করা আন্তজার্তিক বেনিয়াচক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনলেও জাতির জন্য ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করবে।

৯. ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ধর্ম-মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা জঙ্গিবাদ না কমিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে জঙ্গিবাদে আক্রান্ত হওয়ার জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। পাশাপাশি অন্যান্য সকল প্রকারের দুর্নীতি, সহিংসতা ও অপরাধ বৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করে। এ জন্য জঙ্গিবাদসহ অন্যান্য সকল সন্ত্রাস, সহিংসতা, দুর্নীতি, মাদকতা, অপরাধ প্রবণতা ও নৈতিক অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

১০. দেশে ইসলামি শিক্ষার বিকৃতি রোধ করতে হবে। কেননা বিকৃত শিক্ষা বা আংশিক ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে অতি আবেগী করে গড়ে তোলে। ফলে সে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

১১. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা আলিম-উলামাদেরদের সম্পৃক্ত করতে হবে। উগ্রতার প্রসারে ইসলামী শিক্ষার যে বিষয়গুলিকে বিকৃত করা হয় সেগুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য সমাজের প্রাজ্ঞ আলিমগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণমাধ্যমে সুযোগ দেওয়া অতীব জরুরী।

১২. আমাদের পরিকল্পনার বাইরে আল্লাহর তা'আলার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু কিছু পাপ সমাজে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ সে সমাজে সামাজিক অবক্ষয় ও অশান্তি ছড়িয়ে দেন। আমরা যদি অবক্ষয় ও অশান্তির এ সকল কারণ দূর করতে না পারি তবে শত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবক্ষয় ও অশান্তি আমাদের দেশ ও সমাজকে গ্রাস করবেই।

১৩. আমাদের আশেপাশে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আল্লাহর সঠিক দ্বীনকে বুঝানো ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। এ জন্য মুমিনের জীবনের একটি বড় দায়িত্ব হলো 'আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহ্ইউ আনিল মুনকার', অর্থাৎ 'ন্যায় কাজের নির্দেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা'। আদেশ ও নিষেধ-কে একত্রে আল্লাহর দিকে আহ্বান বলা হয়।

১৪. ইসলাম বিশ্ব মানবতার ধর্ম। সর্বত্র শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ইসলাম তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছে এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অশান্তি বিস্তারের হুশিয়ারী প্রদান করেছে। সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
"দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাবে না।"[১২৭০]

১২৭০ . আল-কুরআন, ৭: ৫৬

১৫. সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা সমাজের সকলের নিকটই ঘৃণিত। আল্লাহও তাদেরকে ঘৃণিত ও লা'নতপ্রাপ্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে লা'নত ও মন্দ আবাস।"[১২৭১] তাই আমাদের সবাইকে এ ঘৃণিত পন্থা পরিহার করতে হবে।

১৬. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিস্তৃতির কারণেই অধিকাংশ সময় মানুষের মধ্যে দুর্ভোগ ও অশান্তি নেমে আসে। কেননা পৃথিবীতে মানুষ যখন নিষ্ঠুরতার চরম শিখরে আরোহন করে, তখন আল্লাহ তা'আলা এ নিষ্ঠুরতার নমুনা স্বরূপ এমন মহামারি পৃথিবীতে দেন যা থেকে মানুষ শিক্ষা নগ্রহন করতে পারে। যেমন, কভিড ১৯, ক্যান্সার ইত্যাদি। এ সম্পর্কে সতর্ক করতঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মানুষের কৃত কর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান; যাতে তারা ফিরে আসে।"[১২৭২]

১৭. সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্বই আল্লাহ তা'আলার কাম্য। মানব জাতির চিরশত্রু শয়তানের ফাঁদে পড়ে অনেকেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাওবা করে এ পত থেকে ফিরে আসতে হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ অশান্তি (সন্ত্রাস) পছন্দ করেন না।"[১২৭৩]

১৮. সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত। কেননা তারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে লিপ্ত থাকার দরুন আল্লাহর কোপানলে পতিত হয়েছে। তারা আল্লাহর দয়া ও কল্যাণের আশা করা করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন।"[১২৭৪]

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পরিণাম ভয়াবহ। আর তাহলো দুনিয়ায় অপমান, লাঞ্ছণা বঞ্চণা আর পরকালে জাহান্নামের তাদের জন্য অবধারিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-"ফিতনা (অর্থাৎ পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ, শিরক, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"[১২৭৫]

১৯. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সর্বগ্রাসী, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ভয়াল ছোবল সকলকেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট করে তোলে। এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা এমন ফিতনাকে (সন্ত্রাস) ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[১২৭৬]

২০. সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা সন্ত্রাস ও জঙ্গি কার্যকলাপ চালিয়েও নিজেদেরকে সমাজে শান্তি স্থাপনকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তারা নিজেদেরকে শান্তি স্থাপনকারী বললেও বাস্তবিক পক্ষে তারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তাদের সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করো না; তারা বলে আমরাইতো শান্তি স্থাপনকারী।"[১২৭৭]

২১. আল কুরআনে মুনাফিক চরিত্রের এমন কিছু সন্ত্রাসী লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা স্বীয় স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাধারণ লোকদের সাথে মিষ্টি মধুর কথা বলে প্রতারণা করে এবং তাদেরকে অশান্ত করে তোলে। জাহান্নামই হবে এ সকল সন্ত্রাসীদের আবাসস্থল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে, সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।"[১২৭৮]

[১২৭১]. আল-কুরআন, ২: ২৭

[১২৭২]. আল-কুরআন, ৩০: ৪১

[১২৭৩]. আল-কুরআন, ২: ২০৫

[১২৭৪]. আল-কুরআন, ৮৯: ১২

[১২৭৫]. আল-কুরআন, ২: ১৯১

[১২৭৬]. আল-কুরআন, ৮: ২৫

[১২৭৭]. আল-কুরআন, ২: ১১

[১২৭৮]. আল-কুরআন, ২: ২০৬

২২. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি যথাযথ হক আদায়ের ওপরই বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল। তাই সবাইকে স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথ ভাবে আদায় করতে হবে। যারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় তারা ক্ষতির মধ্যে নিমর্জিত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আল্লাহর সহিত দৃঢ় অঙ্গীকার আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত"[১২৭৯]

২৩. ওজনে হ্রাস-বৃদ্ধি করার ফলে অনেক সময় সমাজে বিশৃঙ্খলা বা সন্ত্রাস সৃষ্টি হতে পারে। তাই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি যাতে না হয় তার প্রতি নির্দেশ দিয়ে শু'আইব (আ.) এর বক্তব্য তুলে ধরে কুরআনে বলা হয়েছে, "হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সংগতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) ঘটাবে না।"[১২৮০]

২৪. পৃথিবীর বুকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং উদ্ধতভাবে চলাফেরা হতে বিরত থাকতে হবে। যারা নিজেদেরকে এসব থেকে বিরত রেখেছে তাদের জন্য রয়েছে সু-সংবাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটি আখিরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।"[১২৮১]

২৫. লূত (আ.) এর সম্প্রদায় সমাজে নানা ধরণের অপকর্ম (সন্ত্রাস) করত বলে আল্লাহ তাদের ওপর যে শাস্তি অবধারিত করেছিলেন। বর্তমানেও যারা এ ধরণের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেলিপ্ত হবে, তারাও তদানুরুপ ধ্বংশের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমরা এই জনপদবাসীর ওপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা ছিল পাপাচারী।"[১২৮২]

২৬. সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। আর তাহলো দুনিয়ায় চরম অপমান, লাঞ্চনা ও পরকালে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন," আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরগণ ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের; কারণ তারা অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করত।"[১২৮৩]

পৃথিবীর বুকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টিকারীরা হলো সীমালজ্ঘনকারী। তাদের অন্যায় আদেশ পরিত্যাগ করতে হবে। তাদের অন্যায় আদেশ অমান্য করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং সীমালজ্ঘনকারীদের (সন্ত্রাসীদের) আদেশ মান্য করো না"[১২৮৪]

২৭. সালিহ (আ.) সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হবার পর তাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছালে সন্ত্রাসী কিছু লোক তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হত্যার হীন চক্রান্তে মেতে ওঠে এবং তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তাদের ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন "অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হয়েছে- আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এই তো তাদের ঘরবাড়ি, সীমালজ্ঘন হেতু যা জনশূন্য পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে"[১২৮৫]

আমাদের সকলকে দেশ ও সমাজে শান্তি স্থাপন করতে হবে। পাশাপাশি পরোপকারে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না।"[১২৮৬]

২৮. দুনিয়ার বুকে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের জন্য মারাত্মক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের শাস্তির ধরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিতে চড়ানো হবে অথাব তাদের

[১২৭৯]. আল-কুরআন, ২: ২৭
[১২৮০]. আল-কুরআন, ৭: ৮৫
[১২৮১]. আল-কুরআন, ২৮: ৮৩
[১২৮২]. আল-কুরআন, ২৯: ৩৪
[১২৮৩]. আল-কুরআন, ১৬: ৮৮
[১২৮৪]. আল-কুরআন, ২৬: ১৫১
[১২৮৫]. আল-কুরআন, ২৭: ৫১
[১২৮৬]. আল-কুরআন, ২৮: ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[১২৮৭]

২৯. ইসলাম সর্বদা তার অনুসারীদেরকে জনগণের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য সতর্ক করেছে। যারা মানুষের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তারা আল্লাহর রহমতের অতি নিকটবর্তী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করবে না। তাঁকে (আল্লাহকে) ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"[১২৮৮]

৩০. কুরআনে উল্লিখিত মাদায়েন শহরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় আল্লাহ তাদের হিদায়াতের জন্য শু'আইব (আ.) কে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর কথা অমান্য করায় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভূকম্পন দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। বাসস্থানগুলোও বিপর্যস্ত ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। আমাদের মাঝে যারা এরূপ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তাদের পরিণতিও তদানুরুপ হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি মাদায়েনবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শু'আইব (আ.) কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, শেষ দিবসের ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) ঘটাবে না। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করলো; অতঃপর তারা ভূমিকম্পন দ্বারা আক্রান্ত হলো; ফলে, তারা নিজগৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল"[১২৮৯]

৩১. প্রত্যেক মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অন্য ভাইয়ের রক্ত, মাল ও সম্মান রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। এ সব ক্ষুণ্ন করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩২. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হত্যা সম্পর্কিত মোকদ্দমার ফায়সালা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফায়সালা হবে তা হলো, রক্তপাত বা হত্যা সম্পর্কিত।"[১২৯০]

৩৩. কবিরা গোনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "কবিরা গোনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ হলো আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা অথবা তিনি বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"[১২৯১]

৩৪. হত্যাকৃত ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে হত্যাকারী সম্পর্কে বলবে 'হে প্রভু সে আমাকে হত্যা করেছে : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হত্যাকৃত ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে হত্যাকারীর মাথার অগ্রভাগ নিজ হাতে ধরে এমনভাবে নিয়ে আসবে যে হত্যাকারীর গলার রগসমূহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। তখন হত্যাকৃত ব্যক্তি এ কথা বলতে বলতে হত্যাকারীকে আরশের কাছে নিয়ে আসবে 'হে প্রভু সে আমাকে হত্যা করেছে।"[১২৯২]

৩৫. ইসলামের নামে উগ্রতায় লিপ্ত বা জঙ্গিরা যে সকল মতাদর্শ ও দাবি দাওয়া পেশ করে তা বর্জন করতে হবে। তারা বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও খুনখারাপি রক্তারক্তির মাধ্যমে তাদের আদর্শ চাপিয়ে দিতে চান। এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

৩৬. সরকারকে জনগণের ক্ষোভ-হতাশাকে উপেক্ষা না করে এর কারণসমূহ আন্তরিকভাবে চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

৩৭. সুশাসনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যাতে কারো প্রতি কোনো রূপ অন্যায় অবিচার না হয়।

৩৭. রাষ্ট্র পরিচালনায় সঠিকভাবে গণতন্ত্রের চর্চা করতে হবে। দেশে সঠিক গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ টিকে থাকতে পারে না।

[১২৮৭]. আল-কুরআন, ৫: ৩৩

[১২৮৮]. আল-কুরআন, ৭: ৫৬

[১২৮৯]. আল-কুরআন, ২৯: ৩৫-৩৬

[১২৯০]. সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৩০৪

[১২৯১]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ৪

[১২৯২]. সুনানুত্ তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৯০

৩৮. রাষ্ট্রের সবাইকে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সর্বস্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলে এ বৈশ্বিক মহামারি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে।

৩৯. ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটাতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন পালনের মাধ্যমে ধর্মান্ধতা ও ধর্মের অপব্যাখ্যা দূরীকরণ সম্ভব হবে।

৪০. যে সকল মুসলিম দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের শাসকদের বুঝতে হবে, এটা ইসলাম বিদ্বেষী, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান গোষ্ঠীর চক্রান্ত। অতএব, তাদের পাতা ফাঁদে পা দেয়া যাবে না। এ সব কিছু কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

৪১. ইসলামের জিহাদ বা কিতাল আর সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ এক কথা নয়। জিহাদ বা কিতালের আদেশ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ঐ সময় করেছেন যখন শত্রুরা তাঁকে ও তাঁর দ্বীনকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তবে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা বা অন্যায়ভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এমন নজীর ইসলামের ইতিহাসে নেই। তাই আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৪২. জঙ্গিবাদের সাথে গুটিকয়েক বিভ্রান্ত মুসলিম জড়িত। তাদেরকে হিদায়াতের জন্য আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কোনক্রমেই ইসলামের পথ নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে জাহান্নামের পথ।

৪৩. যেহেতু জঙ্গিবাদের সাথে সত্যিকার ইসলামপন্থিরা জড়িত নয়, তাই জঙ্গিবাদ দমনের জন্য মূলধারার ইসলামী শক্তি, ইসলামী দলগুলোর সহযোগিতা নিতে হবে এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

৪৪. মসজিদের ইমাম, খতিবদের কে জুমার খুতবায় ও অন্যান্য সময়ে মাসজিদগুলোতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদেরকে অবহিত করতে হবে। তাহলে তা সর্বস্তরের জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

৪৫. মূলধারার ইসলামী শক্তি ও দলগুলোকে রাজনৈতিকভাবে কোনঠাসা করার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শ, মাদরাসা-মক্তবকে ঢালাওভাবে জঙ্গি আখড়া, জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র, তালেবান দুর্গ, মৌলবাদী অভয়ারণ্য বলার মত উসকানিমূলক বক্তব্য বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি এ সমস্যা প্রতিরোধে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করতে হবে।

৪৬. এ দেশের জনগণ হলো ধর্মপ্রাণ। ধর্মের অবমাননা হয় এমন কাজ এ দেশের জনগণ মেনে নেয় না। তাই সরকার জনগণকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন করতে পারে।

৪৭. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসকদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা যখনই মুসলিমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন আইন বা নিয়ম জোর করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় তখনই তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করতে না পারলে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মত অশুভ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

৪৮. দেশের আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখরা ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁরা কুরআন ও হাদিসের সঠিক উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সতর্ক করতে পারেন।

৪৯. দেশের ইসলামিক ও অনিসলামিক বিভিন্ন দল, সংস্থা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতামূলক ব্যাপক উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে পারেন। তারা এর ভয়াবহতা ও অনিষ্টকর দিকগুলো সম্পর্কে জনসাধারণকে অভিহিত করতে পারেন।

৫০. ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ভয়াবহ পরিণামের বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে সিলেবাসভুক্ত করে সকল শ্রেণিতে পাঠদান করা যেতে পারে।

৫১. ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের স্থান নেই এ কথা রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে বেশি বেশি প্রচার করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫২. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসাগুলোতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা যেতে পারে।

৫৩. ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এলাকায় জঙ্গিবাদের কুফলগুলো তুলে ধরতে পারেন এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে সভা-সমাবেশ ও মানববন্ধন ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে।

৫৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রচার পরিহার করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে জনসাধারণ অনেক সময় অনাকাঙ্খিত পরিবেশ তৈরী করে ফেলে।

৫৫. কোন ব্যক্তির দোষকে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ওপর ঢালাওভাবে চালিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা প্রতিশোধের স্পৃহা থেকেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটে।

৫৬. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা। তাই এ সমস্যা দূর করতে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

৫৭. ইসলামের মৌলিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। তা নাহলে স্বল্প বা অর্ধ-শিক্ষিতরা ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে জনগণকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিতে পারে।

৫৮. আমাদের প্রত্যেকের সন্তান-সন্তুতির মধ্যে পারিবারিক শিক্ষা ও ইসলামিক মূল্যবোধ তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। তা নাহলে এসব সন্তানরাই বড় হয়ে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেতে পারে।

৫৯. সংস্কৃতি একটি দেশের প্রাণ। সুষ্ঠু সংস্কৃতির চর্চা হলে কখনো কোন লোক বিপদগামী হতে পারে না। এ জন্য আমাদের দেশের এফডিসি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সুস্থ্য ধারার চলচিত্র ও নাটক নির্মাণ করতে হবে। যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আগ্রাসী না হয়ে কোমল হৃদয় ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে পারে।

৬০. ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে হবে। কোথাও মন্দ কাজ দেখা দিলে সম্ভব হল সেটা প্রতিহত করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় প্রশাসনকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে হবে।

৬১. নিজ নিজ এলাকার জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তাঁরা যদি তৃণমূল পর্যায় থেকে পুলিশ প্রশাসনকে যথাসময়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয় তাহলে তা নির্মূল করা সম্ভব হবে।

৬২. ইহূদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক ও বিভিন্ন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, আচার ইত্যাদির অসার, ভিত্তিহীন। আর ইসলামে বিশ্বাস ও কর্মের যৌক্তিকতা, সৌন্দর্য, প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

৬৩. মানবিক ও নৈতিক গুণাবলীর অভাবে একজন মানুষ ফিতনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সে জন্য নৈতিক তথা প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে যাতে মানুষ তা নিজের মধ্যে রপ্ত করে খাঁটি মানুষে পরিণত হতে পারে। তাছাড়া প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা থাকলে ধর্মের নামে কেউ তাকে বিভ্রান্তও করতে পারবে না। ৬৪. সমাজ ও রাষ্ট্রের যুবকরাই চালিকা শক্তি। যুবকরাই পারে এ সমাজ ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলাও যুব শ্রেণিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই যুবকদেরকে নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্র ধারণ করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

৬৫. দুনিয়ার ফিতনা, ফাসাদ, বিপর্যয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে যে ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন তা জনগণকে অবহিত করতে হবে। যাতে তা স্মরণ করে তারা সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে পারে।

৬৬. যে সব দুর্বৃত্ত সমাজ ও রাষ্ট্রে ফিতনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টির সাথে জড়িত তারা সমাজের দুষ্ট ক্ষত। তাদেরকে জনসমক্ষে এমন শাস্তি দিতে হবে, যা দেখে অন্য লোক সংশোধন হয়ে যায়। অন্য কেউ সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের পথে পা বাড়াতে সাহস না পায়।

৬৭. কঠোর আইন শুধু প্রণয়নের বিষয় নয়, বরং তার প্রয়োগ নিশ্চিতকরতে হবে। কোন সন্ত্রাসীই যেন আইনের ফাঁকফোঁকরে অবৈধ পন্থার আশ্রয় নিয়ে মাফ পেয়ে না যায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। সন্ত্রাসীদের অর্থবিত্তের অভাব নেই। তাই তারা মনে করে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি পেয়ে যাবে। সকল অবৈধ পথ যদি রুদ্ধ করে দেয়া যায়, তাহলে কঠোর শাস্তির ভয়ে অবশ্যই তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত হবে।

৬৮. সমাজের মূলধারার আলিম-উলামা, চিন্তাবিদ ও পীর-মাশাইখ ঐক্যবদ্ধ হলে তাঁরা সমবেতভাবে জঙ্গিবাদের বিষয়ে মতবিনিময় করতে পারলে দীনের নামে সকল বিভ্রান্তি ও উগ্রতা সহজেই দূরীভূত করা সম্ভব হবে।

৬৯. যে পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মাধ্যমে সীমালংঘন করে তাদের জন্য দুনিয়ায় কঠোর, লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি এবং পরকালে জাহান্নামই হবে তার আবাস।

৭০. বাংলাদেশের ভৌগলিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী ও আন্তর্জাতিক বেনিয়া-চক্র যে কোনো মূল্যে এদেশের ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চেষ্টা করবেন। কখনো তারা জঙ্গি তৈরি করবেন এবং কখনো জঙ্গিবাদের অযুহাতে ধার্মিক মানুষদের হয়রানি, অত্যাচার, ইসলাম প্রচারকদের কণ্ঠরোধ, ইসলামী শিক্ষা সংকোচন ইত্যাদির মাধ্যমে জঙ্গিবাদকে উস্কে দিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে সরকার ও প্রশাসনকে তাদের সহায়তা গ্রহণে বাধ্য করবেন। এ সব কিছু সরকার ও প্রশাসনকে বিচক্ষণতার সাথে মোকাবিলা করতে হবে।

৭১. যে বিষয়টি উগ্রতার পথ উন্মুক্ত করে তা হলো দুনিয়ামুখিতা ও দুনিয়ার ফলাফল বিচার। রাতারাতি পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে সব কিছু ভাল করে ফেলার বা কোনো জাগতিক ফল অর্জন ও কিছুই হবে না বলে হতাশ হয়ে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ঘটানোর চিন্তা ও মানষিকতা পরিহার করতে হবে।

৭২. হতাশা মানুষকে আগ্রাসী করে তোলে। এতে মানুষ উগ্রতায় নিপতিত হয়। মুমিন সমকালীন পরিস্থিতি দেখে ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে এরূপ আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারেন। তাই এ মনোভাব পরিহার করতে হবে।

৭৩. যে সকল সাধারণ ভুলত্রুটি উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা ছড়াতে পারে তা সচেতনতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দলগত, পদ্ধতিগত বা মাসআলাগত ভিন্নতার কারণে একে অপরকে ইসলামের শত্রু, দালাল, ইহূদী-খৃস্টানদের এজেন্ট, নবী-ওলীগণের দুশমন, ইত্যাদি বলে পারস্পারিক ঘৃণা উস্কে দিচ্ছেন। এ সবই তাকফীর বা কাফির কথনের বিভিন্ন রূপ। এসবই ধর্মীয় উগ্রতা উস্কে দিচ্ছে। তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

৭৪. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের জন্য সন্ত্রাসের মনোবিকারমূলক চরিত্রগত দুর্বলতা সেগুলো দূরীকরণেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ জন্য প্রবৃত্তির শুদ্ধি বা তাযকিয়াতুন নাফস- আজকের প্রচলিত পরিভাষায় যাকে তাসাউউফ বলে- তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে তার নাফসকে পরিশুদ্ধ করলো, নি-য়ই সে সফলকাম হয়েছে। আর যে তার নাফসকে কলুষিত করলো সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[১২৯৩]

৭৫. আদেশ নিষেধের জন্য স্বভাবতই ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রয়োজন। এ জন্য যারা সমাজে ও রাষ্ট্রে দায়িত্ব ও ক্ষমতায় রয়েছেন তাদের জন্য এ দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফরয আইন বা ব্যক্তিগতভাবে ফরয। দায়িত্ব ও ক্ষমতা যত বেশি আদেশ ও নিষেধের দায়িত্বও তত বেশি। আলাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ও তাদের তত বেশি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে বা ক্ষমতাবান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকার্যে নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আলাহর এখতিয়ারে।"[১২৯৪]

৭৬. দেশের শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক প্রশাসকগণ, বিচারকগণ, আলিমগণ, বুদ্ধিজীবিগণ ও সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে বেশী, তাদের জন্য আশংকাও বেশি। তাদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত্ব পালন না করে নিশ্চুপ থাকেন তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়াবহ। অনুরূপভাবে নিজের পরিবার, নিজের অধীনস্থ মানুষগণ ও নিজের প্রভাবাধীন মানুষদের আদেশ ও নিষেধ করা গৃহকর্তা বা কর্মকর্তার জন্য ফরয আইন। কারণ আলাহ তাকে এদের মধ্যে ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল করেছেন এবং তিনি তাকে এদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্বাধীনদের

[১২৯৩]. আল-কুরআন, ৯১: ৯-১০
[১২৯৪]. আল-কুরআন, ২২: ৪১

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মানুষদের উপর দায়িত্ব-প্রাপ্ত শাসক বা প্রশাসক অভিভাবক এবং তাকে তার অধিনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বাড়ির কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ি ও তার সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব প্রাপ্তা এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[১২৯৫]

৭৮. ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বা জঙ্গি নির্মূল করার নামে ইসলামী মূল্যবোধ প্রসারমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের দাবি করা হয়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার মূল দাবী হলো সকল ধর্মের মানুষকে তার ধর্ম পালন ও ধর্মের বিষয়ে তার নিজের ব্যাখ্যা ও মতবাদ প্রচারের সুযোগ দেওয়া। গ্রহণ করা বা না করা জনগণের ইচ্ছা। গণতান্ত্রিক অধিকারের আওতায় মতপ্রকাশের অধিকার দিলে উগ্রতার পথ রুদ্ধ হয়। অতীতে কোনোকোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি নিষেধ করার ফলে সমাজতান্ত্রিক জঙ্গিবাদের উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীতে মূলধারায় সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সুযোগ দেওয়ার ফলে সর্বহারার রাজত্বের জন্য বা সাম্যবাদের নামে সন্ত্রাস ক্রমান্বয়ে কমে যায়।

৭৯. আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য জানিয়ে দিয়েছেন যে, সীমালংঘন করা এবং দুনিয়াবী জীবন যাত্রাকে অগ্রাধিকার দেয়ার পরিণাম হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে আল্লাহকে ভয় করা এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরতা রাখা তথা আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়ার পরিণাম চিরশান্তির নিবাস জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,'অনন্তর যে সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।"[১২৯৬] এই ঘোষণা এবং সাথে সাথে দুনিয়ার ফিতনা, ফাসাদ, বিপর্যয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহ আখিরাতে যে ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন তা জনগণকে অবহিত করতে হবে। যাতে তা স্মরণ করে তারা সহিংসতা ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে।

উপসংহার

[১২৯৫]. সহীহুল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫
[১২৯৬]. আল-কুরআন, ৭৯: ৩৭-৪১

Dhaka University Institutional Repository

আজ সারা বিশ্ব সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের তাণ্ডবে কেঁপে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, তুরস্ক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের থাবা; আর ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ শকুনীদের নখের আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত। এই দেশের সুখ-শান্তি নষ্ট করার জন্য ইসলামের চরম শত্রু ইসরাঈল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানা ষড়যন্ত্র করছে। আর সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ তারই একটি অংশ মাত্র। সারা পৃথিবী অশান্তির আগুনে পুড়ছে। মানুষে-মানুষে হানাহানি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, আদর্শিক গোঁড়ামী, পাশবিক হিংস্রতায় করাল গ্রাসে ক্ষত বিক্ষত সমগ্র পৃথিবী। যার মূল কারণ হলো আমাদের মাঝে ইসলামের শান্তি, উদারতা ও সম্প্রীতির প্রচণ্ডঅভাব। সহিংসতা, ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বর্তমান বিশ্বের এক জটিল বাস্তবতা। একারণেই এ গবেষণা কর্ম যা আমাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যাতে সকল প্রকার উদারতা ও সম্প্রীতির শিক্ষা পাওয়া যায়। এ জীবন ব্যবস্থায় সকল ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখে। ইসলামে উগ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা, চরমপন্থা ও স্বেচ্ছাচারিতার ন্যূনতম কোনও স্থান নেই। উদারতা ও সম্প্রীতি হলো সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ধর্মীয় সহনশীলতার নৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তি। তাই ইসলামের শাশ্বত জীবন বিধান কোনো সময়, স্থান বা পরিবেশের সাথে সীমাবদ্ধ হতে পারে না। এ জীবন ব্যবস্থার রয়েছে প্রশস্ততা ও উদারতা যেখানে জঙ্গিবাদের মাধ্যমে অশান্তি, মানুষ হত্যা ও বর্বর হামলার স্থান নেই।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের এ বিষবাস্প দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে জঙ্গিবাদকে দমন করার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সরকার যেখানে জঙ্গি ঘটনায় জিরো টলারেন্স দেখাতে বদ্ধপরিকর সেখানে সবাইকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জঙ্গিবাদের উত্থান অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে হবে। বিশেষ করে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে মানস ও মননশীলতা, মানবীকতা ও সামাজিক মূল্যবোধে গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সুকুমারবৃত্তির অনুশীলনের পরিমিত ব্যবস্থা থাকতে হবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তারা কোথায় যায় এবং কাদের সঙ্গে মিশে সেদিকে কঠোরভাবে নজর রাখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, জঙ্গিরা ইসলামের নাম ব্যবহার করছে। সুতরাং ইসলামের সঠিক শিক্ষা, রূপ তুলে ধরতে হবে। দেশের আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, মূল ইসলামী দল, সচেতন জনতা ও প্রশাসনের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব। যা-ই হোক, সন্ত্রাস নির্মূলের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিপুল উত্থানে বিশ্বের মধ্যে তৈরি হয়েছে আরও একটি বিশ্ব। তার নাম জঙ্গি বিশ্ব। কারণ, জঙ্গি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বজুড়ে এত বেশি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি করে চলেছে তাদের সদস্য সংখ্যা, তার প্রভাব পৃথিবীর প্রতিটি কোণেই আলোড়ন তুলেছে। বিশ্বের অনেক দেশ বলছে যে, জঙ্গিরা তথ্য প্রযুক্তি ওয়েব ও সোশ্যাল মিডিয়াকে ম্যানিপুলেট করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করে নিচ্ছে। তেমনি তারা এর মাধ্যমে তরুণ সমাজের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে উচ্চশিক্ষিত আধুনিক প্রজন্মকেও প্রতিদিন জঙ্গি সংগঠনের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করছে। তাই এখন সবাইকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং এর ভয়ংকর পরিণাম সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এছাড়াও ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে হবে, যাতে আগামী প্রজন্ম ইসলাম বিরোধী সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইসলামী আদর্শ ও নীতি নৈতিকতায় অটল ও অবিচল থাকতে পারে। সর্বোপরি ঈমান ও আকিদা রক্ষা করতে পারে। তাছাড়া আদর্শিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা ইসলামের একটি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ সমাজ কাঙ্খিত উন্নতি ও প্রগতির সোপান অতিক্রম করতে পারে না। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে সে বিষয়ে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখবে

Dhaka University Institutional Repository

বলে আমরা আশাবাদী। এই অভিসন্দর্ভে গবেষণার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য উপাত্ত মৌলিক উৎস থেকে যথাযথ ও প্রামাণিকভাবে উপস্থাপন করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তী গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আরো বিস্তৃতি ঘটাবেন বলে আমি আশা রাখি। আল্লাহ্ আমাদের সকল প্রচেষ্টা ও শ্রম কবুল করুন। আমীন!

গ্রন্থপঞ্জি

- ❖ **আল-কুরআনুল কারীম**
- ❖ নাছির উদ্দিন আবু সায়ীদ আব্দুল্লাহ ইবন উমর বায়যাবী, **আনওয়ারুত্ তানজীল ওয়া আসরারুরত্ তা'ওয়ীল** (বৈরূতঃ দারু ইহয়াউত্ তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ-১৪১৮ হি.)
- ❖ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা:), **তানবীরুল মাকাবিছ মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, তা.বি, মাকতাবাতুশ শামেলা)
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ শামছুদ্দিন কুরতুবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ, **আল-জামী' লিআহকামিল কুরআন** (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিশরীয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৪ খ্রী.)
- ❖ আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমার ইবন কাছীর, **তাফসীরুল কুরআনিল আজীম** (কায়রোঃ দারুত্ তায়্যেবাতি লিন্নশরে ওয়াত্-তাওযী, ২য় সংস্করণ ১৪২০ হি.)
- ❖ তাফসীর বিশারদ আলেমগণ, **আত-তাফসীরুল মুয়াস্সার** (রিয়াদঃ বাদশাহ্ ফাহাদ মূল্যবান বই প্রকাশনা সংস্থা, ২য় সংস্করণঃ ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.)
- ❖ মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ মাযহারী, **তাফসীরে মাযহারী** (পাকিস্তানঃ মাকতাবাতুর রশদীয়্যাহ, ১ম মূদ্রণঃ ১৪১২ হিঃ)
- ❖ হাফেজ ইমামুদ্দিন ইবন কাছীর (রঃ), অনূদিতঃ ড. মোঃ মুজীবুর রহমান, **তাফসীর ইবন কাসীর** (ঢাকঃ হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণঃ ১৪২৯ হিঃ)
- ❖ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল কাযী, **মাউসূআ'তু কাশ্শাফ** (বৈরূতঃ মাকতাবাতু লেবানন নাশিরুন, ১ম মুদ্রণঃ ১৯৯৬ খ্রি.)
- ❖ জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী ও মাহাল্লী, **তাফসীরে জালালাইন** (দেওবন্দঃ মাকতাবাতুন্ নু'মানিয়া, তা.বি.)
- ❖ আহমদ ইবন মুস্তফা আল-মারাগী, **তাফসীরুল মারাগী** (মিশরঃ প্রকাশনা সংস্থা, ১ম সংস্করণ-২০০১ খ্রি.)
- ❖ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, **তাফহীমুল কুরআন,** অনূদিতঃ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.) (দিল্লীঃ মারকাযী মাকতাবাহ্ ইসলামী, ২য় সংস্করণ- ১৯৯২)
- ❖ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, **তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন**, অনূদিতঃ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ (লন্ডনঃ আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ১৯তম সংস্করণঃ ১৪৩২ হি./ ২০১১ খ্রি.)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন আলি শাওক্বানী, **ফাত্হুল কাদির** (দামেস্কঃ দারু ইবন কাছীর, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৪ হি.)
- ❖ আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান রাযী ইবন আবি হাতেম, **তাফসীরুল কুরআনিল আযীম** (রিয়াদঃ মাকতাবাতু নায্যার মুস্তফা বায, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৯ হি.)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন জারীর ইবন ইয়াজিদ আত-তাবারী, **জামেউল বয়ান ফী তা'ওয়ীলিল কুরআন** (বৈরূতঃ মুআ'স্সাতুর রিছালা, ১ম সংস্করণঃ ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.)
- ❖ সায়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, **তাফহীমুল কুরআন,** অনূদিতঃ আব্দুল আজীজ কামাল (পাকিস্তানঃ ইসলামী পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৯ খ্রি.)
- ❖ আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন ওমর ইবন কাছীর, **তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,** অনূদিতঃ শায়খ সফিউর রহমান মুবাারকপুরী (রিয়াদ: দারুস্ সালাম পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণঃ ২০০০ খ্রি.)
- ❖ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, **মারেফুল কুরআন** (করাচীঃ মাকতাবা দারুল উলূম, ২০০5 খ্রি.)
- ❖ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানিপথী, **তাফসীরে মাযহারী,** অনূদিতঃ বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন (ঢাকাঃ ইফা, ২০০৪)
- ❖ আল্লামা সাব্বির আহমদ উছমানী, **দ্যা নোবেল কুরআনঃ তাফসীরে উছমানী,** 'অনূদিতঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আশফাক আহমদ (লাহোরঃ আল-আমিন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৩ খ্রি.)

- ❖ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবন মাসউদ মহিউস্ সুন্নাহ্ আল-বাগওয়ী, **মা'লিমুত্ তানযিল ফী তাফসীরুল কুরআন** (বৈরূত: দারু ইইয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ: ১৪২০ হি.)
- ❖ আবু হাইয়্যান মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আছিরুদ্দিন উনদুলূসী, **আল-বাহরুল মুহীত ফীত্ তাফসীর** (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১ম সংস্করণ: ১৪২০ হি.)
- ❖ ইসমাঈল হাক্কী ইবন মুস্তফা, রুহুল বয়ান (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা.বি.)
- ❖ আবুল হাসান মুকাতিল ইবন সুলাইমান, **তাফসীরে মুকাতিল ইবন সুলাইমান** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্ তুরাছ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি.)
- ❖ ড. মুস্তাফিজুর রহমান, **কুরআনের পরিভাষা** (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ১ম প্রকাশ: ১৯৯৮ খ্রি.)
- ❖ মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী, **কুরআনী তা'লিমাত** (হায়দারাবাদ: হামিদিয়া কতুব খানা, ২য় সংস্করণ: ১৯৭৬ খ্রি.)
- ❖ শায়খ তানভীর জাওহারী, **আয-জাওয়াহীর ফিল কুরআনিল কারীম** (কায়রো: দারুল ফিক্র, তা.বি)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন অবিবকর শামসুদ্দিন ইবনুল কায়্যিম জাওযী, **আত্-তিবয়ান ফী আকসামীল কুরআন** (বৈরূত: দারুল মা'রেফা, তা.বি.)
- ❖ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, **আল-মু'জামুল মুফাহ্হারাসু লি-আলফাযিল কুরআনিল কারীম** (কায়রো: দারুল হাদীস-২০০১ খ্রি.)
- ❖ আবুল কাশিম আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মদ রাগেব আল-ইস্পাহানী, **আল-মুফরাদাতু ফি গারিবীল কুরআন** (কায়রো: আল-মাকতাবাতুত্ তাওফীক্বিয়্যাহ- ২০০৩ খ্রি.)
- ❖ আমিন আহসান ইসলাহী, **তাদাব্বুরে কুরআন: Pondering over The Quran,** (কুয়ালালামপুর: ইসলামী বুক ট্রাস্ট, সালিম কায়ানী ট্রান্স, ১ম সংস্করণ: ২০০৭ খ্রি.)
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, **আস্-সহীহ** (বৈরূত: দারু তুকীন্ নাজাত, ১ম সংস্করণ: ১৪২২ হি.)
- ❖ মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশাইরী আন-নাইশাবুরী, **আস্-সহীহ** (বৈরূত: দারু ইহয়াউত্ তুরাছিল আরাবী, তা.বি)
- ❖ আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আসআ'স, **আস্-সুনান** (বৈরূত: আলমাকতাবাতুল আছরিয়্যাহ্, তা.বি)
- ❖ আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুয়াইব আন-নাসাঈ, **আস-সুনান** (আলেপ্পো: মাকতাবাতুল মাতবুয়াতিল ইসলামিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ: ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.)
- ❖ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, **আস্-সুনান** (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, প্রকাশের সন: ১৯৯৮ খ্রি.)
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, **আস-সুনান** (কায়রো: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ্, তা.বি)
- ❖ মালেক ইবন আনাস, **মুয়াত্তা** (আম্মান: মু'আস্সাতু যায়েদ ইবন সুলতান, ১ম সংস্করণ: ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.)
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ্ আল-হাকেম, **আল-মুসতাদরাক** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ: ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন মুহাম্মদ, **আস-সহীহ** (বৈরূত: মুআ'স্সাতুর রিছালা, ১ম সংস্করণ: ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খ্রি.)
- ❖ আবু জা'ফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামা আত-ত্বাহাবী, **শারহু মাশকীলিল আছার** (বৈরূত: মুআ'স্সাতুর রিছালা, ১ম মুদ্রণ: ১৪১৫ হি.)
- ❖ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্দুর রহমান দারেমী, **সুনানু দারেমী** (রিয়াদ: দারুল মুগনী লিন্নশরী ওয়াত্বওযী, ১ম মুদ্রণ: ১৪১২ হি./২০০০ খ্রি.)
- ❖ আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মদ নাছিরুদ্দিন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীছিস্ সহীহা** (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফি লিন্নশরী ওয়াত্বাওযী, প্রথম প্রকাশ: ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.)

- ❖ আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন আহমদ আত-তাবরানী, **আল-মু'জামুল আওসাত** (কায়রো: দারুল হারামাইন, তা.বি.)
- ❖ আলাউদ্দিন আলি ইবন হুসাম ইবন কাযীখান, **কানযুল উম্মাল** (বৈরূত: মুআ'স্সাতুর রিছালা, ৫ম সংস্করণ: ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.)
- ❖ ইমাম বায়হাকী, **ঈমানের ৭৭টি শাখা,** অনূদিত: মোঃ রফিকুল ইসলাম (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ: ২০১৪ খ্রি.)
- ❖ আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমা, **সহীহ ইবন খুযাইমা** (বৈরূত: মাকতাবাতুল ইসলামী, তা.বি.)
- ❖ আবু বকর আহমাদ ইবন ওমর আল-বায্যার, **মুসনাদুল বায্যার** (মদীনা: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম সংস্করণ: ১৯৮৮ খ্রি.)
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, **আল-আদাবুল মুফরাদ বিত্তালিক্বাত** (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরেফে লিন্নাশরে ওয়াত্ তাওযী, ১ম সংস্করণ- ১৪১৯ হি:)
- ❖ মা'মার ইবন্ আবি আমর রাসেদ, **আল-জামী'** (বৈরূত: তাওযীউল মাকতাবিল ইসলামী, ২য় সংস্করণ: ১৪০৩ হি:)
- ❖ আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন-নববী, **আল-মানহায শারহু সহীহে মুসলিম** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, ২য় সংস্করণ: ১৩৯২ হি.)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমদ, **আল-ইহসানু ফি তাকরীবে সহীহ ইবন হিব্বান** (বৈরূত: মু'আস্সাতুর রিছালা, ১ম সংস্করণ ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.)
- ❖ আবু মহাম্মদ হারিস ইবন মুহাম্মদ, **বাগইয়াতুল বাহেছ আল-যাওয়ায়েদে মাসনাদিল হারিছ** (মদীনা: মারকাযু খিদমাতিস্ সুন্নাহ্ ওয়াস্ সিরাতিন্ নাবওয়ীয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ: ১৪১৩ হি.)
- ❖ আলাউদ্দিন আলি ইবন হুসামুদ্দিন কাযীখান, **কানযুল উম্মাল** (বৈরূত: মুআ'সসাতুর রিছালা, ৫ম সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.)
- ❖ আবুবকর ইবন আবি শায়বা, **আল-কিতাবুল মুসান্নাফ** (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.)
- ❖ সুহাইব আব্দুল জাব্বার, **আল-জামেউস্ সহীহ লিস্-সুনান ওয়াল মাসানিদ,** (মাকতাবাতুশ শামেলা, ২০১৪)
- ❖ আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাযালী, **ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন** (বৈরূত: দারুল মা'রেফা, তা.বি. মাকতাবাতুশ্ শামেলা)
- ❖ আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন্-নাসায়ী, আহমদ ইবন শুয়াইব, **আস-সুনানুল কুবরা,** তাহকীক: ড. আব্দুল গাফ্ফার সুলাইমান (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১খ্রী.)
- ❖ আবুল কাশেম সুলাইমান ইবন আহমদ তাবরানী, **আল-মু'জামুল কাবীর** (মাকতাবাতুশ্ শামেলা http://www.mawsoah.net)
- ❖ আবু বকর আহমাদ ইবন্ হুসাইন ইবন আলি আল-বায়হাকী, **সুনানুল কুবরা** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ৩য় সংস্করণ; ১৪২৪ হি:)
- ❖ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আসআস, **সুনানু আবিদাউদ,** অনূদিত: ড.আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ- ১৪২৭ হি:)
- ❖ আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবন ইব্রাহিম, **মুসনাদু ইসহাক ইবন্ রা'হউয়্যাহ্** (মদীনা: মাকতাবাতুল ঈমান, ১ম সংস্করণ: ১৪১২ হি:)
- ❖ আবু বকর আহমদ ইবন হুসাইন ইবন আলি বায়হাক্বী, **শুয়াবুল ঈমান** (রিয়াদ: মাকতাবাতুর্ রশদে লিন্নশরে ওয়াত্ তাওযী, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রী.)

- ❖ আবু ইয়া'লা আহমদ ইবন আলি, **আল-মুসনাদ** (দামেস্কঃ দারুল মামুন লিত্-তুরাছি, ১ম সংস্করণঃ ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.)
- ❖ আবুল হাসান নুরুদ্দিন আলি ইবন আবি বকর, **মাযমাউয্ যাওয়ায়েদ** (কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুদ্সী, প্রকাশের সন-১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)
- ❖ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবনুস্ সুন্নী, **আ'মালুল ইয়াউমে ওয়াল্ লাইল** (বৈরূতঃ দারুল কিবলা লিস্ ছাক্বাফাতিল ইসলামিয়্যাহ্, তা.বি)
- ❖ সুহাইব আব্দুল জাব্বার, **আলজামেউস্ সাহীহ লিস্-সুনান ওয়াল মাসানিদ** (প্রকাশকালঃ ২০১৪ খ্রি. মাকতাবাতুশ শামেলা)
- ❖ আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবন ইব্রাহিম ইবন রাহওয়াইয়া, **মুসনাদ** (মদীনাঃ মাকতাবাতুল ঈমান, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯০ খ্রি.)
- ❖ আহমদ ইবন হুসাইন ইবন আলী আবু বকর আল-বায়হাকী, **আস্-সুনানুল কুবরা** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,৩য় সংস্করণঃ ২০০৩ খ্রি.)
- ❖ ইবনু আবী শাইবা আবু বকর আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ, **আল-মুসান্নাফ** (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশঃ ১৪০৯ হিঃ)
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ্ অলিউদ্দিন তিবরিযী, **মিশকাতুল মাছাবীহ্** (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় মুদ্রণঃ ১৯৮৫ খ্রি.)
- ❖ আলাউদ্দিন আলি ইবন হুসাম উদ্দিন, **কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকউয়াল ওয়াল আফআ'ল** (কায়রোঃ মুআচ্ছাসাতুর রিছালা, ৫ম মুদ্রণঃ ১৪০১ হিঃ)
- ❖ আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন্ আহমাদ তিবরানী, **আল-মুজামুস সগীর** (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী-দারুল আম্মার, ১ম সংস্করণ; ১৪০৫ হিঃ)
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন সালামা আল-কাযায়ী, **মুসনাদুস সিহাব** (বৈরূতঃ মুআ'স্সাতুর রিছালা, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.)
- ❖ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্দুর রহমান, **সুনানুদ্ দারেমী** (রিয়াদঃ দারুল মুগনী লিন্নশরে ওয়াত্ তাওযী, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./২০০০ খ্রি.)
- ❖ আহমদ ইবনুল হুসাইন আবুবকর বায়হাকী, **শুয়াবুল ইমান** (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রশদে লিন্নশরে ওয়াত তাওযী, ১ম মুদ্রণঃ ১৪২৩ হিঃ)
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ্ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, **আল-মুসনাদ** (কায়রোঃ মুয়াস্সাতুর রিসাল, প্রথম মুদ্রণঃ ১৪২১ হিঃ)
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাইল বুখারী, **আল-আদাবুল মুফরাদ** (বৈরূতঃ দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ৩য় মুদ্রণঃ ১৪০৯ হিঃ)
- ❖ আবুল হাসান আলি ইবন মুহাম্মদ মোল্লা আলি ক্বারী, **মিরকাতুল মাফাতিহ** (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.)
- ❖ আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন আহমাদ তাবরানী, **মুসনাদুস্ সামীন** (বৈরূতঃ মু'আস্সাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণঃ ১৪০৫ হিঃ)
- ❖ ইমাম আবু হামিদ আল-গায্যালী (রহ.), **এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,** মাওলানা মহিউদ্দিন খান অনুদিত (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০০৩ খ্রি.)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন সালেহ ইবন মুহাম্মদ উছায়মিয়্যীন, **শরহু রিয়াদিস্ সালেহীন** (রিয়াদঃ দারুল ওয়াত্বন লিন্নশ্র, প্রকাশঃ ১৪২৬ হি.)
- ❖ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইবন ওহাব, **আল-জামেউ ফিল হাদিস** (রিয়াদঃ দারু ইবনিল জাউযী, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৬ হিঃ)
- ❖ জামিল চৌধুরী, **আধুনিক বাংলা অভিধান** (ঢাকাঃ বাংলা একডেমি, প্রথম পূনর্মুদ্রণঃ আষাঢ় ১৪২৩/জুন ২০১৬)

- ❖ সম্পাদনা পরিষদ, **ব্যবহারিক বাংলা অভিধান** (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, চতুর্দশ পূন:মূদ্রণ, জুন-২০১১ খ্রী.)
- ❖ সম্পাদনা পরিষদ, **আরবী-বাংলা অভিধান** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন-২০০৬ খ্রী.)
- ❖ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, **ব্যবহারিক বাংলা অভিধান** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ২০০০ খ্রি.)
- ❖ মুহাম্মদ মতিওর রহমান, **ঐতিহাসিক অভিধান** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী-২০০৪ খ্রি.)
- ❖ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, **English-Bangla Dictionary** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ: ১৪২২ হি./২০১৫ খ্রি.)
- ❖ রাম শঙ্কর ভট্টাচার্য, **সংসদ বাংলা অভিধান** (কোলকাতা: সাহিত্য সংসদ, নতুন সংস্করণ, www.amarboi.com তা.বি)
- ❖ অশোক মুখোপাধ্যায়, **সংসদ সমার্থ শব্দকোষ** (কোলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ৩য় সংস্করণ: ১৯৯০ খ্রি.)
- ❖ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম.এ, **সংসদ বাঙ্গালা অভিধান** (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, সর্বশেষ মুদ্রণ: ১৯৭৩ খ্রি.)
- ❖ সনাতন শব্দের অর্থ নিত্য, চির বর্তমান, শাশ্বত, বহুকাল প্রচলিত এবং সনাতন ধর্ম বলতে বুঝায় চিরস্থায়ী ধর্ম। ড. আহমদ শরীফ, **সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান** (ঢাক: বাংলা একাডেমী, ১ম পুনমুদ্রণ: ১৯৯৮ খ্রি.)
- ❖ আবুল ফদল জামালুদ্দিন ইবন মানযুর, **লিসানুল আরব** (বৈরূত: দারু সাদের, ৩য় মুদ্রণ: ১৪১৪ হি:)
- ❖ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, **আল-মু'জামুল ওয়াঁফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান** (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৫খ্রী.)
- ❖ আবু নছর ইসমাইল ইবন হাম্মাদ জাওহারী ফারাবী, **আস-ছিহাহ্ তাজুল লুগাহ** (বৈরূত: দারুল ইলমে লিলমালায়িন, ৪র্থ সংস্করণ: ১৪০৭ হি.)
- ❖ মাজদুদ্দিন আবু তাহের মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব ফায়রুযআবাদী, **আল-ক্বামুসুল মুহীত** (বৈরূত: মু'আস্‌সাতুর রিছালা লিত্বাবাআতি লিন্নশরি ওয়াত্বাওযী, ৮ম সংস্করণ: ১৪২৬ হি.)
- ❖ আহমদ ইবন ফারেস ইবন যাকারিয়া, **মু'জামু মাক্বায়িসুল্ লুগাহ** (কায়রো: দারুল ফিক্‌র, প্রকাশকাল: ১৩৯৯ হি.)
- ❖ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলি, **আল-মিছবাহুল মুনীর** (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি)
- ❖ ড. আহমদ মুখতার আব্দুল হামিদ ওমর, **মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাতিল মুআসারা** (কায়রো: আলিমুল কুতুব, ১ম মুদ্রণ: ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.)
- ❖ হামিদ সাদিক কানিবী, **মু'জামু লুগাতিল ফুক্বাহা** (বৈরূত: দারুন্ নাফায়েছে লিত্বাবাআতি ওয়ান্নশরী ওয়াত্ তাওযী, ২য় মুদ্রণ: ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.)
- ❖ ইব্রাহিম মুস্তফা (মাজমাউল লুগাতিল আরাবীয়্যাহ), **আল-মু'জামুল ওয়াসীত,** (কায়রো: দারুদ দাওয়াহ্, মাকতাবাতুশ শামেলা)
- ❖ জিবরান মাসউদ, মু'জামুর রায়েদ, (কায়রো: দারুল ইলম, ৭ম মুদ্রণ: ১৯৯২ খ্রী.)
- ❖ আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ যুবাইদ, **তাজুল উরুছ** (বৈরূত: দারুল হেদায়া, মাকতাবাতুশ শামেলা)
- ❖ মালূফ লুইস ও সম্পাদনা পরিষদ, **আল-মুনজিদ ফিল্ লুগাতি ওয়াল ই'লম** (বৈরূত: দারুল মাশরিক্, ২৮তম প্রকাশ: ১৯৮৬ খ্রি.)
- ❖ ড. ইব্রাহিম মাদকূর ও সম্পাদনা পরিষদ, **আল-মু'জামুল ওয়াসীত** (দেওবন্দ: কতুবখানা হুসাইনিয়া, ২য় সংস্করণ, তা.বি.)

❖ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রাজ্জাক আল-হুসাইনী আবুল ফাইয, **তাজুল উরুছ মিন যাওয়াহিরীল ক্বামূছ** (বৈরূতঃ দারুল হিদায়া, তা.বি.)

❖ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনুল আজহারী আল হারয়ী আবু মানসূর, **তাহযীবুল্ লুগাহ্** (বৈরূতঃ দারু ইহয়াই তুরাছিল আরাবী, প্রথম মুদ্রণঃ ২০০১)

❖ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, **যমহারাতুল্ লুগাহ্** (বৈরূতঃ দারুল ইলমি লিল্ মালায়ীন, ১ম মুদ্রণঃ ১৯৮৭ খ্রি.)

❖ আহমদ ইবন ফারেস, **মুজমালুল্ লুগাহ্** (বৈরূতঃ মুআ'স্সাতুর রিছালা, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.)

❖ মুহাম্মদ ইবন মুকার্‌রাম জামালুদ্দিন ইবন মান্‌যুর, **লিসানুল আরব** (বৈরূতঃ দারু সাদের, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.)

❖ এস. এম মাহফুজুর রহমান, **বাংলা পিডিয়া** (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ম সংস্করণ-২০০৩ খ্রি.)

❖ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, **কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা** (ঝিনাইদহঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১৪২৮ হিঃ)

❖ ড. সায়িদ ইবন আলি, **বয়ানু আকীদাতু আহলিস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআত ওয়া লুযুমে ইত্তেবাউহা** (রিয়াদঃ মুআস্সাতুল যারীচি লিত্ তাওযী ওয়াল ইলান, ১৪০৫ হিঃ)

❖ আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবন আলি আল-ফাইউমী, **আল-মিসবাহুল মুনির ফী গারিবে শারহিল কাবির** (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)

❖ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্দুল আজীজ হাম্মাদা, **মুখতাসারু তাসহীলিল আকীদাতিল ইসলামিয়্যাহ্** (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ২য় প্রকাশ- ১৪২৪ হি.)

❖ সাইয়্যেদ ছাবেক, **ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্** (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় সংস্করণঃ ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.)

❖ সায়্যেদ সায়ীদ আব্দুল গণি, **আল-আক্বীদাতুস্ ছাফীয়া লিলফিরক্বাতিন্ নাযিয়া,** (www.aqeedeh.com)

❖ মুহাম্মদ ইবন সালেহ ইবন উছাইমীন, **মাজমু ফাতা'ওয়া** (রিয়াদঃ দারুল ওয়াতান, সর্বশেষ সংস্করণঃ ১৪১৩ হি.)

❖ সালেহ ইবন ফাউযান, **আল-ইরশাদ ইলা সহিহীল ই'তেকাদ** (দাম্মামঃ দারু ইবনুল জাওযী, ৪র্থ সংস্করণঃ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি, http:/www.alifta.com)

❖ ইমাম আবু হানিফা নু'মান ইবন সাবেত, **ফিক্‌হুল আকবর** (কুয়েতঃ মাকতাবাতুল ফুরক্বান, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.)

❖ আব্দুর রহমান ইবন নাছের, **শরহুল আক্বীদাতি ত্বাহাওয়ীয়্যাহ্** (রিয়াদঃ দারুত্ তাদমুরীয়্যাহ্, ড. আত-তুরকী তাহকীক কৃত, ২য় সংস্করণঃ ১৪১৯ হি./২০০৮ খ্রি.)

❖ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবন মাসউদ, **শরহুস্ সুন্নাহ্** (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.)

❖ নাশওয়ান ইবন সায়ীদ হুমায়রী, **শামসূল উলূম** (বৈরূতঃ দারুল ফিকরিল মুআসার, ১ম মূদ্রণঃ ১৪২০ হিঃ)

❖ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী, **আত-তা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ্** (পাকিস্তানঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম মুদ্রণঃ ১৪২৪ হিঃ)

❖ আবুবকর জাবের আল-জাযাঈরী, **আক্বীদাতুল মু'মিন** (মদীনাঃ মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় সংস্করণঃ ১৯৯৬ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ আবু তায়্যিব মুহাম্মদ সিদ্দীক খান আল-কিন্নাওযী, **কাত্ফুহ্ ছামার ফী বয়ানি 'আক্বীদাতি আহলিল আসার** (সৌদী আরবঃ দাওয়াত, পরামর্শ, ওয়াক্ফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১ম সংস্করণ- ১৪২১ হি.)
- ❖ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্দুল মুহসীন আত-তুরকী, **মুজমাল ই'তিক্বাদী আয়িম্মাতি সালফ** (সৌদী আরবঃ দাওয়াত, পরামর্শ, ওয়াক্ফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১ম সংস্করণ- ১৪১৭ হি.)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবি সাহল, **আল-মাবসূত** (বৈরূতঃ দারুল মা'রেফাহ্, ১ম সংস্করণ- ১৪১৪/১৯৯৩ খ্রি.)
- ❖ আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক, **আয্-যুহুদ ওয়ার্ রাক্বায়েক** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আজীজ সুলাইমান, **আল-ক্বার'আবি, আল-জাদীদ ফি শরহে কিতাবিত্ তাওহীদ** (জেদ্দাঃ মাকতাবাতুস্ সওয়াদী , ৫ম সংস্করণঃ ১৪২৪ হি/২০০৩ খ্রি.)
- ❖ জাহিয, **তাহযীবুল আখলাক** (বৈরূতঃ দারুস্ সাহাবা লিত্-তুরাছ, ১ম সংখ্যা, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.)
- ❖ ইমাম মাসকুইয়া, **তাহযীবুল আখলাক ফিত্-তারবীয়্যাহ্** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪০১ হি. মোতাবেক ১৯৮১ খ্রি.)
- ❖ আবুল হাসান বসরী আল-মাওয়ার্দী, **তাসদীকুন-নযর ওয়া তা'জীলুয্-যুফর** (বৈরূতঃ সম্পাদনা ড. ইয়াহ্ইয়া হিলাল সারহান, ১৯৮৩ খ্রি.)
- ❖ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ আল্-গায্যালী (রহ.), **এহইয়াউ উলুমিদ্দিন** (আত্মশুদ্ধির সন্ধানে, অনূদিতঃ মোঃ মুজিবুর, রহমান), সম্পাদনায় মোঃ লুৎফুর রহমান (ঢাকাঃ দি দেশ প্রিন্টার্স, ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খ্রি.)
- ❖ শামসুদ্দিন ইবনুল কায়্যিম জাওযী, **ইগাছাতুল লিহফান মিন মাসায়িদিস্ শায়তান** (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২য় সংস্করণঃ ১৩৯৩ হি.)
- ❖ আবু বকর আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবিদ্ দুনিয়া, **আল-ওয়ারাউ** (কুয়েতঃ আদ্-দারুস্ সালাফীয়্যাহ্, ১ম সংস্করণঃ ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.)
- ❖ মারকাযুল আছফা, **ইমাম শাফেঈ ও তাঁর উস্তাদ ওয়াকীর ঘটনা** (অনলাইনঃ আল-মাওসূআতুদ্ দীনিয়া, ১৯ জানুয়ারী, ২০০৮ খ্রি.)
- ❖ ওমর সুলাইমান আশকার, **নাহ্ওয়া ছাক্বাফাতিন ইসলামিয়্যাতিন আছলিয়্যাহ্** (আম্মানঃ দারুন্ নাফায়েছ লিন্নশরে ওয়াত্তাওযী, ৪র্থ সংস্করণঃ ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)
- ❖ যয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন আহমাদ ইবন রজব হাম্বলী, **জামি'উল উলূমি ওয়াল হিকাম** (বৈরুতঃ মুয়াচ্ছাসাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.)
- ❖ মুহাল্লাব ইবন আহমাদ ইবন আবি চুপরা, **আল-মুখতাসারুন্ নাসীহ্ ফি তাহযিবিল কিতাবে আলজা'মে আস-সহীহ** (রিয়াদঃ দারুত্ তাওহীদ, দারু আহলিস্ সুন্নাহ্, ১ম সংস্করণঃ ২০০৯ খ্রী.)
- ❖ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন হুসাইন আল-আমেলী, **কাশকুল** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.)
- ❖ আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মুকরী আত-তিলমাসানী, **নাফহুত তীর** (বৈরূতঃ দারু ছাদির, ১ম সংস্করণঃ ১৯৫৮ খ্রি.)
- ❖ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ আবু শায়খ আল-ইসবাহানী, **আল-ফাওয়ায়েদ** (রিয়াদঃ দারুছ ছামী লিন্নশরে ওয়াত্তাওযী, ১ম সংস্করণ ১৪১২ হি.)
- ❖ আহমাদ ছালামা কালয়ূবী, **হাশিয়াতা কালয়ূবী ওয়া উমাইরা** (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, প্রকাশঃ ১৪১৫ হি.)
- ❖ আবুবকর মুহাম্মদ যাকারিয়া, **আশ্ শির্ক ফিল ক্বাদীম ওয়াল হাদীছ** (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রশদি লিন্নশরী ওয়াত্তাওযী, ১ম সংস্করণঃ ১৪২১ হি.)

- ❖ আবুল আউন শামছুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আস্‌সাফারিনী, **লাওয়ামিউল আনওয়ার** (দামেস্কঃ মু'আস্‌সাতুল খাফেক্বাইন ওয়া মাকতাবাতিহা, ২য় সংস্করণঃ ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.)
- ❖ আব্দুল আজীজ ইবন আব্দুল্লাহ্‌ ইবন বাজ, **শারহু ছালাছাতিল উসূল** (রিয়াদঃ দারুল মাছির, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.)
- ❖ হাফেজ ইবন আহমদ আল-হাকামী, **মা'আরিজুল ক্বাবূল** (দাম্মামঃ দারু ইবনুল কায়্যিম, ১ম সংস্করণঃ ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.)
- ❖ সুলাইমান ইবন আব্দুল্লাহ্‌, **তাইসীরুল আজীজীল হামীদ** (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণঃ ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন আবুবকর শামছুদ্দিন ইবনুল কায়্যিম, **আল-জাওয়াবুল কাফী** (দামেস্কঃ দারুল মা'রেফা, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন সালেহ আল-উছাইমীন, **তাক্বরীবুত্‌ তাদমুরীয়্যাহ্‌** (দাম্মামঃ দারু ইবনুল জাওযী, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৯ হি.)
- ❖ আবু বকর মুহাম্মদ ইবন জা'ফর সামেরী, **মাকারীমুল আখলাক** (কায়রোঃ দারুল আফাক্বিল আরাবিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.)
- ❖ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, **কাওকাবুদ্‌ দুরারী** (ঢাকাঃ সুফী প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.)
- ❖ আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন্‌ আহমাদ তিবরানী, **মাকারিমুল আখলাক** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ; ১৪০৯ হিঃ)
- ❖ বাদশাহ্‌ ফাহাদ লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত, **আল-আখলাকু ফিল ইসলাম** (রিয়াদঃ আল-মাকতাবুত তা'আউনী ওয়াল ইরশাদ, প্রথম প্রকাশ- ১৪২১ হি.)
- ❖ আবুল কাসেম আলী ইবন হাসান ইবন আসাকীর, **তারীখু দামেস্ক** (রিয়াদঃ দারুল ফিক্‌র লিত্‌-তাবায়াতী ওয়ান্নশরী ওয়াত্‌-তাওযী, প্রকাশের সনঃ ১৪১৯ হি./১৯৯৫ খ্রি.)
- ❖ আবু ওমর শিহাব উদ্দিন ইবনু আব্দি রাব্বিহী উন্দুলূসী, **আল-ইক্বদুল ফারীদ** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণঃ ১৪০৪ হি.)
- ❖ আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান দারেমী, **রওজাতুল উক্বালা ওয়া নুযহাতুল ফুদালা** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্‌, তা.বি)
- ❖ আহমদ ইবন ইবরাহিম ইবন মুস্তফা হাশেমী, **যাওয়াহীরুল আদব** (বৈরূতঃ মু'আস্‌সাতুল মা'আরেফ, তা.বি)
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবন আহমদ শামছুদ্দিন যাহাবী, **সিয়রু আ'লামিন্‌ নুবালা** (কায়রোঃ দারুল হাদীছ, প্রথম সংস্করণঃ ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রী.)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন আবি বকর শামছুদ্দিন ইবনুল কায়্যিম জাওযী, **মাদারিজুস্‌ সালেকীন** (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশঃ ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.)
- ❖ উরীদ ফারুহ, **আল-ইনসান বাইনাল জাওহার ওয়াল-মাযহার** (আলামুল মা'রিফা, আগষ্ট ১৯৮৯ খ্রি.)
- ❖ হযরত মাওলানা হাকীম আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ আল-কাদিরী দানাপুরী (রহঃ), **আসাহ্হুস সিয়ার,** মাওলানা আ.ছ.ম. মাহমুদুল খান ও মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-২০১০ খ্রি.)
- ❖ ইমাম আল-গাযালী, **কিমিয়ায়ে সাআদাত** (করাচীঃ এমদাদিয়া কুতুবখানা, ৩য় সংস্করণঃ ১৯৮০ খ্রি.)
- ❖ আবু হাইয়্যান মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন আলি ইবন ইউসুফ ইবন হাইয়্যান আছীরুদ্দিন আল উন্দলূসী, **তুহফাতুল আরীব** (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ্‌, ১ম মুদ্রণঃ ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.)

❖ যয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আহমাদ ইবনে রজব ইবনে হাসান, **আহওয়ালুল কুবুর** (কায়রোঃ দারুল গাযযিল জাদীদ আলমানসূরা, ১ম মুদ্রণঃ ১৪২৬ হিঃ)
❖ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ জামাল উদ্দিন, **আল-আলফাযুল মুখতালাফা ফিল মাআ'নীল মু'তালাফা** (বৈরূতঃ দারুল জাঈল, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি.)
❖ আবু আব্দুর রহমান খলিল ইবন আহমদ, **কিতাবুল আইন** (বাগদাদঃ মাকতাবাতুল হেলাল, ১ম সংস্করণঃ ১৯৮৫ খ্রি.)
❖ সম্পাদনা পরিষদ, **মাউসূআ'তুল মাফাহীমিল ইসলামীয়্যাহ্ আল-আ'ম্মাহ্** (কায়রোঃ আল-মাজলিসুল আ'লা লিশ্ শুউনীল ইসলামীয়্যাহ্, তা.বি 'মাকতাবাতুশ্ শামেলা')
❖ জয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন আহমাদ ইবন রজব আল-বাগদাদী, **আত্-তাখওয়ীফু মিনান্ নার ওয়াত্-তা'রীফু বিহালি দারিল বুয়ার** (দামেস্কঃ দারুল বয়ান, ২য় সংস্করণঃ ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.)
❖ শামছুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আহমদ, **আস্-সিরাজুল মুনীর ফিল ইআ'নাহ্** (কায়রোঃ মাতবাআ'তু বুলাকিল আমিরীয়্যাহ্, প্রকাশের সনঃ ১২৮৫ হি.)
❖ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন কাসিমী, **মাহাসিনুত্ তা'ওয়ীল** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৮ হি.)
❖ আবুল কাশেম আলী ইবন হাসান ইবন আসাকীর, **তারীখে দামেস্ক** (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র লিত্তাবায়ী ওয়ান্নশরে ওয়াত্তাওযী, প্রকাশের সনঃ ১৪১৫ হি.)
❖ জালালুদ্দিন সুয়ূতী, **তারীখুল খুলাফা** (বৈরূতঃ মাকতাবাতুল নায্যার, ১ম সংস্করণঃ ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.)
❖ আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন ওমর ইবন কাছীর, **আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া** (কায়রোঃ দারু ইহইয়াউত্ তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণঃ ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.)
❖ আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবন মোবারক, **আয্-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৯ হি.)
❖ আবু বকর আহমদ ইবন মারওয়ান, **আল-মাযালিছাতু ওয়া যাওয়াহিরুল ইলম** (বৈরূতঃ যাবই'য়্যাতুয্ যারবিয়্যাতিল ইসলামীয়্যাহ্, ১ম প্রকাশঃ ১৪১৯ হি.)
❖ ড.শালাবা, **আল-মুজতামা' আল-ইসলামী** (কায়রোঃ মাকতাবাহ্ নাহ্দাহ, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.)
❖ সফিউর রহমান মোবারকপুরী, **আর-রাহীকুল মাখতুম** (বৈরূতঃ দারুর হেলাল, ১ম সংস্করণ, তা.বি.)
❖ আব্দুল হাই ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ, **সাজারাতুজ যাহাব** (বৈরূতঃ দারু ইবন কাসীর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.)
❖ আবুল ফারয জামালুদ্দিন আব্দুর রহমান মুহাম্মদ জাওযী, **আল-মুনতাযিমু ফী তারিখীল উমাম ওয়াল মুলূক** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.)
❖ আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ আযরাকী, **আখবারু মক্কা** (বৈরূতঃ দারুল উন্দলূস, তা.বি)
❖ আব্দুল মালেক ইবন হিশাম, **আস-সীরাতুন্ নাবাওয়ীয়্যাহ** (কায়রোঃ শিরাকাতুন মাকতাবা ওয়া মাতবা'আতুল মুস্তফা, ২য় সংস্করণ, ১৩৭৫ হি./১৯৫৫ খ্রি.)
❖ আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর জালালুদ্দিন সুয়ূতী, **তারীখুল খুলাফা** (বৈরূতঃ মাকতাবাতু নায্যার, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.)
❖ আব্দুর রহমান ইবন আহমদ ইবন রজব হাম্বলী, **কালিমাতুল ইখরাছ ওয়া তাহক্বীকু মা'নাহা** (মাকতাবাতুশ শামেলা, ৪র্থ সংস্করণ)
❖ আবুল কাসেম ইবন মুহাম্মদ ইবন তাইমিয়্যাহ্, **জামেউর রাসায়েল** (রিয়াদঃ দারুল আতা, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.)

- ❖ আহমদ আহমদ গালূস, **দা'ওয়াতুর রসূল আলাইহিস সালাম** (বৈরূতঃ মুআ'স্সাতুর রিছালা, ১ম সংস্করণ ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.)
- ❖ আবুবকর আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবিদ্ দুনিয়া, তাহাকীক: রমজান ইউসুফ, **কাসরুল আমল** (বৈরূতঃ দারু ইবনি হাজম, ২য় সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.)
- ❖ মাওলানা সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, **আহসানুল বয়ান,** অনূদিতঃ সফিউর রহমান রিয়াযী (রিয়াদঃ ইসলামিক সেন্টার আল-মাজমাআ'হ, তা.বি)
- ❖ জামালুদ্দিন জাওযী, **আল-মুন্তাজিম ফী তারিখীল উমাম ওয়াল মুলূক** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.)
- ❖ শামসুদ্দিন আয-যাহাবী, **তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফিয়াতুল মাশাহিরে ওয়াল আ'লাম** (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.)
- ❖ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, **তারীখুত্ তাবারী** (বৈরূতঃ দারুত্ তুরাছ, ২য় সংস্করণ, ১৪৮৭ হি.)
- ❖ আবুল হাসান আলি ইবন আবিল কিরাম ইবন মুহাম্মদ আস-সাইবানী, **আল-কামিলু ফীত্ তারীখ** (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.)
- ❖ মুযীরুদ্দিন আব্দুর রহমান হাম্বলী, **আত-তারীখুল মু'তাবার** (সিরিয়াঃ দারুন্ নাওয়াদের, ১ম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১১ খ্রি.)
- ❖ ইয়াকুব ইবন সুফিয়ান, **আল-মা'রেফাতু ওয়াত্ তারীখ** (বৈরূতঃ মু'আস্সাতুর রিছালা, ২য় সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.)
- ❖ আবুল হাসান আলি ইবন ইসমাইল, **আল-মুহকাম ওয়াল মুহিতুল আ'জাম** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.)
- ❖ আবুল হাসান আলি ইবন ইসমাইল, **আল-মুখাস্সাস** (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াউত্ তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.)
- ❖ আব্দুল আযীয ইবন মুহাম্মদ, **মাওয়ারিদুজ্ জামআ'ন লিদুরুসি জ্জামান** (কায়রোঃ ৩০তম সংস্করণ, ১৪২৪ হি)
- ❖ আবুল হাসান আলি ইবন ইসমাইল, **আল-মুহকাম ওয়াল-মুহিতুল আ'যম** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.)
- ❖ মুহাম্মদ ইবন আবি বকর ইবনুল কায়্যিম জাওযী, **ই'লামুল মু'ক্কীইন আ'ন রাব্বিল আ'লামিন** (১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.)
- ❖ শামছুদ্দিন আয-যাহাবী, **তারীখুল ইসলাম** (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.)
- ❖ ডা. জাকির নায়েক, **লেকচার সমগ্র** (সবখণ্ড একত্রে) সম্পাদনায় আল-হাজ্ব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা: সত্য প্রকাশ, জানুয়ারি- ২০১১ খ্রি.)
- ❖ স্যার সৈয়দ আমীর আলী, **দ্যা স্পিরিট অব্ ইসলাম,** ড. রশীদুল আলম অনূদিত (ঢাক: মল্লিক ব্রাদার্স, ৪র্থ মুদ্রণ, মার্চ ১৯৯৪ খ্রি.)
- ❖ এ.কে.এম. নাজির আহমদ, **ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি** (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৫)
- ❖ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা,** অনুবাদঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাক: আধুনিক প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণঃ ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.)
- ❖ মরিয়ম জামিলা, **ইসলাম ও আধুনিকতা,** অনূদিতঃ এ কে এম হানিফ (ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণঃ ২০০৩ খ্রি./১৪২৪ হি.)
- ❖ আব্দুল হামিদ ফায়যী মাদানী, **দ্বীনে-ইসলামে সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য** (www.dawh-mjmah.com)
- ❖ সম্পাদনা পরিষদ, **ইসলামী বিশ্বকোষ** (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১৯৮৯ খ্রি.)

- ডা. এন.সি.বোস, **কোরআন-বাইবেল, বেদ বিজ্ঞান** (ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ: ২০০৪ খ্রি.)
- সায়্যিদ কতুব শহীদ, **ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা,** অনূদিত: আব্দুল মালিক (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)
- সা'ঈদ হানী, **আল-ইসলাম** (কায়রো: মাকতাবাহ ওয়াবাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.)
- মুহাম্মদ ইবনে জামিল জয়নু, ***মাজমুয়াতু রেসায়েলেত তাওজিহাতুল ইসলামিয়া,*** (রিয়াদ: দারুস্ সাম্য়ী লিন্নশরে ওয়াত্ তাওযী, ৯ম সংস্করণ: ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.)
- আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আস-সিরাজ, ***হাদিসুস্ সিরাজ*** (কায়রো: আল-ফারুকুল হাদীসাহ্ লিত্ ত্বাবাআ'তী ওয়ান্ নুশরে, ১ম সংস্করণ- ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.)
- মু. আবদুর রব মিয়া, ***ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ*** (ইফাবা, নামায অধ্যায়, ২০০৪ খ্রি.)
- আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, ***ইসলামে যাকাতের বিধান,*** মাওলানা আব্দুর রহীম অনুদিত (ই.ফা.বা, ২য় প্রকাশ ২০০৮ খ্রি.)
- মুহাম্মাদ ইবন সালিহ উসাইমীন, ***আল-কাওলুল মুফীদ*** (দাম্মাম: দারু ইবনিল জাওযী, তা.বি)
- শামসুল হক আযীম আবাদী, ***আউনুল মা'বূদ*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি.)
- আব্দুর রহমান মুবারকপূরী, ***তুহফাতুল আহওয়াযী*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)
- আব্দুর রাউফ মুনাবী, ***ফাইদুল কাদীর*** (কায়রো: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি.)
- জাবেদ মুহাম্মদ, ***আল্লাহর হক মানুষের হক*** (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশ: জুলাই, ২০১৫)
- বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ***অধ্যায় ৫১ অধিকার সমূহ, ধারা- ১২৬৩***, তৃতীয় ভাগ, প্রথম প্রকাশ, ইফাবা
- আবুল হাসান আলি ইবন মুহাম্মদ মাওয়ারদী, ***আল-আহকামুস্ সুলতানিয়্যাহ্*** (কায়রো: দারুল হাদিস, তা.বি)
- মোঃ মাহমুদ বিন সাঈদ, ***ইসলামে উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার*** (পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স,বাংলাবাজার, ঢাকা, তা.বি.)
- আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক মু'আফিরি ইবনু হিশাম (রহ.), ***সিরাতুন্নবী (সা.)*** (ঢাকা: ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.)
- মাওলানা রুহুল আমীন খান, ***সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে মহানবী (সা.) এর আদর্শ এবং ইসলামী সমাজে তার প্রতিফলন*** (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.), ই.ফা.বা. বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.)
- সম্পাদনা পরিষদ, ***সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ*** (ঢাকা: ইফাবা, তা.বি)
- ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, শিপ প্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত ; ***বাংলা একাডেমিক ব্যবহারিক বাংলা অভিধান;*** ঢাকা : বাংলা একাডেমি; ২০০৭
- ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ***আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*** (ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, মে ২০০৯)
- Longman Dictionary of Contemporary English (Essex: Pearson Education Limited, England, 2010)
- Kuran, Timur, (2004) **'*Why the Middle East is Economically underdeveloped* :Historical Mechanisms of Institutional stagnation'**, The Journal and Economic Perspectives, summer
- Makdisi, 1981, Pp. 35-74; Hodgson, 1977, Volume 2, p.124;Kahf, 2004 and Ahmad, 2004

- ❖ Inalcik Halil (1970) `***The Rise of the Ottoman Empire'***, in Holt , et al, Volume 1,
- ❖ **The Oxford Dictionary** (Oxford: 1961 A.D) Wet. Stacey, **A critical History of Greek Philosophy** (London: 1967 A.D), P. 128; J. Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics (New York: 1958 A.D) The Oxford Dictionary
- ❖ R. Bailay, **Biblical perspectives on death** (London: Philadelphia, Fotress Press-1985)
- ❖ T. G Schur, **Illnes and Crisis, Coping the Jewish way** (New York: National Conference of Synagogue Youth, 2nd ed. 1987)
- ❖ J. D Bleich, **Time of Death in Jewish Law** (New York: Berman Pubishing Co. 3rd ed- 1991)
- ❖ H. Rabinowicx, **A Guide to life, Jewish Laws and Cutoms of Mouring,** (London: Jewish Chromichle, 2nd ed. 1982)
- ❖ M. Lamm, **The Jewish way in death and mourning** (New York: Jonathan David, 1st ed. 1969)
- ❖ W. Herberg, **Protestant-catholic-Jew, An Essay in American Religious Sociology** (New York: Anchor Books, 2nd ed. 1960)
- ❖ H. Hendrick, **The Resurrection Narratives of the Synoptic Gospels** (London: Geottrey Chapman- 1984)
- ❖ W. Herberg, **Protestant-catholic-Jew, An Essay in American Religious Sociology** (New York, Anchor Books, 2nd ed - 1960)
- ❖ Aryan Sun Mith, **The Origin of Religion** (London: Truber and Co, 2nd ed. 1987)
- ❖ Sramanera Jivaka, **Growing up into Buddhism** (Calcutta: Maha Bodhi Book Agency, 1st ed.- 1998)
- ❖ (Department of Al-Quran & Islamic Studies, Islamic University, Kushtia: The Quranic Studies, A Half Yearly Research Journal, june- 2017)
- ❖ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, ৫৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৭ খ্রি.)
- ❖ সামীম মোহাম্মদ আফজল : **জঙ্গিবাদের উৎস মওদুদীপন্থীদের ভ্রান্ত শিক্ষা রাজনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা,** ইফাবা, তৃতীয় প্রকাশ (রাজস্ব),মার্চ ২০১৬
- ❖ মাওলানা কাজী আবু হুরায়রা, *বিশ্ব সংঘাত নিরসনে মহানবী (সা.) এর আদর্শ.* নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***সন্ত্রাস প্রতিরোধ ইসলাম,*** ঢাকা : ইফাবা, ৩য় সংস্করণ,২০০৯
- ❖ মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ সম্পাদিত, ***সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম*** (ঢাকা: বি.আই.আই.টি. ২০০৫ খ্রি.)
- ❖ তারেক শামসুর রহমান, ***নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*** (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২য় সংস্করণ, ২০০৮)
- ❖ ড. আব্দুর মুগনী, ইসলাম ও সন্ত্রাস, নূরুল ইসলাম সরকার অনূদিত, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ সম্পাদিত, **সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম** (ঢাকা: বি.আই.আই.টি, ২০০৫ খ্রি.)
- ❖ কে. এম. এ. হোসাইন, **ইসলাম কি ও কেন?** (ঢাকা: ধর্মীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ইসলাম প্রচার মিশন, ২০০২ খ্রি.)
- ❖ চৌধুরী, *সন্ত্রাস: মুসলমানদের উপর অযৌক্তিক দোষারোপ,* দৈনিক ইনকিলাব, ১লা আগস্ট, ২০১১ খ্রি.
- ❖ ড. মোঃ ময়নুল হক, সন্ত্রাস, সন্ত্রাবাদ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ; নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ***সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে ইসলাম;*** ঢাকা: ইফাবা.,৩য় সংস্করণ; ২০০৯
- ❖ মুহাম্মদ তাহের হোসেন,*জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম,*ই.ফা.বা., প্রকাশকাল; ২০১১
- ❖ রওশান আলী খন্দকার, *সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.),* ই.ফা.বা, প্রকাশনা; ২৩১৭, প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০৫

- ❖ মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার, **সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা** (ঢাকা: ইফাবা, ৫৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৮)
- ❖ ড. আহমাদ আলী, **ইসলামের শাস্তি আইন** (ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ ২০০৯ খ্রি.
- ❖ অধ্যক্ষ মো: আলতাফ হোসেন, **জুরিস্প্রুডেন্স** (হিরা পাবলিকেশন্স, সংস্ক. ১, জুলাই ২০১১
- ❖ প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমান, **সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.)**, রওশন আলী খোন্দকার সংকলিত (ঢাকা: ইফাবা, প্রকাশ: ২০০৫ খ্রি.
- ❖ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, **আল্লাহর পথে দা'ওয়াত** (আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, ২০০৯
- ❖ জাকিয়া সুলতানা জলি; মো: শাহিনুর রহমান, **জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লীগ্যাল থিওরী** (সম্পাদনায় : এম জগলুল কবির,পাইভ জুয়েল পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩
- ❖ ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, **ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ** (আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, ২০০৯
- ❖ ড. আমিনুল ইসলাম, ***"জঙ্গিবাদ : ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মূল্যায়ন"***, ঢাকা : মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০১১
- ❖ সম্পাদনা পরিষদ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, প্রফেসরস প্রকাশন, বর্ষ-২২, সংখ্যা-২৫০, এপ্রিল ২০১৭
- ❖ প্রফেসর, ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান, FRCS (Glasgow), ***যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানো হয়েছে*** (ঢাকা: কুরআন রিচার্স ফাউন্ডেশন, গবেষণা সিরিজ ৩০, ২য় সংস্করণ: ২০১৪ খ্রি.
- ❖ আসমা বারলাস, ***জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ অপব্যাখ্যার রাজনীতি***, মেসবাহ উদ্দীন আহমদ অনুদিত, মুহাম্মদ আবদুল আজিজ সম্পাদিত, ***সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম*** (ঢাকা : বিআইটি, ২০০৫)
- ❖ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, ৪৯ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০০৯)
- ❖ মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান আশরাফী, ***অগ্রপথিক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ইসালাম*** (ঢাকা: ইফাবা: অক্টোবর ২০১৬ খ্রি.)
- ❖ এডভোকেট মুজিবুর রহমান, **ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌম, শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ৯১**, ঢাকা: সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ১৯৯১
- ❖ প্রফেসর ড. খন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ***আল্লাহর পথে দাওয়াত*** (https://islamhouse.com/read/bn.)
- ❖ দৈনিক ইনকিলাব (https://www.dailyinqilab.com.bd)
- ❖ দৈনিক নয়া দিগন্ত (https://www.dailynayadiganta.com.bd)
- ❖ দৈনিক ইত্তেফাক (https://www.ittefaq.com.bd)
- ❖ দৈনিক যুগান্তর (https://www.jugantor.com.bd)
- ❖ দৈনিক জনগন্ঠ (https://www.dailyjanakantha.com.bd)
- ❖ দৈনিক সমকাল (https://samakal.com.bd)
- ❖ দৈনিক আমার দেশ (https://www.amardesh.com.bd)
- ❖ দৈনিক ভোরের কাগজ (https://www.bhorerkagoj.com.bd)
- ❖ দৈনিক মানবকন্ঠ (https://www.manobkantha.com.bd)
- ❖ দৈনিক মানবজমিন (https://www.mzamin.com.bd)
- ❖ দৈনিক কালের কন্ঠ, (https://www.kalerkantho.com.bd)
- ❖ দৈনিক সংবাদ (https://www.sangbad.net.bd)
- ❖ দৈনিক যায়যায়দিন (jaijaidinbd.com.bd)

- ❖ দৈনিক আজাদী (https://www.dainikazadi.net.bd)
- ❖ দৈনিক জনতা (https://www.dainikjanata.com.bd)
- ❖ দৈনিক পূর্বকোণ (https://www.dainikpurbokone.net.bd)
- ❖ দৈনিক সংগ্রাম (https://www.dailysangram.com.bd)
- ❖ আমাদের অর্থনীতি (https://www.amaderorthoneeti.com.bd)
- ❖ আলোকিত বাংলাদেশ (https://www.alokitobangladesh.com.bd)
- ❖ দৈনিক সময়ের আলো (https://www.shomoyeralo.com.bd)
- ❖ বাংলাদেশ প্রতিদিন, (https://www.bd-pratidin.com.bd)
- ❖ দৈনিক বণিক বার্তা (https://www.bonikbarta.net.com.bd)
- ❖ The Daily Star, (https://www.thedailystar.com)
- ❖ Daily Sun (https://www.daily-sun.com)
- ❖ ঢাকা ট্রিবিউন (https://bangla.dhakatribune.com.bd)
- ❖ The New Nation (https://www.thedailynewnation.com)
- ❖ New Age (https://www.newagebd.net.com)
- ❖ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম (https://.bangla.bdnews24com.bd)
- ❖ বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম (https://www.banglanews24.com)
- ❖ জাগোনিউজ২৪.কম (https://www.jagonews24.com)
- ❖ বিবিসি বংলা (https://www.bbc.com/bengali/news)
- ❖ প্রিয়.কম (https://www.priyo.com.bd)
- ❖ দৈনিক গ্রামের কাগজ, (http://gramerkagog.com)
- ❖ ন্যাশনালনিউজ,(http://www.nationalnews.com.bd)
- ❖ আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন, (https://www.anandabazar.com)
- ❖ বাংলা ট্রিবিউন, (https://www.banglatribune.com)
- ❖ সময়ের কন্ঠস্বর, (https://www.somoyerkonthosor.com)
- ❖ The Guardian, (https://www.theguardian.com)
- ❖ www.benarnews.org › bengali › news
- ❖ সুব্রত শুভ (https://blog.muktomona.com)
- ❖ risingbd.com (https://www.risingbd.com)

এ্যাবষ্ট্রাক্ট

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার ধর্ম। পবিত্র কুরআন ও ইসলাম চায় মানবজাতীর মাঝে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ

নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে সম্প্রীতি সোনালী সুতোয় গাঁথতে চায়। চায় পৃথিবীকে শান্তির সবুজ শালবনে পরিণত করতে, অগ্নিগর্ভ বানাতে নয়। যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদারতা ও সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাই সার্বজনীন মানবতার ধর্ম ইসলাম বিশ্বজনীন উদারতা ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টির প্রধান অন্তরায় সাম্প্রদায়িকতাকে সমূলে বিনাশ করেছে। শান্তির ধর্ম ইসলামে সহিংসতা, ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদ, অশান্তি, মানুষ হত্যা ও বর্বর হামলার স্থান নেই। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব আজ অশান্তির আগুনে পুড়ছে। মানুষে-মানুষে হানাহানি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, আদর্শিক গোঁড়ামী, পাশবিক হিংস্রতায় করাল গ্রাসে ক্ষত বিক্ষত সমগ্র পৃথিবী; যার মূল কারণ হলো আমাদের মাঝে উদারতা ও সম্প্রীতির প্রচ- অভাব। সহিংসতা, ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বর্তমান বিশ্বের এক জটিল বাস্তবতা। বর্তমানে সন্ত্রাস, সহিংসতা ও জঙ্গিবাদের করাল গ্রাসে পৃথিবী ব্যাপী অশান্তির দাবানলে রাষ্ট্র আজ চরমভাবে উৎকণ্ঠিত। এ অশান্তির দাবানল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশও মুক্ত নয়। আন্তর্জাতিক সহিংসতা ও জঙ্গিবাদের ধারাবাহিকতায় প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে এর বিষবাস্প দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্ব জঙ্গিবাদ মানবসমাজকে ঠেলে দিচ্ছে এমন একটি অন্ধকার সময় ও স্থানের দিকে, যেখানে গণতান্ত্রিক সমাজের ধারণাগুলো বিলুপ্ত। যেখানে বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তারা সমাজ কাঠামোতে ভাঙ্গন ধরিয়ে সুচতুর কৌশলে মানবসমাজে বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে তা করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপ্রিয়। এ দেশের ইতিহাসে কখনো ধর্মীয় সংঘাত, হানাহানি ও রক্তারক্তি দেখা যায়নি। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, কাশ্মীর বা অন্যত্র যেমন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এবং একই ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ ও দলের মধ্যে হানাহানি ও রক্তারক্তির ঘটনা ঘটেছে কিন্তু বাংলাদেশে তা কখনোই ঘটেনি। তবে বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রতা ও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উন্মেষ লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে উগ্রতা, সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশীয় নব্য জঙ্গিদের সাথে বহির্বিশ্বের জঙ্গিদের নিবিড় সম্পৃক্ততার বিষয়ে বিভিন্ন অভিযানে এ দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। সুতরাং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ সরকার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এ গবেষণা কর্মটি তার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাই এ ব্যাপারে কার্যক্রম পরিচালনা করতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তার দিক নির্দেশনা এ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে প্রয়াস চালানো হয়েছে। সে সাথে জঙ্গিবাদের শাস্তির বিধান বর্ণনার মাধ্যমে সমাজ থেকে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে প্রশাসন ও সরকারকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আরো অধিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে। শিরোনামের বিষয়বস্তু যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা ও আলোচনার গুরুত্ব বিচারে এ অভিসন্দর্ভটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো হলো: (১) **ইসলামের মর্মবাণী উদারতা ও সম্প্রীতির পরিচিতি।** এ অধ্যায়ে ইসলামের মর্মবাণী, উদারতা ও সম্প্রীতির পরিচয়, ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির অপরিহার্যতা, আল-কুরআনে উদারতা ও সম্প্রীতি, আল-হাদীসে উদারতা ও সম্প্রীতি, ঈমান আকীদা ও ইবাদত বন্দেগীতে উদারতা ও সম্প্রীতি, অমুসলিমদের সাথে আচার-আচরণে উদারতা ও সম্প্রীতি, ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির মূলনীতি, ও ইসলামে উদারতা ও সম্প্রীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (২) **সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের পরিচয়।** এ অধ্যায়ে সহিংসতা ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের পরিচিতি, চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ -এর পারিভাষিক পরিচিতি, পারিভাষিক পরিচিতির বিশ্লেষণ, ইসলামে চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রকারভেদ, সন্ত্রাসের নেপথ্যে আসলে কারা, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের উৎস, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সূত্রপাত ও বিস্তার, সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের কারণ ও প্রতিকার, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিভিন্ন কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (৩) **ইসলামের ইতিহাসে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ইতিবৃত্ত। এ অধ্যায়ে** ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস, বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ, বাংলাদেশীয় জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রবাদী জঙ্গি দলসমূহ, কালো তালিকাভুক্ত দল সমূহ, বিশেষ ২৩ জেলায় জঙ্গি তৎপরতা, নিষিদ্ধ চারটি আত্মস্বীকৃত জঙ্গি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনসমূহ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জঙ্গি সংগঠনগুলো, মায়ানমার ভিত্তিক জঙ্গি গ্রুপ, জঙ্গি অর্থায়নে

Dhaka University Institutional Repository

অভিযুক্ত বিভিন্ন এনজিও সংস্থা, প্রকাশ্যে বিভিন্ন জঙ্গিদলের উত্থান পর্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। **(৪) বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার বিবরণ**। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলার ইতিহাস, আনসার আল ইসলাম ও আইএস এর জঙ্গি কার্যক্রম, আনসার আল ইসলাম, নব্য জেএমবি জঙ্গি হামলা, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা, বিভিন্ন জঙ্গিদলের সশস্ত্র হামলা সমূহের বিবরণ সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। (৫) **জিহাদের নামে বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**। এ অধ্যায়ে বিভ্রান্তির সমকালীন প্রেক্ষাপট, জিহাদ বা কিতাল বিষয়ক অপপ্রচার, ইসলামে জিহাদের নামে কাফির ও মুশরিক হত্যায় বিভ্রান্তি, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় খারিজীগণের বিভ্রান্তি, ইসলামী শরীয়তে প্রকৃত জিহাদ ও তার পূর্বশর্ত, জিহাদের শাব্দিক অর্থ, জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা, জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্যাবলী, জিহাদ বা কিতাল ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী, জিহাদের ফযীলত ও বিধান, জিহাদ বা কিতাল সম্পর্কে আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের কতিপয় বিভ্রান্তির অপনোদন, বাতিল দল-উপদলসমূহের জিহাদ বা কিতাল বিষয়ক বিভ্রান্তি, বাতিল ও খারিজীগণের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণ, সমাজ পরিবর্তনে সাহাবী ও পরবর্তীদের কর্মধারা, জিহাদ বনাম সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(৬) **ইসলামী আইনে ধর্মান্ধতা সহিংসতা ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান**। **এ অধ্যায়ে** ইসলামের নামে সহিংসতা, ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদ সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান ও সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে সার্বিক মূল্যায়নে কিছু প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটির পরিশিষ্টে গবেষণার সার-সংক্ষেপের উপর একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহার এবং গ্রন্থপঞ্জী বা তথ্যসূত্র সংযোজিত হয়েছে।